প্রবেশিকা
বাঙলা রচনা
ও
নিবন্ধ

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

প্রবেশিকা বাঙলা রচনা ও নিবন্ধ

(৭ম হইতে ১০ম শ্রেণীর পাঠ্য)

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী
এম-এ, বিদ্যারত্ন, সাঙ্খ্যভূষণ
অধ্যক্ষ, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
বঙ্গবাসী কলেজ, কলি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

নবম মুদ্রণ : বৈশাখ, ১৩৬৫

সাড়ে তিন টাকা (৩.৫০ ন. প.)

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

(ক)

ব্যাকরণ ও রচনা

শব্দ ১
সন্ধি ও সমাসের কথা ৯
বানান—অশুদ্ধ ও শুদ্ধ ১১
একই শব্দের দুইপ্রকার বানান ১৭
সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দাবলী ২০
প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দাবলী ২৯
বিপরীতার্থক শব্দাবলী ৩১
নানার্থক শব্দাবলী ৩৫
একার্থক ভিন্নশব্দাবলী ৩৯
শব্দার্থগত অশুদ্ধি ৪০
লিঙ্গঘটিত অশুদ্ধি ৪২
একই শব্দের বিভিন্ন পদে প্রয়োগ ৪৬
বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (Idiom) ৫০
শব্দের বিচিত্র বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ ৬২
বিশেষণের সুপ্রয়োগ ৭২
বিশেষণ-সৃষ্টি ৭৪
বাক্য
উদ্দেশ্য ও বিধেয় ৭৯
বাক্যের প্রকারভেদ ৮৫
বাক্যের রূপান্তরীকরণ ৮৭
বাক্‌সংহতি ৯১
ভাবের বিচিত্র প্রকাশ ৯৮
বাক্যের অর্থান্তর ১০০
বাক্যে কয়েকটি অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ ১০১
বাক্য-বিশ্লেষণ ১০৪

বিষয়			পৃষ্ঠা
(খ)			
ভাব-সম্প্রসারণ	...	...	১০৭
ভাব-সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যা (পার্থক্য)	....	...	১১৬
সুভাষিতাবলী—প্রবাদ	....	...	১১৮
ভাব-সঙ্কোচন	...	...	১২৬
ভাবের পুনঃপ্রকাশ	...	...	১৩২
(গ)			
অনুবাদ	...	...	১৩৩
ভাষায় রূপান্তরীকরণ	...	...	১৩৯
অনুশীলনী	...	...	১৪৪
(ঘ)			
নিবন্ধ			
উদ্ভিদ্-প্রসঙ্গ			
ধান্য	...	...	৫
কদলীবৃক্ষ	...	...	৭
পাট	...	...	৮
একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের আত্মকথা	...	...	১০
প্রাণি-প্রসঙ্গ			
গোরু	...	...	১৪
অশ্ব	...	...	১৫
উষ্ট্র	...	...	১৭
কুকুর-বিড়াল	...	...	১৯
পক্ষী	...	...	২১
কাক	....	...	২৩
পিপীলিকা	...	...	২৪
মধুমক্ষিকা	...	...	২৬

বিষয়			পৃষ্ঠা
খনিজ সম্পদ্			
লৌহ	...	...	২৮
পাথুরে কয়লার আত্মকাহিনী	...	...	২৯
পেট্রোল	...	...	৩১
বিজ্ঞানের দান			
বিজ্ঞানের দান	...	...	৩৪
মুদ্রাযন্ত্র	...	...	৩৭
কাগজ	...	...	৪০
বিমানপোত	...	...	৪২
বেতার	...	...	৪৫
চলচ্চিত্র—নির্ব্বাক্ ও সবাক্	...	...	৪৭
বিদ্যুতের কাহিনী (ক. বি. ১৯৫১)	...	...	৫০
যুদ্ধ—প্রাচীন ও আধুনিক	...	...	৫৩
নৈসর্গিক			
মেঘ ও বৃষ্টি	...	...	৫৭
ভূমিকম্প	...	...	৫৮
নদী	...	...	৬১
গঙ্গানদীর আত্মকথা (ম. প. ১৯৫৩)	...	...	৬৩
চরিতকথা-প্রসঙ্গ			
ভীষ্ম	...	...	৬৬
বুদ্ধদেব	...	...	৬৮
শ্রীচৈতন্য	...	...	৬৯
মহাত্মা গান্ধী	...	...	৭২
নেতাজী	...	...	৭৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	...	...	৭৮
হাজি মহম্মদ মহসীন	...	...	৮০
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ	...	...	৮২
কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না	...	...	৮৪
রবীন্দ্রনাথ (ম. প. ১৯৫৫)	...	...	৮৬
স্বামী বিবেকানন্দ (ম. প. ১৯৫২)	...	...	৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভ্রমণপ্রসঙ্গ	
দেশভ্রমণের মূল্য	৯২
ভ্রমণ—প্রাচীন ও আধুনিক	৯৫
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান	
বারাণসী	৯৮
অজন্তা	১০১
পূজা ও উৎসব	
দুর্গাপূজা	১০৩
সরস্বতীপূজা	১০৫
ঈদ্	১০৬
মহরম	১০৮
দেহচর্চ্চা	
সাঁতার	১১০
বাহিরের খেলা—দেশী ও বিদেশী	১১১
স্বাস্থ্যই সম্পদ্	১১৩
হিতাহার ও মিতাহার	১১৫
একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা (ম. প. ১৯৫৩)	১১৬
সমালোচনা ও বিতর্কিকা	
লক্ষ্মণ ও ভরত	১১৯
আমার প্রিয় গ্রন্থ	১২০
আমার প্রিয় কথাসাহিত্যিক	১২৩
আমার প্রিয় কবি	১২৬
ছায়াচিত্র ও সমাজ-জীবন	১২৯
বাঙলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে কি না ...	১৩৩
পল্লী ও নগরী	১৩৪
ছাত্র ও রাজনীতি	১৩৭
লেখাচিত্র	
হিমাচল	১৪১
পল্লীর বর্ষা	১৪৩

বিষয়			পৃষ্ঠা
পঞ্চাশের মন্বন্তর	…	…	১৪৪
আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালী	…	…	১৪৯
বাঙলাদেশে গ্রীষ্মকাল (ম. প. ১৯৫৩)	…	…	১৫২

নক্‌সা

রিক্সাভ্রমণ	…	…	১৫৪
একটি ঝাঁকামুটের রোজনামচা	…	…	১৫৬

পত্র-প্রবন্ধ

গ্রীষ্মাবকাশযাপনের প্রস্তাবসংবলিত পত্র		…	১৫৮
গ্রামের জলকষ্ট-নিবারণের জন্য পত্র	…	…	১৫৯
একটি স্মরণীয় দিবসের বর্ণনা করিয়া পত্র (ম. প. ১৯৫৫)		…	১৬১

বিচিত্রা

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি"		…	১৬৪
দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ		…	১৬৫
"বিনা স্বদেশীভাষা মিটে কি আশা ?"	…	…	১৬৭
কাজ করবি শক্ত, কাজের হবি ভক্ত	…	…	১৬৯
ব্যবসায়ে বাঙালী	…	…	১৭০
বাঙলার একান্নবর্ত্তী পরিবার	…	…	১৭২
জীবসেবাই শিবসেবা	…	…	১৭৫
সহযোগিতা ও সঙ্ঘশক্তি	…	…	১৭৭
পল্লী-উন্নয়ন	…	…	১৭৯
ছাত্রের সাধনা	…	…	১৮২
নারীশিক্ষা ও গৃহধর্ম্ম	…	…	১৮৪
স্বাবলম্বন	…	…	১৮৭
সাধারণ পাঠাগার	…	…	১৮৮
নিরক্ষরতা ও সমাজজীবন	…	…	১৯০
পশ্চিম-বাঙলার ভবিষ্যৎ	…	…	১৯২
সময়ের মূল্য	…	…	১৯৪
"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" (ম. প. ১৯৫৫)			১৯৬
"পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য"	…	…	১৯৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
আমার জীবনের আদর্শ	...	...	২০০
রণরঙ্গে বাঙালী	...	...	২০৩
বঙ্গবিভাগ	...	...	২০৫
বাধ্যতামূলক সামরিক-শিক্ষা	...	...	২০৭
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	...	...	২০৯
নিরুদ্দেশ-যাত্রা	...	...	২১১
উদ্বাস্তু-সমস্যা ও পুনর্বাসন	...	...	২১২
"বিত্ত হ'তে চিত্ত বড়, এই ভারতের সত্য বাণী" (ক. বি. ১৯৫১)			২১৫
বাঙলার কৃষিজীবী (ক. বি. ১৯৪৫, ১৯৫০ ও ম. প. ১৯৫২)			২১৮
"যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে" (ম. প. ১৯৫২)			২২১
একটি ঝড়ের রাতে (ম. প. ১৯৫২)	...	...	২২২
"পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে" (ম. প. ১৯৫৩)			২২৪
তোমার দেখা একটি মেলা (ম. প. ১৯৫৩)		...	২২৬
"জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে কল্যাণপূত কর্ম্মে" (ম. প. ১৯৫৪)			২২৯
আধুনিক যুগে বেতারের প্রভাব (ম. প. ১৯৫৪)		...	২৩১
বঙ্গদেশে শরৎকাল (ম. প. ১৯৫৫)	...	...	২৩৩
বনভোজনের বর্ণনা (ম. প. ১৯৫৬)	...	...	২৩৫
বাঙলাদেশের পশুপক্ষী (ম. প. ১৯৫৬) ...		...	২৩৮
"হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস—" (ম. প. ১৯৫৬)			২৪১
দেশোন্নতির কাজে বিজ্ঞানের আবশ্যকতা (ম. প. ১৯৫৬)	...		২৪৩

সঙ্কেতে নিবন্ধ

১। বাঙলার কুটীরশিল্প, ২। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ৩। স্ত্রীশিক্ষা ও গৃহস্থালী, ৪। বিপদে ধৈর্য্য, ৫। বাঙলার শিল্প, ৬। শীতকালে বাঙলাদেশের শোভা, ৭। খাদ্যসমস্যা, ৮। ভারতের বনসম্পদ, ৯। "রৈল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে" ২৪৬-২৫১

———

মুখবন্ধ

নূতন গ্রন্থে যদি সত্যকার নূতনত্ব না থাকে, তাহা হইলে পাঠকসমাজে তাহার আবির্ভাব নিতান্তই নিরর্থক। পূর্ব্ব-প্রকাশিত সমজাতীয় গ্রন্থের মাত্র সংখ্যাবৃদ্ধি কোন চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকাগণের শুভাকাঙ্ক্ষী গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমার 'প্রবেশিকা বাঙলা রচনা ও নিবন্ধ' যাঁহাদের উদ্দেশ্যে রচিত, তাঁহারা আমার সুপরিচিত এবং পরমস্নেহভাজন ছাত্রছাত্রী। তাঁহাদের প্রয়োজন, তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি; কারণ আমার প্রাক্-কলেজীয় জীবন দীর্ঘ নয় বৎসর আমি প্রবেশিকা বিদ্যালয়েরই শিক্ষক ছিলাম। ক্লাসে পড়াইবার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভ করেন, সেই পদ্ধতিতেই আমার গ্রন্থ রচিত। প্রয়োজনীয় বিচিত্র বিষয়বস্তুর সুশৃঙ্খল বিন্যাস, জটিল তত্ত্বাবলীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান, প্রয়োজনমত প্রায়সমধর্ম্মী বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার বিশদীকরণ, প্রচুর উদাহরণের সমাবেশ এবং আদ্যন্ত সহজবোধ্য অথচ সরল ভাষা আমার 'প্রবেশিকা বাঙলা রচনা ও নিবন্ধ'-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজী Essay-র প্রতিশব্দরূপে 'রচনা'-কে গ্রহণ করা অসঙ্গত মনে করিয়া আমি Essay-কে 'নিবন্ধ' এবং Composition-কে 'রচনা' বলিয়াছি। অধ্যাপক Classen তাঁহার 'Style and Composition'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "*Composition* is mainly the ordering and arrangement of thought with a view to rendering it clear and intelligible"। গান, কবিতা, ছবি, কথিকা, নিবন্ধ, নাটক—সবই Composition অর্থাৎ মানস-বিন্যাসের বাস্তব রূপায়ণ। আমাদের 'রচনা' এই অর্থতাৎপর্য্যই বহন করে। কবিতারচনা, গল্পরচনা, শয্যারচনা ("কার তরে তুই শয্যা, দাসী, **রচিস্** আনন্দে?"—সত্যেন্দ্রনাথ), "আমার গোপন প্রেম করেছে **রচনা** এই মুখখানি" (রবীন্দ্রনাথ), "ভূর্জ্জপাতায় নবগীত করো **রচনা**" (রবীন্দ্রনাথ), "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি **রচনা**" (রবীন্দ্রনাথ), বেণীরচনা, কবরীরচনা, মাল্যরচনা প্রভৃতির 'রচনা' ঐ Composition-ভাবাপন্ন এবং অতিব্যাপক ইহার প্রয়োগ। Essay ও একপ্রকার রচনা; কিন্তু Essay = 'রচনা' নয়।

এই গ্রন্থরচনায় কলিকাতা সেণ্ট পল্‌স্ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্ররঞ্জন শিক্ষক-দ্বয় শ্রীমান্ পুষ্পেন্দু দাশগুপ্ত ও শ্রীমান্ ধীরেন্দ্ররঞ্জন ভট্টাচার্য্য আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পুষ্পেন আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং ধীরেন ছাত্রকল্প ; এই কারণে উঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনে আমি বিরত রহিলাম। ইতি।

কলিকাতা
দীপান্বিতা অমাবস্যা
কার্ত্তিক, ১৩৫৭

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপক,
বঙ্গবাসী কলেজ।

প্রবেশিকা বাঙলা রচনা ও নিবন্ধ

শব্দ

সামান্য একটি বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া বিপুলকলেবর একখানি মহাগ্রন্থ পর্য্যন্ত সকলই কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি। **বাক্য** আবার পদের সমষ্টি—পদগুলি পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে এমনভাবে মিলিয়া থাকে যে তাহাদের দ্বারা মনের একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। **পদ** স্বয়ংসিদ্ধ নয়, বিভক্তিযুক্ত **শব্দ**মাত্র। শব্দের আবার এক বা একাধিক অঙ্গ আছে, তাহাকে **বর্ণ** বলে। এই **শব্দের** কোনটি **মৌলিক**, কোনটি বা **গঠিত**। শব্দই সকল ভাষার মূল উপাদান। কিন্তু জগতে এমন কোন দেশ নাই, যেখানকার শব্দসম্ভার মাত্র সেই দেশের নৈসর্গিক বস্তুর মত দেশান্তরের সহিত সম্পর্কশূন্য ভাবে জন্মিয়াছে এবং গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন যে ইংরেজী ভাষা, তাহারও মধ্যে শুদ্ধ ইংলণ্ডীয় শব্দের স্থান কতটুকু? গ্রীক, লাটিন, কেল্‌টিক, শ্লাভনিক, হাই জার্ম্মান, লো জার্ম্মান, আধুনিক ইতালীয়, ফ্রেঞ্চ, এমন কি সংস্কৃত, আর্‌বী, ফার্সী, হিন্দুস্থানী, বাঙলা প্রভৃতি সংখ্যাহীন শব্দ ইংরেজের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া রূপান্তরলাভে ইংরেজী হইয়া গিয়াছে। বাঙলার সম্বন্ধেও এই কথা। অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ অবিকল-রূপে বাঙলায় রহিয়াছে (আরও আসিতেছে এবং প্রয়োজনানুসারে ভবিষ্যতেও আসিবে)। এগুলির নাম **তৎসম**। বহু সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বিশেষ নিয়মে রূপান্তরিত হইয়া বাঙলায় আসিয়াছে; ইহারা **তদ্ভব**। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের ভিতর দিয়া না আসিয়া সোজাসুজি বাঙলায় আসিয়াছে; কিন্তু বাঙলা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের ফলে বিকৃত হইয়া গিয়াছে—এগুলি **অর্দ্ধতৎসম** বা **ভগ্নতৎসম**। ইহা ছাড়া আছে বহু **দেশী** ও **বিদেশী** শব্দ। ইহাদের এবং পূর্ব্বোক্ত বাক্য, পদ প্রভৃতির বিশদ আলোচনা আছে **বাঙলা ব্যাকরণে**। বর্ত্তমান গ্রন্থ ব্যাকরণ নয় বলিয়া ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা এখানে আমরা করিব না। ভাষার ব্যাবহারিক দিক্‌টিই এ গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য।

তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দগুলিই, বলিতে গেলে, বাঙলাভাষার প্রাণ—ইহারাই খাঁটি বাঙলার নিদর্শন।

হাত, পা, কান, চোখ, মা, ভাই, বোন, কামার, কুমোর, বামুন, তাঁতী, জেলে, তেল, ঘি, নুন, ভুঁই, মাটি, চাঁদ, বাঘ, হাতী, পাখী, বাজ, গাই, ষাঁড়, গোরু, লোহা,

তামা, ঘড়া, পাথর, আম, পড়শী, রাই (রাধিকা), গাঁ, ঘোল, আঠার, আধ, পৌনে, কেয়া, সোহাগ, ননী, আমি, তুমি, আপন, না, আর, করে, বলে, বসে, খায়—এমন অসংখ্য **তদ্‌ভব শব্দ** বাঙলায় রহিয়াছে।

কেষ্ট, বিষ্টু, ছিষ্টি (-ছাড়া), অনাছিষ্টি, উচ্ছন্ন, নেমন্তন্ন, বয়েস, অভ্যেস, অবিশ্যি, সত্যি, মিথ্যে, গিন্নী, ঘেন্না, রোদ্দুর, রাত্তির প্রভৃতি **অর্দ্ধতৎসম** শব্দের সংখ্যাও বাঙলায় কম নয়। ইহারাও ক্ষেত্রবিশেষে সাহিত্যিক মর্য্যাদা লাভ করে : রবীন্দ্রনাথের

"ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্ব্বোধ অতি ঘোর—

যা-কিছু হারায় **গিন্নী** বলেন **কেষ্টা** বেটাই চোর"-এ স্থূলাক্ষর দুটি পদই অর্দ্ধতৎসম শব্দজাত।

তৎসম বা অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা বাঙলায় প্রচুর। ইহারা বাঙলাভাষার গৌরব তথা আভিজাত্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তদ্‌ভব শব্দ হালকা, অর্দ্ধতৎসম আরও হালকা। ভাবমহিমময় গুরুগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় (কি মৌখিক ভাষায়, কি সাহিত্যে) ইহাদের উপযোগিতা কম বলিয়া বক্তা বা সাহিত্যিককে সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইতে হয়। শুধু শব্দচয়নে নয়, সংস্কৃত কৃদন্ত-তদ্ধিতান্ত-সন্ধি-সমাসেরও আশ্রয় না লইলে চলে না।

কতকগুলি **দেশী** শব্দ বাঙলায় রহিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা তত বেশী না হইলেও, মূল্য যথেষ্ট। খোকা, ঢেঁকি, ধামা, ধুচুনী, কুলো, নাদা, ডোকলা, ছানি (বিচালি বা চোখের ব্যাধি), ডিঙ্গি, ঝাঁটা, চাটাই, মই, পাতনা, সাঙা (ঘরের), নোড়া, ঘোড়া ('ঘোটক' বহুপরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত—pseudo-Sanskrit)—এগুলি দেশী শব্দ।

বিদেশী বলিতে আমরা সেই সকল শব্দ বুঝি, যাহারা ভারতের বাহির হইতে আসিয়া নানাকারণে বাঙলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

বাঙলায় বিদেশী শব্দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক ফার্সী (তৎসহ আর্‌বী ও তুর্কী), ইহাদের নীচে ইংরেজী এবং ইংরেজীর নীচে পর্তুগীজ। এগুলি ছাড়া, ফরাসী, ইতালীয়, জাপানী, চীনা, অষ্ট্রেলিয়, ওলন্দাজ প্রভৃতি ভাষা হইতেও কিছু শব্দ বাঙলায় আসিয়াছে।

ফার্সী : ফার্সীর সহিত কিছু আর্‌বী ও তুর্কী শব্দও বাঙলায় আসিয়াছে। আচার্য্য সুনীতিকুমারের মতে বাঙলায় প্রচলিত ফার্সী শব্দের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

বাঙলায় বহুপ্রচলিত কয়েকটি ফার্সী শব্দঃ দরবার, হুজুর, আইন, আদালত, বাজেয়াপ্ত, মোকদ্দমা, নালিশ, পিয়াদা, খাজনা, তাঁবু, শিকার, মালিক, বাদশা, সেপাই, জমি, কানুন, তালুক, দারোগা, জবানবন্দী, মুন্সেফ, রায় (মামলার), কোরবানী, শহীদ, কাফের, কবর, হিসাব, মসজিদ, শরিয়ৎ, শিরনী, কসাই, আয়না, পরদা, দোয়াত, দালান, শিশি, সিন্ধুক, হালুয়া, হুঁকা, রেশম, শাল, কুলুপ, খানসামা, মখমল, খাতা, গোলাপ, ময়দা, চাবুক, জামা, তাকিয়া, আসমান, আওয়াজ, নেহাৎ, পেশা, পছন্দ, দখল, দরকার, নগদ, বেকুব, মজবুত, হজম, খোরাক, চশমা, চাপকান, তাজা, ওজন ইত্যাদি।

ইংরেজীঃ ইস্কুল, কলেজ, চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, সোফা, সেলেট, পেনসিল, ইস্ক্রুপ, টিকিট, ডাক্তার, নার্স, নম্বর, গেলাস, দেরাজ, বুরুশ, মেম (Madam—Ma'am), থিয়েটার, মোটর, ইঞ্জিন, লণ্ঠন, কানেস্তারা, পুলটিশ, বেলেস্তারা (Blister), পলস্তারা (Plaster), পালিশ, বার্নিশ, জজ, লাট (Lord), ব্যাঙ্ক, ফোন, চেক (Cheque), ব্যাগ, ফী, পার্ক, প্লাটফর্ম, ইঞ্চি, ফুট, ডেক, ডেস্ক (Desk), রেজেষ্ট্রি, ইনসিওর, হারমোনিয়াম, কোট, শার্ট, পিন, পিয়ন, আরদালি (Orderly), আড়কাটি (Recruiter), কাপ্তেন, মার্কিন (American—'merican), কফি, কাটলেট, কেরোসিন, লম্প (Lamp), চিমনি, রেলিং, রেল, ভোট, টিন, ট্রাম, বাস (Bus), মগ (Mug), জালিবোট (Jollyboat), কাপ, ডিশ, ফুটপাত, বোর্ড, আর্ট, ডজন, হুক (Hook), প্যাড, সিল্ক, ফ্লুট, বাথরুম, সোডাওয়াটার, এয়ারিং (Ear-ring), ফুটবল, ষ্টীল পেন, ফাউণ্টেন পেন, কডলিভার অয়েল, লেডি-ডাক্তার, কোচোয়ান (Coachman), হ্যাটকোট, কোটপ্যাণ্ট, মানি-ব্যাগ, হ্যাণ্ড-ব্যাগ, হেডমাষ্টার, ইষ্টিশন-মাষ্টার, ওয়াটার-প্রুফ, ট্রেড মার্ক, পোষ্ট-অফিস, পুলিশ কেস, আয়রন চেষ্ট, ডেইলি প্যাসেঞ্জার ইত্যাদি।

পর্ত্তুগীজঃ সাবান, চাবি, পাঁউরুটি, পেঁপে, গাঁদা (ফুল), গীর্জ্জা, পাদরি, তোয়ালে, নোনা (আতা), মিস্ত্রী, গরাদে, বন্দর ইত্যাদি।

ফরাসীঃ কুপন, রেস্তরাঁ, কাফে, কার্ত্তুজ ইত্যাদি।

জাপানীঃ রিক্‌শ, হারাকিরি ; **ইতালীয়ঃ** ম্যাজেণ্টা (রঙ) ; **অষ্ট্রেলীয়ঃ** কাঙ্গারু ; **আফ্রিকীয়ঃ** জেব্রা ; **রুশীয়ঃ** বলশেভিক।

কুইনাইন **পেরু** হইতে এবং আমাদের এত সাধের বাতাবি লেবু **বাতাভিয়া** (Batavia) হইতে আমদানী করা হইয়াছে।

উপরে যে শব্দগুলি লিখিত হইল, তাহারা এখন আমাদের কাছে আর বিদেশী নয়, **বাঙলা**। শুধু মুখের কথায় নয়, ইহাদের প্রায় সকলেই আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' হইতে মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি কেমন করিয়া স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেশী-বিদেশী উপাদানের সমন্বয়ে খাঁটি বাঙলার সাহিত্যিক রূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে :

"এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেন সাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্ত্তে পূরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছিল।"

—এইটুকুর মধ্যে **দেশী** (টের), **ইংরেজী** (ডেক-কাপ্তেন), **ফার্সী** (সাহেব-জানোয়ার), **তৎসম** (জল-স্রোত-মানুষ-বন্ধ-ক্ষণ), **তদ্ভব** (মাঝে) অর্থাৎ প্রায় সকল উপাদানই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্যাপ্টেন-কে যদি ইংরেজী-তৎসম বলি, 'কাপ্তেন'-কে বাঙালীর উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত (ইংরেজী) **অর্দ্ধতৎসম** অনায়াসেই বলিতে পারি।

কাব্যে, কথাসাহিত্যে, প্রবন্ধে, নাটকে এই বিচিত্র উপাদান প্রয়োজনমত প্রয়োগ করার অধিকার সকলেরই আছে। মাত্র অকারণ প্রয়োগই অসঙ্গত অর্থাৎ (রবীন্দ্র-পরিষদের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন) 'রক্ত' না লিখিয়া 'খুন' বা 'শৃঙ্খল' না লিখিয়া 'জিঞ্জির' লেখা অন্যায়।

বাঙলা শব্দ **দুই শ্রেণীতে** পড়ে :

(১) এক শ্রেণীর শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না অর্থাৎ ভাঙিয়া তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Derivative meaning) দেখান যায় না। ইহাদের নাম সিদ্ধ বা মৌলিক শব্দ।

কান, চোখ, হাত, পা, পেয়ারা, পেঁপে, আলু, লেবু, কানা, খোঁড়া, বেঁটে, লাল, জামা, মামা, ইট, পাথর, দোয়াত, কলম, খাতা, বই, মামলা, চেয়ার, খোকা, ঘোড়া, পাহাড় প্রভৃতি **সিদ্ধ** বা **মৌলিক শব্দ**। ইহারা **নামপ্রকৃতি**।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায়। পাগলামি, পড়ন্ত-কে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় : পাগল+আমি, পড়্+অন্ত। 'পাগল' নামপ্রকৃতি, 'পড়্' ধাতু-প্রকৃতি। এইজাতীয় শব্দের নাম সাধিত শব্দ। সংজ্ঞা এইরূপ :

নামপ্রকৃতি বা ধাতুপ্রকৃতির সহিত প্রত্যয়যোগে যে-শব্দ গঠিত হয় অথবা সমাসের ফলে যে-শব্দ পাওয়া যায়, তাহার নাম সাধিত শব্দ।

নামপ্রকৃতি+প্রত্যয় : ধূর্ত্তামি, পাকাম, লালচে, লাঠিয়াল, মরদানি, গিন্নীপনা, মাষ্টারি, কেরানিগিরি, সাহেবিয়ানা ("মোদের **সাহেবিয়ানা**য় বাধা এই যে রঙটা হয় না সাদা"—দ্বিজেন্দ্রলাল), তামাটে, ধোঁয়াটে, গোঁয়ার্তুমি, শহুরে, গাড়োয়ান ইত্যাদি।

ধাতুপ্রকৃতি+প্রত্যয়ঃ জ্বলন্ত, খাওয়া, দেখান, "**আসাযাওয়া** দুদিকেই খোলা রবে দ্বার"—রবীন্দ্রনাথ ; "হঠাৎ-আলোর **ঝলকানি** লেগে ঝলমল করে চিত্ত" —রবীন্দ্রনাথ, "সর্দ্দার**পোড়ো** (পড়ুয়া—Student) ভুলোর জিম্মায় থাকিবে"—শরৎচন্দ্র ; "**ঝর্ণা ঝর্ণা** সুন্দরী **ঝর্ণা**"—সত্যেন্দ্রনাথ ; "মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া **বাটনা** বাটে"—শরৎচন্দ্র ; হাঁফ, ঝোঁক, ঝরতি-পড়্তি, বাড়ন্ত (গড়ন) ইত্যাদি।

সমাসের ফলেঃ মা-বাপ, খোকাখুকু, **এককানকাটা** যায় গাঁয়ের পাশ দিয়ে আর **দুকানকাটা** যায় গাঁয়ের **মাঝখান** দিয়ে, গাছপাকা, পোকাধরা, গায়ে-হলুদ, হাতখরচা, 'বীরবলের **হালখাতা**' (প্রমথ চৌধুরী), '**দেনা-পাওনা**' (শরৎচন্দ্রের একখানি উপন্যাসের নাম), খোসগল্প, ত্রিনয়ন, '**সাত-সমুদ্র তের-নদীর** পার' 'পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী', "**তড়িৎবরণী হরিণনয়নী** দেখিনু ঘাটের কূলে"—চণ্ডীদাস ; "উদ্ধত যত শাখার শিখরে **রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ**"—রবীন্দ্রনাথ ; **দশহাতি** কাপড়, "**চারি-কোণা** পুকুরটি টুবুটুবু করে" (ব্রতের ছড়া), চুলোচুলি, খানাপিনা, পীতাম্বর, গলাকাটা, **কলেজেপড়া** মেয়ে ইত্যাদি।

উপসর্গযোগেও নূতন শব্দ সৃষ্ট হয়ঃ প্রহার, আহার, বিহার, সংহার, পরিহার প্রভৃতি। দরকচা (আম), পাঁতিহাস, পাতিলেবু, পাতকূয়া, অঘোর (যেমন—অঘোরে ঘুমান) প্রভৃতিকে উপসর্গযোগে বাঙলা শব্দ বলা হয়। কিন্তু দর, পাতি (পাত), অ উপসর্গবৎ প্রযুক্ত প্রাক্‌সংযোগে (Prefix) অব্যয়মাত্র ; উপসর্গ নয়, কারণ ধাতুর সহিত ইহারা যুক্ত হয় নাই। অনাসৃষ্টি, বেহেড, নিখুঁত, আকাট (আকাট মূর্খ—আকাঠ), গরহাজির, হররোজ, আকাঁড়া-র, অনা, বে, নি, আ, গর, হর, আ সমাসের পূর্ব্বপদ, উপসর্গ নয়। **খাঁটি বাঙলায় উপসর্গ নাই বলিলেই চলে।** প্রণাম, নিমন্ত্রণ-এর খাঁটি বাঙলা রূপ পেন্নাম, নেমন্তন্ন। ইহাদের **পে** ও **নে** সত্যকার উপসর্গ অর্থাৎ সংস্কৃত প্র ও নি-র অর্দ্ধতৎসম রূপ।

ধাতুর সহিত যে প্রত্যয় হয়, তাহার নাম কৃৎ-প্রত্যয়।

অন, অনি, অন্ত, আ, আনি, ই, ইয়ে, তি প্রভৃতি বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয় এবং ঢাকন, বাঁধন, নাচন ; কাঁদনি, বাঁধুনি, রাঁধুনি, নাচুনি, জ্বলুনি ; চলন্ত, পড়ন্ত, জ্বলন্ত ; পড়া বই, খোলা পাতা, বই পড়া, পাতা খোলা ; নিড়ানি, ঝাঁকুনি, কাতরানি, ঝলকানি ; হাসি, ঝারি, ঝাঁপি, ফাঁসি ; বলিয়ে, কইয়ে, গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে ; উঠ্‌তি, চল্‌তি, গল্‌তি, পড়্‌তি ইহাদের যথাক্রমিক উদাহরণ। ল্যুট্ বা অনট্ (অন), অসুন্ (অস্ = অঃ), আলুচ্ (আলু), ন, ক্তি (তি), শানচ্ (আন, মান), মন্ (ম), ষ্ট্রন্ (ত্র) প্রভৃতি সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় এবং গমন, নয়ন, দর্শন ; মনঃ, তপঃ, যশঃ ;

তন্দ্রালু, দয়ালু, ভয়ালু; যত্ন, প্রশ্ন, স্বপ্ন; গতি, স্থিতি, নতি; শয়ান, বর্ত্তমান, ম্রিয়মাণ, দৃশ্যমান; কর্ম্ম, জন্ম; শস্ত্র, নেত্র, বস্ত্র, শাস্ত্র ইহাদের যথাক্রমিক উদাহরণ।

এইভাবে গঠিত শব্দের নাম **কৃদন্ত শব্দ**।

যে প্রত্যয়যোগে শব্দ হইতে নূতন শব্দ গঠিত হয়, তাহার নাম তদ্ধিত-প্রত্যয়।

অট, অটিয়া (বহুক্ষেত্রে 'অটে'-তে রূপান্তরিত), আ, আড়, আইত, আনি, আমি, আম (আমো), ই, উ, এ, কা, তা, মন্ত প্রভৃতি বাঙলা তদ্ধিত-প্রত্যয় এবং সাপট, দাপট, জমাট; ভাড়াটিয়া, ধোঁয়াটে, বোকাটে, তামাটে, পাকাটে; কেষ্টা, গোপলা, বাঘা, রোগা, লোনা, নরা, গজা, বলদা, ছাগলা, পাগলা; খেলোয়াড়, যোগাড়; সেবাইত, ডাকাইত, রামাইত; বাবুয়ানি, হিঁদুয়ানি; জ্যাঠামি, পাকামি, ফাজলামি; ছেবলাম (মো), বাঁদরাম, পাকাম, ডেঁপোম; ডাক্তারি, মাষ্টারি, স্বতি, রেশমি, পশমি; পঞ্চু, হারু, নরু, খুকু, দুষ্টু, নীচু, ভীতু; আদুরে, কাঁদুনে, বেগুনে (রঙ); পট্‌কা, দম্‌কা, ঝট্‌কা, রাঙতা, নামতা, পড়্‌তা; পয়মন্ত, ভাগ্যমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত, শ্রীমন্ত ইহাদের যথাক্রমিক উদাহরণ।

ষ্ণ (অ), ষ্ণি (ই), ষ্ণেয় (এয়) অপত্যার্থে সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়, এবং ইহাদের ক্রমানুবর্ত্তী উদাহরণঃ মানব, দানব, বাসব, রাঘব, যাদব, কৌরব, পাণ্ডব, পৌত্র, দৌহিত্র; দাশরথি, সৌমিত্রি, রাবণি; ভাগিনেয়, বৈমাত্রেয়, কৌন্তেয়, গাঙ্গেয়।

ষ্ণ (অ), ষ্ণি (ই), ষ্ণেয় (এয়) অন্য অর্থেও প্রযুক্ত হয়ঃ হৈম, জৈব, বৈধ, নৈশ, পাতঞ্জল, শারদ, বৈদেহ, মৈথিল, পাঞ্চাল; আতিথেয়, বৈধেয়, পৌরুষেয়।

ষ্ণিক (ইক), ঈয়, ঈন, মতুপ্‌ (মৎ, বৎ—পুংলিঙ্গে মান্‌, বান্‌ ও স্ত্রীলিঙ্গে মতী, বতী), ইল, র, ল, শ, দা; বিন্‌ (বী) প্রভৃতি অন্য বহুবিধ অর্থের সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয় এবং ইহাদের যথাক্রমিক উদাহরণঃ বৈদিক, নৈয়ায়িক, হৈমন্তিক, সামুদ্রিক, জৈবিক, ঐহিক, পারলৌকিক, ভৌমিক, বৈদেশিক; জলীয়, বাষ্পীয়, ভারতীয়, বঙ্গীয়, ভবদীয়, মদীয়, শাস্ত্রীয়; কুলীন, সর্ব্বজনীন; শ্রীমান্‌, ধীমান্‌, বুদ্ধিমান্‌, জ্ঞানবান্‌, ধনবান্‌, লক্ষ্মীবান্‌, প্রজ্ঞাবান্‌; ফেনিল, পঙ্কিল; মধুর, পাণ্ডুর, মুখর; শ্রীল, মাংসল, শীতল, শ্যামল, পিঙ্গল; লোমশ, কর্কশ; একদা, সর্ব্বদা, সদা; যশস্বী, তেজস্বী, ওজস্বী, মায়াবী।

এইভাবে গঠিত শব্দের নাম **তদ্ধিতান্ত শব্দ**।

শব্দের আবার অন্যপ্রকারের **তিনটি জাতিভেদ** আছেঃ **বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্ব্বনাম।**

দ্রষ্টব্যঃ ইহাদের আলোচনার পূর্ব্বে একটি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্‌ তথ্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাইঃ বিশেষ্যপদ, বিশেষণপদ, সর্ব্বনামপদ ইত্যাদি

লেখা অনেকের অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু জানা ও মনে রাখা উচিত যে **শব্দের সহিত যতক্ষণ বিভক্তিযোগ না হইতেছে, ততক্ষণ ইহা 'পদ' নাম পাইতে পারে না।** বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্ত শিশু, মধুর, আমি শব্দ। **শিশু,** তোমার **মধুর** হাসিতে **আমি** মুগ্ধ—শিশু, মধুর, আমি যথাক্রমে বিশেষ্যপদ, বিশেষণপদ, সর্ব্বনামপদ ; কারণ, এগুলি বিভক্তিযুক্ত বাক্যাংশ, যদিও বিভক্তির চিহ্ন এগুলিতে সপ্রকাশ নাই।

অব্যয়-সম্বন্ধেও এই কথা। 'যখন' শব্দ ; "বিশ্ব **যখন** নিদ্রামগন" (রবীন্দ্রনাথ)-এ 'যখন' অব্যয়পদ।

বিনা অর্থে শব্দ হয় না। উপসর্গগুলির নিজস্ব অর্থ যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে ইহাদিগকেও শব্দ বলিতে হয়। বহু মনস্বী উপসর্গের নিজস্ব অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নাই ; ইহারা ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া ধাতুরই বিচিত্র অর্থসম্ভাবনাকেই প্রকট বা অভিব্যক্ত করে। [আমার 'সরল বাঙলা ব্যাকরণ' দ্রষ্টব্য] এ মতে উপসর্গ শব্দও হয় না, পদও হয় না।

বিশেষ্য

যে শব্দে দ্রব্য, জাতি, সংজ্ঞা, সমষ্টি, গুণ, ভাব, কার্য্য বা অবস্থা বুঝায়, তাহার নাম বিশেষ্য।

দ্রব্য : জল, বায়ু, আকাশ, মাটি, কলম ইত্যাদি।
জাতি : মানুষ, গোরু, পাখী, মাছ, বাঙালী ইত্যাদি।
সংজ্ঞা : রাম, বৃন্দাবন, গঙ্গা, মক্কা, বেদ, কোরান ইত্যাদি।
সমষ্টি : সভা, সমিতি, পল্টন, শ্রেণী, জনতা ইত্যাদি।
গুণ : দয়া, ক্ষমা, অনুকম্পা, করুণা, প্রতিভা ইত্যাদি।
ভাব : স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব, মাহাত্ম্য, স্থৈর্য্য, বাবুগিরি, ন্যাকাম ইত্যাদি।
কার্য্য : দর্শন, শ্রবণ, আহার, বিহার, ত্যাগ ইত্যাদি।
অবস্থা : সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, শান্তি ইত্যাদি।

বিশেষণ

বিশেষ্যের (বা সর্ব্বনামের) গুণ, ধর্ম্ম, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি যাহার দ্বারা বিশিষ্ট হয়, তাহার নাম বিশেষণ।

শান্ত, ভদ্র, নম্র, ভালো, মন্দ, নোংরা, কালো, লাল, গরিব, অল্প, বেশী, পাঁচ, সাত প্রভৃতি বিশেষণ।

বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের বিশেষণকে নামবিশেষণ বলা হয়।

(বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, বাক্যাংশ এবং বাক্যেরও বিশেষণ হয়, কিন্তু সে আলোচনা এখানে চলিবে না, পদপ্রসঙ্গে করিব।)

সর্ব্বনাম

সংস্কৃতমতে "সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি" (পাণিনি) অর্থাৎ 'সর্ব্ব' শব্দ আদিতে আছে যাহাদের এমন আটাশটি শব্দ সর্ব্বনাম।

কিন্তু বাঙলায় আটটি সংস্কৃত সর্ব্বনাম শব্দ এবং ষোলটি বাঙলা সর্ব্বনাম শব্দ মিলিয়া চব্বিশটি সর্ব্বনাম হইয়াছে ঃ

সংস্কৃত ঃ অন্য, এক, পর, স্ব, উভয়, অপর, নিজ, সকল ; **বাঙলা ঃ** সব, তুমি, আমি, যে, সে, কে, কি, ও, ইহা, উহা, যাহা, তাহা, কিছু, কেহ, এ, আপনি—এই **চব্বিশটি** বাঙলা সর্ব্বনাম।

যিনি, তিনি, ইনি, উনি, তুই—এই **পাঁচটি** প্রকৃতপক্ষে যে, সে, এ, ও, তুমি-র রূপান্তর।

এই পাঁচটিকে লইয়া বাঙলায় সর্ব্বনাম সংখ্যা দাঁড়ায় **উনত্রিশটি**।

বিশেষ্য বা বিশেষ্যধর্ম্মী শব্দের (Noun-Equivalent) পুনরুক্তির ফলে যে ক্লান্তিকর শ্রুতিকটুতার সৃষ্টি হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্যই বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনামের প্রয়োগ হয়।

ইহাই সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ইহা সত্য নয়। যেখানে সোজাসুজি 'আমি' বা 'তুমি'র প্রয়োগ হয়, সেখানে কোন বিশেষ্যের পুনরুক্তি-নিবারণের প্রশ্ন উঠে না।

শব্দের আবার লিঙ্গ, পুরুষ ও বচন আছে।

'বালক', 'ছেলে' পুংলিঙ্গ ; 'বালিকা', 'মেয়ে' স্ত্রীলিঙ্গ। **বিশেষ্য শব্দমাত্রই প্রথম-পুরুষ। সর্ব্বনামের 'আমি' উত্তম, 'তুমি' মধ্যম, 'সে' প্রথম-পুরুষ।** 'বালকগণ', 'ছেলেরা' বহুবচন। সংস্কৃতে 'বালকাঃ' শব্দ নয়, পদ ; কারণ ইহা বিভক্তি-যুক্ত। সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি কারক এবং বচন দুইই বুঝায় ("সংখ্যাকারক-বোধয়িত্রী বিভক্তিঃ")। বাঙলায় তা হয় না। আমরা যখন 'ছেলেরা', 'বালকেরা' (+রা, +এরা) বলি, তখন বিভক্তি-চিহ্নদ্বারাই বচন ও কারক দুইই সৃষ্টি করি। কিন্তু মাত্র প্রথমার বহুবচন ছাড়া অন্য কোথাও এ নিয়ম চলে না। শব্দের সহিত প্রথমে **গণ, দিগ** প্রভৃতি বহুবচন-জ্ঞাপক কোন প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দটিকে বহুবচন করি এবং তাহার সহিত 'কে' প্রভৃতি বিভক্তিযোগে কর্ম্ম প্রভৃতি কারক সৃষ্টি করি। 'বালকগণকে' বা 'গোরুগুলিকে' পদ ; কিন্তু বাক্যে প্রযুক্ত নয় এমন বিচ্ছিন্ন বালকগণ, গোরুগুলি পদ নয়, মাত্র বহুবচন শব্দ। সংস্কৃত হইতে বাঙলার এই পার্থক্য

বিশেষভাবে লক্ষণীয়। **বাঙলায় বচন মাত্র দুটি—এক ও বহু।** পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই তিনটি লিঙ্গই বাঙলায় স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু শব্দের লিঙ্গবিচারে মতভেদ রহিয়াছে। সত্যকার পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এবং অন্য সবকিছুকেই ক্লীবলিঙ্গ বলা এখনও বৈয়াকরণিক রীতিরূপে গৃহীত হয় নাই (নানাকারণে হওয়া সম্ভবও নয়)। খাঁটি বাঙলায় 'জামাই'-কে পুংলিঙ্গ, 'বউ'-কে স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'চাঁদ'-কে ক্লীবলিঙ্গ যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই আবার তৎসম 'জামাতা', 'বধূ', 'চন্দ্র'-কে যথাক্রমে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও **পুংলিঙ্গ** বলেন। তৎসম শব্দের লিঙ্গ-বিচারে আমরা অধিকাংশক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলি। কিন্তু চলি মাত্র শব্দের লিঙ্গনির্ণয়ে; বিশেষণ-প্রয়োগে বিশেষ্যের অনুসরণ করা আমাদের ইচ্ছাধীন এবং এ ইচ্ছা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রুতিমাধুর্য্যের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ নিয়ম মানিয়া লিখিয়াছেন, "**নিঃসঙ্গিনী** ধরণী" ('সন্ধ্যা' কবিতা), আবার না মানিয়া লিখিয়াছেন, "হে **মুগ্ধ** জননী" ('বঙ্গভূমি' কবিতা)। এ শৈথিল্য আমাদের সাহিত্যে সুপ্রচুর এবং **এই শৈথিল্যই**, বলিতে গেলে, **আমাদের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য।** [আমার 'সরল বাঙলা ব্যাকরণ' দ্রষ্টব্য।]

প্রসঙ্গক্রমে **সন্ধির** কথা বলিতে হয়।

পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি।

সন্ধি ধ্বনিতত্ত্বের ফল; কাজেই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই সন্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের সহিত বাঙলার গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। সংস্কৃতে **নদী+অম্বু=নদ্যম্বু শব্দ-সন্ধি**; কিন্তু **বালকঃ+তিষ্ঠতি=বালকস্তিষ্ঠতি বাক্যান্তর্গত পদসন্ধি।** এই শেষোক্ত রীতি বাঙলায় একেবারেই চলে না। 'ত্বম্ অত্র আগত্য উপবিশ'-কে 'ত্বমত্রাগত্যোপবিশ' সংস্কৃতে স্বচ্ছন্দে করা যায় এবং, বরঞ্চ, ইহাতে বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিই পায়। কিন্তু 'তুমি এখানে আসিয়া উপবেশন কর'-কে 'তুম্যেখানয়াসিয়োপবেশন কর'-তে পরিণত করা বাতুলতার নামান্তর। হাদ্দিয়ে (হাত+দিয়ে=হস্তদ্বারা), হাদ্দেখাও (হাত+দেখাও)-জাতীয় দুর্লভ দুই-একটি ক্ষেত্র ছাড়া **বাঙলা সন্ধি শব্দসন্ধি।**

সমাসে সন্ধি নিত্য—ইহাই সংস্কৃত নিয়ম। কিন্তু বাঙলায় এ বিষয়েও লেখকের স্বাধীনতা চরম। মেঘনাদবধ কাব্যে এ নিয়মভঙ্গের অসংখ্য উদাহরণ মিলিবে। প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালের বাঙলাসাহিত্যে এই নিয়ম না মানার নিদর্শন প্রচুর।

চণ্ডীদাসের "কানু-**অ**নুরাগ", জ্ঞানদাসের "প্র**তি-অ**ঙ্গ লাগি কাঁদে", মধুকবির "রঘুরাজগৃ**হ-আ**নন্দ", রবীন্দ্রনাথের "শর**ৎ-র**বির সোনার আলো", যতীন্দ্রমোহনের "রঘুবং**শ-অ**বতংস", বঙ্কিমচন্দ্রের "জগ**ৎ-শ**রীর", শরৎচন্দ্রের "আহ্বা**ন-ই**ঙ্গিত"—মাত্র কয়েকটি উদাহরণ।

তথাপি সন্ধিবিধি জানিতে ও বুঝিতে হইবে ; কারণ তৎসম ও খাঁটি বাঙলায় ইহার শুদ্ধপ্রয়োগও সীমাহীন।

সন্ধি তিনপ্রকার: স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি। খাঁটি বাঙলায় বিসর্গসন্ধি নাই ; তৎসম শব্দে আছে।

সমাসের কথা

অর্থে পরস্পরের সহিত অন্বয় বা সম্পর্কযুক্ত দুই বা দুইয়ের অধিক পদের একপদীকরণের নাম সমাস।

সমাসযুক্ত পদগুলির প্রথমটি **পূর্ব্বপদ**, শেষেরটি **উত্তরপদ**।

'রামানুজ'—**সমস্তপদ** ;

'রামের অনুজ'—**ব্যাসবাক্য, বিগ্রহবাক্য** বা **সমাসবাক্য** ;

'রামের'—**পূর্ব্বপদ** ;

'অনুজ'—**উত্তরপদ** ;

'রামের', 'অনুজ'—**সমস্যমানপদ**।

আমরা যাহাকে **সমস্তপদ** (সমাসে মিলিত পদ) বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে পদ নয়, **শব্দ** বা **প্রাতিপদিক** ; কারণ ইহার সহিত কারকবিভক্তি যুক্ত হয় এবং কারকবিভক্তি যুক্ত হইলে তখন ইহা পদ হইয়া যায়। (মৎপ্রণীত 'সরল বাঙলা ব্যাকরণ' দ্রষ্টব্য।)

সমাস চারিপ্রকার: (১) **তৎপুরুষ,** (২) **দ্বন্দ্ব,** (৩) **অব্যয়ীভাব** ও (৪) **বহুব্রীহি।**

কর্ম্মধারয়, উপপদ, নঞ্, প্রাদি, দ্বিগু—ইহারা তৎপুরুষেরই প্রকারভেদ।

(১) তৎপুরুষে উত্তরপদের প্রাধান্য।

পানসাজা, বাসনমাজা, শরণাপন্ন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস
বজ্রাহত, ঢেঁকিছাঁটা, ঝাঁটাপেটা	তৃতীয়া " "
বালিকাবিদ্যালয়, পাগলাগারদ, ল-কলেজ	চতুর্থী " "
মৃত্যুভয়, দলছাড়া, বিলাতফেরতা	পঞ্চমী " "
রাজকন্যা, বোনপো, ধানক্ষেত	ষষ্ঠী " "
বিশ্ববিখ্যাত, গাছপাকা, ঘরপাতা (দই)	সপ্তমী " "
নীলোৎপল, কানাকড়ি, ভাঙাহাট, কালোমেয়ে	কর্ম্মধারয় " "
বজ্রকঠিন, অরুণ-রাঙা, কাজলকালো	উপমান কর্ম্মধারয় "
পুরুষসিংহ, তনুলতা, সোনামুখ, চাঁদবদন	উপমিত " "
মনমাঝি, সুখসাগর, শাসনপাশ, তারাবুদ্‌বুদ	রূপক কর্ম্মধারয় "
সত্যবাদী, ছেলেধরা, মানুষখেকো, কুলমজানী	উপপদ তৎপুরুষ "

অভাব, নপুংসক, অজান্তি, নামঞ্জুর, অনাবৃষ্টি — নঞ্ তৎপুরুষ সমাস
অতিমানব, প্রত্যক্ষ, উদ্বেল — প্রাদিতৎপুরুষ „
কাপুরুষ, কদর্থ, কদাকার — কু-তৎপুরুষ „
পঞ্চবটী, চৌপায়া, পাঁচফোড়ন — দ্বিগু „

(২) **দ্বন্দ্বে পূর্ব্ব ও উত্তর দুই পদেরই প্রাধান্য।**

তরুলতা, রবিশশী, ভালোমন্দ, মাতাপিতা, রাধাশ্যাম, পানসুপারি, ওঠাবসা, আসা-যাওয়া, ছোটবড়—দ্বন্দ্ব সমাস।

(৩) **বহুব্রীহিতে সমস্যমান পদের বাহিরে অন্যপদের প্রাধান্য।**

পীতাম্বর, আয়তলোচনা, ড্যাবরাচোখো, পাকাচুল—সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ;
কমলাসনা, খড়্গপাণি, হাসিমুখো, ছেলেকাঁখী (ঝি)—ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ;
নিষ্কলঙ্ক, 'অজ্ঞান (বালিকা'), নির্জ্জলা (দুধ), অপয়া (বউ)—নঞ্ বহুব্রীহি ;
পঞ্চানন (শিব), তিনহাতী (গামছা), দুনলা (বন্দুক)—সংখ্যা বহুব্রীহি ;
কর্ণাকর্ণি, দণ্ডাদণ্ডি, চুলোচুলি, কানাকানি, হাতাহাতি—ব্যতিহার বহুব্রীহি।

(৪) **অব্যয়ীভাবে সমস্তপদটি অব্যয় হইয়া যায়।**

প্রতিদিন, যথাসাধ্য, সেরকরা, মাথাপিছু, টাকাপ্রতি, ফি-বছর—অব্যয়ীভাব।

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য

সন্ধি **বর্ণ**মিলন ; সমাস **পদ**মিলন। সন্ধিতে **মাত্র দুটি** বর্ণ মিলিত হয় ; সমাসে **দুই বা তাহার অধিক** পদের মিলন হয়। সন্ধি ধ্বনিতত্ত্বের দ্বারা অনুশাসিত, **অর্থের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই** ; সমাসে সমস্যমান পদগুলির **অর্থ-সম্পর্কই বড় কথা**। সমাস **বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়** ; সন্ধির **এদিকে কোন মূল্যই নাই।**

বানান—অশুদ্ধ ও শুদ্ধ

ছাত্রগণের রচনায় যে বিচিত্র বানানভুল দেখা যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রধানতঃ এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাহারা ব্যাকরণের কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়, সন্ধিবিধি, ণ-ত্ব-বিধান ও ষ-ত্ব-বিধান মনোযোগ দিয়া পড়িয়া এগুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে না। অথচ তৎসম শব্দের উপর আপন অধিকার বিস্তার করিতে হইলে ব্যাকরণের বিধিনিষেধগুলিকে সযত্নে মনে রাখিয়া সাবধানে প্রয়োগ করিতে হইবে। তৎসম শব্দের বর্ণশুদ্ধির ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

√'নী+ক্তি (তি)=নীতি' জানা থাকিলে 'তী' লেখা অসম্ভব। মূল শব্দটি 'ভূগোল' জানা থাকিলে ইহার উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় 'ষ্ণিক' (ইক)-যোগে ভৌগলিক

কেহ লিখিবে না, লিখিবে 'ভৌগোলিক'। 'ই+অ=য' এই সন্ধিনিয়মটি যাহার জানা আছে, সে অনুমতি+অনুসারে='অনুমত্যানুসারে' লিখিতে পারে না। 'র'-এর পরস্থিত পদমধ্যবর্ত্তী 'ন' 'ণ' হয় বা 'অ আ'-ভিন্ন স্বরের পরবর্ত্তী পদমধ্যস্থ 'স' 'ষ' হয়, এ বিধি যাহার মনে আছে, সে 'মরন' 'নিসেধ' না লিখিয়া 'মরণ' 'নিষেধ' লিখিবে।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করি যে প্রতিটি শব্দের বুৎপত্তি জানা অতীব সুকঠিন ব্যাপার; "অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্"। শুদ্ধ-ব্যাকরণের ছাত্রের নিকট ইহা আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু যাহাকে দশটা বিষয় পড়িয়া একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার এতখানি সময় বা ধৈর্য্য না থাকারই কথা। তবু বলিব, এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞান থাকিলেও তাহার মূল্য অসামান্য।

আধুনিক কালের 'বর্ণপরিচয়' পুস্তকে আনন্দ-পরিবেষণের প্রচুর আয়োজন আছে সত্য, কিন্তু বানানশিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া মনে করি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ' হয়তো রসহীন, কিন্তু এই বই দুইখানি যে মন দিয়া পড়িয়াছে, সে যে সচরাচর প্রযুক্ত শব্দের বানানে সহসা ঠকিবে তাহা মনে করি না।

বানানভুলের যে কারণগুলির কথা বলিলাম, তাহা ছাড়া আরও কারণ আছে। যথাস্থানে তাহাদের আলোচনা করিব।

যে-সকল বানানভুল সাধারণতঃ দেখা যায় সেগুলিকে শ্রেণীগতভাবে সাজাইয়া তাহাদের শুদ্ধরূপসহ কয়েকটি তালিকা দিতেছি।

(ক) কৃৎ-প্রত্যয়গত

(ধাতুর বানানের সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলও আছে।)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
উহ্য	উহ্য	সান্তনা	সান্ত্বনা
জাগরুক	জাগরূক	উজ্জল	উজ্জ্বল
পূণ্য	পুণ্য	পিচাশ	পিশাচ
দুরুহ	দুরূহ	অর্পণা	অপর্ণা
উদ্ভুত	উদ্ভূত	চিন্ত্যনীয়	চিন্তনীয়
ধ্বংশ	ধ্বংস	উদ্বিঘ্ন	উদ্বিগ্ন
প্রসংশা	প্রশংসা	উচিৎ	উচিত
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	প্রাতঃকৃত্ত	প্রাতঃকৃত্য
আয়ত্ব	আয়ত্ত	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
মধ্যস্ত	মধ্যস্থ	পক্ক	পক্ব

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
উৎপাৎ	উৎপাত	জাগ্রত	জাগ্রৎ
সুশ্রুষা	শুশ্রূষা	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু	বিভিষিকা	বিভীষিকা
চ্যূত	চ্যুত	নিরিক্ষণ	নিরীক্ষণ
বিকির্ণ	বিকীর্ণ	বিকীরণ	বিকিরণ
দূর্গা	দুর্গা	সমুহ	সমূহ
মান্যনীয়	মাননীয় (মান্য)	গৃহীতা ('গ্রহণকর্ত্তা' অর্থে)	গ্রহীতা
প্রতিদ্দন্দী	প্রতিদ্বন্দ্বী	উদ্‌গীরণ	উদ্‌গিরণ

(খ) তদ্ধিত-প্রত্যয়গত

(মূল শব্দের বানান-সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলও আছে।)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দাশরথী	দাশরথি	জ্ঞানমান্	জ্ঞানবান্
মানসীক	মানসিক	লক্ষ্মীমান্	লক্ষ্মীবান্
কায়ীক	কায়িক	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
পারিষদ্	পারিষদ	পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
স্বরস্বতী	সরস্বতী	সত্ত্বা	সত্তা
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	মহত্ব	মহত্ত্ব

(গ) সন্ধিগত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনুমত্যানুসারে	অনুমত্যনুসারে	বিদ্যুতালোক*	বিদ্যুদালোক
ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী	অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
অত্যাদ্ভুত	অত্যদ্ভুত	অধিন	অধীন
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	ব্যায়	ব্যয়
অত্যাধিক	অত্যধিক	ব্যেতীত	ব্যতীত
অত্যান্ত	অত্যন্ত	সদ্যজাত	সদ্যোজাত
ব্যাবহার	ব্যবহার	পরপোকার	পরোপকার
অনাটন	অনটন	স্বয়ম্বর*	স্বয়ংবর
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান	প্রিয়ম্বদা*	প্রিয়ংবদা
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	বশম্বদ*	বশংবদ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
যত্থাপি	যত্থপি	বারম্বার	বারংবার
ব্যাবসায়	ব্যবসায়	কিম্বা*	কিংবা
ব্যাবধান	ব্যবধান	সম্বাদ*	সংবাদ
পর্য্যাটন	পর্য্যটন	কিম্বদন্তী*	কিংবদন্তী
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	বয়োপ্রাপ্ত	বয়ঃপ্রাপ্ত
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	মনান্তর*	মনোঽন্তর
অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়	মন্বান্তর	মন্বন্তর
পৃথকান্ন	পৃথগন্ন	শিরোশোভা*	শিরঃশোভা
চক্ষুরোগ	চক্ষ্‌ুরোগ	রবিন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ
নিরস	নীরস	মনহর	মনোহর
নিরোগ	নীরোগ	শিরোপরি*	শির-উপরি
সুহৃদোত্তম	সুহৃদুত্তম	বয়োকনিষ্ঠ	বয়ঃকনিষ্ঠ
সন্মুখ	সম্মুখ	যশদা	যশোদা
সুহৃদাগ্রগণ্য	সুহৃদগ্রগণ্য	সন্মান	সম্মান

তারকাচিহ্নিত শব্দগুলি অশুদ্ধরূপেই বাঙলাসাহিত্যে কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবি যেগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে অশুদ্ধ। তবে আচার্য্যগণের দ্বারা প্রযুক্ত বলিয়া উহাদিগকে 'আর্ষ-প্রয়োগ' বলিয়া সম্মান করিব। ছাত্রগণ যখন সাহিত্যিক হইবে তখনকার কথা স্বতন্ত্র। এখন ছাত্রের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করিতে হইবে। সরকারী ইস্তাহারে 'অনুমত্যানুসারে' পাওয়া যায় ; সংবাদপত্রে 'এতদ্-সম্পর্কে', 'তদ্-সংক্রান্ত' প্রভৃতি প্রায়ই দেখা যায়। এইজাতীয় বানান পরিহার করাই ছাত্রগণের উচিত ; তাহারা লিখিবে 'এতৎ-সম্পর্কে', 'তৎ-সংক্রান্ত'। অনেক সময় 'বশম্বদ', 'স্বয়ম্বর' লেখার মূলে থাকে 'ম'-এর পরবর্ত্তী 'ব' যে অন্তঃস্থ তদ্বিষয়ে জ্ঞানের অভাব। 'চক্ষুস্', 'তেজস্', 'মনস্', 'শিরস্', 'বক্ষস্' প্রভৃতি 'অস্'-ভাগান্ত শব্দের 'স্' (ঃ) বাঙলায় সাধারণতঃ অস্বীকৃত হয়। আমরা চক্ষু, তেজ, মন, শির, বক্ষ লিখিয়া বা বলিয়া থাকি। কাজেই সন্ধিও অনেক সময় বিসর্গসন্ধির মতে করিও না। এই কারণে মনান্তর, মনাগুন, শিরোপরি ("শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া"—মধুসূদন, "তাহাদের **শিরোপরি** লোষ্ট্রনিক্ষেপণে"—কৃষ্ণচন্দ্র), মনমাঝে ("ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি **মনমাঝে**"—রবীন্দ্রনাথ), চক্ষুলজ্জা, চক্ষুশূল প্রভৃতি লেখা হইয়া থাকে। অনেক সময় বিসর্গ স্বীকার করিয়াও সাহিত্যিকগণ সন্ধি করেন না : "উৎস **রজঃ-ছটা**" (মধু), "ফুলকুল **চক্ষুঃ-বিনোদন**" (মধু)। অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

(ঘ) ণ-ত্ব-বিধানগত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	প্রস্রবন	প্রস্রবণ
প্রনাশ	প্রণাশ	অরুন	অরুণ
প্রণষ্ট	প্রনষ্ট	অহর্ণিশ	অহর্নিশ
শিরোণাম	শিরোনাম	রামায়ন	রামায়ণ
তৃন	তৃণ	রমনীয়	রমণীয়
ঘর্ষন	ঘর্ষণ	পূর্ব্বাহ্ন	পূর্ব্বাহ্ণ
গৃহিনী	গৃহিণী	প্রানী	প্রাণী
বর্ননা	বর্ণনা	নির্নয়	নির্ণয়
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ	গোপণ	গোপন
আগুণ	আগুন	মুণি	মুনি

ফাল্গুন, গগন, ফেন—এই তিনটির বানানে অনেকে 'ণ' ব্যবহার করে ; কিন্তু সাবধান ঃ "ফাল্গুনে গগনে ফেনে **ণত্বম্ ইচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ**"।

কণা, কোণ, ফণা, বাণ, কল্যাণ, তূণ, বেণী, বাণী, শোণিত, স্থাণু, কঙ্কণ, মণি, লাবণ্য, বণিক্, পুণ্য, গৌণ, পণ্য প্রভৃতি শব্দে **বিনা কারণেই (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধভাবেই) 'ণ'**।

(ঙ) ষ-ত্ব-বিধানগত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুসমা	সুষমা	সুসুপ্তি	সুষুপ্তি
নিসেধ	নিষেধ	অভিসেক	অভিষেক
চিকিৎষা	চিকিৎসা	পিতৃস্বসা	পিতৃষ্বসা
পূজনীয়াষু	পূজনীয়াসু	দৃস্টি	দৃষ্টি
পূজনীয়েসু	পূজনীয়েষু	নিঃষহ	নিঃসহ
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	নিস্প্রাণ	নিষ্প্রাণ

ভাষা, আষাঢ়, পাষণ্ড, ষণ্ড, পাষাণ, বাষ্প, পৌষ, কাষ্ঠ, মূষিক, পুষ্প প্রভৃতি শব্দে **বিনা কারণেই নিত্য 'ষ'**।

এইবার বানানভুলের যে তালিকা দিতেছি তাহা—

(চ) সমাসগত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রাজাগণ	রাজগণ	প্রাণীপ্রসঙ্গ	প্রাণিপ্রসঙ্গ
কর্ত্তারূপে	কর্ত্তৃরূপে	পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক
ক্রেতাসমূহ	ক্রেতৃসমূহ	মহারাজা	মহারাজ
মহিমাগান	মহিমগান	গ্রামবাসীগণ	গ্রামবাসিগণ
আত্মাপুরুষ	আত্মপুরুষ	শশীভূষণ	শশিভূষণ
হস্তীতুল্য	হস্তিতুল্য	সন্ন্যাসীবৃন্দ	সন্ন্যাসিবৃন্দ
মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	গরিমাকীর্ত্তন	গরিমকীর্ত্তন
সঙ্গীহীন	সঙ্গিহীন	গুণীসভা	গুণিসভা
মন্ত্রীবর	মন্ত্রিবর	ব্রহ্মাকথিত	ব্রহ্মকথিত

নীচের বানানগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিরস্কার	তিরস্কার	দন্দ	দ্বন্দ্ব
পরিস্ফুট	পরিস্ফুট	অব্যয়িভাব	অব্যয়ীভাব
পুরস্কার	পুরস্কার	বশিভূত	বশীভূত
প্রস্ফুটিত	প্রস্ফুটিত	অদ্ভূত	অদ্ভুত
আবিস্কার	আবিষ্কার	হটাৎ	হঠাৎ
পরিস্কার	পরিষ্কার	সুরধনী	সুরধুনী
বহিস্কার	বহিষ্কার	(অন্ন-) পরিবেশন	(অন্ন-) পরিবেষণ
নমষ্কার	নমস্কার	পাঁচন .	পাচন
সুস্পষ্ট	সুস্পষ্ট	কাঁচ	কাচ
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	বিসদ	বিশদ
নিস্প্রভ	নিষ্প্রভ	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	নিরামিশাষী	নিরামিষাশী
সরযুনদী	সরযূনদী	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস
উচিৎ	উচিত	কালীদাস	কালিদাস
সমিচিন	সমীচীন	দেবীদাস	দেবিদাস
ভাগবৎ	ভাগবত	সাক্ষর (নামসহি)	স্বাক্ষর
লঘুকরণ	লঘূকরণ	সারথী	সারথি

(তিরস্কার থেকে নিস্প্রভ পর্যন্ত:) এগুলি ষ-ত্ব-বিধানের অন্তর্গত

লিখিবার সময় অন্যমনস্কতা, চিন্তার দ্রুতগতি প্রভৃতি কারণে বহু অদ্ভুত বানানভুল ঘটিয়া থাকে। কোথাও বা বর্ণবিন্যাসের বিপর্য্যয় ঘটে, কোথাও বর্ণ বাদ পড়িয়া যায়, কোথাও বা একবর্ণ দুইবার লেখা হয়ঃ 'রবীন্দ্রনাথ'-এর স্থলে 'বরীন্দ্রনাথ', 'বিবেকানন্দ'-স্থলে 'বিবেকান্দ', মল্লিকা'-স্থলে 'মল্লীলিকা' ইহাদের ক্রমিক উদাহরণ।

* 'তেজস্কর', 'শ্রেয়স্কর' প্রভৃতির অনুকরণে প্রায়ই 'লজ্জাস্কর' লেখা হয়। মনে রাখা উচিত যে 'লজ্জা' আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; 'তেজস্', 'শ্রেয়স্', 'যশস্'-এর মত 'অস্'ভাগান্ত নয়।

বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে

কয়েকটি যুক্তবর্ণ ঠিক মনে না থাকায় ছাত্রদিগের অনিচ্ছাক্রমেই একপ্রকার বানানভুল ঘটিয়া যায়। **'অজ্ঞ'** লিখিতে **'অঞ্জ'**, **'খঞ্জ'** লিখিতে **'খজ্ঞ'** অনায়াসেই হইয়া য়ায়।

(১) (i) জ্ + ঞ = **জ্ঞ** ঃ বিজ্ঞ, জ্ঞান, সংজ্ঞা, আজ্ঞা, কৃতজ্ঞ।
(ii) ঞ্ + জ = **ঞ্জ** ঃ খঞ্জন, গঞ্জন, অঞ্জন, রঞ্জন, ভঞ্জন।
(২) (i) র্ + উ = **রু** ঃ মারুতি, নিরুত্তর, কুরু, অরুণ, তরুণ। } এগুলিতে
(ii) র্ + ঊ = **রূ** ঃ রূপ, রূঢ়। } স্বরযোগ
(৩) (i) ক্ + র (র-ফলা) = **ক্র** ঃ চক্র, বিক্রম, আক্রমণ, পরিক্রমা।
(ii) ত্ + র্ + উ = **ত্রু** ঃ ত্রুটি, শত্রু।
(৪) (i) দ্ + র্ + উ = **দ্রু** ঃ দ্রুত, দ্রুম, শতদ্রু, কদ্রু।
(ii) দ্ + র্ + ঊ = **দ্রূ** ঃ বিদ্রূপ।
(৫) (i) হ্ + ম = **হ্ম** ঃ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম।
(ii) ক্ + ষ = **ক্ষ** ঃ রাক্ষস, রক্ষা, বৃক্ষ, অক্ষ, ক্ষমা।
(৬) (i) ণ্ + ড = **ণ্ড** ঃ অণ্ড, পিণ্ড, গণ্ড, লণ্ডভণ্ড, খণ্ড, চণ্ডী।
(ii) ন্ + ত = **ন্ত** ঃ অন্ত, দন্ত, ক্ষান্ত, শান্ত, মোহান্ত।
(৭) (i) হ্ + ণ = **হ্ণ** ঃ অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ।
(ii) হ্ + ন = **হ্ন** ঃ আহ্নিক, বহ্নি, চিহ্ন।
(৮) (i) ষ্ + ণ = **ষ্ণ** ঃ কৃষ্ণ, বৃষ্ণি।

একই শব্দের দুইপ্রকার বানান

পরের শব্দগুলির **দুইপ্রকার বানানই শুদ্ধ**। ইহাদের অধিকাংশে একই স্বরের হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই রূপেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন কোন শব্দের দ্বিরূপতা ব্যঞ্জনগত। আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে শব্দগুলিকে সাজাইলাম।

(ক) স্বরগত

শব্দ — অর্থ

অঙ্কুর
অঙ্কূর—উ, ঊ : বীজের 'কল'

অঙ্গুলি
অঙ্গুলী—ই, ঈ : আঙুল

অঙ্গুরি
অঙ্গুরী—ই, ঈ : আঙটি

অটবি
অটবী—ই, ঈ : বন

অন্তরিক্ষ
অন্তরীক্ষ—ই, ঈ : আকাশ

অবনি
অবনী—ই, ঈ : পৃথিবী

আবলি
আবলী—ই, ঈ : শ্রেণী

ইন্দিবর
ইন্দীবর—ই, ঈ : নীলপদ্ম

উষা
ঊষা—উ, ঊ : খুব সকাল

কটি
কটী—ই, ঈ : কোমর

কাঞ্চি
কাঞ্চী—ই, ঈ : মেখলা

কিংবদন্তি
কিংবদন্তী—ই, ঈ : জনশ্রুতি

কুটির
কুটীর—ই, ঈ : সামান্য গৃহ

শব্দ — অর্থ

গাণ্ডিব
গাণ্ডীব—ই, ঈ : ধনুর্বিশেষ

জম্বুক
জম্বূক—উ, ঊ : শৃগাল

তরণি
তরণী—ই, ঈ : নৌকা

তরি
তরী—ই, ঈ : নৌকা

ত্রুটি
ত্রুটী—ই, ঈ : দোষ

ধমনি
ধমনী—ই, ঈ : শিরা

ধরণি
ধরণী—ই, ঈ : পৃথিবী

পেশি
পেশী—ই, ঈ : মাংসপেশী

পদবি
পদবী—ই, ঈ : উপাধি

বল্মিক
বল্মীক—ই, ঈ : উইঢিবি

বল্লরি
বল্লরী—ই, ঈ : লতা

বল্লি
বল্লী—ই, ঈ : লতা

বেণি
বেণী—ই, ঈ : কেশবন্ধ

শব্দ **অর্থ**

ভ্রুকুটি
ভ্রুকুটী
ভ্রূকুটি —ই, ঈ ; উ, ঊ ঃ ভ্রুভঙ্গ
ভ্রূকুটী —(র্+উ, ঊ ; ঋ)
(ভৃকুটি
ভৃকুটী)

মসুর
মসূর উ, ঊ ঃ কলাইবিশেষ

মহি
মহী—ই, ঈ ঃ পৃথিবী

যুবতি
যুবতী—ই, ঈ ঃ যৌবনময়ী

রজনি
রজনী—ই, ঈ ঃ রাত্রি

শব্দ **অর্থ**

রাজি
রাজী—ই, ঈ ঃ শ্রেণী

লহরি
লহরী—ই, ঈ ঃ তরঙ্গ

লাঙ্গুল
লাঙ্গূল—উ, ঊ ঃ লেজ

শম্বুক
শম্বূক—উ, ঊ ঃ শামুক

শ্রেণি
শ্রেণী—ই, ঈ ঃ সারি

সূচি
সূচী—ই, ঈ ঃ ছুঁচ

হনুমান্
হনূমান্—উ, ঊ ঃ পবননন্দন

(খ) ব্যঞ্জনগত

কংশ
কংস—শ, স ঃ শ্রীকৃষ্ণের মাতুল

কিশলয়
কিসলয়—শ, স ঃ নবপল্লব

কুশীদ
কুসীদ—শ, স ঃ সুদ

কৃমি
ক্রিমি—ঋ, রি ঃ কীট

কপাট
কবাট—প, ব ঃ দুয়ারের

কলশ
কলস—শ, স ঃ কুম্ভ

কেশর
কেসর—শ, স ঃ (ফুলের বা সিংহের)

বশিষ্ঠ
বসিষ্ঠ—শ, স ঃ মুনিবিশেষ

যবানী
যমানী—ব, ম ঃ যোয়ান

রশনা
রসনা—শ, স ঃ চন্দ্রহার বা জিহ্বা

বাষ্প
বাস্প—ষ, স ঃ

শৃগাল
সৃগাল—শ, স ঃ

শব্দার্থ

আমরা বাঙলাশব্দের উপাদানপ্রসঙ্গে তৎসম, অর্দ্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দাবলীর কতকটা বিশদ আলোচনাই করিয়াছি। পরে বাঙলা শব্দাবলীকে **সিদ্ধ** ও **সাধিত** এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়া উদাহরণসহ তাহাদের পার্থক্য দেখাইয়াছি এবং সাধিত শব্দপ্রসঙ্গে কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। সাধিত শব্দের (বিশেষ করিয়া তৎসম সাধিত শব্দের) গঠনবৈচিত্র্য-বিষয়ক নিয়মাবলীর সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকিলে শব্দগুলিকে শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করার যোগ্যতা যেমন বাড়িয়া যাইবে, প্রয়োজনমত নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া লইবার অধিকারও তেমনি প্রসারিত হইবে। তৎসম শব্দ বাঙলায় প্রচুর এবং কালে কালে প্রচুরতর হইবার সম্ভাবনাই সমধিক ও স্বাভাবিক। ইহারা যে আমাদের ভাষাজননীর কৌলীন্যের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহের ছায়াও নাই।

বাঙলায় বহুপ্রযুক্ত এই তৎসম শব্দাবলীর অর্থগত বৈচিত্র্যের কথা এইবার থেকে একে একে বলিতেছি। **এই সকল শব্দের অর্থের প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়া ইহাদের বানান মনে রাখিতে হইবে।**

এই সকল শব্দযুগ্মের প্রয়োগপার্থক্য দেখাইতে **রীতিমত বাক্য** রচনা করিতে হইবে।

"একের অনলে বহুরে **আহুতি** দিয়া"—রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশ; কাজেই প্রামাণ্য। কিন্তু 'দিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া এটি **বাক্য নয়**; এই কারণে উদাহরণরূপে ইহার উদ্ধৃতি অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিতে হইলে পূর্ণ বাক্যটির উদ্ধার করিতে হইবে :

"তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে **আহুতি** দিয়া,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া" —রবীন্দ্রনাথ।

[ক]

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দাবলী

অণুগত—অতিসূক্ষ্মভাগ-সম্বন্ধীয় (Molecular): উভয়ের মধ্যেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকিলেও জল এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইডে **অণুগত** পার্থক্য আছে।

অনুগত—বাধ্য, বশীভূত : "**অনুগত** জনে কেন কর এত প্রবঞ্চনা ?"—বাঙলা গান।

অশিত—ভুক্ত : **অশিত** বস্তুর পরিপাককালে আহার অনুচিত।

অসিত—কৃষ্ণ (কালো) : "**অসিত**বরণী শ্যামা দনুজদলনী"—গান।

আষাঢ়—মাসের নাম : "নীল নবঘনে **আষাঢ়**গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে"
—রবীন্দ্রনাথ।

আসার—বর্ষণ : 'ঢালিছে শ্রাবণমেঘ ধারা**সারে** জল।' "অশ্রু-বারিধারা **আসার**"
—মধু।

আপন—নিজের : "**আপন** মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা"
—রবীন্দ্রনাথ।

আপণ—দোকান : "এবার তোর ভরা **আপণ**
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে"—অতুলপ্রসাদ।

আশা—ভরসা : "**আশা**র ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু"—মধুসূদন।

আসা—আগমন করা : "**আসা**যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার"—রবীন্দ্রনাথ।

একই বাক্যে—"এখন হ'লো রে তার **আসা**র সময় **আশা** এলো প্রাণে"—রবীন্দ্রনাথ।

আস্তিক—ঈশ্বরবিশ্বাসী : পাপপুণ্য, ইহকাল-পরকাল—এসকল **আস্তিকের** কথা।

আস্তীক—নামবিশেষ : মনসাদেবী **আস্তীক**মুনির জননী।

আভাষ—ইঙ্গিত : এমন কৌশলে তিনি কথা বলিলেন যে প্রকৃত ব্যাপারের **আভাষ**ও পাইলাম না।

আভাস—ঈষৎ দীপ্তি বা আলো : "উষার **আভাস** জাগ্‌ল কি রে ?"—সত্যেন্দ্রনাথ।

মন্তব্য : ভাবের দিক্ হইতে বিচার করিলে 'আভাষ' ও 'আভাস' প্রায় একই মূল্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথ 'আভাষ'-এর স্থলে 'আভাস' লিখিয়াছেন, কারণ 'আভাস'-এর মধ্যেও একটু ক্ষীণ আলোকপাতের ভাব রহিয়াছে।

"তাহার জন্য নানাপ্রকার **আভাস**ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়"
—রবীন্দ্রনাথ ('সাহিত্য')।

আহুতি—হোমে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত বস্তু : দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞের হোমানলে ক্ষুদিরাম নিজের জীবন **আহুতি** দিয়াছিলেন।

আহূতি—আহ্বান : সভাপতির **আহূতি** পাইয়াই আমি সভায় গিয়াছিলাম।

মন্তব্য : 'আহ্বান' অর্থে 'আহূতি'-র প্রয়োগ বাঙলায় পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশেষণ-রূপ 'আহূত' শব্দের বহুলপ্রয়োগ রহিয়াছে : এ উৎসবে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের কেহ **আহূত**, কেহ **অনাহূত**, কেহ বা **রবাহূত**।

কিন্তু 'হোমে প্রক্ষিপ্ত বা উৎসর্গীকৃত' অর্থে বিশেষণ 'আহুত' শব্দের প্রয়োগ বিরল।

ইতি—সমাপ্তিবোধক অব্যয় : নববর্ষের অভিবাদন জানিবেন। **ইতি**।

নিষ্ফল আলোচনা চালাইয়া লাভ নাই। এইবার **ইতি** করিয়া দিন।

(এই প্রয়োগটি বিশিষ্ট ভাবের)

ঈতি—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ছয়প্রকার শস্যহানির উপদ্রব : দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ **ঈতি**।

(বাঙলায় 'ঈতি'-র প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে। সংস্কৃতে আছে: "কৃষের্ভয়ং কিম্? ঈতিঃ")

কটি—কোমর: "**কটি**তটে ধৃত পীতবসন"—নীলকণ্ঠ।

কোটি—শতলক্ষ: "সাত**কোটি** সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি"—রবীন্দ্রনাথ।

কিল—মুষ্ট্যাঘাত: ভীমের একটি **কিলে** মহাবীরের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিল।

কীল—খিল, গোঁজ: **কীল** উৎপাটন করিতে গিয়া বানর লাঙ্গুল হারাইয়াছিল।

কুট—পর্ব্বতচূড়া: হিমালয়ের **কুট**দেশে আরোহণ অসম্ভব।

কূট—বক্র, কঠিন বা জটিল: **কূট**বুদ্ধি না থাকিলে রাষ্ট্রনায়ক হওয়া যায় না। মহাভারতে অনেক ব্যাস**কূট** আছে।

কু-জন—দুর্জ্জন: '**কু-জনে**র কথা কানে কভু তুলিয়ো না'।

কূজন—কাকলী: 'প্রভাতে বসুধা জাগে বিহঙ্গ**কূজনে**'।

কুল—বংশ: "**একুলে ওকুলে দুকুলে** গোকুলে কে আর আমার আছে"
—চণ্ডীদাস।

কূল—তটভূমি: "নদী**কূলে** বাস ভাবনা বারোমাস"—নীলকণ্ঠ।
"**কূল** দে মা কুলকুণ্ডলিনী"—রামপ্রসাদ।

কৃত—করা (নিষ্ঠায় 'আ'প্রত্যয়—বিশেষণ), সম্পন্ন: **কৃত**কর্ম্মের ফলভোগ সকলকেই করিতে হইবে। কৃত্তিবাস**কৃত** রামায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ নয়।

ক্রীত—মূল্যবিনিময়ে গৃহীত: শ্রমিক মালিকের **ক্রীত**দাস নয়। **ক্রীত** দ্রব্যগুলি বাবু কুলির মাথায় উঠাইয়া দিলেন।

কৃতি—কার্য্য (রচনা): রসবোধ না থাকিলে কবি**কৃতি**র মূল্য বুঝা যায় না।

কৃতী—কৃতিমান্: **কৃতী** ব্যক্তির সম্মান সর্ব্বত্র।

কুশাসন—কুশনির্ম্মিত আসন: পুরোহিত **কুশাসনে** বসিয়া পূজা করিতেছেন।

কু-শাসন—নিন্দনীয় শাসন: রাজার **কু-শাসনের** ফলে দেশে প্রজাবিদ্রোহ হয়।

কোণ—বিদিক্, জ্যামিতির কোণ: ঈশান**কোণে** মেঘ উঠেছে। 'বাঙালী কি চিরদিন র'বে গৃহ**কোণে**?' ত্রিভুজের তিন **কোণ** দুই সমকোণের সমান।

কোন্—অনিশ্চয়ার্থক বিশেষণ: "**কোন্** দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল?"—সত্যেন্দ্রনাথ।

ক্ষুর—কামাইবার যন্ত্র (Razor) : "**ক্ষুর** দেখি নাপিতের হাতে ভয়ে বানর যায় তফাতে।"—দাশরথি।

খুর—গোরু প্রভৃতির পায়ের নিম্নাংশবিশেষ (শফ) : ঘোড়ার **খুর** গোরুর মত দুইভাগে বিভক্ত নয়।

গিরিশ—মহাদেব : 'বিল্বপত্র গঙ্গাজলে **গিরিশের** প্রাণ গলে'।

গিরীশ—গিরিরাজ : **গিরীশ** হিমাচলকে কালিদাস দেবতাত্মা বলিয়াছেন।

(একই বাক্যে—**গিরিশ গিরীশের** জামাতা।)

গোলক—বর্তুলাকার বস্তু : ফুটবল খেলার অর্থ শূন্যগর্ভ **গোলকের** পশ্চাদ্ধাবন।

গোলোক—বৈকুণ্ঠ : **গোলোক**পতি নারায়ণকে প্রণাম করি।

গোকুল—বৃন্দাবন : "আমার কাজ কি **গোকুল**, কাজ কি গো কুল ?"—দাশরথি।

গো-কুল—গোজাতি : অযত্নে ও অন্যান্য কারণে দেশের **গো-কুল** আজ নির্মূল হইতে চলিয়াছে।

গোচর—প্রত্যক্ষ, জ্ঞাত : অবশেষে একখানি গ্রাম আমার নয়ন**গোচর** হইল। এমন পাপ নাই যাহা মনের **গোচর** নয়।

গো-চর—গবাদি পশুর চরিবার জন্য তৃণক্ষেত্র : অত্যাচারী জমিদার **গো-চর** ভাঙিয়া ধানের জমি করিয়াছে।

চির—দীর্ঘ, দীর্ঘকাল : "**চির**দিন কারও সমান না যায়"—হেমচন্দ্র। তাহাদের স্মৃতি **চির**তরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

চীর—ছিন্ন বসন : জটা**চীর**ধারী রাম যান বনবাসে। চোরাবাজারের কল্যাণে দরিদ্র বাঙালী আজ **চীর**ধারী।

চূত—আম্র : 'অশোক পলাশ **চূত**মঞ্জরী জেগেছে ফাগুনবনে'।

চ্যুত—স্খলিত : 'পদ**চ্যুত** সেনাপতি বৃন্ত**চ্যুত** পুষ্পসম ম্লান'।

জব—গতিবেগ : **জব**শীল বস্তুনিচয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ শ্রেষ্ঠ।

যব—শস্যবিশেষ : চৈতসংক্রান্তিতে **যবের** ছাতু খাইতে হয়।

জমক—আড়ম্বর : "জাঁক**জমকে** করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে"—রামপ্রসাদ।

যমক—সমোচ্চারিত শব্দের পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দালঙ্কার : " 'কাজ কি বাসে ? কাজ কি বাসে ?'*—এমনিধারা **যমকে** অলঙ্কারের ছটায় ভাষা চমকে !"

জাম—ফলবিশেষ : 'পাকা **জাম** খেতে ভালো রঙটি কেবল কালো'।

যাম—প্রহর : 'যামিনীতে **যাম**ঘোষ ডাকে প্রতি **যাম**'।

(যামঘোষ—ডাকিয়া রাত্রির প্রহর ঘোষণা করে বলিয়া শৃগালের নাম যামঘোষ)।

---

* দাশরথি রায়। প্রথম 'বাসে'=গৃহে, বাসস্থানে, দ্বিতীয় 'বাসে'=বসনে।

জাত—উৎপন্ন ঃ দুগ্ধ**জাত** দ্রব্যাদি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্যবংশ**জাত**।

যাত—গমন ('যা'-ধাতু+ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়—বিশেষ্য ; 'গত' অর্থে বিশেষণ-প্রয়োগ বাঙলায় বিরল) ঃ আজকাল ট্রেনে **যাতা**য়াত কষ্টকর।

জিব—জিহ্বা ঃ এমন কথা মুখে আনলে **জিব** খ'সে যাবে।

জীব—প্রাণী ঃ "**জীবে** প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।—বিবেকানন্দ।

জিনি—জয় করিয়াঃ "বিমল হেম **জিনি** তনু অনুপাম রে"—বৃন্দাবন দাস।

যিনি—যে ব্যক্তি (সম্মানে) ঃ 'জীব দিয়াছেন **যিনি** আহার দিবেন তিনি'।

জাল—ফাঁদ, নকল ঃ যে **জাল** পেতেছি, অনেক রুইকাতলা রাঘববোয়াল ধরা পড়বে। সাবধান, **জাল** হইতেছে!

জ্বাল—আগুনের আঁচ ঃ নরম **জ্বালে** কাঁচাগোল্লা ভালো হয়।

টিকা—ভাতের ফেনমিশ্রিত কয়লাগুঁড়ার চাকৃতি ঃ ভালো করিয়া **টিকা** ধরাইয়া রামু মনিবের হাতে কলিকাটি দিল।

টীকা—সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ কালিদাসের কাব্যাবলীর **টীকা** রচনা করিয়াছেন মল্লিনাথ।

তরা—পার হওয়া ঃ হরিপদতরী বিনা ভবনদী **তরা** ভার।

ত্বরা—শীঘ্রতা ঃ একটু বসো, কিসের **ত্বরা**?

তদীয়—তাহার ঃ
ত্বদীয়—তোমার ঃ } **তদীয়** অনুরোধক্রমে **ত্বদীয়** ভবনে আগমন করিয়াছি।

তুলা—তুলনা, মাপযন্ত্র ঃ "কে বলে শারদ শশী মুখের **তুলা**?"—ভারতচন্দ্র।
ধর্ম্মের **তুলা**দণ্ডে তোমার কার্য্যাবলীর পরিমাপ হইবে।

তুলা—কার্পাসাদি তন্তু ঃ পশমি শাল অপেক্ষা **তুলার** বালাপোষে আরাম বেশী। কমমূল্যে কাঁচা**তুলা** বিদেশীকে দিয়া তাহার নিকট আমরা অত্যধিক মূল্যে সূতা কিনি।

দার—পত্নী ঃ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র **দার**-পরিগ্রহ করেন নাই।

দ্বার—দুয়ার ঃ "পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে **দ্বার**"—রবীন্দ্রনাথ।

দারা—পত্নী (বাঙলায় এই রূপটি খুবই চলে) ঃ "ভাইবন্ধু সুত**দারা** সুখের সময় সবাই তারা"—নীলকণ্ঠ। "**দারা** পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার?"—হেমচন্দ্র।

দ্বারা—দিয়া, হইতে ঃ "নাঃ, আমার **দ্বারা** আর রাজ্যশাসন চলে না"
—ক্ষীরোদপ্রসাদ।

দিন—দিবস : "**দিনে-দিনে দিন** যায়—দিন যায়"—যতীন্দ্রমোহন।
—দরিদ্র, সামান্য : "**দীনের** তিনি পিতামাতা"—রবীন্দ্রনাথ।
"**দীন** ভৃত্যে করো দয়া"— ঐ

দীপ—প্রদীপ : "দিনে **দীপ** জ্বালি ওরে ও খেয়ালী কি লিখিস হিজিবিজি ?"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ : ক্ষুদ্র**দ্বীপ**বাসী মুষ্টিমেয় ইংরেজ কূটবুদ্ধিতে জগজ্জয়ী।

দ্বিপ—হস্তী : শুণ্ড ও মুখ দিয়া জল পান করে বলিয়া হস্তীর অপর নাম **দ্বিপ**।

দেশ—শস্যশ্যামল বঙ্গভূমি বাঙালীর **দেশ**।

দ্বেষ—অসূয়া, শত্রুতা : 'শুধু ঘৃণা শুধু **দ্বেষ**, প্রেমের নাহিক লেশ'।

দুকুল—দুই বংশ : "একুলে ওকুলে **দুকুলে** গোকুলে কে আর রাধার আছে ?"
—চণ্ডীদাস।

দুকূল—ক্ষৌম বাস : শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের **দুকূল** হরণ করিয়াছিলেন।

দ্যূত—পাশাখেলা : কপট**দ্যূতে** পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়াছিলেন।

দূত—চর, বার্ত্তাবহ : কবিরা কোকিলকে বসন্ত**দূত** বলেন।

ধনী—ধনশালী ; তরুণী নারী (গদ্যেও প্রয়োগ হয়) : "হের ওই **ধনীর** দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে"—রবীন্দ্রনাথ। "ও **ধনী** কে কহ বাটে"—চণ্ডীদাস। "স্বয়ংবরা বধূ **ধনী**"—মধুসূদন। কি গো বউ **ধনী**, কি হচ্ছে ?

ধ্বনি—শব্দ : "শুধু দুটি লঘু পদ**ধ্বনি** শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল"—শরৎচন্দ্র।

নাকি—প্রশ্নে (অব্যয়) : কে গো ? বড় বউ **নাকি** ?

নাকী—খোনা : 'শাঁখচুন্নী অনেক দূরে কইছে কথা **নাকী** সুরে'।

নাশ—ধ্বংস : রাজার পাপে রাজ্য**নাশ** ঘটে।

নাস—নস্য : উত্তপ্ত কালোজিরের **নাসে** মাথাধরা সেরে যায়।

নিতি—নিত্য (প্রতিদিন—পদ্যে) :
নীতি—ন্যায় :
} '**নিতি নিতি** শুনি আমি কত **নীতি**কথা।'

নিরাকার—আকারহীন :
নীরাকার—জলের আকার :
} "অকূল অসীম সিন্ধু তুফান না হয়।
নিরমল **নিরাকার নীরাকার** নয়॥"—ভারত।

নিরাশ—আশাহীন : জ্ঞানী ব্যক্তি সহজে **নিরাশ** হন না।

নিরাস—নিরসন : এ জটিলতার **নিরাস** সহজ নয়।

নিবার—নিবারণ : "নিবারিতে করি মনে **নিবার** না যায়"—চণ্ডীদাস।

নীবার—উড়িধান্য : কপোত **নীবার**কণায় উদরপূর্ত্তি করিতেছে।

পটল—সমূহ : নবজলধর**পটলে** গগন সমাচ্ছন্ন।

পটোল—প্রসিদ্ধ ফল : যকৃৎরোগে দরকারী কচি **পটোলের** তরকারী।

পাণ—তাম্বূল :
পান—তরলবস্তুর গলাধঃকরণ : } "মুনি কন 'খাও রে **পাণ**, এর সত্ত্ব সুধা**পান**'।"—দাশরথি।
(সত্ত্ব—রস ; যেমন, আমসত্ত্ব)

পরশ্ব—পরশু : আগামী **পরশ্ব** তিনি কলিকাতা যাইবেন।

পরস্ব—পরধন : দস্যুরা **পরস্ব** অপহরণ করে।

বর্শা—সড়কি : **বর্শার** আঘাতে শত্রুবক্ষঃ বিদীর্ণ হইল।

বর্ষা—প্রাবৃট্‌কাল : '**বর্ষার** মেঘে আকাশ গিয়েছে ছেয়ে'।

বলি—পূজোপহার : "দেবক-ছাগকে…মায়ের কাছে **বলি** দিব।"—বঙ্কিমচন্দ্র।
"আমার পূজার **বলি** ফিরায়ে দিয়াছে"—রবীন্দ্রনাথ।

বলী—বলবান্, বীর : "হুঙ্কারে ধনু টঙ্কারিলা **বলী**"—মধুসূদন।

বাণ—শর : "হাতে ধনুর্**বাণ** রাম আইসেন ঘরে"—কৃত্তিবাস।

বান—বন্যা : "বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদী এল **বান**"—ছড়া।
(অনেকে 'নদেয় এলো বান' লেখেন ; 'নদেয়' পাঠ সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলেভুলানো ছড়া'-প্রবন্ধে 'নদী' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।)

বাণী—কথা, সরস্বতী : 'দিগ্‌দিগন্তে মুক্তির **বাণী** ধ্বনিছে রাত্রিদিন'।

বানী—গহনার মজুরী : সামান্য একটা আঙটির **বানী** আজ বারো টাকা।

বিনা—ব্যতীত : **বিনা** বাক্যব্যয়ে কাজ করিয়া যাও।

বীণা—তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ : "আমারে করো তোমার **বীণা**"—রবীন্দ্রনাথ।
(একবাক্যে—আমি গান করি **বিনা** যন্ত্রে, নারদ করেন **বীণা**যন্ত্রে।)

বিজন—নির্জন : "দুজনে **বিজনে** গাহিব ভূপালী"—গান।

বীজন—ব্যজন : 'বিজনী লইয়া করে সখীরা **বীজন** করে।'

ভাণ—ছল : যাহারা নিদ্রার **ভাণ** করিয়া থাকে, তাহাদিগকে জাগানো অসম্ভব।

ভান—দীপ্তি : জাগিলে ভানুর **ভান** রাত্রি করে তিরোধান।

মণ—চল্লিশ সের :
মন—চিত্ত : } 'শিশুগণ এক**মনে** **মণ**কষা শিখে'।

মাষ—কলাইবিশেষ :
মাস—বৎসরের বারো ভাগের এক ভাগ : } কার্তিক **মাসে** **মাষ**কলাই বুনিতে হয়।

মিলন—সংযোগ : "তোমায় আমায় **মিলন** হবে সেই মোহানার ধারে।"
—রবীন্দ্রনাথ।

মীলন—মুদ্রণ : সূর্য্যোদয়ে কুমুদিনীর **মীলন** ও পদ্মিনীর উন্মীলন হয়।

লক্ষ—শতসহস্র : "এক লক্ষ পুত্র তার সওয়া **লক্ষ** নাতি"—কৃত্তিবাস।

লক্ষ্য—উদ্দেশ্য, লক্ষণীয়, বেধ্য : "ধর্ম্মে **লক্ষ্য** করি পূজিনু দেবতা-কূলে।"
—মধুসূদন।

"চিরদিন এক **লক্ষ্য** জীবনবিকাশ"—অক্ষয় বড়াল। লক্ষ্নৌ সহরে এখন মিলিটারীর **লক্ষ্য** নেকড়ে আর হায়না।

শণ—একপ্রকার ছোট ছোট গাছ : **শণের** তন্তু পাটের চেয়ে সূক্ষ্ম।

সন—বৎসর : "নৌকা ফি-**সন** ডুবিছে ভীষণ"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

শর—বাণ : "অনুস্বার ধনুঃ**শর** নহে মহারাজ"—রবীন্দ্রনাথ।

সর—দুধের সর ; পুষ্করিণী : "ক্ষীর**সর**ননী দিলাম আঁচলে বাঁধিয়া"—বলাইদাস।
"যাইতে মানস**সরে** কার না মানস সরে"
—দ্বিজেন্দ্রনাথ।

স্বর—ধ্বনি ; বর্ণ : "গাও পঞ্চ**স্বরে** সীতার দুঃখের গীত"—মধুসূদন।
"যত বাছা করে **সর সর**, পাপিনী বলে সর্ সর্
অবসর হয় না **সর** দিতে।
সর সর ক'রে ত্রিভঙ্গ হয় বাছার **স্বর**ভঙ্গ
বাক্য**শর** হানে আবার তাতে॥"—দাশরথি।

সুত—পুত্র : দৈবকী**সুত** শ্রীকৃষ্ণ নররূপী ভগবান্।

সূত—সারথি : কর্ণ **সূত**পুত্ররূপে পরিচিত ছিলেন।
('সূত্র' শব্দের চলিত বাঙলা অপভ্রংশ 'সূত' : "এ হাটে বিকায় না অন্য সূত, শুধু নন্দরাণীর সুত"—নীলকণ্ঠ। সূত = সূত্র ; সুত = পুত্র।)

সুতা—কন্যা : শৈল**সুতা** পার্ব্বতী জগজ্জননী।

সূতা—সূত্র : বাবুরা মিহি**সূতার** কাপড় পরেন।

শান্ত—নিবৃত্ত, অচঞ্চল : "মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে **শান্ত** কর্‌লো বকে"—প্রবাদ।

সান্ত—সসীম : জগৎ **সান্ত** ; ব্রহ্ম অনন্ত।

শুচি—নির্ম্মল, পবিত্র : **শুচি**রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে।"—রবীন্দ্রনাথ।
"মুখরুচি কত **শুচি** করিয়াছে শোভা"—কাশীরাম দাস।

সূচি (চী)—ছুঁচ ; সূচীপত্র : সূক্ষ্ম **সূচী**শিল্পের জন্য শান্তিপুর বিখ্যাত।

শাড়ী—নারীপরিধেয় বসন ঃ "চলে নীল **শাড়ী** নিঙাড়ি নিঙাড়ি।"—চণ্ডীদাস।
শারী—স্ত্রী-শালিকপাখী ঃ **শারী** বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ।"
—শুকশারীর দ্বন্দ্ব।

শুক—টিয়াপাখী ঃ "**শুক** বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।"—শুকশারীর দ্বন্দ্ব।
শূক—শুঁয়াপোকা ঃ এবার **শূক**কীটের উপদ্রবে পাটের ক্ষতি হইয়াছে।

শূর—বীর ঃ "আতিথেয়-সেবা, তিষ্ঠি লহ, **শূর**শ্রেষ্ঠ"—মধুসূদন।
সুর—দেবতা, গানের সুর ঃ "জাগ্রত কি দানবারি **সুর**বৃন্দ আজ ?"—হেমচন্দ্র।
"যে **সুরে** বেঁধেছ এ বীণার তার নামিয়া নামিয়া গেছে বারেবার"
—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রুতি—কর্ণ, শ্রবণ ঃ "পদ্মপত্রে যুগ্মনেত্রে পরশয়ে **শ্রুতি**।"—কাশীরাম দাস।
স্রুতি—স্রাব, ক্ষরণ ঃ হস্তীর দেহ হইতে মদ**স্রুতি** হয়।

শিকার—মৃগয়া ঃ **শিকার** বুঝি হাতছাড়া হইয়া যায়।
স্বীকার—অঙ্গীকার ঃ আসামী অভিযোগ **স্বীকার** করিল না।

সহিত—সঙ্গে ঃ
স্ব-হিত—নিজের মঙ্গল ঃ } **স্ব-হিতের সহিত** পরের কথাও ভাবিতে হয়।

সজাতি—সমজাতি ঃ অনেক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিগণের **সজাতি**।
স্ব-জাতি—নিজশ্রেণী ঃ আমাদের মধ্যে **স্ব-জাতি**-প্রীতির অভাব আছে।

শঙ্কর—শিব ঃ "শঙ্করী **শঙ্করে**, দেব, পূজে দিবানিশি কিঙ্কর"—মধুসূদন।
সঙ্কর—মিশ্র ঃ বাঙালী **সঙ্কর** জাতি।

সুকৃতি—সৎকার্য্য, সৌভাগ্য ঃ যশস্বী পুত্র পিতামাতার **সুকৃতির** ফল।
সুকৃতী—সুকৃতিমান্ ঃ সুভাষচন্দ্র বঙ্গজননীর **সুকৃতী** পুত্র।

সত্ত্ব—সত্তা, গুণবিশেষ ঃ **সত্ত্ব**গুণের অনুশীলনে মানুষই দেবতা হইয়া উঠে।
স্বত্ব—আপন অধিকার ঃ জীবন দিব, তবু **স্বত্ব** ত্যাগ করিব না।

সর্গ—সৃষ্টি ; মহাকাব্যের পরিচ্ছেদ ঃ **সর্গ**-ব্যাপারে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহিলেন। কুমারসম্ভব-কাব্যের প্রথম **সর্গে** হিমালয়বর্ণন আছে।
স্বর্গ—সুরলোক ঃ "মর্ত্ত্যভূমি **স্বর্গ** নহে, সে যে মাতৃভূমি"—রবীন্দ্রনাথ।

সাক্ষর—শিক্ষিত ঃ বাঙলাদেশে নিরক্ষর লোক অপেক্ষা **সাক্ষর** লোকের সংখ্যা অতীব অল্প।
স্বাক্ষর—নামসহি ঃ **স্বাক্ষর**কারীর নাম গণেশ দাস।

[খ]

প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দাবলী

অন্ত—শেষ, সীমা : "পাই নে মা তোর **অন্ত** কোথা"—নীলকণ্ঠ।

অন্ত্য—অন্তস্থিত : 'ঙ' ক-বর্গের **অন্ত্য**বর্ণ।

অন্নপুষ্ট—অন্নদ্বারা পুষ্ট : প্রাণিমাত্রেরই দেহ **অন্নপুষ্ট**।

অন্যপুষ্ট—অন্যের দ্বারা পুষ্ট : কাকের দ্বারা পালিত হয় বলিয়া কোকিলের নাম **অন্যপুষ্ট**।

অবিহিত—অনুচিত : ন্যায়ের নামে অন্যায় আচরণ **অবিহিত**।

অভিহিত—কথিত : কৃষ্ণদ্বীপে জন্মহেতু ব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে **অভিহিত**।

অবিরাম—অবিশ্রান্ত : **অবিরাম** বর্ষণে গ্রামগুলি জলমগ্ন হইল।

অভিরাম—রমণীয় : 'নবঘনশ্যাম নয়না**ভিরাম** রামকে প্রণাম করি'।

অবদান—উপহার, দান, প্রশংসনীয় কৃতি : বাঙলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের **অবদান** অতুলনীয়।

অবধান—মনোযোগ দান : "দুঃখ কর **অবধান**"—কবিকঙ্কণ।

আদি—মূল, প্রথম : বাল্মীকি বিশ্বের **আদি**কবি।

আধি—মনঃকষ্ট : **আধি**ব্যাধিনিপীড়িত মানুষের মুক্তি কোথায় ?

আবরণ—আচ্ছাদন : } 'নাহি জুটে অঙ্গে **আবরণ**,
আভরণ—অলঙ্কার : } কোথা পাব রত্ন-**আভরণ** ?'

অর্ত্তি—দুঃখ : } রোগা**র্ত্তি** ঘুচাও আমি কৃপা**র্থী** তোমার।
অর্থী—প্রার্থী : }

উপাদান—মূল বস্তু : মানবদেহের **উপাদান** নাকি পঞ্চভূত।

উপাধান—বালিশ : 'ঘুমায়ে পড়িল সীতা শ্রীরামের বাহু-**উপাধানে**'।

উদ্ধত—দুর্বিনীত : **উদ্ধত** স্বভাব উন্নতির অন্তরায়। "**উদ্ধত** যত শাখার শিখরে রডোডেন্ড্রন্-গুচ্ছ"—রবীন্দ্রনাথ।

উদ্যত—উন্মুখ (উন্নীত) : '**উদ্যত** করিয়া ফণা দংশিল নাগিনী'।

কমল—পদ্ম : "হাসে রবি **কমল**লোচনে"—যতীন্দ্রমোহন।

কোমল—নরম : "যেত ছোট কলসীখানি **কোমল** তাহার কক্ষে নিয়া"—কুমুদরঞ্জন।
(একই বাক্যে : "আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে তোমার **কমল-কোমল** পাণি" —রবীন্দ্রনাথ।)

কতক—কিছু : শাড়ীখানির **কতক** কালো, **কতক** শাদা।

কথক—বক্তা (বিশেষ করিয়া ভাগবতের) : **কথক**মহাশয় ধ্রুবচরিত্র শুনাইতেছেন।

গৃহিণী—গৃহকর্ত্রী ঃ
গ্রহণী—রোগবিশেষ ঃ } **গৃহিণীর গ্রহণী** হইয়াছে।

চতুষ্পথ—রাস্তার চৌমাথা ঃ কলিকাতার **চতুষ্পথে** যান-নিয়ামক প্রহরী থাকে।
চতুষ্পদ—চারিপাযুক্ত ঃ গোরু **চতুষ্পদ** জন্তু।

তরণী—নৌকা ঃ 'সাধের **তরণী** মোর কে দিল তরঙ্গে ?'
তরুণী—যুবতী ঃ তরুণ**তরুণীদের** সমবেত সাধনায় দেশের মুক্তি হইবে।

দেবত্ব—দেবভাব ঃ মনুষ্যত্বেরই নামান্তর **দেবত্ব**।
দেবত্র—দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি ঃ দেবপূজা না করিয়াই অনেকে **দেবত্র** ভোগ করিতেছে।

ধড়া—কটিবসন ঃ 'শ্যাম-অঙ্গে পীত**ধড়া** মেঘেতে বিজলী'।
ধরা—ধরণী ঃ সীতা ছিলেন **ধরার** দুহিতা।

নিশিত—শাণিত, তীক্ষ্ণধার ঃ মহারাজ দুষ্মন্ত, তোমার শর **নিশিত**-নিপাত ও বজ্রসার।
নিশীথ—গভীর রাত্রি ঃ "দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি **নিশীথে**"—নজরুল।

নিরস্ত—বিরত, ক্ষান্ত ঃ পুলিশের লাঠি খাইয়া সে **নিরস্ত** হইল।
নিরস্ত্র—অস্ত্রহীন ঃ **নিরস্ত্র** জনগণের উপর রাজাকারদের অত্যাচার অমার্জ্জনীয়।

নির্জর—দেবতা ঃ
নির্ঝর—ঝরনা ঃ } **নির্জর**গণ স্বর্গের **নির্ঝরে** স্নান করেন।

প্রসাদ—অনুগ্রহ ঃ "ও পদ-**প্রসাদে**....জয়ী রক্ষোরণে এ কিঙ্কর"—মধুসূদন।
প্রাসাদ—বৃহৎ অট্টালিকা ঃ বুভুক্ষু প্রজার ক্রন্দন রাজার **প্রাসাদে** প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

পরভৃৎ—পরকে পালন করে যে ঃ
পরভৃত—পরের দ্বারা পালিত হয় যে ঃ } কাক ও কোকিল যথাক্রমে **পরভৃৎ** ও **পরভৃত**।

পরিচ্ছদ—পোশাক ঃ "বহুমূল্য **পরিচ্ছদ** রতনভূষণ।
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্দ্ধন ॥—কৃষ্ণচন্দ্র।
পরিচ্ছেদ—অধ্যায় ঃ মহাভারতের প্রত্যেক পর্ব্ব বহু **পরিচ্ছেদে** বিভক্ত।

পরিষদ্—সভা ঃ
পারিষদ—সভ্য, সদস্য ঃ } বঙ্গীয় ব্যবস্থা**পরিষদের** অধিবেশনে অনেক **পারিষদ** উপস্থিত থাকেন না।

প্রকার—রকম ঃ বিশেষ্য পাঁচ**প্রকার**। তোমার আকার**প্রকারে** দারিদ্র্যের চিহ্ন।
প্রাকার—প্রাচীরবেষ্টনী ঃ লঙ্কাপুরী **প্রাকার**বেষ্টিত ছিল।

বিস্মিত—আশ্চর্য্যান্বিত ঃ
বিস্মৃত—স্মৃতিচ্যুত ঃ
তুমি 'বর্ণপরিচয়'-এর বানান **বিস্মৃত** হইয়াছ দেখিয়া আমি **বিস্মিত** হইলাম।

মুখ—বদন ঃ "কুকথায় পঞ্চ**মুখ** কণ্ঠভরা বিষ"—ভারতচন্দ্র।

মূক—বাক্যহীন ; বোবা ঃ মূক ব্যক্তি সাধারণতঃ বধির হয়।
(একবাক্যে ঃ "**মূক মুখে** দিতে হবে ভাষা"—রবীন্দ্রনাথ।)

বসন—বস্ত্র ঃ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের **বসন** হরণ করিয়াছিলেন।

ব্যসন—নিন্দনীয় বিষয়ে আসক্তি ; বিপদ্ ঃ বহু ধনীর পতনের মূলে আছে **ব্যসন**।
ব্যসনে যিনি সঙ্গে থাকেন, তিনি বন্ধু (বিপদ্)।

শয্যা—বিছানা ঃ
সজ্জা—সাজ ঃ
ক্লান্ত কেরানি আপিসের **সজ্জা** ছাড়িয়া **শয্যার** আশ্রয় লইলেন।

শ্বশ্রূ—শাশুড়ী ঃ
শ্মশ্রু—দাড়ী ঃ
শ্বশ্রূমাতা আমার আবক্ষলম্বিত **শ্মশ্রু** দেখিয়া আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিহাস করিলেন।

স্তম্ব—তৃণ ঃ **স্তম্ব** হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সবই ব্রহ্মময়।

স্তম্ভ—থাম ঃ স্ফটিক**স্তম্ভ** হইতে নৃসিংহ বাহির হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন।

[গ]

বিপরীতার্থক শব্দাবলী

নঞ্ তৎপুরুষ সমাসের সাহায্যে যে-কোন শব্দকে বিপরীতার্থক করা যায় ; কিন্তু **অল্প কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্যত্র এই পদ্ধতি অবলম্বন করা সঙ্গত নয়।**

বহু, জন্ম, বন্ধন, আবশ্যক, লঘু, ঘন, আহূত—এই শব্দ কয়টির বিপরীতার্থক শব্দ যদি কেহ লেখে ঃ অবহু, অজন্ম, অবন্ধন, অনাবশ্যক, অলঘু, অঘন, অনাহূত তাহা হইলে মাত্র 'অনাবশ্যক' ও 'অনাহূত'কে গ্রহণ করা হইবে এবং বাকীগুলিকে কোন মূল্যই দেওয়া হইবে না। বাকীগুলির যথাক্রমিক বিপরীতার্থক শব্দ ঃ অল্প, মৃত্যু, মুক্তি, গুরু, তরল।

(১) নঞ-যোগে বিপরীতার্থক শব্দাবলী

অভ্যাস	অনভ্যাস	আস্তিক	নাস্তিক
অশন	অনশন	গণ্য	নগণ্য, অগণ্য
আচার	অনাচার	ধর্ম্ম	অধর্ম্ম
আহার	অনাহার	নিত্য	অনিত্য

ন্যায়	অন্যায়	সরকারী	বেসরকারী
পবিত্র	অপবিত্র	সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
প্রধান	অপ্রধান	সহযোগ	অসহযোগ
রসিক	অরসিক	সার	অসার
শান্ত	অশান্ত (দুরন্ত)	স্থাবর	অস্থাবর (সম্পত্তি)
শুচি	অশুচি	স্পৃশ্য	অস্পৃশ্য

সরকারী—বেসরকারী (বিদেশী শব্দ)

(২) বিচিত্ররূপের বিপরীতার্থক শব্দাবলী

অণু	বৃহৎ	উন্নতি	অবনতি
অল্প	বহু, অধিক	উন্মীলিত	নিমীলিত
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	উপকার	অপকার
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	উষ্ণ	শীতল
অনুকূল	প্রতিকূল	ঊর্দ্ধ	অধঃ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	ঋজু	বক্র
অনুলোম	বিলোম	ঐহিক	পারত্রিক
অনুরাগ	বিরাগ	কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
অন্তর্	বহিঃ	কর্কশ, কঠিন, কঠোর	কোমল
অন্ত্য	আদ্য	কু	সু
অর্থী	প্রত্যর্থী	কুৎসা	প্রশংসা
অলস	পরিশ্রমী	কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন (অকৃতজ্ঞ)
অলীক	সত্য	কৃশ	স্থূল
অন্ধকার	আলোক	কৃষ্ণ	শুক্ল
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	ক্রন্দন	হাস্য
আগমন	গমন	ক্ষয়	বৃদ্ধি
আদি	অন্ত	গরল (বিষ)	অমৃত
আপদ্	সম্পদ্	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
আদান	প্রদান	গুণ	দোষ
আরম্ভ	শেষ	গুপ্ত	প্রকাশিত
আলস্য	শ্রম	গৃহী	সন্ন্যাসী
আর্দ্র	শুষ্ক	গৌরব	লাঘব
আবির্ভাব	তিরোভাব	গ্রহণ	বর্জন

ইতর	ভদ্র (বাঙলায়)	নিরত	বিরত
ইহকাল	পরকাল	নির্দ্দয়	সদয়
ইহলোক	পরলোক	নির্ম্মল	মলিন
ঈষৎ	অধিক	নূতন	পুরাতন
উচ্চ	নীচ	নৈসর্গিক	কৃত্রিম
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	পক্ষ	প্রতিপক্ষ
উত্তম	অধম	পরকীয়	স্বকীয়
উদয়	অস্ত (বিলয়)	পতন	উত্থান
ঘন	তরল	পরুষ	কোমল
ঘাত	প্রতিঘাত	পাপ	পুণ্য
চঞ্চল	স্থির	পাপী	পুণ্যবান্
চোর	সাধু	পূর্ণিমা	অমাবস্যা
জড়	চেতন	পুষ্ট	ক্ষীণ
জন্ম	মৃত্যু	প্রকৃতি	বিকৃতি
জাগরণ	নিদ্রা	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
জীবন	মরণ	প্রফুল্ল	ম্লান
তরল	কঠিন (ঘন)	প্রভু	ভৃত্য
তস্কর	সাধু	প্রবীণ (দক্ষ অর্থে)	অপ্রবীণ
তরুণ	বৃদ্ধ	প্রবীন (প্রাচীন অর্থে)	নবীন
তাপ	শৈত্য	প্রশংসা	নিন্দা, কুৎসা
তিমির	আলোক	প্রাচীন	নব্য (নবীন)
তিরস্কার	পুরস্কার	বন্ধন	মুক্তি
দক্ষিণ	বাম	বন্ধু	শত্রু
দাতা	গ্রহীতা	বন্ধুর	মসৃণ
দানশীল	কৃপণ	ব্রাহ্মণ	শূদ্র
দিন	রাত্রি	ভয়	সাহস (অভয়)
দীর্ঘ	হ্রস্ব	ভীরু	নির্ভীক
দুর্লভ	সুলভ	মধুর	কটু, তিক্ত
দুষ্কৃতি	সুকৃতি	মহৎ	নীচ
ধনিক	শ্রমিক	মান	অপমান
ধনী	দরিদ্র	মিত্রতা	শত্রুতা
ধর্ম্মিষ্ঠ	পাপিষ্ঠ	মিলন	বিরহ

মৃদু	তীব্র, কঠোর	শিষ্য	গুরু
মিথ্যা	সত্য	শোক	হর্ষ
যশ (ঃ)	অপযশ	সন্নিকৃষ্ট	বিপ্রকৃষ্ট
রুগ্ন (রুগ্‌ণ)	সুস্থ	সংক্ষেপ	বাহুল্য
রোষ	প্রসাদ	সমাপ্ত	আরব্ধ
লঘিমা	গরিমা	সরস	বিরস
লঘু	গুরু	সহযোগী	প্রতিযোগী
বর্দ্ধমান	হ্রসমান (হ্রস্বমান নয়)	সৃষ্টি	লয়
বন্য	গ্রাম্য, সামাজিক, গৃহপালিত	স্নিগ্ধ	রুক্ষ
		সঞ্চয়	অপচয়
বাদ	প্রতিবাদ	সম্পদ্‌	বিপদ্‌
বালক	বৃদ্ধ	সুখ	দুঃখ
বিনীত	দুর্বিনীত, উদ্ধত	স্মৃতি	বিস্মৃতি
বিরল	বহুল	সংযোগ	বিয়োগ
বিষাদ	হর্ষ	সন্ধ্যা	প্রভাত
বৃহৎ	ক্ষুদ্র	সংবৃত	বিবৃত
বৃদ্ধি	হ্রাস	স্থাবর	জঙ্গম
ব্যর্থ	সার্থক	স্বর্গ	মর্ত্ত্য
ব্যষ্টি	সমষ্টি		

মন্তব্য ঃ মূল শব্দ বিশেষ্য হইলে বিপরীতার্থক শব্দ বিশেষ্য হইবে ; মূল শব্দ বিশেষণ হইলে বিপরীতার্থক শব্দ বিশেষণ হইবে। এ নিয়ম লঙ্ঘন করা চলিবে না।

কয়েকটি উদাহরণ

"**পুণ্যে পাপে, দুঃখে সুখে, পতনে উত্থানে**
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে"—রবীন্দ্রনাথ।

"**বামুন শূদ্র, বৃহৎ ক্ষুদ্র** কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লুটে"—সতেন্দ্রনাথ।

"**জীবন মৃত্যু** পায়ের ভৃত্য"—রবীন্দ্রনাথ।

"**সফেদ কালা** মিশ খাবে না"—হেমচন্দ্র (সফেদ = শাদা)।

"এই জীবনব্যাপী **ভালমন্দ সুখদুঃখের** অবস্থাগুলা যেন আতসবাজী"—শরৎ।

"**আদি অন্ত** হারিয়ে ফেলে
শাদা কালোর আসন মেলে
প'ড়ে আছে আকাশটা খোসখেয়ালী—রবীন্দ্রনাথ।

"**স্বর্গমর্ত্ত্য** পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির **অন্তরে-বাহিরে** আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে"—শরৎ।

"আমরা **পূর্ব্ব**, তোমরা **পশ্চিম**। আমরা **আরম্ভ**, তোমরা **শেষ**।...আমরা **উষা**, তোমরা **গোধূলি**। আমাদের অন্ধকার হ'তে **উদয়**, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর **বিলয়**।...তোমরা **দৈর্ঘ্য**, আমরা **প্রস্থ**। আমরা **নিশ্চল**, তোমরা **চঞ্চল**।" —বীরবল (প্রমথ চৌধুরী)।

"**দূর**কে করিলে **নিকট** বন্ধু, পরকে করিলে ভাই"—রবীন্দ্রনাথ।

"সাঙ্গ আমার **বেচা-কেনা**—
এসেছি ক'রে হিসাবনিকাশ যাহার যত **পাওনা দেনা**"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

"কেবা **শত্রু, মিত্র** কেবা?"—নবীনচন্দ্র।

"ভারতবর্ষ **ছোট-বড়, স্ত্রীপুরুষ,** সকলকেই মর্য্যাদা দান করিয়াছে"—রবীন্দ্র।

"**পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিত; মহৎ, ক্ষুদ্র;** ইংরেজ, বাঙ্গালী—এইখানে সকলেই সমান।"—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

"**লঘুগুরু** মানো না, কষ্ট পাবে জানো না?"—প্রবাদ।

"**আলোক** ও **অন্ধকার** সর্ব্বত্র একসঙ্গে বিচরণ করে"—কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

"**আসা-যাওয়া** দুদিকেই খোলা রবে দ্বার"—রবীন্দ্রনাথ।

সমাসবদ্ধ অবস্থায় বিপরীতার্থক শব্দযুগ্মের বহুল প্রয়োগ আমাদের সাহিত্যে আছে। উপরে কয়েকটি উদাহৃত হইয়াছে। আরও কয়েকটি সাজাইয়া দিলাম:

অগ্রপশ্চাৎ, আপনপর, আয়ব্যয়, আলোআঁধারী, আদ্যন্ত, আসলনকল, আদানপ্রদান, আলোছায়া, আসমানজমীন, আকাশপাতাল, উচ্চনীচ, উদয়াস্ত, কড়িকোমল, কমবেশি, ক্ষতিবৃদ্ধি, চড়াই-উৎরাই, জমাখরচ, জোড়বিজোড়, জয়পরাজয়, জীবন্মৃত, দণ্ডপুরস্কার, মরণবাঁচন, যাতায়াত, যোগবিয়োগ, যোগাযোগ, শুকোহাজা, সরুমোটা, হিতাহিত, হাসিকান্না, হারজিত।

[ঘ]
নানার্থক শব্দাবলী

অঙ্ক: (i) নাটকের পরিচ্ছেদ:
(ii) ক্রোড়:

"এই নাটকের এই **অঙ্কে**, পেয়েছি স্থান তোর **অঙ্কে**, হয়ত যাব পর **অঙ্কে** পর-**অঙ্কে** পুত্র সেজে"—অহিভূষণ। (সুরথ-উদ্ধার)

(iii) সংখ্যাচিহ্ন: এই পুস্তকের **পত্রাঙ্ক** ৬৭।

(iv) গণিত: ছেলেটি **অঙ্ক** কষিতেছে।

অর্থ : (i) ধন : তোমার অদৃষ্টে প্রচুর **অর্থ**লাভ রহিয়াছে।
(ii) প্রয়োজন : পুত্র**ার্থে** ভার্য্যাগ্রহণ শাস্ত্রবিধি।
(iii) অভিপ্রায় : মহাশয়ের অবগত্য**র্থে** নিবেদন করিতেছি।
(iv) তাৎপর্য্য (মানে) : রবীন্দ্রনাথ 'অনুভূতি' **অর্থে** 'বেদনা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অম্বর : (i) বস্ত্র : 'পরিধানে পীত**াম্বর** গলে বনমালা'।
(ii) আকাশ : "গম্ভীরে **অম্বরে** যথা নাদে কাদম্বিনী"—মধুসূদন।
একই বাক্যে : "অসম্বর **অম্বর, অম্বর** পড়ে শিরে"—ভারত।

কর : (i) কিরণ : "আজি এ প্রভাতে রবির **কর** কেমনে পশিল প্রাণের 'পর" —রবীন্দ্রনাথ।
(ii) হস্ত : "বামে নন্দী মহাকাল **করে** শূল গলে মাল"—কাশীরাম।
(iii) রাজস্ব : ভারতবাসী **কর**ভারে নিপীড়িত।
(iv) হস্তিশুণ্ড : 'সুদীর্ঘ বঙ্কিম **করে** করী জলপান করে'।

গোত্র : (i) বংশ : "ভগবান্, **গোত্র** নাহি জানি"—রবীন্দ্রনাথ।
(ii) পর্ব্বত : "**গোত্রের** প্রধান পিতা"—ভারতচন্দ্র।

গুণ : (i) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বিনয়াদি : "কোন **গুণ** নাই তার কপালে আগুন" —ভারতচন্দ্র।
(ii) ধনুকের ছিলা : "ধনুর অহঙ্কার **গুণ**"—মতি রায়।
(iii) রজ্জু : "একবার ইন্দ্র, একবার আমি **গুণ** টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।"—শরৎচন্দ্র।
(iv) স্বভাব-ধর্ম্ম (property) : লৌহের **গুণ** কাঠিন্য।
(v) পূরণ : সাতের তিন**গুণ**। আমার কথায় তাহার ক্রোধ দ্বি**গুণ** বাড়িয়া গেল।

গ্রহণ : (i) আদান : এ অর্থ **গ্রহণ** করিব না।
(ii) চন্দ্র বা সূর্য্য-গ্রহণ : চন্দ্রে **গ্রহণ** লাগিয়াছে।

তারা : (i) তারিণী :
(ii) চক্ষুতারকা :
(iii) নক্ষত্র :
(iv) দেবী :

"যেদিন তিনদিন ব'লে গিয়েছে সে দীন**তারা**
সেইদিন তখনই আমি দেখেছি রে দিনে **তারা** ;
তারাহারা হ'য়ে আমি হ'য়ে আছি **তারা**হারা"
—দাশরথি।

দ্বিজ : (i) বিপ্র : "দেখ **দ্বিজ** মনসিজ জিনিয়া মূরতি"—কাশীরাম।
(ii) দন্ত : (বাঙলায় প্রয়োগ নাই)
(iii) অণ্ডজ প্রাণী : সংস্কৃত মহাভারতে জটায়ু পক্ষীকে "মহাভাগং **দ্বিজোত্তমম্**" বলা হইয়াছে। (বাঙলায় পাই নাই।)
(iv) চন্দ্র : "বামনে ধরে **দ্বিজরাজ**"—দাশরথি।

দণ্ড : (i) ২৪ মিনিট : "ঘরের বাহিরে **দণ্ডে** শতবার তিলে তিলে আইসে যায়" —চণ্ডীদাস।
(ii) যষ্টি : **দণ্ডা**ঘাতে শত্রুর মস্তক চূর্ণ করিব।
(iii) শাস্তি : অপরাধীর **দণ্ডই** বাঞ্ছনীয়।
(iv) চিহ্ন : কপালে রাজ**দণ্ড** ছিল বলিয়াই ভিক্ষুক রাজা হইল।
(v) রাজার করধৃত দণ্ড : অত্যাচারী রাজার রাজ**দণ্ড** খসিয়া পড়ে। (sceptre)।

পক্ষ : (i) ডানা : এরোপ্লেনের পাখীর মত দুইটি **পক্ষ** আছে।
(ii) মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ (১৫ দিন) : "কৃষ্ণ**পক্ষে** আধখানা চাঁদ উঠল অনেক রাতে"—রবীন্দ্রনাথ।
(iii) দল : কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব**পক্ষে** ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

পণ : (i) প্রতিজ্ঞা : **পণ** করিয়াছি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও দিব না।
(ii) কুড়িগণ্ডা : "আট**পণে** আধসের কিনিয়াছি চিনি"—ভারতচন্দ্র।

ভূত : (i) অতীত : **ভূত**কালের সুখস্মৃতি আনন্দময়।
(ii) ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি : প্রাণীর দেহ পঞ্চ**ভূতে** গঠিত।
(iii) প্রেত : **ভূতেরা** নাকি নাকী সুরে কথা কয় ?
(iv) সৃষ্টি : 'সর্ব্ব**ভূতে** ভগবান্ জানিয়াছি স্থির'।

বর্ণ : (i) অক্ষর : শিশুটি **বর্ণ**মালা শিখিতেছে।
(ii) রঙ : দ্রৌপদী কৃষ্ণ**বর্ণা** ছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম কৃষ্ণা।
(iii) জাতি : ব্রাহ্মণাদি চারি**বর্ণ** বিধাতার সৃষ্টি।

বাস : (i) বস্ত্র : } "আমার কাজ কি **বাসে**, কাজ কি **বাসে**"—দাশরথি।
(ii) বাসগৃহ : } (প্রথম বাস = বস্ত্র ; দ্বিতীয় বাস = বাসস্থান)
(iii) অবস্থান : } "কুসুমের **বাস**
(iv) গন্ধ : } বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় **বাস**"—ঈশ্বর গুপ্ত।
(প্রথম বাস = গন্ধ ; দ্বিতীয় বাস = অবস্থান)

নীচের শব্দগুলির বানান এক, উচ্চারণ ও অর্থ ভিন্ন :

আটা : (i) পিষ্ট গম : **আটা**ই হিন্দুস্থানীর প্রধান খাদ্য।
(ii) গঁদজাতীয় বস্তু : কাগজ দুইখানি **আটা** দিয়া জুড়িয়া দাও।
একই বাক্যে : ময়দার মত **আটা** দিয়াও **আটা** তৈয়ারী হয়।

আড়ি : (i) ভাবের অভাব : আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার **আড়ি**।
(ii) মাপবিশেষ : দুই **আড়ি** ধানে আমার কি হবে ?

কড়া : (i) তিন ক্রান্তি : **কড়ায়** গণ্ডায় শোধ ক'রে দাও।
(ii) কটাহ : **কড়ায়** মাছের ঝোল আছে।
(iii) কিণাঙ্ক : বাসন মাজিয়া মাজিয়া হাতে **কড়া** পড়িয়া গিয়াছে।

কলাই : (i) মাষকলাই প্রভৃতি : মাষ**কলাই**য়ের ডাল আর কচুভাতে
—ব্যস্, আর কি চাই ?
(ii) এনামেল : আজকাল **কলাই**করা বাসনের খুব আদর।

কই : (i) মাছবিশেষ : **কই** মাছের ঝোল রোগীর পথ্য।
(ii) কোথায় : আমার কলমটা **কই** ?

কলি : (i) যুগবিশেষ : "**কলি**শেষে একবর্ণ হইবে যবন"।
(ii) ফুলের বা গানের : আঙুলগুলি চাঁপার **কলি**। গানের অন্তরাকে আমরা বলি **কলি**।

কালা : (i) বধির : "কানে **কালা** কারো কথা নাহি শুনে"—গান।
(ii) কৃষ্ণ : "কালো জল ঢালিতে সই **কালা** পড়ে মনে"—চণ্ডীদাস।
(iii) অত্যন্ত ঠাণ্ডা : দারুণ শীতে হাত **কালা** হ'য়ে গেল।

কড়ি : (i) কপর্দ্দক : 'নাই প্রভু মোর পারের **কড়ি** পার ক'রে দাও দয়া করি'।
(ii) ঘরের কড়ি : কি করি ভাই, ব'সে ব'সে **কড়ি** গুনছি।

গুঁড়ি : (i) চূর্ণ : আজকাল ময়দায় কাঁইবীচির **গুঁড়ি** মিশানো হয়।
(ii) বৃক্ষকাণ্ড : পা তো নয়, যেন শালগাছের **গুঁড়ি**।

ছাপা : (i) ঢাকা : গোপনে পাপ করলেও চিরদিন তা **ছাপা** থাকে না।
(ii) চিত্রিত, মুদ্রিত : **ছাপা**শাড়ীপরা মেয়েটির লেখা বইখানি **ছাপা** হয়েছে।

ছানা : (i) দুগ্ধজাত দ্রব্যবিশেষ : **ছানার** সন্দেশ মুখরোচক।
(ii) শাবক : খুকুমণির সঙ্গী একটি বিড়াল**ছানা**।

পড়া : (i) পতন : ছাদ হইতে জল**পড়া** বন্ধ হইল না।
(ii) অধ্যয়ন : "সকাল বেলায় **পড়ার** ধুম।"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

বাড়ি : (i) ঘা : লাঠির এক **বাড়িতে** কুকুর জব্দ হইল।
(ii) বৃদ্ধি : মণে দশ সের হিসাবে ধান **বাড়ি** দেওয়া হইয়াছে।

মাড়ি : (i) (যেমন) তালের : দইচিনি দিয়ে তালের **মাড়ি** খেতে খুব ভালো।
(ii) দাঁতের গোড়া : ঠাণ্ডা লেগে দাঁতের **মাড়ি** ফুলেছে।

[ঙ]

একার্থক ভিন্নশব্দাবলী

অঙ্গ—দেহ, তনু, গাত্র, শরীর, বপুঃ, কায় (বাঙলায় 'কায়া'ও হয়)।

অগ্নি—বহ্নি, অনল, বিভাবসু, কৃশানু, পাবক, সর্ব্বভুক্, হুতাশন, আগুন।

অন্ধকার—তিমির, তমঃ, তমসা, তমিস্র, আঁধার।

আকাশ—গগন, অম্বর, ব্যোম, অন্তরীক্ষ, নভঃ, খ, শূন্য, আসমান।

ইচ্ছা—বাসনা, কামনা, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, অভিলাষ, অভিপ্রায়, সাধ।

ঈশ্বর—স্রষ্টা, ভগবান্, বিধাতা, প্রভু, নিখিলপতি, জগদীশ্বর, জগৎপিতা, বিধি, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, বিভু।

কন্যা—দুহিতা, পুত্রী, তনয়া, নন্দিনী, আত্মজা, সুতা, মেয়ে, ঝী ("শুন লো রাজার **ঝী**" —চণ্ডীদাস)।

কথা—বাক্য, ভাষণ, বচন, উক্তি।

কর্ণ—শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রোত্র, কান।

কিরণ—প্রভা, আভা, বিভা, অংশু, কর, রশ্মি, দীপ্তি, জ্যোতিঃ।

কেশ—কুন্তল, চিকুর, চুল।

গৃহ—ভবন, সদন, আবাস, আলয়, নিকেতন, আগার, ঘর, বাড়ী।

চন্দ্র—বিধু, চন্দ্রমা, হিমাংশু, সুধাংশু, শীতাংশু, সোম, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, কুমুদবান্ধব, নিশানাথ, ইন্দু, নিশাকর, চাঁদ।

চক্ষু—নেত্র, নয়ন, লোচন, অক্ষি, চোখ।

জল—বারি, অম্বু, জীবন, অপ্, পয়ঃ, উদক, নীর, তোয়, সলিল।

দেবতা—সুর, নির্জর, ত্রিদশ, অমর, দেব, বিবুধ, ত্রিদিবনিবাসী।

নদী—তটিনী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিণী, সরিৎ, নির্ঝরিণী।

নারী—রমণী, কামিনী, মহিলা, স্ত্রী, যোষিৎ, বামা, রামা।

পক্ষী—বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, খেচর, খগ, পাখী।

পদ্ম—সরোজ, পঙ্কজ, সরোরুহ, সরসিজ, উৎপল, কমল, ইন্দীবর, কোকনদ, পুণ্ডরীক, শতদল, নলিনী।

পৃথিবী—ধরা, বসুধা, বসুন্ধরা, ধরণী, মেদিনী, পৃথ্বী, বসুমতী, ভূ, সর্ব্বংসহা, ধরিত্রী, মহী, ক্ষিতি, অবনী।
পুত্র—তনয়, নন্দন, সুত, আত্মজ, ছেলে।
পর্ব্বত—গিরি, শৈল, নগ, অচল, শিখরী, মহীধর, ধরাধর, ভূধর, অদ্রি, পাহাড়।
বন—কান্তার, অরণ্য, বিপিন, অটবী, জঙ্গল।
ভ্রমর—মধুকর, মধুপ, অলি, ষট্‌পদ, শিলীমুখ, দ্বিরেফ, ভোমরা।
মেঘ—জলদ, নীরদ, ঘন, নীরধর, পয়োধর, জীমূত, অভ্র, বারিদ।
মৃত্যু—মরণ, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, লোকান্তর, মহাযাত্রা, দেহত্যাগ, পরলোক-গমন।
যুদ্ধ—রণ, আহব, সংগ্রাম, সমর, বিগ্রহ।
রাজা—নৃপতি, নৃপ, নরপতি, ভূপাল, মহীপাল, ভূপতি, ভূপ, নরেশ।
রাত্রি—যামিনী, ত্রিযামা, রজনী, ক্ষণদা, ক্ষপা, শর্ব্বরী, বিভাবরী, নিশা, নিশীথিনী, রাতি, রাত।
বায়ু—সমীর, সমীরণ, অনিল, পবন, মরুৎ, গন্ধবহ, প্রভঞ্জন, বাতাস।
বিদ্যুৎ—চপলা, চঞ্চলা, সৌদামিনী, ক্ষণপ্রভা, দামিনী, তড়িৎ, বিজলী।
বৃক্ষ—পাদপ, তরু, শাখী, বিটপী, দ্রুম, গাছ।
শিখী—ময়ূর, কলাপী, কেকী, বর্হী, অহিভুক্।
সমুদ্র—সাগর, সিন্ধু, নীলাম্বু, রত্নাকর, উদধি, পয়োধি, জলধি, বারিধি, পয়োনিধি, অর্ণব, অম্বুধি।
সর্প—ভুজঙ্গ, ভুজগ, ভুজঙ্গম্, ফণী, কুণ্ডলী, আশীবিষ, নাগ, অহি, সাপ।
সূর্য্য—রবি, তপন, সহস্রাংশু, দিনকর, মরীচিমালী, মার্ত্তণ্ড, প্রভাকর, সবিতা, আদিত্য, অংশুমালী, ভানু, ভাস্কর, দিবাকর, দিননাথ, মিহির, দিনমণি, দিনেশ।
স্বর্ণ—কাঞ্চন, হিরণ্য, হাটক, হেম, সুবর্ণ, অষ্টাপদ, কনক, সোনা।
হস্ত—ভুজ, বাহু, কর, পাণি, হাত।
হস্তী—গজ, করী, কুঞ্জর, মাতঙ্গ, বারণ, দ্বিপ, দ্বিরদ, হাতী।

শব্দার্থগত অশুদ্ধি

পূর্ব্বে বানানভুলের আলোচনা বিশেষভাবেই করিয়াছি। এখন যে ভুলের কথা বলিতেছি, তাহা বানানঘটিত নয়, শব্দের অর্থঘটিত। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছিঃ

অনেকে **'নির্দ্দোষী', 'নিরপরাধী'** লিখিয়া থাকে। বানান ঠিকই আছে; তবু শব্দ দুইটি অশুদ্ধ, কারণ যাহার 'দোষ' বা 'অপরাধ' নাই এই অর্থে নঞ্-বহুব্রীহি-সমাসে **'নির্দ্দোষ', 'নিরপরাধ'** শুদ্ধ—ইহারা বিশেষণ। কাজেই ইহাদের উপর নূতন করিয়া 'ইন্' (ঈ) প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য করা অর্থহীন। এই দুইটি শব্দকে ভাবার্থে

'তা' প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য করা যায়; তখন ইহাদের রূপ দাঁড়ায় **'নির্দ্দোষতা', 'নিরপরাধতা'**—'নির্দ্দোষিতা' বা 'নিরপরাধিতা' নয়। এইগুলি সাধিত শব্দ এবং ইহাদের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ফলে প্রাপ্ত অর্থ মনে রাখিলে এজাতীয় ভুল হইবে না।

একই অর্থের কৃৎ- বা তদ্ধিত-প্রত্যয় একই ধাতু বা শব্দে দুইবার হয় না। ঔচিত্যার্থে 'য' বা 'অনীয়' কৃৎ-প্রত্যয়যোগে √নিন্দ্ নিন্দ্য বা **'নিন্দনীয়'** হয়; 'নিন্দ্যনীয়' **ভুল**। 'এক' শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'ষ্ণ্য' বা 'তা' তদ্ধিত-প্রত্যয় করিলে হয় **'ঐক্য'** বা **'একতা'**; ডবল তদ্ধিত (ষ্ণ্য+তা)-যোগে 'ঐক্যতা' **ভুল**।

বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন বিশেষণকে (বিশেষ্য বলিয়া ভুল করিয়া?) প্রত্যয়যোগে বা নূতন সমাসে আবার বিশেষণে পরিণত করা একটি অতিসাধারণ ভুল:

সলজ্জ, নিরানন্দ, সানন্দ, নীরোগ, সচেষ্ট, সাহ্লাদ, নিরভিমান, সাবধান, নিঃসন্দেহ, সাদর, নির্দ্দোষ, সবিনয়, নিরহঙ্কার—এগুলি বহুব্রীহি-সমাসনিষ্পন্ন বিশেষণ—**শুদ্ধ**।

কিন্তু অনেকের লেখায় দেখা যায়:

সলজ্জিত, নিরানন্দময়, সানন্দিত, নীরোগী, সচেষ্টিত, নিরভিমানী, সাহ্লাদ-সহকারে, নির্দ্দোষী, সাদরপূর্ব্বক, নিঃসন্দেহসহকারে, সবিনয়পুরঃসর, সাবধানপূর্ব্বক, নিরহঙ্কারপূর্ণ—এগুলি **ভুল**।

'কাতর', 'কৃতজ্ঞ'—বিশেষণ; অথচ বিস্ময়ের কথা **রবীন্দ্রনাথও 'সকাতর' 'সকৃতজ্ঞ' লিখিয়াছেন!**

'সক্ষম' শব্দের অর্থ ক্ষমার সহিত বর্ত্তমান (বহুব্রীহি)। কিন্তু বাঙলায় 'সমর্থ' অর্থে 'সক্ষম' অনেক সাহিত্যিকই লেখেন। **'সমর্থ'** লেখাই উচিত।

'উত্তম আশ্রয়' অর্থে মহদাশ্রয় (মহৎ-আশ্রয়ও) লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল। লিখিতে হইবে **মহাশ্রয়** (কর্ম্মধারয় সমাস)। (সমাসে সমানাধিকরণ বুঝাইলে 'মহৎ' 'মহা' হইয়া যায়—ইহাই ব্যাকরণের অনুশাসন।) **মহদাশ্রয়, মহদাশ্রম, মহদুপকার = মহতের আশ্রয়, মহতের আশ্রম, মহতের উপকার** (ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)।

বাঙলায় 'সহকারে', 'পুরঃসর', 'পূর্ব্বক' সমাসের উত্তরপদ হইয়া শব্দটিকে ক্রিয়া-বিশেষণভাবাপন্ন করিয়া তোলে। কাজেই ইহাদের পূর্ব্বপদের বিশেষ্য হওয়া উচিত। 'সাবধানপূর্ব্বক', 'সবিনয়পুরঃসর', 'আনন্দসহকারে' **না** লিখিয়া, লিখিতে হইবে 'অবধানপূর্ব্বক', 'বিনয়পুরঃসর', 'আনন্দসহকারে' (অথবা **সাবধানে, সবিনয়ে, সানন্দে**—এই রূপ শ্রুতিমধুর বলিয়া বাঙলায় চলিয়া গিয়াছে এবং বাঙলাভাষার প্রকৃতিসিদ্ধও বটে)।

'গ্রাহ্যযোগ্য' ভুল ; **শুদ্ধ 'গ্রহণযোগ্য'** (বিশেষণ পূর্ব্বপদ করিয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না—'গ্রাহ্য' বিশেষণ)। 'আবশ্যকীয়' ভুল ; **শুদ্ধ 'আবশ্যক'** (কারণ, 'আবশ্যক' নিজেই বিশেষণ)।

লিঙ্গঘটিত অশুদ্ধি

তৎসম শব্দের লিঙ্গপরিবর্ত্তনে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মই মানিয়া চলা উচিত। কিন্তু বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক **লিঙ্গের অপপ্রয়োগ** করিয়াছেন :

(i) "**শুন রজকিনী** রামী" অথবা "**রজকিনী**-রূপ কিশোরীস্বরূপ"—চণ্ডীদাস।

(ii) "একে হাম **পরাধীনী**"—জ্ঞানদাস ('অধীনী')।

(iii) "**চাতকিনী** কুতুকিনী ঘনদরশনে"—মদনমোহন।

(iv) "**সুকেশিনী** রাঘববাসনা"—মধুসূদন।

(v) "**কুরঙ্গিণী**-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে"—মধুসূদন।

(vi) "সুপ্ত **নটিনীর** মত নিস্তব্ধ তটিনী"—রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "**শূদ্রাণী** মা"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

(viii) "**অপ্সরী** কিন্নরী দিবে হুলুধ্বনি"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "রূপে তুমি **অপ্সরী**"—সত্যেন্দ্রনাথ।

(x) "দয়াহীনা সভ্যতা-**নাগিনী**" অথবা "**নাগিনীরা** ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস"—রবীন্দ্রনাথ।

(xi) "গাইছে **গায়কী**"—মধুসূদন।

(xii) "কেলিছে **নায়কী**"—ঐ

(xiii) "**তড়িৎ-বরণী হরিণ-নয়নী**"—চণ্ডীদাস।

(xiv) "**অনাথিনী** শবরকুমারী"—যতীন্দ্রমোহন।

(xv) "বীরমাতা প্রভাময়ী **সুচিরযৌবনী**"—হেমচন্দ্র।

—এগুলি কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। স্থুলাক্ষর শব্দগুলির শুদ্ধ রূপ যথাক্রমে 'রজকী', 'পরাধীনা', 'চাতকী', 'সুকেশা বা সুকেশী', 'কুরঙ্গী', 'নটী', 'শূদ্রা' (এখানে 'জাতি' বুঝাইতেছে, 'পত্নী' নয় ; 'পত্নী' বুঝাইলে 'শূদ্রাণী'), 'অপ্সরা (:)', 'নাগী', 'গায়িকা', 'নায়িকা', 'তড়িৎ (দ্)-বরণা হরিণ-নয়না', 'অনাথা', 'সুচিরযৌবনা'।

এখন প্রশ্ন—ছাত্রগণের পক্ষে এই কবি-সম্মানিত অপপ্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা এবং নিজে প্রয়োগ করা চলে কিনা? উত্তর—**না**। সাহিত্যিকের যে স্বাধীনতা আছে, পরীক্ষার্থী ছাত্রের সে স্বাধীনতা নাই। তাহাদের নিয়ম মানিয়া চলাই উচিত বলিয়া মনে করি। এ কথাও সত্য যে সাহিত্যিকের স্বাধীনতারও সীমা আছে, স্বেচ্ছাকৃত

ব্যভিচারের অধিকার তাঁহাদিগেরও নাই। 'নায়িকা'-র স্থলে 'নায়কী' লিখিতে মধুসূদনের মত যুগপ্রবর্ত্তক মহাকবিকেও কৈফিয়ত দিতে হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলিবার আছে ; কতকগুলি সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সংস্কৃতে যে-অর্থে প্রযুক্ত হয়, বাঙলায় সে অর্থে হয় না। শব্দগুলি তৎসম, কিন্তু অর্থ বাঙলা। এইগুলি অব্যাহতভাবে চলিয়া বাঙলায় এখন স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইহাদের প্রয়োগ অপপ্রয়োগ বলিয়া এখন মনে করা যায় না। এইরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিতেছি :

(i) **ছাত্রী**—সংস্কৃতে ইহার অর্থ 'ছাত্রপত্নী' এবং যে বালিকা শিক্ষার্থিনী তাহাকে বলা হয় **ছাত্রা**। 'ছাত্রা' শব্দের প্রয়োগ বাঙলায় মোটেই নাই।

(ii) **সতী**—সংস্কৃতে 'সৎ' (চিরন্তন বা সাধু)-এর স্ত্রীলিঙ্গ 'সতী'; কিন্তু বাঙলায় **সতী = পতিব্রতা নারী**।

(iii) **সাধ্বী**—সংস্কৃতে 'সাধু'-র স্ত্রীলিঙ্গ 'সাধ্বী' ; কিন্তু বাঙলায় **সাধ্বী = সতী** (নারী)।

(iv) **বর্ষীয়সী**—সংস্কৃতে দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 'ঈয়সু' (ঈয়স্) প্রত্যয় হয়। কাজেই '**বর্ষীয়সী** নারী' বলিলে বুঝায় দুই নারীর মধ্যে যাহার বয়স অধিক তাহাকেই। কিন্তু বাঙলায় বর্ষীয়সী = অধিকবয়স্কা ; ইহার মধ্যে তুলনার ভাব নাই। রবীন্দ্রনাথের "আমি নারী, আমি **মহীয়সী**"-র **মহীয়সী**-ও এই ভাবের অর্থাৎ **মহীয়সী = মহতী**।

(v) **কিঙ্করী**—সংস্কৃতে কিঙ্করী = কিঙ্কর (ভৃত্য)-পত্নী। 'দাসী' অর্থে শুদ্ধ শব্দ **কিঙ্করা**। কিন্তু বাঙলায় **কিঙ্করী = দাসী**। 'কিঙ্করা' শব্দের প্রয়োগ বাঙলায় একেবারেই নাই।

(vi) **মালিনী**—সংস্কৃতে 'মালিনী' = মাল্যধারিণী। বাঙলায় সমাসে এই অর্থে 'মালিনী'-র প্রয়োগ আছে : নৃমুণ্ডমালিনী, তরঙ্গমালিনী। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শব্দরূপে 'মালিনী' = '**মালী**' (Garden-keeper)-র **স্ত্রী**।

(vii) **বন্দিনী**—সংস্কৃতে 'বন্দিনী' = 'বন্দনাকারিণী' (নারীজাতীয় চারণ বা ভাট), কিন্তু বাঙলায় **বন্দিনী = কারারুদ্ধা**। এই 'বন্দিনী' যে-'বন্দী' হইতে করা হইয়াছে তাহার সহিত সংস্কৃত 'বন্দী'-র (বন্দনা করা অর্থে বন্দ্ ধাতু + ইন্ পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন) কোন সম্বন্ধ নাই। **Prisoner-অর্থক 'বন্দী' বিদেশী শব্দ এবং ইহা মেয়ে পুরুষ দুই-ই বুঝায়।**

সংস্কৃতে 'সেবকা' ('সেবক'-এর স্ত্রীলিঙ্গ) বাঙলায় চলে না। বাঙলায় ইহা **সেবিকা** হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বজনস্বীকৃতভাবে বহু-প্রযুক্ত হইতেছে বলিয়া ইহা বাঙলাতে **শুদ্ধ**।

ধ্বনিমাধুর্য্যের দিকে আমাদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। এই ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা (বিশেষতঃ কবিগণ) সংস্কৃত 'ঈপ্‌' (ঈ)-প্রত্যয়কে উঠাইয়া দিয়া বহুস্থলে **ইনী**-প্রত্যয় যোগ করিয়াছি। ইহারই ফল চাতকিনী, কুরঙ্গিণী, বিহঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, রজকিনী, সিংহিনী, হংসিনী, ব্যাঘ্রিণী, চণ্ডালিনী, নাগিনী প্রভৃতি। সংস্কৃত 'টা' (আ)-প্রত্যয়ের স্থলেও 'ইনী' বসাইতে কুণ্ঠিত হই নাইঃ "যৈছে **চটকিনী** বোল"—বলরাম দাস (চটকিনী = চটকা অর্থাৎ স্ত্রী-চড়ুইপাখী)। **'টা'** (আ)-র স্থলে 'ঈ'-ও বসাইয়াছিঃ "হরিণ-নয়নী", "তড়িৎ-বরণী", "খঞ্জননয়নী", "চন্দ্রবদনী" ইত্যাদি।

কিন্তু এ প্রয়োগ **ছাত্রগণকে** অশুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। আমার কথা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। এইজন্য একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইতেছিঃ ধরা যাক, আমি পরীক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন করিয়াছেন :

'স্থূলাক্ষর শব্দগুলির উপর ব্যাকরণ-টীকা-লেখ :

(i) "**নিঃসঙ্গিনী** ধরণী"।

(ii) "**সুকেশিনী** শিরোশোভা কেশের ছেদনে"।

(iii) **রজকিনী** আজ আমাদের কাপড় আনিবে।

(iv) "শুন **রজকিনী** রামী"।

—(i), (ii) ও (iv) উদ্ধৃতিচিহ্নযুক্ত, কাজেই কবির কাব্য হইতে উদ্ধৃত ; (iii)-এর কাব্যমূল্য নাই, যে-কোন লোকের কথা। উত্তরে এই কথা লিখিব কি যে (ক) তৃতীয় বাক্যটির 'রজকিনী' ব্যাকরণ-অনুসারে অশুদ্ধ, শুদ্ধ রূপ 'রজকী'—বাকীগুলি শুদ্ধ, কারণ ইহারা কবিকীর্ত্তি ? অথবা লিখিব কি যে (খ) বাঙলায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনী'-প্রত্যয়ের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় ; এই বিচারে শব্দগুলি, তৎসম হইলেও, বাঙলামতে শুদ্ধ।

না কি এইভাবে লিখিব (গ) :

(i) 'নিঃসঙ্গিনী' অশুদ্ধ : কারণ বহুব্রীহি-সমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন 'নিঃসঙ্গ' স্ত্রীলিঙ্গে **'নিঃসঙ্গা'** ['টা' (আ)-প্রত্যয়যোগে] হয়।

(ii) 'সুকেশিনী' অশুদ্ধ ; কারণ বহুব্রীহি-সমাসনিষ্পন্ন শব্দের উত্তরপদ অঙ্গবাচক হইলে শব্দটির উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে 'ঈপ্‌' (ঈ) বা 'টা' (আ)-প্রত্যয় হয়। এখানে 'সু (শোভন) কেশ যাহার' ইতি 'সুকেশ', 'কেশ' উত্তরপদ ; কাজেই ইহার স্ত্রীলিঙ্গ রূপ—**'সুকেশী', 'সুকেশা'**।

(iii) 'রজকিনী' অশুদ্ধ ; শুদ্ধ রূপ 'রজকী' (রজক + ঈপ্‌)।

(iv) 'রজকিনী' অশুদ্ধ ; শুদ্ধ রূপ 'রজকী'।

(i), (ii) ও (iv) কবিপ্রয়োগ হইলেও ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ।

বাঙলায় 'ইনী'-যোগে বহু তৎসম শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ পাওয়া গেলেও, সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুযায়ী শুদ্ধ প্রয়োগও বাঙলায় যথেষ্ট রহিয়াছে।

এই তৃতীয় উত্তর (গ) ছাত্রের উত্তর।

চলিত বাঙলায় (অর্থাৎ তদ্‌ভব ইত্যাদি শব্দযোগে) বিশেষণের লিঙ্গ সাধারণতঃ বিশেষ্যের অনুগামী হয় নাঃ 'কালো ছেলে', 'কালো মেয়ে', 'কালো চুল'—সর্ব্বত্রই 'কালো'। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছেঃ "দাঁড়াইয়া **কাঙালিনী** মেয়ে"—রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃতানুগ গুরুগম্ভীর ভাষায় বিশেষণ বিশেষ্যের অনুগামী অনেকক্ষেত্রে হইলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই হয় না। এ বিষয়ে বক্তার বা লেখকের স্বাধীন ইচ্ছাই বলবতী। শ্রুতিমাধুর্য্য এই নিয়মভঙ্গের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। কবিতায় ছন্দের খাতিরে অনেক সময় বিশেষণের লিঙ্গপরিবর্ত্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান এই দীন বীণাখানি"-তে 'বীণা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং ইহার বিশেষণ 'ছিন্নতন্ত্রী', 'নীরব', 'ম্লান' ও 'দীন'। ইহাদের মধ্যে মাত্র 'ছিন্নতন্ত্রী' স্ত্রীলিঙ্গ। আগের চরণের 'গান'-এর সহিত মিল রাখার প্রয়োজন না থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ কখনই 'ম্লানা' লিখিতেন না। আবার তাঁহার 'ভারতলক্ষ্মী' কবিতাতে ("অয়ি ভুবনমনোমোহিনী···") যতগুলি বিশেষণ আছে, সব স্ত্রীলিঙ্গ ; মাত্র একটি নয়ঃ

"চির কল্যাণময়ী তুমি মা **ধন্য**
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন···"

—'ধন্য' যে 'অন্ন'-এর খাতিরে 'ধন্যা' হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়।

"তালবৃক্ষ-**শোভিত** হরিৎক্ষেত্রে **চিত্রিত** পৃথিবী অতিশয় **মনোমোহিনী** দেখা যায়"—বঙ্কিমচন্দ্র।

—স্ত্রীলিঙ্গ 'পৃথিবী'-র বিশেষণ তিনটির মধ্যে মাত্র 'মনোমোহিনী' স্ত্রীলিঙ্গ।

এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। **একটিমাত্র কাজের কথা** বলিয়া নূতন প্রসঙ্গ আরম্ভ করিব। বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রশ্ন করেনঃ 'নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলির যোগ্য বিশেষণ দাওঃ—জননী, বন, ভাগীরথী, সাগর, যামিনী, লতা, জল।'

উত্তর লিখিবার সময় বিশেষণগুলিকে লিঙ্গচিহ্নিত করাই উচিত। লেখা যাইতে পারেঃ

স্নেহময়ী জননী, শ্যামল বন, পুণ্যসলিলা ভাগীরথী, বিশাল সাগর, জ্যোৎস্নাস্নাতা যামিনী, কুসুমিতা লতা, নির্ম্মল জল।

কয়েকটি বিশেষ বিধি

(i) 'স্ত্রী' স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু 'স্ত্রীলোক' (বাঙলায় অজস্র চলে) পুংলিঙ্গ। কাজেই ইহার বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হইবে না। বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক, 'সুন্দরী স্ত্রীলোক' (বঙ্কিমচন্দ্র)

ভুল। লেখা উচিত 'বুদ্ধিমান্ স্ত্রীলোক' ইত্যাদি ; কিন্তু ইহা শ্রুতিকটু বলিয়া ('লোক' বাদ দিয়া) 'বুদ্ধিমতী স্ত্রী', 'সুন্দরী স্ত্রী' লেখাই সঙ্গত।

(ii) স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য যদি **গণ, সমূহ, বৃন্দ, পুঞ্জ, বর্গ, দল**-যোগে বহুবচন জ্ঞাপন করে, তবে তাহার **বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হইবে না।** অনেক খ্যাতিমান্ সাহিত্যিক এইজাতীয় শব্দের স্ত্রীবিশেষণ দেন, ইহা ভুল বলিয়াই ধরা উচিত।

'সুন্দরী' বালিকাবৃন্দ, 'তপশ্চারিণী' ঋষিপত্নীগণ, জ্যোতির্ম্ময়ী' তারাপুঞ্জ, 'গর্ব্বিতা' মহিষীবর্গ, 'স্বার্থহীনা' সেবিকাদল, 'পরীক্ষার্থিনী' ছাত্রীসমূহ—**বিশেষণগুলি অশুদ্ধ। শুদ্ধ**—সুন্দর, তপশ্চারী, জ্যোতির্ম্ময়, গর্ব্বিত, স্বার্থহীন, পরীক্ষার্থী। সবচেয়ে ভাল বিশেষণগুলিকে পৃথক্ না রাখিয়া বিশেষ্যের সহিত কর্ম্মধারয় সমাসে যুক্ত করিয়া দেওয়া।

(iii) স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য যদি সমাসে পূর্ব্বপদ হয়, তাহার বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত নয়। 'স্নেহময়ী' মাতৃদত্ত 'উজ্জ্বলা' তারকামণ্ডিত, 'পুণ্যসলিলা' গঙ্গাতীরে, 'সংখ্যাহীনা' নদীমাতৃক (দেশ—বহুব্রীহি)—এইজাতীয় ক্ষেত্রে বিশেষণগুলিকে স্ত্রীচিহ্নবর্জ্জিত করিয়া সমাসে বদ্ধ করা উচিত: **স্নেহময়মাতৃদত্ত, উজ্জ্বল-তারকামণ্ডিত, পুণ্যসলিলগঙ্গাতীরে, সংখ্যাহীননদীমাতৃক।** এইপ্রকার **ভুল**ও অনেক সাহিত্যরথী করিয়াছেন।

মন্তব্য: কিন্তু ভুলগুলি এমন ধারা ধরিয়া চলিতেছে এবং বহুপ্রয়োগে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে যে এগুলিকে ভুল বলা আর হয়তো সম্ভব হইবে না। বাঙলাভাষায় অন্তঃপ্রকৃতির অনুগত, কাজেই শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া ব্যাকরণকেও ইহাদের জন্য স্থান করিতে হইবে।

একই শব্দের বিভিন্ন পদে প্রয়োগ

সুখ—(i) বিশেষ্য: "**সুখের** লাগিয়া এঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল"—চণ্ডীদাস।
(ii) বিশেষণ: **সুখ**শয্যা সন্ন্যাসীর জন্য নয়।

পুণ্য—(i) বিশেষ্য: "পতির **পুণ্যে** সতীর **পুণ্য**"—রবীন্দ্রনাথ।
(ii) বিশেষণ: জীবসেবা **পুণ্য** কর্ম্ম।

রক্ত—(i) বিশেষ্য: "এও যে **রক্তের** মত রাঙা দুটি জবাফুল"—রবীন্দ্রনাথ।
(ii) বিশেষণ: তোমার **রক্ত** চক্ষু দেখিয়া আমি ভয় পাই না।

গুরু—(i) বিশেষ্য: বৃহস্পতি দেব**গুরু**।
(ii) বিশেষণ: "**গুরু**জনের চরণ ছাড়া করিনে কারে প্রণিপাত"—রবীন্দ্রনাথ।

পাপ—(i) বিশেষ্য: "পুণ্যে **পাপে**, দুঃখে সুখে, পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে"—রবীন্দ্রনাথ।
(ii) বিশেষণ: 'বিসর্জ্জিব **পাপ** দেহ জাহ্নবীর জলে'।

সভ্য— (i) বিশেষ্য : অরুণকুমার তরুণ-সমিতির অন্যতম **সভ্য**।
(ii) বিশেষণ : তোমার মত হীনব্যক্তির **সভ্য** সমাজে স্থান নাই।

ধনী— (i) বিশেষ্য : "হের ঐ **ধনী**র দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে"—রবীন্দ্রনাথ।
(ii) বিশেষণ : **ধনী** ব্যক্তি সমাজের মঙ্গল করিতে পারেন।

দরিদ্র—(i) বিশেষ্য : **দরিদ্রের** ক্ষুধা ধনী বুঝিবে না।
(ii) বিশেষণ : **দরিদ্র** কেরানীগণ ভুখা মিছিল বাহির করিয়াছিলেন।

সাধু—(i) বিশেষ্য : চোরেরা অনেক সময় **সাধুর** ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়ায়।
(ii) বিশেষণ : "তুমি মহারাজ **সাধু** হ'লে আজ"—রবীন্দ্রনাথ।

সত্য— (i) বিশেষ্য : "**সত্য**ভঙ্গ হবে না বিধির।"—রবীন্দ্রনাথ।
রাম পিতৃ**সত্য** পালন করিতে বনে গিয়াছিলেন।
(ii) বিশেষণ : "সেই **সত্য**, যা রচিবে তুমি"—রবীন্দ্রনাথ।

মূর্খ— (i) বিশেষ্য : **মূর্খের** অনেক দোষ।
(ii) বিশেষণ : "আমি **মূর্খ** নারী"—রবীন্দ্রনাথ।

অন্ধ— (i) বিশেষ্য : তুমি আমার **অন্ধের** যষ্টি।
(ii) বিশেষণ : "**অন্ধ** জনে দেহ আলো"—রবীন্দ্রনাথ।

বড়— (i) বিশেষ্য : "**বড়র** পিরীতি বালির বাঁধ"—ভারতচন্দ্র।
(ii) বিশেষণ : 'ছোট মুখে **বড়** কথা'।
(iii) বিশেষণের বিশেষণ : রাম **বড়** ভাল ছেলে।
(iv) ক্রিয়ার বিশেষণ : '**বড়** লাফাচ্ছ যে, কতটা রস জমেছে হাতে ?'

ভাল—(i) বিশেষ্য : '**ভালর** কাল নাই'। 'তিলক শোভিছে **ভালে**'।
(ii) বিশেষণ : "বেঁধে বেঁধে রাখিও না **ভাল** ছেলে ক'রে"—রবীন্দ্রনাথ।
(iii) অব্যয় : "**ভাল**, এ গ্রামে হরিমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায় আমায় কেহ দেখাইতে পারেন ?" —বঙ্কিমচন্দ্র।

ধীর— (i) বিশেষ্য : "যদি তুমি ওহে **ধীর**, ব্যথিতের অশ্রুনীর
নিজ-করে না কর মোচন" —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
(ii) বিশেষণ : ছেলেটি অতীব **ধীর** প্রকৃতির।
(iii) ক্রিয়ার বিশেষণ : "**ধীরে** তীরে কর পার"—গান।

সার— (i) বিশেষ্য : অরসিক লোকে কাব্যের **সার**টুকু ফেলিয়া, অসারটুকু চর্ব্বণ করে।
(ii) বিশেষণ : "ভবনদী হ'তে পার তোমারই চরণ **সার**"—গান।

অনন্ত— (i) বিশেষ্য : "সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে **অনন্তের** কানে"—রবীন্দ্রনাথ।
"সমাহিত ওই নীল **অনন্তে** ভুঞ্জিবে ভূমানন্দ"
—করুণানিধান।
(ii) বিশেষণ : "মন্দ্রিছে মরণগীতি **অনন্ত** আঁধারে"—চিত্তরঞ্জন।
"যামিনীর শান্ত বাণী ক্ষণমাত্রে **অনন্ত** সংসার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।"—রবীন্দ্রনাথ।

বিদ্বান্— (i) বিশেষ্য : **বিদ্বানের** জয় সর্ব্বত্র।
(ii) বিশেষণ : তাঁহার পুত্রগণ সকলেই **বিদ্বান্**।

বিশেষ—(i) বিশেষ্য : গোরুর খুরে ও ঘোড়ার খুরে **বিশেষ** আছে।
(ii) বিশেষণ : আমার **বিশেষ** অনুরোধে তিনি এখানে ছিলেন।

ঘোর— (i) বিশেষ্য : "সাধের ঘুম**ঘোর** কভু কি ভাঙ্গিবে না"—গান।
(ii) বিশেষণ : "ছনু **ঘোর** বনে, নাম পঞ্চবটী"—মধুসূদন।

শুভ— (i) বিশেষ্য : **শুভা**শুভের ভার লহ কর্ণধার"—গান।
(ii) বিশেষণ : **শুভ**ক্ষণে সুভাষের জন্ম হইয়াছিল।

গীত— (i) বিশেষ্য : বনভূমি বিহঙ্গ**গীতে** মুখরিত।
(ii) বিশেষণ : রবীন্দ্রগীত এখন সর্ব্বত্রই **গীত** হইতেছে।
(প্রথম গীতটি বিশেষ্য)

কর্ত্তব্য—(i) বিশেষ্য : } **কর্ত্তব্য**পালন মানুষমাত্রেরই **কর্ত্তব্য**।
(ii) বিশেষণ : } (প্রথমটি বিশেষ্য, দ্বিতীয়টি বিশেষণ)

ভরা— (i) বিশেষ্য : পাপের **ভরা** পূর্ণ হয়েছে, এইবার ডুববে।
(ii) বিশেষণ : "**ভরা** নদী ক্ষুরধারা খরপরশা"—রবীন্দ্রনাথ।

কাঁচা পাকা } (i) বিশেষ্য : **পাকাদের** সামলান যায়, **কাঁচাদের** সামলান দায়।
(ii) বিশেষণ : "আমগুলি সব ডালে ডালে ঝুলতে লেগেছে—
কতক **কাঁচা**, কতক **পাকা**, কতক ডেঁসেছে।"—ছড়া।

বিস্তর— (i) বিশেষ্য : } "সে কহে **বিস্তর** মিছা, যে কহে **বিস্তর**"—ভারতচন্দ্র।
(ii) বিশেষণ : } (প্রথমটি বিশেষণ, দ্বিতীয়টি বিশেষ্য)
(iii) ক্রিয়াবিশেষণ : **বিস্তর** বুঝিয়েছি, কিন্তু সে বুঝল না।

আকূল—(i) বিশেষ্য : তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে, **অকূলে** কূল পেয়েছ।
(ii) বিশেষণ : "আমি যেন এই **অকূল** পাথার।"—রবীন্দ্রনাথ।

বাঁকা— (i) বিশেষ্য : "মুরলী সরল হ'য়ে **বাঁকার** মুখেতে র'য়ে
শিখিয়াছে **বাঁকার** স্বভাব।"—চণ্ডীদাস।
(ii) বিশেষণ : **বাঁকা** কথা ছাড়া সোজা কথা তোমার মুখে আসে না?
একই বাক্যে : "তুমি **বাঁকা** কুব্জা **বাঁকা**, দুই **বাঁকাতে** মিলেছে"
—গান (প্রথম দুইটি 'বাঁকা' বিশেষণ, তৃতীয়টি বিশেষ্য)।

জোর— (i) বিশেষ্য : "**জোর** যার মুল্লুক তার"—প্রবাদ।
(ii) বিশেষণ : **জোর** গলায় চেঁচালেই গান হয় না।

খল— (i) বিশেষ্য : **খলের** স্বভাবপরিবর্ত্তন অসম্ভব।
(ii) বিশেষণ : **খল** ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিও না।

অসম্ভব—(i) বিশেষ্য : } স্বর্ণমৃগের জন্ম **অসম্ভব**; তথাপি সেই **অসম্ভবেরই** পশ্চাতে
(ii) বিশেষণ : } রামচন্দ্র ছুটিলেন (প্রথমটি বিশেষণ, দ্বিতীয়টি বিশেষ্য)।

ঠিক— (i) বিশেষ্য : দেখো যেন **ঠিকে** ভুল ক'রো না।
(ii) বিশেষণ : **ঠিক** কথা বলেছ।
(iii) ক্রিয়ার বিশেষণ : **ঠিক** আসবে তো?

খাঁটি— (i) বিশেষ্য : এজগতে **খাঁটির** চেয়ে মেকির চলনই বেশী।
(ii) বিশেষণ : **খাঁটি** কথার মানুষ তিনি, তাঁর কথার নড়চড় নাই।
(iii) বিশেষণের বিশেষণ : **খাঁটি** সত্যি কথা বলছি।

কোন্— (i) সর্ব্বনাম : **কোন্টা** তোমার—সাদাটা, না কালোটা?
(ii) বিশেষণ : "**কোন্** ধন হ'তে বিশ্বজগতে **কোন্** জন করে বঞ্চিত"
—রবীন্দ্রনাথ।

কি— (i) সর্ব্বনাম : "**কি** যে বল আর **কি** যে কর!
(ii) বিশেষণ : "এ **কি** কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?"—মধুসূদন।
(iii) অব্যয় : বইখানা এনেছ **কি**?

যে— (i) "**যে** সহে, সে রহে"—প্রবাদ।
(ii) বিশেষণ : **যে** গল্প লিখেছ, তার তুলনা নাই।
(iii) বিশেষণের বিশেষণ : **যে** টক আম—এ আমি খেতে পারব না।
(iv) অব্যয় : পড়ব কেন? আজ **যে** রবিবার।

ভার— (i) বিশেষ্য : এ গুরু**ভার** আর বইতে পারি না।
(ii) বিশেষণ : "তবু মায়া তার ত্যাগ করা **ভার**"—রবীন্দ্রনাথ।

বন্ধ— (i) বিশেষ্য : পূজার **বন্ধে** বাড়ী যাইব।
(ii) বিশেষণ : "খেয়াপারাপার **বন্ধ** হয়েছে আজি রে"—রবীন্দ্রনাথ।

দীন— (i) বিশেষ্য : "**দীনের** তিনি পিতামাতা"—রবীন্দ্রনাথ।
(ii) বিশেষণ : "দিনের দিন সবে **দীন**—মনোমোহন।

কালো— (i) বিশেষ্য : "এ **কালোর** রূপ না জেনে নামটি শুনে
প্রাণটি তাতে মত্ত হ'ল।"—রামপ্রসাদ।
(ii) বিশেষণ : "**কালো** জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।"—চণ্ডীদাস।
একই বাক্যে : কে বলে সই কৃষ্ণ **কালো** ?—ঐ **কালোর** রূপে জগৎ আলো (প্রথমটি বিশেষণ, দ্বিতীয়টি বিশেষ্য)।

চমৎকার—(i) বিশেষ্য : **চমৎকার**-সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য।
(ii) বিশেষণ : নন্দলাল একখানি **চমৎকার** ছবি আঁকিয়াছেন।
(iii) ক্রিয়ার বিশেষণ : লোকটা **চমৎকার** নাচতে পারে।
(iv) অব্যয় : "জাহানারা, আবার বলি—**চমৎকার** ?"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ (Idiom)

ইংরেজী Idiom-এর প্রতিশব্দরূপে 'বাগ্‌ধারা' শব্দটির সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ ইহার প্রয়োগের পক্ষপাতী। স্মরণাতীত কালে 'যাওয়া' অর্থে 'গমন' যখন প্রযুক্ত হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঐ অর্থেই 'গমন' শব্দটির প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। কাজেই 'গমন'ও 'বাগ্‌ধারা' হইবে না কেন ? বাক্‌মাত্রই তাহার অর্থকে লইয়া অবারিত স্রোতোধারায় প্রবাহিত হইতেছে। 'পটোল তোলা'র কোন অংশেই 'মরা'-র অর্থদ্যোতনা নাই ; অথচ সামগ্রিকভাবে ইহার অর্থ 'মরা'। 'পটোল' এখানে যে-ভূমিকায় দাঁড়াইয়াছে, ঝিঞে, উচ্ছে প্রভৃতি কোন ফলই সে-ভূমিকা গ্রহণে অধিকারী নয়। অর্থ এখানে **বিশিষ্ট**, কতকটা 'রূঢ়ি'-র মত। 'হতাশ হওয়া' অর্থে 'হাল ছাড়া'-র 'হাল'-এ নৌকাসম্পর্কীয় অর্থটি সুস্পষ্ট। বরঞ্চ এখানে অর্থের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে বলা যায়। এটিকে 'যোগরূঢ়'-জাতীয় বলিলে অন্যায় হয় না। 'Idiom'-কে **বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ** বলাই সঙ্গত মনে করি। 'Idiom' যেমন একটি ছোট শব্দ, 'বাগ্‌ধারা'ও প্রায় তেমনি। **বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ** দীর্ঘ, কিন্তু সার্থক। 'বাগ্‌ধারা' ঠিক সার্থক নয়। কিন্তু 'Idiom'-এর বাঙলা প্রতিশব্দ না করিয়া যদি ইহাকে 'পেনসিল', 'বেঞ্চি', 'ইষ্টিশেন'-এর মত বাঙলা শব্দ বলিয়াই গ্রহণ করি এবং লিখি **ইডিয়ম্‌**, ক্ষতি হয় বলিয়া মনে করি না। বাঙলা প্রতিশব্দের প্রয়োজন যদি হয়, তবে মনে হয়, 'বাক্‌-চাল' কথাটিই অধিকতর সার্থক ; কারণ, 'চাল' শব্দটির মধ্যে 'চলতি'র (প্রবাহের) ভাবও যেমন আছে, তেমনি কৌশল বা চাতুর্য্যের ভাবও আছে। সকল ভাষাতেই প্রচুর ইডিয়ম্‌ আছে। এগুলি লৌকিক সৃষ্টি ; অথচ ইহাদের মাধুর্য্য অসাধারণ। এক হিসাবে ইহারা

ভাষার প্রাণ। ইহাদের উপর অধিকার না থাকিলে ভাষাশিক্ষা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বহুক্ষেত্রে ইহাদের মধ্যে যে অলঙ্কার থাকে, তাহা অতুলনীয়। "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ" (ভারতচন্দ্র) প্রকৃতপক্ষে রূপক অলঙ্কারের উদাহরণ। 'বালির বাঁধ'-এর দৃঢ়তা না থাকায় জলের আঘাত লাগিবামাত্রই তাহা ভাঙিয়া যায়। তেমনি যাহা কিছু শিথিলভিত্তিতে গাঁথা, নির্ভরের অযোগ্য, তাহাই 'বালির বাঁধ'। 'তাসের ঘর', 'অকূলে কূল পাওয়া', 'অকূল পাথার', 'চোখে সরষের ফুল দেখা', 'দিনে তারা দেখা', 'ডুমুরের ফুল', 'আগুনের মধ্যে পড়া' প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অলঙ্কার লক্ষণীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ইডিয়ম্' ব্যাকরণের সম্মতির অপেক্ষা রাখে না। ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগে। কাজেই **'ইডিয়ম্'-শিক্ষার অর্থ ইহার সুষ্ঠু-প্রয়োগ-শিক্ষা**।

ইডিয়মের অর্থ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় ইহার মধ্যে শব্দের বাচ্যার্থ মিলে না, মিলে লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ। এই কারণে বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ কি, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ

(অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা)

বাচ্যার্থ (অভিধা): শব্দের মৌলিক অর্থই (অর্থাৎ অভিধানে যে অর্থ পাওয়া যায়) বাচ্যার্থ। ইহারই অপর নাম অভিধা, শক্যার্থ, মুখ্যার্থ। গাড়ী, ঘোড়া, কালো, সাদা, লেবু, আতা, খাওয়া, যাওয়া, দর্শন, শ্রবণ, বই, খাতা, মাথা, হাত, ভাল, মন্দ, প্রতীক্ষা প্রভৃতি শব্দের অর্থ বাচ্যার্থ।

এই বাচ্যার্থ মুখ্য বা প্রধান অর্থ হইলেও স্থূল ; এই কারণে মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ইহাদের দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এ কার্য্য সাধন করিতে পারে লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ।

লক্ষ্যার্থ: শব্দ যদি তাহার মুখ্য (আভিধানিক) অর্থটির স্পষ্ট প্রকাশ না করিয়া তাহার সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট একটি নূতন অর্থের সঙ্কেত বা ইঙ্গিত করে, তবেই বলি শব্দটি লক্ষ্যার্থক। যখন বলি 'সকল দিকে আমার **চোখ** আছে', তখন **'চোখ'-এর অর্থ হয় 'দৃষ্টি'** ; অথচ এই 'দৃষ্টি' চোখেরই কাজ। 'চোখ' এখানে 'নয়ন' ইন্দ্রিয়কে না বুঝাইয়া বুঝাইল তাহার ক্রিয়া 'দৃষ্টি'কে—এই নূতন অর্থটি সঙ্কেতিত (লক্ষ্য), অথচ 'চোখ'-এর সহিত সম্পর্কহীন নয়। এমনি আরও উদাহরণ: 'ওসব কথায় **কান** দিও না', 'অঙ্কে তার **মাথা** নাই' ('কান' = মনোযোগ, 'মাথা' = বুদ্ধি)।

ব্যঙ্গ্যার্থ : শব্দের অর্থ যেখানে অতীব গূঢ়, মুখ্য (বাচ্য)ও নয় বা উহার সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট লক্ষ্য (সঙ্কেতিত)ও নয়, সেইখানেই তাহার নাম হয় ব্যঞ্জনা। অভিধা ও লক্ষণাকে অতিক্রম করিয়া রহস্যময় তাৎপর্য্যের সৃষ্টিই ব্যঞ্জনার কাজ। 'মাথায় **আকাশ ভাঙিয়া পড়া', 'পাকামাথায় সিঁদুর পরা', 'দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা', 'আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া', 'দুধে ধোয়া মন', 'পোয়া বারো'**— ইহাদের অর্থ বিষম অনর্থপাত হওয়া, আজীবন সধবা থাকা, শত্রুকে স্নেহ দিয়া কাছে রাখা, হঠাৎ বড়লোক হওয়া, নির্ম্মল ও সৌভাগ্য। এ অর্থ ব্যঙ্গ্য। বহু-ব্যবহারের ফলে ইহাদের অর্থ আমরা অনেক স্থলেই বুঝি।

তবু এই শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বাক্যে প্রযুক্ত হইলে ইহাদের বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ স্পষ্ট হইয়া উঠে। 'মানুষের দুইটি **হাত** আছে', 'ইহাতে আমার **হাত** নাই', 'রমেশ বড়বাবুর **হাত**ধরা'—এই তিনটি বাক্যে 'হাত' যথাক্রমে বাচ্যার্থক, লক্ষ্যার্থক ও ব্যঙ্গ্যার্থক। **ইডিয়মে ব্যঞ্জনাই অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছে।**

অরণ্যে রোদন—নিষ্ফল আবেদন : অন্নবস্ত্রের অভাবমোচনের জন্য সরকারের নিকট প্রার্থনা **অরণ্যে রোদন** মাত্র।

গোলক-ধাঁধা—যাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসার পথ নাই : "এ দুনিয়া **গোলক-ধাঁধা** ভাই মায়ার খেলা ফক্কিকার"—প্রসিদ্ধ গান।

জলের তিলক—অস্থায়িবস্তু : "কতক্ষণ **জলের তিলক** রহে ভালে।"—কাশীরাম।

চুলচেরা—সূক্ষ্ম : "সম্রাটের কাছে একেবারে **চুলচেরা** বিচার।"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

পাকা ধানে মই দেওয়া—প্রভূত ক্ষতি করা : "আমি কি দিয়েছি তোমার **পাকা ধানে মই** ?"—রামপ্রসাদ।

বাতাসে ফাঁদ পাতা—অসাধ্য সাধন করা : ঝগড়া করার জন্য ছল খোঁজা : "**বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ**, ধ'রে দিতে পারি চাঁদ"—ভারতচন্দ্র।
"বাহিরে **বাতাসে ফাঁদ পাতে** ননদিনী"—চণ্ডীদাস।

উলুবনে মুক্তা ছড়ান—অপাত্রে দান : চোরকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া **উলুবনে মুক্তা ছড়ান**।

সোনায় সোহাগা—যোগ্য বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুদ্বয়ের মিলন : রাজকন্যার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব—একেবারে **সোনায় সোহাগা**।

বুকের পাটা—সাহস : দারোগার মুখের উপর তার কুকীর্ত্তিগুলি শুনিয়ে দিলে ? —তোমার **বুকের পাটা** তো কম নয়!

আকাশ থেকে পড়া—অত্যন্ত বিস্মিত হওয়া বা হওয়ার ভান করা : আমার সাত বছরের ছেলে দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে শুনে আমি একেবারে **আকাশ থেকে পড়লাম!** কি মশায়, 'আপনি খুনে' এই কথা শুনে যে একেবারে **আকাশ থেকে পড়লেন**—দেখুন তো এই চিঠিখানার নীচে নামসইটি কার।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—বিনা কারণে কার্য্য : আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যুতে অমৃতলাল লিখিয়াছিলেন, "**বিনা মেঘে বজ্রাঘাত**, অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত"।

চোখের চামড়া—চক্ষুলজ্জা : এতটুকু **চোখের চামড়া**ও যদি তার থাকত, এতটা কঞ্জুষের মতন ব্যবহার সে করতে পারত না।

শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া—শত্রুর কামনা বা উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেওয়া : **শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে** রামধন এখন বেশ কিছু বিষয়সম্পত্তি করেছে।

জিলিপির প্যাঁচ—কুচক্র : লোকটার পেটে **জিলিপির প্যাঁচ**।

হাল ছাড়া—আশা ত্যাগ করা : ছেলেটিকে মানুষ করার সকল চেষ্টাই যখন নিষ্ফল হইল, তখন অগত্যা **হাল ছাড়িয়া** দিতে হইল। "ঢেউ দেখে **ছেড়ো না হাল** আজ না হয় হবে কাল।"—গান।

মাথা খাওয়া—(i) নষ্ট করা : আদর দিয়ে ছেলেটার **মাথা খেয়েছ**।
(ii) নারীসুলভ দিব্য : "**মাথা খাও**, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে ক'রে।"
—রবীন্দ্রনাথ।

ঘাড়ে দুটো মাথা—দুঃসাহস : "কার **ঘাড়ে দুটো মাথা** এ কর্ম্ম করিবে ?"
—ভারতচন্দ্র।

ছেলের হাতের কলা (বা মোয়া)—যাহা সহজলভ্য : "**ছেলের হাতের কলা** নয় মা ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবে।"—রামপ্রসাদ।

নাকের জলে চোখের জলে করা—জব্দ করা, নাজেহাল করা : "জব্দ ব'লে জব্দ, তার **নাকের জলে চোখের জলে করব**।"—রবীন্দ্রনাথ।

বেনাবনে মুক্তো ছড়ান—অপাত্রে দান : "কোন্ আক্কেলে তার পাতে না দিয়ে **বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে** দিলি ?"—শরৎচন্দ্র।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা—মহৎকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা : কিছু কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে নিধিরাম **ধরাকে সরা জ্ঞান করতে** আরম্ভ করেছে।

গা করা—যত্ন লওয়া : কোন কাজেই সে **গা করে** না।

রাবণের চিতা—অনির্ব্বাণ দাহ : প্রবীরের মৃত্যুতে জনার হৃদয়ে **রাবণের চিতা** জ্বলিতেছিল।

ঘুঘু চরানো—সর্ব্বস্বান্ত করা : আমার যে সর্ব্বনাশ তুমি করেছ, তোমার ভিটেয় **ঘুঘু চরিয়ে** তবে ছাড়ব।

অর্দ্ধচন্দ্র—গলাধাক্কা : চরিত্রসংশোধন যদি না কর, ভদ্রসমাজ হইতে **অর্দ্ধচন্দ্র** দিয়া তোমাকে বিদায় করিব।

আকাশকুসুম—অসম্ভব : কলিকাতায় একখানি বাড়ী করা দরিদ্রের পক্ষে **আকাশ-কুসুম**।

ঘর করা—সংসার করা : "যে ঘরেতে **ঘর করি** হরি বলতে প্রাণে মরি।"—গান।

হাতে জল না গলা—সামান্যতম দানও না করা (কৃপণ-সম্পর্কে ব্যবহৃত) : কেন যাচ্ছ তার কাছে চাঁদার খাতা নিয়ে—তার **হাতে জল গলে না** জান না?

আদায় কাঁচকলায়—আদা সারক, কাঁচকলা ধারক ; ইহারা পরস্পরবিরোধী : শিবের সহিত শ্বশুর দক্ষরাজার **আদায় কাঁচকলায়** সম্বন্ধ ছিল। ("আমাদের ভাব কেমন জামাইশ্বশুরে? যেমন পাখী আর সাতনলায়, যেমন **আদায় আর কাঁচকলায়**"—দাশরথি।)

বাপের ঠাকুর—গৌরবের পাত্র :

"বাপধন **বাপের ঠাকুর** শ্বশুরের নাতি রে
তোমার খেলাতে গড়ায়ে দিব মদমত্ত হাতী রে॥"—নীলকণ্ঠ।

আমরে **বাপের ঠাকুর** এলেন আর কি!

দুধে ধোয়া—নির্ম্মল : তাঁর নামে কুটিলতার অপবাদ দেওয়া চলে না—তাঁর **দুধে ধোয়া** মন।

টাকার কুমীর—অতীব ধনী : চোরাকারবারে লোকটা **টাকার কুমীর** হ'য়ে গিয়েছে।

পোয়া বারো—সৌভাগ্য, সুযোগ : তোমার এখন **পোয়া বারো**, ধূলোমুঠো ধরতে সোনামুঠো হ'য়ে যাবে।

আকাশ ভাঙিয়া পড়া—বিষম অনর্থপাত হওয়া : ভারতীয় সেনার আক্রমণে নিজামের মাথায় **আকাশ ভাঙিয়া পড়িল**।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা—কঠিন পরিশ্রম করা : **মাথার ঘাম পায়ে ফেলে** যারা জমি চাষ করে, তাহাদেরই ভাগ্যে অন্ন জোটে না।

সাত রাজার ধন—মহামূল্য সম্পদ্ : খোকন আমার **সাত রাজার ধন**, আমার 'সাগরসেঁচা মাণিক' (শেষেরটি ইডিয়ম্)।

হাতটান—চুরির অভ্যাস : ও এলে একটু নজর রেখো—চিরদিনই ওর একটু **হাতটান** আছে।

পুকুরচুরি—সর্ব্বস্ব অপহরণ : মাছচুরি নয়, একেবারে **পুকুরচুরি**—ব্যাঙ্কটাই ফেল্ হ'য়ে গেল!

রাই কুড়িয়ে বেল—অল্প অল্প সঞ্চয়ের পুঞ্জীভূত ফল : এ আমার দাঁওমারা ধনও নয়, লটারিজেতা টাকাও নয় ; সারা জীবনের সঞ্চয়—**রাই কুড়িয়ে বেল**।

কলুর বলদ—যাহার কার্য্যের বা চিন্তার স্বাধীনতা নাই : "মা আমায় ঘুরাবি কত **কলুর** চোখঢাকা **বলদের** মত ?"—রামপ্রসাদ।

চিনির বলদ—যে ভোগের উপকরণ শুধু বহিয়াই চলে, ভোগের অধিকারী নয় : আমরা তো ভাই **চিনির বলদ**—মালিকের ঐশ্বর্য্যবিলাসের আয়োজন পূর্ণ ক'রে নিজেরা ফিরি রিক্তহস্তে।

তালপাতার আগুন, খড়ের আগুন—ক্ষণস্থায়ী : বামুনের রাগ **তালপাতার আগুন**—হ'তেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ।

গোবরগণেশ—নির্ব্বোধ, অকর্ম্মণ্য : ও একটা আস্ত **গোবরগণেশ**, ওর কাছে তুমি কি বুদ্ধি পাবে ?

শিবরাত্রির সলতে—ক্ষীণ আশাস্থল : এত বড় সংসার আজ শূন্য, ঐ খোকাটি **শিবরাত্রির সলতের** মত টিমটিম করছে।

আকাশপাতাল প্রভেদ—গুরুতর পার্থক্য : পাশ্চাত্ত্য দর্শনের 'গড্' এবং আমাদের ব্রহ্মে **আকাশপাতাল প্রভেদ**।

আকাশপাতাল ভাবা—যে চিন্তায় কূলকিনারা পাওয়া যায় না, এমন চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া : **আকাশপাতাল ভেবে** লাভ নাই, সংসারটাকে যদি বাঁচাতে চাও যেমন ক'রে হোক একটা কাজে লেগে যাও।

জলে ফেলা—নিষ্ফল প্রয়োগ : লটারির টিকিটে পয়সা খরচ করা পয়সাগুলোকে **জলে ফেলা** মাত্র।

ডুমুরের ফুল—দুর্লভ-দর্শন : "**ডুমুরের ফুল** হ'লে, তোমার দেখা পাওয়া সুকঠিন।" —গান।

অমাবস্যার চাঁদ—সেই কবে দেখেছি ছ'মাস আগে, আর দেখছি আজ—তুমি যে একেবারে **অমাবস্যার চাঁদ** হ'য়ে উঠেছ!

বড় মুখ করা—সসম্মানে রক্ষিত হইবে এই আশায় কাহাকেও কোন কথা বলা :
মুখ রাখা—সম্মান রক্ষা করা : একই বাক্যে : **বড় মুখ ক'রে** তোমাকে আমি কথাটা বললাম, তুমি আমার **মুখ রাখলে** না!

পায়ে ঠেলা—অবহেলা করা, উপেক্ষা করা : "পাতকী বলিয়ে কি গো **পায়ে ঠেলা** ভাল হয় ?"—রজনীকান্ত।

তিলকে তাল করা—সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়া তোলা ঃ "মিথ্যা **তিলকে তাল** করিয়া কষ্ট পাইবেন না"—শরৎচন্দ্র।

মায়াকান্না—ছল করিয়া অশ্রুবর্ষণ ঃ "আর **মায়াকান্না** কাঁদতে হবে না"—শরৎচন্দ্র।

মাটির মানুষ—অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ঃ ভজহরি একেবারে **মাটির মানুষ**—একটি কড়া কথাও ওর মুখে কোনদিন শুনলাম না।

উত্তমমধ্যম—প্রহার ঃ "দস্যুতস্কর ধরা পড়িলে গ্রামবাসীরাও **উত্তমমধ্যম** দিয়া সংক্ষেপে বিচারকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত।"—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

চোখের বালি—চক্ষুশূল ঃ সতীন চিরদিনই সতীনের **চোখের বালি**।

সুখের পায়রা—সুসময়ের বন্ধু, অসময়ের কেহ নয় ঃ এখন ওদের দেখা পাবে না; পাবে, আবার যদি কখন মালক্ষ্মী তোমাকে দয়া করেন—জানই তো ওরা **সুখের পায়রা**।

একচোখো—পক্ষপাতদুষ্ট ঃ বড় বউটির উপর ওঁর যত টান, ছোটটির পানে ফিরেও তাকান না, এমনি **একচোখো** উনি।

কেঁচে গণ্ডূষ করা—নূতন করিয়া আরম্ভ করা ঃ সংসারে বিতৃষ্ণ হ'য়ে হরিনামের ঝোলা নিয়ে এতকাল পরে আবার দারপরিগ্রহ করবে শুনলাম—**কেঁচে গণ্ডূষ করবে** নাকি?

কান ভারি করা—গোপন কুমন্ত্রণায় পরের মন বিকৃত করা ঃ মন্থরা কৈকেয়ীর **কান ভারি করিয়া** তুলিয়াছিল।

তালকাণা—কখন কি করিতে হয় এই বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন ঃ তোমার মতন এমন **তালকাণা** লোক তো দেখি নাই—কি দরকার ছিল একথাটা বলার?

চোখে অন্ধকার দেখা, চোখে ধোঁয়া দেখা, চোখে সরষের ফুল দেখা—গভীরভাবে নিরাশ হওয়া ঃ কন্যার বিবাহের অলঙ্কারপূর্ণ সুটকেসটি খোয়া যাওয়ায় রমেশবাবু **চোখে অন্ধকার (ধোঁয়া, সরষে ফুল)** দেখিলেন।

ঘা খাওয়া—আঘাত পাওয়া, ঠকা ঃ অনেক **ঘা খেয়ে** শিখেছি—এ আমার কঠিন শিক্ষা।

বকধার্ম্মিক—ভণ্ড ঃ খদ্দর প'রে গান্ধীটুপী মাথায় দিয়ে অনেক **বকধার্ম্মিক** কালোবাজারে ঘোরাফেরা করে।

সাতপাঁচ ভাবা—নানাদিক্ চিন্তা করা ঃ উত্তর দিতাম; কিন্তু **সাতপাঁচ ভেবে** চুপ ক'রে রইলাম।

আক্কেলসেলামী—নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ড ঃ প্রতারকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে এই **আক্কেলসেলামী** দিতে হইল।

বুদ্ধির ঢেঁকি—নির্ব্বোধ : "হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা **বুদ্ধির ঢেঁকি**।" —রবীন্দ্রনাথ।

গুড়ে বালি—আশায় ছাই : ভেবেছিলে মামার সম্পত্তিটার মালিক হবে, সে **গুড়ে বালি**—বুড়ো বয়সে মামার একটি পুত্র হয়েছে।

চারিপোয়া—পরিপূর্ণ, ষোল আনা : পাপ **চারিপোয়া** না হইলে এত বড় সর্ব্বনাশ মানুষের হয় না।

গণেশ উল্টানো, লালবাতি জ্বালা—ব্যবসায়ে 'ফেল্' মারা : এত বড় ব্যবসাটা কর্ম্মচারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে নবাবী করলে দুদিনে **গণেশ ওল্টাতে** (**লালবাতি জ্বালতে**) হবে।

গোঁপখেজুরে—অতীব অলস (নবাবের আলসে) : **গোঁপখেজুরের** হাতে দিচ্ছ মামলাতদ্বিরের ভার—জিতলে ব'লে!

টাকার গরম—ধনের অহঙ্কার : **টাকার গরমে** ভজহরির আজকাল আর মাটিতে পা পড়ে না।

তেলেবেগুনে জ্ব'লে ওঠা—ভয়ঙ্কর রাগিয়া উঠা : কথাটা শোনবামাত্রই রামবাবু **তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠলেন**।

গা ঢাকা দেওয়া—আত্মগোপন করা : লোকের ভিড়ে গাঁটকাটা সহজেই **গা ঢাকা দিল**।

পগার পার হওয়া—নিরাপদ স্থানে পলাইয়া যাওয়া : ডাকাত **পগার পার হওয়ার** পরে দারোগাবাবু এলেন তাকে ধরতে।

আমতা আমতা করা—এমনভাবে কথা বলা যাহাতে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কিছুই বুঝা যায় না : জেরার মুখে পড়িয়া সাক্ষী **আমতা আমতা করিতে** লাগিল।

গলগ্রহ—দুর্ব্বহ ভার (যাহা বহিতে ইচ্ছা নাই) : নিজে খেতে পাই না, তার উপর **গলগ্রহ** জুটল সস্ত্রীক পিসতুত ভাই।

কুরুক্ষেত্র বাধান—তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তোলা : দীনুঠাকুরের গণ্ডমূর্খ পুত্রগুলি অল্প কারণেই **কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া** তোলে।

গোকুলের ষাঁড়, ধর্ম্মের ষাঁড়—স্বচ্ছন্দবিহারী (নিন্দার্থে) : বাবার টাকারও অভাব নাই, লেখাপড়া শেখারও বালাই নাই ; বিরূপাক্ষ খায়-দায় আর **ধর্ম্মের** (**গোকুলের**) **ষাঁড়ের** মত ঘুরে বেড়ায়।

টনক নড়া—ঠিক বুঝিতে পারা (নিন্দার্থে) : ধড়ীবাজ নন্দলাল ঠিক বুঝেছে যে এই সুযোগে কিছু মেরে নেওয়া যাবে ; জানই তো 'ভাগাড়ে গোরু পড়ে, শকুনির **টনক নড়ে**'।

ধামাচাপা দেওয়া—ইচ্ছাপূর্ব্বক চাপিয়া যাওয়া বা এড়াইয়া যাওয়া : শিশুরাষ্ট্রের দোহাই দিয়া অন্নবস্ত্রের সমস্যা **ধামাচাপা দিবার** একটা চেষ্টা চলিতেছে।

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ—নীচ কুলে জাত উচ্চহৃদয় সন্তান : ব্যাধের ছেলের এত জীবে দয়া—এ যে দেখছি **দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ**।

গোবরে পদ্মফুল—অযোগ্য স্থানে যোগ্যের উদ্ভব : গণ্ডমূর্খের ঘরে এম. এ.-পাসকরা ছেলে—**গোবরে পদ্মফুল**।

চক্ষে ধূলি দেওয়া—ফাঁকি দেওয়া : মনিবের **চক্ষে ধূলি দিয়া** রূপচাঁদ বেশ দু'পয়সা হাতাইতে লাগিল।

সাতখুন মাপ—সকল অপরাধের মার্জ্জনা : রাজার শালাদের চিরকালই **সাতখুন মাপ**।

দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা—শত্রুকে স্নেহ দিয়া নিকটে রাখা : দেশের শত্রুকে বিশ্বাস ক'রে বুকে টানছ—**দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছ**।

কাঁচা পয়সা—নগদ পয়সা (অধিক পরিমাণে) : যুদ্ধের সময় লোহালক্কড়ের কাজে **কাঁচা পয়সা** হাতে এল, তারই ফলে এই বাড়ী আর এই গাড়ী।

সাতঘাটের জল খাওয়ান—চরম নাকাল করা : আমার সঙ্গে লাগতে এসেছে—বাছাধনকে **সাতঘাটের জল খাইয়ে** তবে ছাড়ব।

বর্ণচোরা আম—বাহির হইতে যাহার স্বরূপ বুঝা যায় না : "কলিকাতার লোক চেনা ভার, অনেকেই **বর্ণচোরা আম**"—টেকচাঁদ।

রাজা-উজীর মারা—লম্বাচওড়া কথা বলা : মুখে অমন **রাজা-উজীর মারতে** সবাই পারে ; কাজে দেখাতে পার তবে বলি হাঁ।

শিমুলফুল—অন্তঃসারশূন্য : চেহারাখানিই আছে, গুণের 'গ'ও নেই—রামবাবুর ছেলেটি একেবারে **শিমুলফুল**।

সাপের ছুঁচো গেলা—অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া কাজ করা : তোমার ভার নিয়ে আমার হয়েছে **সাপের ছুঁচো গেলা**—বইতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না।

মাথা কেনা—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হওয়া : শতখানেক টাকা দিয়ে আমার **মাথা কিনেছ** নাকি, তাই যা ইচ্ছা তাই করাবে?

সাতেও নাই পাঁচেও নাই—উদাসীন, নির্লিপ্ত : আমি এ সংসারের **সাতেও নাই পাঁচেও নাই**—যা করেন গিন্নী।

শাঁখারীর করাত (শাঁখের করাত)—পরিত্রাণের উপায় নাই এমন সঙ্কট (উভয়-সঙ্কট) : এমন চাল চালব যে **শাঁখারীর করাত**—যেতেও কাটবে, আসতেও কাটবে।

মাথা কাটা যাওয়া—চরম অপমানিত হওয়া : আমার ভাই মাতাল—লজ্জায় আমার **মাথা কাটা যায়**।

হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান—লঘুগুরুজ্ঞান, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান : "তাহার **হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান** কিছুই নাই ; কেবল কতকগুলি টাকা আছে।"—টেকচাঁদ।

সোনার কাঠি রূপার কাঠি, মরণকাঠি জীয়নকাঠি—মরণবাঁচনের উপায়স্বরূপ : "বক্রেশ্বরবাবু কালুষ সাহেবের **সোনার কাঠি রূপার কাঠি** ছিলেন।
—টেকচাঁদ।

হয়কে নয়, নয়কে হয় করা—সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করা : "**হয়কে নয়, নয়কে হয় করিতে** তাহার তুল্য একজনও পাওয়া ভার।"—টেকচাঁদ।

বিড়ালতপস্বী, তুলসীবনের বাঘ—ভণ্ড : ওদের প্রতিষ্ঠিত দুটো ধর্মশালা, দুটো সঙ্কটমোচন-সমিতি দেখে ভুলো না—ওরা **বিড়ালতপস্বী (তুলসীবনের বাঘ)**।

ফাঁপরে পড়া—মুশকিলে পড়া : "মুচিরামবাবু পেস্কারি পাইয়া বড় **ফাঁপরে পড়িলেন**।" —বঙ্কিমচন্দ্র।

ফাঁকা আওয়াজ—মিথ্যা আন্দোলন বা প্রচার : এ্যাটম্ বোমা, কস্‌মিক রে—ওসব **ফাঁকা আওয়াজ** ; শুধু জগৎকে ধাপ্পা দেওয়ার ফন্দীমাত্র।

নামডাক—খ্যাতি, প্রসার (পসার) : ডাক্তারিতে বঙ্কুবাবুর খুব **নামডাক**।

পায়ের উপর পা দিয়ে—নিশ্চিন্ত আরামে : মিত্রমশায় যা রেখে গেলেন, তিন পুরুষ **পায়ের উপর পা দিয়ে** কাটিয়ে দেবে।

পুঁটিমাছের প্রাণ—স্বল্পবিত্ত বা স্বল্পপ্রাণ লোক : **পুঁটিমাছের প্রাণ**—একটা ঘা খেলেই বাছার দফা রফা হ'য়ে যাবে।

আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া—হঠাৎ বড়লোক হওয়া : **আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে**—ও এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করবে বই কি।

অন্ধকারে ঢেলা মারা—আন্দাজে কাজ করা : ডাক্তারবাবু রোগ ধরিতে পারেন নাই, শুধু **অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া** যাইতেছেন।

চোখ ফুটানো—সজ্ঞান করা : তুমিই আমার **চোখ ফুটাইয়া দিয়াছ**, আর কি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি ?

হাতে-কলমে শেখা—বিদ্যা ও তাহার প্রয়োগ একসঙ্গে শেখা : **হাতে-কলমে না শিখিলে** কারিগরী বিদ্যা সম্পূর্ণ হয় না।

পরের ধনে পোদ্দারি—পরের অর্থ লইয়া যথেচ্ছ ব্যয় করা : **পরের ধনে পোদ্দারি** সবাই করিতে পারে, নিজের ধনের বেলায় একটি পয়সা মা-বাপ। সকল দেশের ব্যাঙ্কই **পরের ধনে পোদ্দারি** করে।

হিতে বিপরীত—ভাল করিতে মন্দ ফল : স্বভাবহিংস্রকে অহিংসার উপদেশ দিতে গেলে **হিতে বিপরীত** হয়।

তাক লাগা—বিস্ময়বিমূঢ় হওয়া : বাজীকর যখন আমের আঁঠি থেকে সদ্য গাছ বার ক'রে তাতে সঙ্গে সঙ্গে আম ফলিয়ে দিলে, লোকের **তাক লেগে** গেল।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা—গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া : অত বাড়াবাড়ি করলে **হাটে হাঁড়ি ভেঙে** দেব।

মুখ তুলে চাওয়া—প্রসন্ন হওয়া : **মুখ তুলে চাও**, মা, খোকনকে আমার ভাল ক'রে দাও!

কাষ্ঠহাসি, দেঁতো হাসি—আন্তরিকতাহীন শুষ্ক হাসি : নির্য্যাতনসত্ত্বেও মনিবের বদরসিকতায় তাহাকে একটু **কাষ্ঠহাসি** হাসিতে হয়।

সাক্ষিগোপাল—নিষ্ক্রিয়, দর্শনীয় কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ : গণতান্ত্রিক দেশে রাজা নাকি **সাক্ষিগোপাল**?

দন্তস্ফুট করা—কোন বিষয়ের ভিতর আংশিকভাবেও প্রবেশ করা : রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' কবিতায় **দন্তস্ফুট করা** যায় না।

খয়ের খাঁ—চাটুকার : অযোগ্য হ'য়েও গোবর্দ্ধন যে প্রমোশনের পর প্রমোশন পেয়েছে তার কারণ সে হয়েছে বড় সাহেবের **খয়ের খাঁ**।

বাগে পাওয়া—নিজের আয়ত্তে পাওয়া : একবার **বাগে পেলে** তাকে নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়ব।

ইঁচড়ে পাকা—অল্পবয়সেই নষ্ট হওয়া, ডেঁপো হইয়া যাওয়া : ভবতারণের ছেলেটি একেবারে **ইঁচড়ে পেকে** গিয়েছে—ওর পরকাল ঝর্‌ঝরে।

ঠোঁটকাটা—চক্ষুলজ্জাহীন কঠোরভাষী : লোকটা একদম **ঠোঁটকাটা**—কোন হীন বা কঠিন কথাই ওর মুখে বাধে না।

গলাকাটা—ঠকাইয়া লইতে ওস্তাদ : ওর দোকানে যেও না, অমন **গলাকাটা** এ বাজারে আর নাই।

শালগ্রামের ওঠাবসা—যাহার অবস্থা-পরিবর্ত্তন বুঝা যায় না : হস্তিশিশুতুল্য বাবুটির রোগা-হওয়া সেরে-ওঠা **শালগ্রামের ওঠাবসার** মতন বুঝাই যায় না।

পাততাড়ি গুটানো—(কারবার) বন্ধ করা : রেশন হওয়ায় চালের দোকানগুলোকে **পাততাড়ি গুটোতে** হয়েছে।

সোনার পাথরবাটি, কাঁটালের আমসত্ত্ব—অসম্ভব : বিশ্বের শান্তিভঙ্গকারীদের দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে বিশ্বশান্তিসংসদ—এ যেন **কাঁটালের আমসত্ত্ব (সোনার পাথরবাটি)**।

ভস্মে ঘি ঢালা—নিষ্ফল চেষ্টা করা : জড়বুদ্ধি ছেলের শিক্ষার জন্য টাকা খরচ করা **ভস্মে ঘি ঢালা**।

চূনকালি—কলঙ্ক : কতকগুলো অকালকুষ্মাণ্ড জন্মে বংশটার মুখে **চূনকালি** দিলে।

রাশভারি—গম্ভীর : তিনি এমন **রাশভারি** লোক ছিলেন যে কেউ হঠাৎ তাঁকে কোন কথা বলতে সাহস করত না।

তাল সামলান—একসঙ্গে এত কাজে হাত দিচ্ছ; শেষে **তাল সামলাতে** পারবে তো?

পাল্লা দেওয়া—প্রতিযোগিতা করা : বড়লোকের সঙ্গে **পাল্লা দিতে** গিয়ে রামধন দুদিনেই ফতুর হ'য়ে যাবে।

হাড়ে বাতাস লাগা—স্বস্তি অনুভব করা : ইংরেজ এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়ায় আমাদের **হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে**।

আগুন নিয়ে খেলা—বিপদ্-বরণ : বাঙলার বিপ্লবীগণ জানিতেন যে তাঁহারা **আগুন লইয়া খেলা** করিতেছেন।

বাড়া ভাতে ছাই—পূর্ণ হইবার মুখে আশাভঙ্গ : নিঃসন্তান খুড়োমহাশয়ের প্রচুর সম্পত্তির লোভে মাধব পিতাকে অবহেলা করিয়া কায়মনোবাক্যে খুড়ার সেবা করিতেছিল; বৃদ্ধবয়সে খুড়ার একটি পুত্র হওয়ায় তাহার **বাড়া ভাতে ছাই** পড়িল।

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া—অতিতুচ্ছ কষ্টও সহিতে না পারা : জমিদার-নন্দন **ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান**—উনি করবেন দেশের জন্য কারাবরণ!

সাপের পাঁচ পা দেখা—মনের অস্বাভাবিক অবস্থা : যা না তাই করছ—**সাপের পাঁচ পা** দেখেছ নাকি?

চক্ষু ছানাবড়া হওয়া, চক্ষু চড়কগাছ হওয়া—হতবুদ্ধি হওয়া, অন্ধকার দেখা : শ্বশুরমহাশয় টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেই ভবতারণের **চক্ষু ছানাবড়া হইয়া** যাইবে। নিজের হুঁসিয়ারির অহঙ্কার করতে করতে পকেটে হাত পড়তেই গোবরের **চক্ষু** একেবারে **ছানাবড়া (চড়কগাছ)**—ব্যাগটা কোথায় গেল!

রাঘব বোয়াল—বড় বড় পাণ্ডা : কালোবাজারী আইন এমনি মজার আইন যে এর ফাঁক দিয়ে **রাঘব বোয়াল**গুলো বেরিয়ে যায়, ধরা পড়ে **চুনোপুঁটিরা** (তুচ্ছ ছোটখাটোর দল—এটিও ইডিয়ম্)।

মুখনাড়া দেওয়া, মুখঝামটা দেওয়া—কড়া কথা শুনান (মুরুব্বিয়ানার চাল চালা) : এ আমার ঘর; তোমার **মুখনাড়া দেওয়া** সইব না, ঠাকুরঝি।

একই শব্দ বিচিত্রভাবে প্রযুক্ত হইয়া কত বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিতে পারে, তাহার নিদর্শনরূপে কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখাইতেছিঃ

(ক) মাথা

(i) ব্রাহ্মণগণ ছিলেন প্রাচীন হিন্দুসমাজের মাথা (প্রধান)।
(ii) তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন (হতাশ হইয়া)।
(iii) আমার মাথা খাও—আজ যেও না (দিব্যবিশেষ —নারীসুলভ)।
(iv) আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেয়েছ (সর্ব্বনাশ করিয়াছ)।
(v) আমার মাথায় মাথায় ভাবনা (ভাবনার কূলকিনারা নাই)।
(vi) ছেলেটার অঙ্কে মাথা নাই (বুদ্ধি)।
(vii) রাগের মাথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছি (ঝোঁকে, সহসা)।
(viii) চোখের মাথা খেয়েছ নাকি (কানা হইয়াছ নাকি)?
(ix) নিধিরামের মাথা ধরেছে (শিরঃপীড়া)।
(x) "ঝোঁকের মাথায় সকল কথাই বাড়িয়ে বলে"—রবীন্দ্রনাথ (আবেগে, নেশায়)।
(xi) পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙতে বেশ পার (অন্যের ক্ষতি করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা)।
(xii) এত বড় কথা বলে আমাকে—দেখব তার ঘাড়ে ক'টা মাথা (দুঃসাহস)।
(xiii) মাথার দিব্য দিয়ে বলেছি, 'ওগো, চলন্ত ট্রামে উঠতে যেও না' (দিব্য-বিশেষ—নারীসুলভ)।
(xiv) অত মাথা গরম করবেন না, মশায় (রাগিয়া উঠিবেন না)।
(xv) তেমাথার কাছে যুক্তি নেবে (বৃদ্ধ ব্যক্তি)।
(xvi) মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'পয়সা রোজগার করি (কঠিন পরিশ্রম)।
(xvii) পরের কাছে দৈন্যের কথা বলতে আমার মাথা কাটা যায় (দারুণ অপমান বোধ করি)।
(xviii) গোটাকতক টাকা দিয়ে আমার মাথা কিনে রেখেছ নাকি (সম্পূর্ণ অধীন করিয়া)?
(xix) গাছের মাথায় রোদ ঝিকিমিকি করছে (চূড়ায়, শীর্ষে)।
(xx) "যে চৌমাথায় মাথা ঘুরে যায়"—যতীন্দ্রনাথ সেন (চারিটি পথের মিলন-স্থল ; দিশাহারা হইতে হয়)।
(xxi) দইএর মাথা, ঘোলের শেষ খেতে হয় (অগ্রভাগ)।
(xxii) ভাই মাথা আঁচড়াচ্ছে, আর ভগিনী মাথা বাঁধছে (কেশ)।
(xxiii) মাথাপিছু একটাকা চাঁদা (জনপিছু)।
(xxiv) মাথা খাটিয়ে একটা ফন্দী বার করেছি (মস্তিষ্কপরিচালনার দ্বারা)।

(xxv) বড় বড় গুণ করতে আমার মাথা ঘুলিয়ে যায় (গোলমাল হইয়া যায়)।

(xxvi) কাজ করেছ, না আমার মাথা করেছ (সব মাটি করিয়াছ)!

(xxvii) কুকুরকে 'নাই' দিলে মাথায় ওঠে (প্রশ্রয়দাতাকে মানে না)।

(xxviii) কার মাথায় হাত বুলিয়ে এলে (ফাঁকি দিয়া)?

(xxix) "তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা"—রবীন্দ্রনাথ (প্রণাম করি)।

(xxx) যদি আমার মঙ্গল হয়, এ শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব (সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করিব)।

(xxxi) প্রশ্ন শুনিয়া রাম মাথা চুলকাইতে লাগিল (উত্তর ঠিক করিতে পারিল না)।

(xxxii) পুকুরটি মাথায় মাথায় ভরে উঠেছে (কানায় কানায় হইয়াছে)।

(খ) চোখ

(i) মাষ্টারমশায় চোখ টিপিতেই ছেলেটি চুপ হইয়া গেল (ইশারায় নিষেধ করিতে)।

(ii) এবার মামার চোখ ফুটেছে (জ্ঞান হইয়াছে)।

(iii) চোখের চামড়া থাকলে কি আর এই কাজ করে (লজ্জা)?

(iv) ওদের চোখে চোখে কথা হয় (অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময়)।

(v) চোখোচোখি হতেই সে গা ঢাকা দিলে (দৃষ্টি-বিনিময়)।

(vi) পরের ঐশ্বর্য্য দেখে চোখ টাটালে কি হবে (ঈর্ষ্যা করিলে)?

(vii) এদিকে একটু চোখ রাখবেন (নজর)।

(viii) আসবে কেন এখানে—আমি যে তোমার চোখের বালি (চক্ষুশূল)।

(ix) আম্মর চোকখাকী (গালাগালি—নারীসুলভ)!

(x) চোখের মাথা খেয়েছ নাকি (কানা হইয়াছ)?

(xi) লোকটাকে সব সময় চোখে চোখে রাখবেন (নজরবন্দী)।

(xii) ভেবেছ রাঙা চোখে পানি দেখলেই গ'লে যাব—নয় (কান্না)?

(xiii) "ভয় করি না চোখ রাঙালে"—রামপ্রসাদ (উগ্রভাবে শাসন করিলে; ক্রোধ প্রকাশ করিলে)।

(xiv) চোখে ঠুলি দিয়ে থাক নাকি (কোনদিকে দৃষ্টিপাত কর না)?

(xv) চোখের আড়াল, কি মনের আড়াল (দৃষ্টিসীমার বাহিরে)।

(xvi) তোমাকে চোখের জলে নাকের জলে ক'রে, তবে ছাড়ব (নাস্তানাবুদ, নাজেহাল)।

(xvii) রাজারা পরের চোখে দেখেন (পরের বর্ণনাই তাঁহাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্যের মত)।

(xviii) কেউ কাছে এলেই আপনমনে গিসগিস করে—এমন চোখজ্বালা লোক আর দেখি নাই।

(xix) যে ব্যাঙ্কে তাঁর সর্ব্বস্ব গচ্ছিত আছে, সেটি 'ফেল্' করায় তিনি চোখে ধোঁয়া (অন্ধকার, সরষের ফুল) দেখলেন (অকূল পাথারে পড়িলেন)।

(xx) চিঠি পড়ব কি করে? চোখ থাকতে কানা—লেখাপড়া তো শিখি নাই।

(xxi) ছেলেটির চোখ ছলছল করছে (কান্না বা জ্বর আসিতেছে)।

(গ) নাক

(i) নাকে-মুখে দুটো গুঁজে বেরিয়ে পড়লাম (তাড়াতাড়ি কোনরকমে দুটি গলাধঃকরণ করিয়া)।

(ii) এতদিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে নাকি (নির্ভাবনায়, নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়াছিলে)?

(iii) নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাব (কায়দায় ফেলিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করাইব)।

(iv) নাকে খৎ দিচ্ছি—একাজ আর কখন করব না (কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি)।

(v) ঘুরিয়ে নাক দেখান তার স্বভাব—সোজা কথা তার মুখে আসে না।

(vi) বাবু এখন নাক ডাকাচ্ছেন (নাসাগর্জ্জনসহকারে নিদ্রা যাইতেছেন)।

(vii) তোমার হয়েছে মুখ থাকতে নাকে ভাত খাওয়া (অস্বাভাবিক পথ ধরা)।

(viii) ভাল কথাতেও নাক সিঁটকান তোমার স্বভাব (অবজ্ঞা প্রকাশ)।

(ix) দেখ, দিনরাত্রি অমন নাকে-কান্না আমার ভাল লাগে না (ঘ্যানঘ্যানানি, প্যানপ্যানানি)।

(x) যা-ই দাও না, বউমা নাক সিকেয় তুলেই আছেন (অর্থাৎ কিছুই তাহার মনে ধরে না, পছন্দ হয় না)।

(xi) লালবাজার আর কালোবাজারে নাকশোঁকাশুঁকি হয়েই আছে (প্রীতিসম্পর্কস্থাপন)।

(ঘ) কান

(i) সকল কথায় কান দিতে নাই।

(ii) ওর কথা কানে তুলো না।

(iii) আমার কথা আর মামা শুনছেন না—মামীমা ওঁর কান ভারি করে দিয়েছেন।

(iv) বক আর ঝক আমি কানে দিয়েছি তূলো।

(v) "কানপাতলা নারী বড়ই মন্দকারী"—প্রবচন।

(vi) "ঘরে পরে করে কানাকানি"—চণ্ডীদাস।

(vii) দিনরাত্রি ভ্যা ভ্যা ক'রে কান্না—কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল।
(viii) ওদিকে একটু কান রেখো—বাবু হয়তো এখুনি কড়া নাড়বেন।
(ix) গোপন কথা—দেখো, যেন পাঁচ কান না হ'য়ে যায়।
(x) আজকাল লোকে ট্রামে-বাসের কানে-কপালে ঝোলে।
(xi) ভুবন মাসীর কানে কানে কথা বলিল।

(ঙ) মুখ

(i) বাবা আমাকে মুখ করেছেন (তিরস্কার)।
(ii) ভগবান্ আমার মুখ রেখেছেন (মান)।
(iii) হরি মুখ তুলে চাইলে অন্ধও দৃষ্টি পায় (কৃপা করিলে, প্রসন্ন হইলে)।
(iv) বুক ফুটে, তবু মুখ ফুটে না (ভাষায় প্রকাশ করা)।
(v) বউমার দেখছি বেশ মুখ ফুটেছে (কটকট করিয়া শুনাইয়া দিতে শিখিয়াছেন)।
(vi) অমন মুখ চুন ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন (ভয়ে বা দুঃখে ম্লান মুখ)?
(vii) তুমি মুখ ভার করলে জগৎ অন্ধকার দেখি।
(viii) মুখ খারাপ করো না বলছি (অভদ্রভাষায় গালি দেওয়া)।
(ix) "মুখে মিঠে, নিমনিশিন্দে পেটে" (কথায় মধু ঢালে, অন্তরে বিষ)।
(x) মুখের মত জবাব পেলে সবাই ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।
(xi) ওরকম মুখ ভ্যাঙচালে গালে এক চড় বসিয়ে দেব।
(xii) বাবু যখন মুখ খুলেছেন, তখন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর থামাথামি নাই।
(xiii) ছেলেটি বড় মুখচোরা (লাজুক)।
(xiv) তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক (তোমার উক্তি সফল হউক)।
(xv) মুখচাওয়া ছেলের নিত্য অসুখ করে (সকলের অতিমাত্রায় প্রিয়)।
(xvi) কোন্ মুখে এ কথা তাঁকে বলব (বলিতে লজ্জা করে, বলার যোগ্যতা হারাইয়াছি)?
(xvii) "শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা?"—রবীন্দ্রনাথ (অন্তরের সহিত যোগ নাই এমন কথামাত্র)।
(xviii) মুখ সামলে কথা বল (সংযতভাবে)।
(xix) ছেলেটার নাকে-মুখে-চোখে কথা (বেজায় বাচাল)!
(xx) মেয়েটার যে মুখ! কে যাবে ওর কাছে (অর্থাৎ কোন জঘন্য কথাই ওর মুখে আটকায় না)?
(xxi) এই, মুখে চাবি দিলাম—আর একটা কথা যদি বলি।
(xxii) ওকে তুমি চেন না, ওর পেটে এক মুখে আর (কপট)।

(xxiii) গদার মায়ের মুখ ছুটলে কার সাধ্য ওর সামনে দাঁড়ায় (অসংযত গালাগালির বন্যা বহিলে) !

(xxiv) সভায় দশ কথা শুনিয়ে দিতেই হারানবাবুর থোঁতামুখ ভোঁতা হ'য়ে গেল (হারানবাবু জব্দ হইয়া গেল)।

(xxv) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !

(xxvi) পরের মুখ চেয়ে ব'সে থাকলে হবে না (অন্যের উপর নির্ভর করিয়া)।

(xxvii) তুমি মুখ ফিরালে কার কাছে দাঁড়াব (বিমুখ, বাম, প্রতিকূল হইলে) ?

(xxviii) ছোটলোকের মত মুখখিস্তি করো না (অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা)।

(xxix) ছোট মুখে বড় কথা মানায় না।

(xxx) কুলাঙ্গার সন্তান পিতামাতার মুখে চুনকালি দেয়।

(xxxi) চুপচাপ থাক, কিন্তু এখন যে দেখছি মুখে খই ফুটছে।

(xxxii) "পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই লো"—গান।

(xxxiii) পড়া শুধু মুখস্থ করিলে চলিবে না—বুঝিতে হইবে।

(xxxiv) ফোড়াটার অনেকগুলি মুখ হয়েছে—বোধ হয় কার্ব্বাঙ্কল্।

(xxxv) মুখ গোঁজ ক'রে রয়েছিস্—উত্তর দে।

(xxxvi) ছিঃ, অমন কথা মুখে আনতে নাই।

(xxxvii) লোকটা দক্ষিণ মুখে চ'লে গেল।

(xxxviii) কি গো, মুখ সেলাই ক'রে দিয়েছ নাকি ?

(xxxix) বেশি মিষ্টি খেলে মুখ ম'রে যায়—মাঝে মাঝে একটু দই খেয়ে নিতে হয়।

(xl) ভালো মুখে দেবে তো দাও।

(xli) অমন মুখ বাঁকালে আমি নেব না।

(xlii) লোকটা বেজায় মুখ-আল্‌গা, মুখের কোন বাঁধন নাই।

(চ) হাত

(i) চুরি বিদ্যেয় বেশ হাত পাকিয়েছ দেখছি (নৈপুণ্যলাভ করিয়াছ)।

(ii) কবিরাজমহাশয়ের বেশ হাতযশ আছে (গায়ে হাত দিলে বা হাতে করিয়া ওষুধ দিলে রোগ সারে)।

(iii) চোরটা হাতেনাতে ধরা পড়েছে (বামালসমেত)।

(iv) একটু হাত চালাও, নইলে শেষ করবে কেমন ক'রে (দ্রুত কাজ কর) ?

(v) যা বাজার পড়েছে, একটু হাত গুটান দরকার (খরচ কমান)।

(vi) দৈনিক হাতখরচা দশটাকার কমে চলে না (ব্যক্তিগত খরচা)।

(vii) তাসের ম্যাজিক—শুধু হাতচালাকী (হাতের কৌশল)।

(viii) সোনার দর যখন কম ছিল, তখন কিনলে না ; এখন হাত কামড়িয়ে লাভ কি (অনুশোচনা করা) ?

(ix) রামবাবুকে কৌশলে একবার হাত করতে পারি তো কাজ হাঁসিল হয় (বশে আনিতে পারি)।

(x) গাঁটকাটাকে ধরলে কি হবে—ব্যাগটা হাতে হাতে অনেক দূর চ'লে গেছে (বিভিন্ন লোকের মারফত)।

(xi) দুটি ভিক্ষে পাই, মা ?—হাত জোড়া আছে, বাছা (কাজে ব্যস্ত, অবসর নাই)।

(xii) কবিরাজ রোগীর হাত দেখিতেছেন (নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন)।

(xiii) গণকঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছেন যে আমার খুব সুসময় আসছে (করকোষ্ঠী দেখা)।

(xiv) তিনি যে কাজে হাত দেন, তাই সফল হ'য়ে যায় (আরম্ভ করা)।

(xv) কাজটা যখন হাতছাড়া হ'য়ে গেল, তখন তুমি এলে (অধিকারের বাহিরে)।

(xvi) যতই অভাব হোক, পরের কাছে হাত পাতব না (ভিক্ষা চাওয়া)।

(xvii) বাঁ হাতে কিছু না নিলে ডান হাতের ব্যাপার যে বন্ধ হ'য়ে যায় (অস্বাভাবিক উপায়ে কিছু আয় না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না)।

(xviii) তাঁর ডান হাত যা দান করে, বাঁ হাত তা টের পায় না (সংগোপনে দান)।

(xix) ডান হাতে আনতে বাঁ হাতে যায় (সঙ্গে সঙ্গে)।

(xx) এ বিষয়ে আমার কোন হাত নাই (অধিকার)।

(xxi) আয়কর আইনে মিল-মালিকদের যথেষ্ট হাত আছে (প্রভাব, গোপন যোগ)।

(xxii) মাতালটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দাও (সর্ব্বনাশ করা)।

(xxiii) বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ (হাতে দড়ি—বিপদ্ ; হাতে চাঁদ—অসম্ভবের প্রলোভন)।

(xxiv) এমন ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নাই (সুযোগ অবহেলা করা)।

(xxv) 'আকাশের তারা দেয় মোরে হাতছানি' (হাত-ইসারা)।

(xxvi) হাতজোড় করেছি, তবু তাঁর অনুগ্রহ হয় নাই (নতিস্বীকার)।

(xxvii) বুক দুড়দুড় করছে, কোন কাজে হাত-পা আসছে না (উৎসাহ হইতেছে না)।

(xxviii) বলিহারি হাতসাফাই—সকলের সামনে নোটখানি উড়িয়ে দিলে (হস্তকৌশল)!

(xxix) খোকার আজ হাতে-খড়ি (বিদ্যারম্ভ)।

(xxx) একবার হাতে পাই তো নিই (বাগে)।

(xxxi) ওর হাতে জল গলে না—ও তোমাকে সন্দেশ খাওয়াবে (কৃপণ)!

(xxxii) মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লে চলবে না ; ওঠ, প্রতীকারের চেষ্টা কর (হতাশ হইয়া)।

(xxxiii) দেখ তো কেমন ক'রে ওকে হাতে না মেরে ভাতে মারি (প্রত্যক্ষ ক্ষতি না করিয়া পরোক্ষে ক্ষতি করা)।

(xxxiv) টাকাটা হাতের-পাঁচ হিসেবে থাক (শেষ সম্বল)।

(xxxv) হাতনাগাদ সাড়ে চারশ টাকা খরচ হয়েছে (আজ পর্য্যন্ত)।

(xxxvi) হাতে-কলমে কাজ শিখলে তবে ঠিক শেখা হয় (তত্ত্ব ও ব্যবহার—দুইয়েরই সাহায্যে শেখা)।

(xxxvii) হাতে মাথা কাটতে চাও নাকি (এত অলৌকিক শক্তি হইয়াছে তোমার ? —ইহাই ব্যঞ্জনা)।

(xxxviii) জিনিষপত্তোরগুলোর দিকে একটু নজর রেখো—লোকটার বড় হাতটান (চোর)।

(xxxix) পুলিশের সামনে লোকটা হাত কচলাতে লাগল (কাঁচুমাচু করা)।

(xl) সর্ব্বজয়া কবচধারণে হাতে হাতে ফল পাবেন (সদ্যঃ)।

(xli) ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না (তুচ্ছ কাজ করিয়া নিমিত্তের ভাগী হওয়া)।

(xlii) একেবারে হাত খালি করা উচিত নয় (কপর্দ্দকহীন হওয়া)।

(xliii) হাততোলা পাঁচ টাকায় আমার কি হবে (অনুগ্রহের যৎসামান্য দান)।

(xliv) তাই দাও মা, দুটো ছাই-ই দাও—তোমার হাত আসুক (দানের অভ্যাস হউক)।

(xlv) দাঙ্গার সময় প্রাণটি হাতে ক'রে রাস্তায় বেরুতে হ'ত (প্রতি পদে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া)।

(xlvi) আপনি হাতে ক'রে যা দেবেন তাতেই আমার রোগ সেরে যাবে (স্পর্শমাত্র)।

(xlvii) মুখোমুখি থেকে শেষে হাতাহাতিতে দাঁড়াল (মারামারি)।

(xlviii) বড়বাবু ওঁর হাতধরা—ওঁকে ধরলেই চাকরী হ'য়ে যাবে (বশীভূত)।

(xlix) সিনেমা দেখলে বগলে দুটো হাত বেরুবে, কেমন (অলৌকিক কিছু লাভ হইবে)?

(l) গায়ে হাত তুলো না, বলছি (মারিও না)।

(li) লোকটার বেজায় হাতভারি—একটি পয়সা ওর মা-বাপ (কৃপণ)।

(lii) পরের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ দু'পয়সা করেছ (ফাঁকি দিয়া)।

(liii) রামশঙ্কর বড়বাবুর ডান হাত (প্রধান সহায়)।
(liv) জমিদারের কাছে আমার হাত-পা বাঁধা (ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মোটে নাই)।
(lv) চোরটাকে মারবার জন্য হাত-পা নিশপিশ করতে লাগল।
(lvi) স্বার্থের খাতিরে চার্চিল স্টালিনের সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন।

(ছ) গা

(i) কি কথার ছিরি—শুনলে গা জ্ব'লে যায় (বিরক্তি বোধ হয়, রাগ হয়)।
(ii) "গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল"—দাশরথি (ওঠ)।
(iii) অদ্ভুত লোক—কোন কাজে গা নাই, গা করে না।
(iv) আজ কমলার গায়ে-হলুদ।
(v) হতাশ হ'য়ে ব'সে থাকলে চলবে না ; একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠ দেখি।

(জ) কাঁচা

(i) কাঁচা হাতের লেখা হরফেই চেনা যায় (অনিপুণ)।
(ii) কাঁচা বয়সে এমন কাজ অনেকেই ক'রে থাকে (অপরিণত)।
(iii) বললেই অমনি টাকা দিয়ে দেবেন এমন কাঁচা লোক তিনি নন (নির্ব্বোধ)।
(iv) সর্দ্দি হ'লে কাঁচা জলে স্নান করতে নাই (যে জল গরম করিয়া নেওয়া হয় নাই)।
(v) মাছের ঝোলে কেমন যেন কাঁচা তেলের গন্ধ বেরুচ্ছে (যাহা অগ্নিপক্ব নয়)।
(vi) কাঁচা ইটের গাঁথুনি স্থায়ী হয় না (আপোড়া)।
(vii) কচিকাঁচা নিয়ে ঘর করি (বিশেষ্যভাবাপন্ন ; অর্থ—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে)।
(viii) "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা"—রবীন্দ্রনাথ (বিশেষ্যভাবের অর্থ—তরুণ)।
(ix) এত কাঁচা কাজ তিনি করেন না (যে কাজে বিবেচনার অভাব থাকে)।
(x) কাঁচা ঘুমে জাগলে খোকা কাঁদবে (অপূর্ণ)।
(xi) কাঁচা পয়সা হাতে এলে মানুষ একটু গরম হয় বই কি (প্রচুর নগদ পয়সা)।
(xii) কখন কারও কাঁচা আলে পা দিই নি (পায়ের ভর সয় না, ভাঙিয়া যায় এমন নরম কাদার আল ; ব্যঞ্জনা—অনিষ্ট করি নাই)।
(xiii) এ তোমার নিতান্তই কাঁচা কথা (অসার, বাজে)।
(xiv) কাঁচা মাংস আবার মানুষে খায় (আরাঁধা)।
(xv) কাঁচা সর্দ্দিতে নাক জ্বালা করে (তরুণ অর্থাৎ সদ্য-হওয়া)।
(xvi) কাঁচা মালের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ (শাকসব্জী, তরিতরকারী)।
(xvii) এ ছিটটার রঙ কাঁচা (জল লাগিলেই উঠিয়া যাইবে)।
(xviii) কাঁচা চামড়ার কারবারে দীনুদাস ফেঁপে উঠেছে (পাট-না-করা)।

(ঝ) পাকা

(i) গাঁয়ে মাত্র মিত্রমশায়েরই পাকা বাড়ী (ইষ্টকনির্ম্মিত)।
(ii) লোকটা পাকা চোর (ওস্তাদ চোর)।
(iii) পাকা জহুরি না হ'লে কি মাণিক চেনা যায় (অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ) ?
(iv) তাহ'লে এই আপনার পাকা কথা (যে কথার নড়চড় হয় না) ?
(v) আজ বুড়ুর পাকাদেখা হবে (আশীর্ব্বাদ—বিবাহসংক্রান্ত)।
(vi) দোকানের পাকাখাতাখানি চুরি গিয়াছে (আইনসিদ্ধ হিসাবের খাতা)।
(vii) আজ পাকাসোনার দর ১৬।৴০ (খাঁটি)।
(viii) পাকা গিন্নীর হাতে পড়লে সংসারের শ্রী আপনি ফোটে (নিপুণ)।
(ix) আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি (পরিপক্ক ; ব্যঞ্জনা—সর্ব্বনাশ করিয়াছি) ?
(x) পাকা হাড়ে অনেক সয় (শক্ত, পূর্ণপরিণত)।
(xi) এ কাজে পাকা দশটি দিন লাগবে (পূর্ণ)।
(xii) আশীর্ব্বাদ করি, পাকা মাথায় সিঁদুর পর (শুভ্রকেশযুক্ত মাথায়)।
(xiii) পাকা ঘুঁটিটা কাঁচবে (লুডো বা পাশাখেলায় ঘরে-ওঠা ঘুঁটি) ?
(xiv) ঠাণ্ডা জল মাথায় দিও আর কাঁচাপাকা জল দিও গায়ে (ঠাণ্ডা-গরমে মিশান)।
(xv) শাড়ীখানির রঙ পাকা (স্থায়ী)।
(xvi) লেখাটা পাকাহাতের (নিপুণ)।
(xvii) পাকা ছেলে—চুপ কর্ বলছি (ডেঁপো)।

কয়েকটি ক্রিয়াপদের বিচিত্র বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) লাগা (লাগ্ ধাতু)

(i) এ সব ছবি চোখে লাগে না।
(ii) উহুঃ, বড্ড লাগছে।
(iii) আমেরিকা আর রাশিয়া—এবার ষাঁড়ে ষাঁড়ে লাগবে।
(iv) লেগে থাকলে কার্য্যোদ্ধার হবেই।
(v) আপদ্‌টা গেলে হাড়ে বাতাস লাগে।
(vi) কানাকে কানা বললে তার প্রাণে লাগে।
(vii) আদর ক'রে ওকে ঘরে এনেছিলাম ; এখন দেখছি ও গলায় লেগেছে।
(viii) কিনি তো একখানা লটারির টিকিট ; লাগে লাগবে, না লাগে না লাগবে।
(ix) 'ঘাটে লাগায়ে ডিঙা ছুটো পান খাইয়া যাও'—গান।

(x) দুশ টাকা আয় হয় তো দুটো টাকা খরচ করতে গায়ে লাগে না।
(xi) উঠে-প'ড়ে লাগলে পাস অনিবার্য্য।
(xii) অপয়া লোকের চোখ (বা নজর) লাগলে ছেলেপিলের অসুখ হয়।
(xiii) লোকটার দাঁতি লেগেছে।
(xiv) ফসলে পোকা লাগলে, ফসল বাঁচান কঠিন।
(xv) "নেচে আমার ঘুর লেগেছে"—রবীন্দ্রনাথ।
(xvi) বরণ-ডালায় কি কি লাগে ?
(xvii) লুচি আর লাগবে কি ?
(xviii) গাছটার শিকড় নাই, লাগবে না।
(xix) 'গরিবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে'—প্রবাদ।
(xx) মন ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।

(২) **মারা** (মার্ ধাতু)

(i) ব্যাঙ্কটা ফেল্ মেরেছে।
(ii) লোকটা কার পকেট মেরেছে।
(iii) "মেরেছ কলসীর কানা, তাই ব'লে কি প্রেম দেব না ?"—গান।
(iv) "আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা"—রবীন্দ্রনাথ।
(v) মানুষমারা জঙ্গলের ধারে ঘাপটি মেরে ব'সে থাকত।
(vi) মেরে-কেটে পাঁচটা টাকা, তার বেশি নয়।
(vii) পাস ক'রে কেল্লা মেরে দিচ্ছে আর কি !
(viii) একটা তাড়া খেয়েই লোকটা চুপ মেরে গেল।
(ix) হাতে না মেরে ভাতে মারাই ভাল।
(x) কালোবাজারে লোকটা প্রচুর টাকা মেরেছে।
(xi) "মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার"—প্রবাদ।
(xii) ঘুমোয় নাই, মটকা মেরে প'ড়ে আছে।
(xiii) এবার শত্রুর জড় মারব, তবে ছাড়ব।
(xiv) চোরটা নর্দ্দমার মুখ দিয়ে গুড়ি মেরে পালিয়ে গেল।
(xv) ব'সে ব'সে গল্প মারছিস, পড়তে হবে না ?
(xvi) উঁকি মেরে দেখ্ দেখি ওখানে বাবা আছেন কিনা।
(xvii) বাতাস যোগ দিতেই আগুনটা তাল মেরে উঠল।
(xviii) বেশি মিষ্টি মুখ মেরে দেয় ; মাঝে মাঝে একটু ক'রে দই খেয়ে নিতে হয়।
(xix) মদনবাবু মার্কামারা কংগ্রেসী।

(xx) বোতলটার গায়ে একটা লেবেল মেরে দাও।

(xxi) মোটা দাঁও না মারলে এত বড় বাড়ী করা যায় না।

(xxii) এবার ওর চালাকির মুড়ো মেরে দিচ্ছি।

বিশেষণের সুপ্রয়োগ

অনেক সময় একটি বিশেষ্যের উপযোগী বিশেষণের অথবা একটি বিশেষণের উপযোগী বিশেষ্যের প্রয়োগ করিতে না পারায় বক্তব্যটি সার্থক ও সুন্দর হয় না ; কখন কখন বক্তব্য অশুদ্ধ হইয়া যায়। বৃক্ষ **রোপণ** করা হয় এবং বীজ **বপন** করা হয়। কিন্তু কেহ যদি লেখে '**রোপিত বীজটি** অঙ্কুরিত হইয়াছে', তাহার উদ্দেশ্য বুঝা যায় ; কিন্তু **প্রয়োগ হয় অশুদ্ধ**। '**উপ্ত** বীজ', '**রোপিত** বৃক্ষ' শুদ্ধ প্রয়োগ। 'অমূল্য রত্ন' এবং 'মূল্যহীন রত্ন'—ইহাদের **অমূল্য** ও **মূল্যহীন** ব্যাকরণ-বিচারে অর্থের দিক্ দিয়া পৃথক্ নয় ; কিন্তু প্রয়োগে বিপরীত অর্থই প্রকাশ করে। 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা **অগণ্য**' বলিলে বুঝায় তাহারা অসংখ্য ; কিন্তু '**নগণ্য**' বলিলে সংখ্যার ভাবের চেয়ে নিকৃষ্টতার ভাবই বেশী করিয়া প্রকাশ করে। '**প্রাঞ্জল** ভাষা' হয়, কিন্তু 'প্রাঞ্জল চিত্র' হয় না। সুন্দর ফুল, মধুর গান, নির্ম্মল জল, অকূল সমুদ্র, গভীর রাত্রি, সবিনয় নিবেদন, চঞ্চল নদী, ক্ষণিক সুখ—বিশেষ্য-বিশেষণের এইজাতীয় সমাবেশ সহজ। কিন্তু যেখানে বিশেষ অর্থ বুঝাইতে যোগ্যতম বিশেষণটির প্রয়োগ আবশ্যক হয়, সেইখানেই ব্যাপারটি একটু কঠিন হইয়া পড়ে। বিশেষণের উপযোগী বিশেষ্যপ্রয়োগও এইরূপ ক্ষেত্রে ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিতে হয়। ধরা যাক, নিম্নলিখিত বাক্যাবলীর অনুক্ত অংশগুলি পূরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে :

(i) জল — পদার্থ ; কিন্তু প্রস্তর —। এরূপ — দৃশ্য দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। — সমীরণে — দেহ জুড়াইয়া গেল। "— গিরিকান্তারমরু, — পারাবার লঙ্ঘিতে হবে" (নজরুল ইস্‌লাম)। — — আকাশ হইতে — — জ্যোৎস্নাধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র — বিষয় — ও — ভাষায় বুঝাইয়াছেন।

(ii) সূক্ষ্ম — স্থূলবুদ্ধির অগম্য। ভৃত্যের করুণ — প্রভু কঠিন — দ্রবীভূত করিতে পারিল না — যেমন অনন্ত — ও তেমনি অসীম। অনেক ক্ষুদ্র — সুবৃহৎ — অপেক্ষাও বৃহত্তর।

প্রথমটিতে বিশেষ্য আছে, বিশেষণ নাই এবং দ্বিতীয়টিতে বিশেষণ আছে, বিশেষ্য নাই। শুধু 'জল' থাকিলে, বিশেষণরূপে 'নির্ম্মল' বসাইলেই চলিত। কিন্তু 'পদার্থ' ও পরে 'প্রস্তর' থাকায় 'নির্ম্মল' অচল। লিখিতে হইবে 'জল **তরল** পদার্থ ; কিন্তু প্রস্তর

কঠিন। (ii)-এর প্রথমটিতে যদি 'সূক্ষ্ম' বা 'স্থূল' মাত্র থাকিত তাহা হইলে ইহাদের যোগ্য বিশেষ্যরূপে 'বস্তু', 'বুদ্ধি', 'বিচার', 'হিসাব'-এর যে-কোন একটি 'সূক্ষ্ম' বা 'স্থূল'-এর পর বসাইতে পারিতাম। এখানে অর্থ অনুধাবন করিয়া তবে বিশেষ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। কাজেই লিখিতে হইবে 'সূক্ষ্ম **তত্ত্ব** স্থূলবুদ্ধির অগম্য'।

অবশিষ্ট বাক্যগুলির অর্থসঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিশেষণ (i) বা বিশেষ্য (ii) প্রয়োগ করিলে উহারা এইরূপ হইবে :

(i) জল **তরল** পদার্থ, কিন্তু প্রস্তর **কঠিন**। এরূপ **ভয়াবহ** দৃশ্য দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। **শীতল** সমীরণে **তপ্ত** দেহ জুড়াইয়া গেল। "**দুর্গম** গিরিকান্তারমরু, **দুস্তর** পারাবার লঙ্ঘিতে হবে"। **নির্ম্মল নীল** আকাশ হইতে **স্নিগ্ধ মধুর** জ্যোৎস্নাধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র **কঠিন** বিষয় **সরল** ও **প্রাঞ্জল** ভাষায় বুঝাইয়াছেন।

(ii) সূক্ষ্ম **তত্ত্ব** স্থূলবুদ্ধির অগম্য। ভৃত্যের করুণ **মিনতি** প্রভুর কঠিন **হৃদয়** দ্রবীভূত করিতে পারিল না। **আকাশ** যেমন অনন্ত **সিন্ধু**ও তেমনি অসীম। অনেক ক্ষুদ্র **নক্ষত্র** সুবৃহৎ **সূর্য্য** অপেক্ষাও বৃহত্তর।

বাক্যে বিশেষণ প্রয়োগ করিতে বহুক্ষেত্রে বিচারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

বিচ্ছিন্ন বিশেষ্যের বা বিশেষণের, বিশেষণ বা বিশেষ্য বসানর এক হিসাবে কোন অর্থ হয় না। বহুক্ষেত্রে বহু বিশেষণের বা বিশেষ্যের যে-কোন একটি ইচ্ছামত বসাইয়া দেওয়া যায়। **দেহ** স্থূল, বিশাল, দীর্ঘ, সুস্থ, সবল, জীর্ণ, শীর্ণ, খর্ব্ব ইত্যাদি কত কি হইতে পারে। তেমনি **অগাধ** সমুদ্র, বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা ইত্যাদি কত কি হইতে পারে।

এই কারণে, বিচ্ছিন্ন বিশেষ্য-বিশেষণের কোন তালিকা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছি না।

বিশেষ্যের বিশেষণ ছাড়া (i) বিশেষণের বিশেষণ, (ii) ক্রিয়ার বিশেষণ, (iii) ক্রিয়ার বিশেষণের বিশেষণ এবং (iv) অব্যয়ের বিশেষণও আছে।

(i) **বিশেষণের বিশেষণ : অতি** সুন্দর দৃশ্য। **খুব** ভাল ছেলে।

(ii) **ক্রিয়ার বিশেষণ : শীঘ্র** যাও। **ধীরে** চল। **ধীরে ধীরে** চল। **সবিনয়ে** জানাইতেছি। **শীঘ্র করিয়া** আসিও।

(iii) **ক্রিয়ার বিশেষণের বিশেষণ : অতি** সাবধানে কাজ করিবে। **খুব** শীঘ্র আসিয়াছ। **এত** সত্বর যাওয়া যায় না।

(iv) **অব্যয়ের বিশেষণ : কি** চমৎকার! **শত** ধিক্ তোরে! **ঠিক** যেন কেউটে সাপ।

বিশেষণ-সৃষ্টি

(ক) কৃৎ-যোগে (সংস্কৃত)

(i) 'ক্ত' (ত)-প্রত্যয়-যোগে

বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ	বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ
গমন	...	গত	লয়	...	লীন
অধ্যয়ন	...	অধীত	লোভ	...	লুব্ধ
উৎকর্ষ	...	উৎকৃষ্ট	জ্ঞাপন	...	জ্ঞাপিত
আনয়ন	...	আনীত	প্রহার	...	প্রহৃত
দর্শন	...	দৃষ্ট	গান	...	গীত
উদয়	...	উদিত	উদ্ধার	...	উদ্ধৃত
সংসর্গ	...	সংসৃষ্ট	উপদ্রব	...	উপদ্রুত
অধিকার	...	অধিকৃত	দহন	...	দগ্ধ
অভিধা	...	অভিহিত	পরিমাণ	...	পরিমিত
স্থাপন	...	স্থাপিত	প্রণয়ন	...	প্রণীত
বিস্তার	...	বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ	অভ্যাস	...	অভ্যস্ত
উদ্বেগ	...	উদ্বিগ্ন	ধ্বংস	...	ধ্বস্ত
সঞ্চয়	...	সঞ্চিত	বিশ্বাস	...	বিশ্বস্ত
ভেদ	...	ভিন্ন	বিশ্রম্ভ	...	বিশ্রব্ধ
আহরণ	...	আহৃত	গোপন	...	গুপ্ত
ছেদ	...	ছিন্ন	ত্যাগ	...	ত্যক্ত
আহ্বান	...	আহূত	প্রশ্ন	...	পৃষ্ট
ক্লেদ	...	ক্লিন্ন	দীক্ষা	...	দীক্ষিত
আক্রমণ	...	আক্রান্ত	প্রসাদ	...	প্রসন্ন
ক্ষোভ	...	ক্ষুব্ধ	প্রণাম	...	প্রণত
অন্তর্ধান	...	অন্তর্হিত	অবশেষ	...	অবশিষ্ট
ক্রোধ	...	ক্রুদ্ধ	দোষ	...	দুষ্ট
গ্রহণ	...	গৃহীত	উৎসর্গ	...	উৎসৃষ্ট
বিধান, নিধান	...	বিহিত, নিহিত	হর্ষ	...	হৃষ্ট
জন্ম	...	জাত	আদেশ	....	আদিষ্ট
ক্ষয়	...	ক্ষীণ	ভ্রংশ	...	ভ্রষ্ট
ক্রয়	...	ক্রীত	পরামর্শ	...	পরামৃষ্ট

বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ	বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ
উন্নয়ন	...	উন্নীত	শম, দম	...	শান্ত, দান্ত
শ্রম	...	শ্রান্ত	বিকিরণ	...	বিকীর্ণ

(ii) **'তব্য', 'অনীয়', 'য'**-প্রত্যয়-যোগে

দর্শন	...	দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়, দৃশ্য	ক্ষমা	...	ক্ষন্তব্য
গমন	...	গন্তব্য, গম্য	পালন	...	পালনীয়, পাল্য
উচ্চারণ	...	উচ্চার্য্য	হনন (হত্যা)	...	হন্তব্য
করণ	...	কর্ত্তব্য, করণীয়, কার্য্য	বর্জ্জন	...	বর্জ্জনীয়
ক্রয়	...	ক্রেতব্য, ক্রেয়	আদর	...	আদরণীয়
গোপন	...	গোপনীয়, গোপ্য	বচন	...	বক্তব্য, বচনীয়, বাচ্য
জয়	...	জেতব্য, জেয়			(যেমন 'অনির্ব্বচনীয়')
		(যেমন 'অজেয়', 'অপরাজেয়')	মান	...	মাননীয়, মান্য
গণন	...	গণনীয়, গণ্য	শ্রবণ		শ্রোতব্য, শ্রবণীয়, শ্রাব্য, শ্রব্য
ত্যাগ	...	ত্যাজ্য	শোক	...	শোচনীয়, শোচ্য
দহন	...	দহনীয়, দাহ্য	বর্ণন	...	বর্ণনীয়
বিধান	...	বিধেয়	পাঠ		পঠিতব্য, পঠনীয়, পাঠ্য
পরিমাণ	...	পরিমেয়	পাক	...	পাচ্য
স্মরণ	...	স্মর্ত্তব্য, স্মরণীয়	প্রণাম	...	প্রণম্য
অপনয়ন	...	অপনেয়	প্রকাশ		প্রকাশিতব্য, প্রকাশ্য, প্রকাশনীয়
আলোচনা	...	আলোচনীয়, আলোচ্য			
গ্রহণ		গৃহীতব্য, গ্রহণীয়, গ্রাহ্য	নিন্দা	...	নিন্দনীয়
বরণ	...	বরণীয়	দোষ	...	দূষণীয়, দূষ্য
লোভ	...	লোভনীয়	জ্ঞান	...	জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়

(যে রূপগুলি দিলাম না, সেগুলির বাঙলায় প্রয়োগ নাই ; থাকিলেও, অতীব বিরল।)

(iii) **শানচ্ (মান, আন, ঈন)**-প্রত্যয়-যোগে

ক্ষয়	...	ক্ষীয়মাণ	বর্দ্ধন	...	বর্দ্ধমান
প্রবাহ	...	প্রবহমাণ*	মরণ	...	ম্রিয়মাণ

* বাঙলায় চলে ; কিন্তু সংস্কৃতমতে ভুল, শুদ্ধরূপ 'বহমান'।

বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ	বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ
যুদ্ধ	...	যুধ্যমান	আকর্ষণ	...	আকৃষ্যমাণ
আলোচনা	...	আলোচ্যমান	বিকিরণ	...	বিকীর্যমাণ
দর্শন	...	দৃশ্যমান	শয়ন	...	শয়ান
হনন	...	হন্যমান	আসন	...	আসীন

(দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিশেষণগুলি ধাতুর কর্ম্মবাচ্যের রূপ হইতে সাধিত।)

মন্তব্য ঃ 'শানচ্'-প্রত্যয়জাত 'মান'-এর 'ন'-তে হসন্ত চিহ্ন (ন্) দেওয়া চলিবে না। তদ্ধিতের 'মতুপ্'-প্রত্যয়জাত মান্-এর ন হসন্ত (বুদ্ধিমান্)।

বাঙলা কৃৎ-প্রত্যয়-যোগে

পড়া	...	পড়ন্ত (বেলা)	গাওয়া	...	গাইয়ে
ঘুম	...	ঘুমন্ত	বাড়া	...	বাড়তি
জ্বলা	...	জ্বলন্ত	পড়া	...	পড়তি
ফোটা	...	ফুটন্ত	চলা	...	চলতি
বাড়া ('বৃদ্ধি' অর্থে)		বাড়ন্ত (গড়ন)	ভাজা (বি)	...	ভাজা (মাছ)
চলা	...	চলন্ত	করা (")	...	করা (কাজ)
বলা	...	বলিয়ে	দেখা (")	...	দেখা (ছবি)
খাওয়া	...	খাইয়ে	পড়া ("—পাঠ করা)		পড়া (বই)
কওয়া	...	কইয়ে		ইত্যাদি।	

(খ) তদ্ধিত-যোগে (সংস্কৃতে)

ঋষি	...	আর্ষ	জল	....	জলীয়
জীব	...	জৈব	শাস্ত্র	...	শাস্ত্রীয়
পশু	...	পাশব	দেশ	...	দেশীয়
হেম	...	হৈম	শরৎ	...	শারদীয় (শারদ)
বস্তু	...	বাস্তব	বায়ু	...	বায়বীয়
দেব	...	দৈব	সন্ধ্যা	...	সান্ধ্য
জন্তু	...	জান্তব	হেমন্ত	...	হৈমন্তিক
নিশা	...	নৈশ	বেদ	...	বৈদিক
পৃথিবী	...	পার্থিব	পিতা	...	পৈতৃক

বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ	বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ
শরীর	...	শারীরিক	লোম	...	লোমশ
মাস	...	মাসিক	চক্ষুঃ	...	চাক্ষুষ, চক্ষুষ্মান্
বর্ষ	...	বার্ষিক	জ্ঞান	...	জ্ঞানী, জ্ঞানবান্
দিন	...	দৈনিক	শ্রী	...	শ্রীমান্, শ্রীল
মুখ	...	মৌখিক	আয়ুঃ	...	আয়ুষ্মান্
বচন	...	বাচনিক	চিৎ	...	চিন্ময়
অনুমান	...	আনুমানিক	মৃৎ	...	মৃন্ময়
ঘৃণা	...	ঘৃণিত	তপঃ	...	তপস্বী
পুষ্প	...	পুষ্পিত	যশঃ	...	যশস্বী
মাংস	...	মাংসল	মনঃ	...	মনস্বী
শ্যাম	...	শ্যামল	তেজঃ	...	তেজস্বী
পঙ্ক	...	পঙ্কিল	কৃপা	...	কৃপালু, কৃপাবান্
জটা	...	জটিল	ইহলোক	...	ঐহলোকিক
ফেন	...	ফেনিল	পরলোক	...	পারলৌকিক
দন্ত	...	দন্তুর, দন্ত্য	অগ্র	...	অগ্রিম
তালু	...	তালব্য	অন্ত	...	অন্তিম
গ্রাম	...	গ্রাম্য	ধন	...	ধনী
বন	...	বন্য	চক্র	...	চক্রী
অরণ্য	...	আরণ্য	ন্যায়	...	ন্যায্য
সূর্য্য	...	সৌর	গঙ্গা	...	গাঙ্গেয়
চন্দ্র	...	চান্দ্র	স্ত্রী	...	স্ত্রৈণ

বাঙলা তদ্ধিত-প্রত্যয়-যোগে

পশম	...	পশমী	দাম	...	দামী
পাটনা	...	পাটনাই	বেগুন	...	বেগুনী
রেশম	...	রেশমী	গোলাপ	...	গোলাপী
ঢাকা	...	ঢাকাই	রাগ	...	রাগী
বেনারস	...	বেনারসী	দাগ	...	দাগী
মাদ্রাজ	...	মাদ্রাজী	নবাব	...	নবাবী
বিলাত	...	বিলাতী	মাঠ	...	মেঠো
কাবুল	...	কাবুলী	গাঁ	...	গেঁয়ো

বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ	বিশেষ্য	হইতে	বিশেষণ
শহর	…	শহুরে	জোর	…	জোরাল
চোর	…	চোরাই	ধান	…	ধেনো
বন	…	বুনো	ঘর	…	ঘরোয়া
কোণ	…	কুণো	বালি	…	বেলে (মাটি)
পাহাড়	…	পাহাড়ে	রোগ	…	রোগা, রুগটে
জঙ্গল	…	জংলা, জংলী	ভাত	…	ভেতো
গদী	…	গদীয়ান	বুটি	…	বুটিদার (আলোয়ান)
ছুঁচ	…	ছুঁচলো	সূতা	…	সূতি
ধার	…	ধারাল	আদর	…	আদুরে
জাঁক	…	জাঁকাল	কাঁদন	…	কাঁদুনে
কাঠ	…	কেঠো	নাক	…	নাকী (সুর)
মাটি	…	মেটে	পূব	…	পূবে (হাওয়া)
দাঁত	…	দেঁতো, দাঁতাল	মেয়ে	…	মেয়েলি
ধোঁয়া	…	ধোঁয়াটে	চৈত	…	চৈতালি, চৈতিলি
তামা	…	তামাটে	ভাদর	…	ভাদুরে
পেট	…	পেটুক		ইত্যাদি।	

অ-বিশেষ্য হইতে বিশেষণের সৃষ্টি (তৎসম)

সর্ব্বনাম হইতে **বিশেষণ** : **মদীয়**, **ভবদীয়**, অস্মদীয়, ত্বদীয়, মামক, **পরকীয়**, **স্বকীয়**, যুষ্মদীয়, যদীয়, **তদীয়**, অন্যদীয়—সংস্কৃতে 'আপনি' (মধ্যমপুরুষ) বুঝাইতে 'ভবৎ' (পুং ভবান্‌, স্ত্রীং ভবতী) শব্দ সর্ব্বনামগোত্রীয়। বাঙলায় 'ভবৎ' শব্দের প্রয়োগ নাই ; কিন্তু **ভবদীয়** আছে। স্থূলাক্ষর শব্দগুলি বাঙলায় অধিক প্রচলিত।

অব্যয় হইতে বিশেষণ

অব্যয়	বিশেষণ	অব্যয়	বিশেষণ
অত্র	অত্রত্য ('অত্রস্থ' ভুল)	পশ্চাৎ	পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্ত্য
তত্র	তত্রত্য ('তত্রস্থ' ভুল)	ইহ	ঐহিক
ইদানীং	ইদানীন্তন	পরত্র	পারত্রিক
তদানীং	তদানীন্তন	অকস্মাৎ	আকস্মিক
সদা	সদাতন*, সনাতন	পুনঃপুনঃ	পৌনঃপুনিক
পুরা	পুরাতন	শশ্বৎ	শাশ্বত

* বাঙলায় চলে না।

বাক্য

দুই বা ততোধিক পদ মিলিতভাবে যদি একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তাহা হইলে ঐ পদসমষ্টিকে বাক্য বলে।

শিশু হাসিতেছে। মেয়েটি জল আনিতেছে। শ্যাম আমাকে একটি কথা বলিল —ইহাদের প্রথমটি দুই পদের এবং বাকী দুইটি দুইয়ের অধিক পদের বাক্য। এগুলি বাক্যের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ। দশ-পনর পঙ্‌ক্তির একটি অনুচ্ছেদও একটিমাত্র বাক্য অধিকার করিতে পারে।

আবার এমন বাক্যও সম্ভব, যাহার পদসংখ্যা মাত্র এক: রামকে ডাক। **কেন?** দরকার আছে। **কি?** —কেন?=কেন (রামকে ডাকব)? কি?= কি (দরকার আছে)?

এইজাতীয় ভাষণে বাক্য সপ্রকাশ নয়; তবু 'কেন? কি?'-কে বাক্যই বলিতে হয়।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অঙ্গ থাকে; একটির নাম উদ্দেশ্য, অপরটির নাম বিধেয়।

যে বস্তু বা ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হয়, সেই বস্তু বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য এবং যাহা বলা হয়, তাহাই বিধেয়।

'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—এই দুই ক্ষুদ্র বাক্যে যথাক্রমে জলকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পড়ার কথা এবং পাতাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার নড়ার কথা বলা হইয়াছে; কাজেই প্রথমটিতে 'জল' উদ্দেশ্য, 'পড়ে' বিধেয় এবং দ্বিতীয়টিতে 'পাতা' উদ্দেশ্য, 'নড়ে' বিধেয়।

বাক্যের কর্তা থাকে উদ্দেশ্য-অংশে এবং সমাপিকা ক্রিয়া থাকে বিধেয়াংশে।

উদ্দেশ্যের বিশেষণ উদ্দেশ্যের পরে বসিলে বিধেয় হইয়া থাকে। এই বিশেষণের নাম বিধেয় বিশেষণ।

চমৎকার গল্প—উদ্দেশ্য বিশেষণ।
গল্পটি **চমৎকার**—বিধেয়-বিশেষণ।

নিম্নলিখিত বাক্যাবলীর প্রথমাংশ উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়াংশ বিধেয়:

ওস্তাদজী	গান গাহিতেছেন।
ওস্তাদজী	সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতেছেন।

অর্থ ই	অনর্থের মূল।
আমাদের রবি	কবিকুলরবি।
গুল্মরাজি	জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পুষ্পিত হইয়া ফল প্রসব করে, পরে মরিয়া যায়।
তুমি	কবে যাবে ?
ফলটি	কি পাকিয়াছে ?
আমি	বললাম, 'বলিহারি, সাবাস্ পালোয়ান !'
বিদ্যালয়	বন্ধ আছে।
তুমি	আমার বুকের পাঁজর, আমার প্রাণের প্রাণ।

— দেখিলাম দ্বার বন্ধ (উদ্দেশ্য 'আমি' উহ্য)। — তোমার পিতাকে বলিও (উদ্দেশ্য 'তুমি' উহ্য)। — আসুক না একবার (উদ্দেশ্য 'সে' উহ্য)। — সে কথা না হয় না-ই তুলিলাম (উদ্দেশ্য 'আমি' উহ্য)।

উদ্দেশ্য হইবার যোগ্যতা কাহার কাহার আছে

সহজ কথায় বাক্যের কর্ত্তা হইবার অধিকার যাহার আছে, তাহাই উদ্দেশ্য হইতে পারে। বিশেষ্য, বিশেষ্যের স্থলাভিষিক্ত পদ (Noun-equivalent), সর্ব্বনাম—এই ত্রয়ীর উদ্দেশ্য হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে।

বিশেষ্যের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বিশেষণ, বাক্যাংশ, এমন কি একটি পূর্ণ বাক্যও।

(i) **বিশেষ্য ঃ রাম** স্কুলে পড়ে।

(ii) **সর্ব্বনাম ঃ সে** ক্লাসের সকলের চেয়ে ভাল।

(iii) **বিশেষণ** (বিশেষ্যভাবে) ঃ '**দীনহীন** ডাকিছে তোমায়'। **পুণ্যবান্** পুরস্কৃত হইবে। **পাপী** পাইবে শাস্তি। **মূর্খে**ও এ কথা বুঝিতে পারে।

(iv) **বাক্যাংশ** (Phrase) ঃ **ঘরে ব'সে রাজা-উজীর মারাই** বাক্যবীর বাঙালীর স্বভাব। **পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাওয়াই** বুঝি তোমার ধর্ম্ম ?

(v) **বাক্য** ঃ **এক যে ছিল রাজা**-ই সকল উপকথার গোড়ার কথা। '**জল পড়ে পাতা নড়ে**' রবিজীবনের আদিকবির প্রথম কবিতা।

বিধেয় হইবার যোগ্যতা কাহার কাহার আছে

(i) **সমাপিকা ক্রিয়া** ঃ তুমি **যাও**। আমি **থাকি**। সে **আসে**। আপনি **বলুন**।

(ii) **সংযোগমূলক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া** (সমাপিকা): ঘড়ীটি **টিক্‌টিক্ করিতেছে**। উনি **লজ্জা পেয়েছেন**। গোরুটি **জাবর কাটিতেছে**। চোর **চম্পট দিল**। কে **উঁকি মারিতেছে**? (এই উদাহরণগুলি সংযোগমূলক ক্রিয়াপদের)।

ছেলেরা **পড়িতে লাগিল**। আমি **খেতে থাকি**। তুই **দিতে থাক্**। (এগুলি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ)।

(iii) **কর্ম্মসহ (ও সম্প্রদানকারকসহ) সকর্ম্মক ক্রিয়া** (সমাপিকা): রবি **ছবি দেখিতেছে**। দাতা **অন্নহীনকে অন্ন দান করিতেছেন**। মাষ্টারমশায় **ছাত্রকে শ্রুতিলিখন লেখাচ্ছেন**। জননী **শিশুকে চাঁদ দেখাইতেছেন**।

(iv) **ক্রিয়াহীন বাক্যে উদ্দেশ্যের পরে প্রযুক্ত বিশেষণভাবাপন্ন পদ বা পদাবলী**: ছেলেটি **বুদ্ধিমান্**। রবি **কবিকুলরবি**। আশুতোষ **পুরুষসিংহ**। সুভাষ **বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তান**। আমার নীতি—**"জীবে প্রেম স্বার্থত্যাগ ভক্তি ভগবানে"**।

বাক্য-সম্প্রসারণ

'সূর্য্য হাসিতেছেন'—ইহাতে মাত্র একটি উদ্দেশ্য (কর্ত্তৃকারক) একটি বিধেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) বাক্যের ন্যূনতম প্রয়োজন সাধন করিয়াছে: 'সূর্য্য' উদ্দেশ্য, 'হাসিতেছেন' বিধেয়।

এই বাক্যটিকেই প্রসারিত বা বিবর্দ্ধিত করিয়া বলা যায়: 'দিনাধিপতি পরম-জ্যোতির্ম্ময় সহস্রলোচন সূর্য্য আপনার রশ্মিশরজালে অন্ধকারদানবের সংহারসাধন-পূর্ব্বক বিজয়গৌরবে পূর্ব্বদিগন্তে হাসিতেছেন'। উদ্দেশ্য 'সূর্য্য' এবং বিধেয় 'হাসিতেছেন' ঠিকই আছে; কেবল 'দিনাধিপতি' হইতে 'সহস্রলোচন' পর্য্যন্ত তিনটি পদ উদ্দেশ্যকে এবং 'আপনার' হইতে 'পূর্ব্বদিগন্তে' পর্য্যন্ত ছয়টি পদ বিধেয়কে প্রসারিত বা পরিপুষ্ট করিয়াছে। ফলে বাক্যটি সুদীর্ঘ অথচ সুশ্রাব্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক বাক্যেরই আয়তন এইভাবে বর্দ্ধিত করা যায়; কেবল যোগ্য পদাবলীর প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করিতে হয়।

নিম্নে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পরিবর্দ্ধিত করিবার কয়েকটি উপায় দিলাম:

উদ্দেশ্য-সম্প্রসারণ

যাহারা উদ্দেশ্যকে প্রসারিত করে, তাহারা সকলেই কর্ত্তৃকারকের পূর্ব্বে বসে।

(i) **বিশেষণ-যোগ**: **কৃষ্ণ** মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। **ভক্তিমতী** মীরা ভজন গাহিতেছেন।

(ii) **ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পদযোগঃ ছাত্রগণের** মন এখন রাজনীতিতে ডুবিয়া আছে। **আমাদের** বিদ্যালয় এবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

(iii) **সমকারক বিশেষ্য-যোগ**ঃ এগুলি প্রকৃতপক্ষে বিশেষণভাবাপন্ন বিশেষ্য। **মহারাজ** প্রতাপাদিত্য বঙ্গের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। **লঙ্কেশ্বর** রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিল। **মহারাষ্ট্রকুলতিলক** শিবাজী ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

(iv) **অসমাপিকা ক্রিয়া বা অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ-যোগ**ঃ রাম **রাগিয়া** তাহার ভাইকে মারিল। **জনগণের কৃপায় ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া** সকলেই জনগণের কথা ভুলিয়া যায়।

(v) **উক্ত উপায় চতুষ্টয়ের দুই বা ততোধিক উপায়ের একত্র সমাবেশ**ঃ **বৃন্দাবনের নয়নাভিরাম নবঘনশ্যাম নন্দনন্দন কৃষ্ণ কদম্বশাখা হইতে কালিয়-হ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কালিয়নাগের দর্প চূর্ণ করিয়া** হ্রদের জল বিষমুক্ত করিলেন।

বিধেয়-সম্প্রসারণ

(i) **সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত বিশেষণ-যোগ**ঃ অশ্ব **তীব্রবেগে** ছুটিতেছে।

(ii) **সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত বিভিন্ন কারকযোগঃ গাছ হইতে** ফল পড়িল (অপাদান)। সে ছবি আঁকিতেছে (কর্ম্ম)।

(**মন্তব্য**ঃ 'ছবি' কর্ম্মকারক, 'আঁকিতেছে' সকর্ম্মক ক্রিয়া। 'কর্ম্ম' সকর্ম্মক ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া কর্ম্মকে বিধেয়ের বিবর্দ্ধক বা প্রসারক না বলিয়া সকর্ম্মক ক্রিয়া ও কর্ম্মকে একসঙ্গে বিধেয় বলাই সঙ্গত মনে হয়।)

ছুরি দিয়া কলম কাট (করণ)। "বন্যেরা **বনে** সুন্দর, শিশুরা **মাতৃক্রোড়ে**" —সঞ্জীবচন্দ্র (অধিকরণ)। **অনাথকে** আশ্রয় দাও (সম্প্রদান)। [তুমি **আমার** 'চোখের বালি' (সম্বন্ধপদ-যোগ)]

(iii) **কর্ম্মে বিশেষণযোগ বা বিশেষণভাবাপন্ন বিশেষ্যযোগঃ বাসি** দুধ খেও না। 'খাই মোরা **পক্ক** বনফল, পান করি **স্বাদু** নদীজল'। প্রজাপুঞ্জ **তাহাদের রাজা রঘুবংশাবতংস নৃপতিশিরোমণি পরমকান্ত সৌম্যশান্ত** রামচন্দ্রকে দর্শন করিল।

(iv) **ক্রিয়াবিশেষণভাবাপন্ন পদ, পদাবলী বা বাক্যযোগঃ কার্য্যতঃ** ইহা সম্ভব নহে। **অনুগ্রহ করিয়া** আমাকে একটি চাকুরি দিন। তোমার ব্যবহারে আমি **যারপরনাই** দুঃখিত হইলাম (এখানে **যৎপরোনাস্তি**ও লেখা যায়)।

চোরাবাজারীরা **রাতারাতি** বড়লোক হইয়া যায়। চিত্রতারকার **দেখাদেখি** অনেকে স্যুতোর মত গোঁপ রাখে। **যেমন ক'রে পার** কাজ শেষ কর।

বাক্যের গুণ

বাক্যের মৌলিক গঠন এবং উদ্দেশ্য-বিধেয়রূপ দুইটি প্রধান অঙ্গের প্রসারণের দ্বারা বাক্যের সম্প্রসারণ আলোচনা করিয়া এইবার যে-সকল গুণ থাকিলে বাক্য 'বাক্য' হয় তাহাদের কথা বলিতেছি।

বাক্যমাত্রেরই গুণ তিনটি: **যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি**।

যোগ্যতা: বাক্যের অন্তর্গত পদাবলীর পারস্পরিক অর্থসম্পর্ক বুঝিতে যদি অসুবিধা না হয়, তবেই বুঝা যায় যে বাক্যে পদাবলীর **যোগ্যতা** রহিয়াছে।

অর্থাৎ পদগুলি অর্থের দিক্ দিয়া যথাযোগ্যভাবেই বাক্যে প্রযুক্ত হইয়াছে।

'জ্যেঠামহাশয় বাবার চেয়ে ছোট'—'জ্যেঠামহাশয়' উদ্দেশ্য 'বাবার চেয়ে ছোট' বিধেয়; তবু এটি বাক্য নয়, কারণ বাবার চেয়ে ছোট জ্যেঠামহাশয় কখনই হন না—এবিষয়ে তাঁহার যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে।

'চন্দ্র হিমাংশু', 'শাক্যসিংহ গৃহত্যাগ করিয়া মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন'—এগুলি **যোগ্যতা**সম্পন্ন বাক্য।

আকাঙ্ক্ষা: অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য একটি পদ উচ্চারিত হইলে (বা লিখিত হইলে) অন্য পদ শুনিতে মনের যে প্রবল বাসনা জন্মে, তাহাই **আকাঙ্ক্ষা**।

এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইলেই বাক্যার্থ সম্পূর্ণ হয়।

'তিনি সভায় আসিয়া' বলিয়া চুপ করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠিবে 'কি করিলেন?' কারণ 'আসিয়া' ক্রিয়ার ভাবের সমাপ্তি না ঘটায় মনে অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। বক্তা যেই বলিলেন 'বক্তৃতা করিলেন', বাক্যার্থ পূর্ণ হওয়ায় শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হইবে।

নিরাকাঙ্ক্ষ পদ বাক্যসৃষ্টি করিতে পারে না।

আসত্তি: পারস্পরিক অর্থসম্বন্ধে সম্বদ্ধ পদগুলিকে বাক্যে যদি যথাসম্ভব পাশাপাশি বসান হয়, বাক্যার্থ সহজেই বুঝা যায়। ইহার নাম **আসত্তি**:

'আজ সকালে তোমার ছেলে আমার কাছে আসিয়াছিল'—এই বাক্যে অর্থে সম্বদ্ধ পদযুগ্মগুলির বিন্যাস পাশাপাশি হওয়ায় অর্থবোধ সহজ হইয়াছে: 'আজ সকালে', 'তোমার ছেলে', 'আমার কাছে' আসিয়াছিল। আসত্তি এখানে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রহিয়াছে।

বাক্যটিকে এইভাবে সাজান যাক :

'কাছে ছেলে আমার সকালে তোমার আসিয়াছিল আজ'—পাগলের প্রলাপ হইয়া গেল।

বাক্যগঠনে এই গুণকয়েকটি ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত :

(i) **তৎসম শব্দের বানান বিশুদ্ধ হওয়া চাই। এদিকে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।**

অনেকে 'রবি' লিখিতে 'রবী' লেখে ; কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ' লিখিতে 'রবিন্দ্রনাথ' লিখিয়া বসে।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়'—প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ভাল করিয়া মুখস্থ করিলে, এইজাতীয় বানানভুলের সম্ভাবনা প্রায় থাকিবে না—এ উপদেশ আমি বি. এ শ্রেণীর ছাত্রগণকেও দিয়া থাকি।)

(ii) **তদ্ভব শব্দের সাহিত্যিকগণগৃহীত বহুপ্রচলিত বানানই অনুসরণ করিতে হইবে।**

'ভুল' না লিখিয়া 'ভূল' অনেকেই লেখে—ইহা ভুল। প্রচলিত বর্ণাশুদ্ধি ও তাহাদের শুদ্ধ রূপের একটি দীর্ঘ তালিকা পূর্ব্বে দিয়াছি ; সেগুলিকে মনে রাখিতে হইবে।)

(iii) **নিরর্থক শব্দযোজনা পরিহার করিতে হইবে :** 'সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় **প্রীতি ও অনুরাগ** ছিল'—'প্রীতি' অনাবশ্যক কারণ 'অনুরাগ' ঐ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

(iv) বক্তব্যের সরল প্রকাশই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার আশ্রয় লইতে হয়, কারণ মনোভাব সব সময়ে সরল পথে চলে না। এরূপ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে বাক্যের অংশগুলির বিন্যাস যেন স্বাভাবিক ও সুন্দর হয় এবং বক্তব্য যেন শ্রুতিকটু হইয়া না পড়ে—সরসতা ও প্রাঞ্জলতা রচনার একটি প্রধান গুণ। অপ্রচলিত বা স্বল্পপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ অনুচিত।

সরল প্রকাশ : সান্ধ্যসমীরণের স্নিগ্ধ স্পর্শ দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ধরিত্রীর অবসন্ন দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার করিল।

জটিল প্রকাশ : শান্তির ছদ্মবেশে আজ অশান্তির যে অগ্নি ক্ষীণ ধূমরেখায় মধ্যে মধ্যে নয়নগোচর হইতেছে, তাহা যেদিন (হয়তো অচিরেই) প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিবে, সেদিন, যদি কেহ বাঁচিয়া থাকেন, দেখিতে পাইবেন, মানুষের যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনার যত কিছু নিদর্শন চক্ষের নিমেষে ভস্মে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগ :

'দেশের জন্য যিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন, তিনি মানুষ হইলেও **নাকের নির্জর**।' এইরূপ না লিখিয়া লেখা উচিত : দেশের জন্য যিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন, তিনি মানুষ হইলেও **স্বর্গের দেবতা**।

(v) বাক্যে চলিত বাঙলা শব্দের সহিত সংস্কৃতানুগ শব্দের সমাবেশ দূষণীয়। ইহার নাম গুরুচণ্ডালী দোষ। 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ', 'ভাতভোজন', 'অন্ন খাওয়া' প্রভৃতির প্রয়োগ যেমন দোষের, 'উত্তাল তরঙ্গে তরণী ভুক করিয়া ডুবিয়া গেল' অথবা 'জননী করপদ্মসঞ্চালনে মশক খেদাইতেছেন' তেমনি দোষের। লেখা উচিত 'শবদাহ', 'মড়াপোড়ানো', 'ভাত খাওয়া', 'অন্নভোজন', 'সহসা নিমজ্জিত হইল', 'বিতাড়িত করিতেছেন'।

(vi) বাক্যে সাধুভাষার সর্ব্বনাম বা ক্রিয়াপদের সহিত চলতি বাঙলা সর্ব্বনাম বা ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দূষণীয়। 'আমি বাড়ী **আসিয়া দেখিলাম** যে বাবা **বেরিয়ে গিয়াছেন**'; **তাহাকে** বলিও যে **তার** আসিবার প্রয়োজন নাই'—এইজাতীয় প্রয়োগ চলিবে না। লিখিতে হইবে : 'আসিয়া **দেখিলাম**', '**বাহির হইয়া** গিয়াছেন', '**তাহার**'। এই প্রকারের ভুল ছাত্রগণের উত্তরপত্রিকায় প্রচুর পাওয়া যায়।

বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্যের গঠনবৈচিত্র্যের বিচারে ইহাকে তিনটি প্রকার বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে : **সরল** বাক্য, **জটিল** বাক্য ও **যৌগিক** বাক্য।

(i) **সরল** বাক্য : যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে, তাহার নাম **সরল বাক্য**।

এই প্রসঙ্গে দুইএকটি কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে। বিধেয় অংশে সমাপিকা ক্রিয়া থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে।

'ফুল ফুটিয়াছে'—সরল বাক্য : 'ফুল উদ্দেশ্য, 'ফুটিয়াছে' সমাপিকা ক্রিয়া। কিন্তু 'বঙ্গদেশ শস্যশ্যামল'—সরল বাক্য। 'বঙ্গদেশ ভারতের মুকুটমণি'—সরল বাক্য।

—ইহাদের বিধেয়াংশে সমাপিকা ক্রিয়ার উল্লেখ নাই ; প্রথম বাক্যের বিধেয় 'শস্যশ্যামল' বিধেয়-বিশেষণ এবং দ্বিতীয় বাক্যের বিধেয় 'ভারতের মুকুটমণি' বিশেষ্যরূপী কিন্তু বিশেষণভাবাপন্ন, অতএব বিধেয়-বিশেষণ। ক্রিয়াপদ **উহ্য** আছে মনে করিতে হইবে।

'বসন্তসমাগমে বনে বনে আজ বিচিত্র বর্ণের শতসহস্র ফুল ফুটিয়াছে'—সরল বাক্য।

'শীতের তুষারশীতল স্পর্শে মৃতপ্রায় বনভূমিতে বসন্তের দক্ষিণ-সমীরণের উজ্জীবন-মন্ত্রে আজ রূপে রসে গন্ধে ভরা শতসহস্র ফুল ফুটিয়াছে'—সরল বাক্য।

(ii) **জটিল বাক্য** ঃ যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্য ও তাহার উপর নির্ভরশীল এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য থাকে, তাহার নাম **জটিল বাক্য**।

অপ্রধান বাক্য ইংরেজীতে (Sub-ordinate) Clause ; আমরা ইহাকে **উপবাক্য**ও বলিতে পারি।

'যে সহে, সে রহে'—'সে রহে' প্রধান বাক্য, 'যে সহে' উপবাক্য।

'**মা লক্ষ্মী যখন কৃপা করিবেন**, তখন সব দুঃখের শেষ হইবে'। '**যার জন্যে চুরি করি**, সে-ই বলে চোর'।

যেদিন আপনার স্বার্থ বলি দিয়া, চরম দুঃখকেও দেবতার আশীর্ব্বাদ-রূপে গ্রহণ করিয়া, দেশবাসীর মঙ্গলসাধনকেই জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া বুঝিতে শিখিবে, সেইদিন পাইবে দেশমাতৃকার সেবাধিকার।

—উদাহরণ তিনটির স্থূলাক্ষর অংশগুলি **অপ্রধান বাক্য** বা **উপবাক্য** ; শেষের উদাহরণে স্থূলাক্ষর অংশটি দীর্ঘ হইলেও, বাক্য মাত্র একটি।

এইবার একই জটিল বাক্যে একাধিক অপ্রধান বাক্য দেখাইতেছি ঃ

'**মানুষ যতদিন মানুষকে ভালবাসিতে না শিখিবে, পরের উপর প্রভুত্ব করিবার স্পৃহা যতদিন তাহার হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত না হইবে, সাধুজনোচিত বাণীর আবরণে আপন অসাধু মনোবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখার হীন কৌশল যতদিন না ত্যাগ করিবে,** ততদিন বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।'

—এই জটিল বাক্যটিতে তিনটি অপ্রধান বাক্য রহিয়াছে ঃ (১) 'মানুষ···শিখিবে', (২) 'পরের······হইবে', (৩) সাধুজনোচিত······করিবে'।

অপ্রধান বাক্য তিন শ্রেণীর হইতে পারে ঃ বিশেষ্যধর্ম্মী, বিশেষণধর্ম্মী ও ক্রিয়াবিশেষণধর্ম্মী।

বিশেষ্যধর্ম্মী ঃ আমি বুঝিতে পারি না **কেমন করিয়া সে এ কাজ করিল।**

বিশেষণধর্ম্মী ঃ **যে যুক্তি তুমি দিলে,** তাহা অভ্রান্ত।

ক্রিয়াবিশেষণধর্ম্মী ঃ **রাজা যদি ম'রে যায়,** রাজ্য অচল থাকে ?

(iii) **যৌগিক বাক্য** ঃ দুই বা দুইএর অধিক স্বাধীন সরল বাক্য অব্যয়যোগে এক বাক্য সৃষ্টি করিলে, এই সৃষ্ট বাক্যটির নাম হয় **যৌগিক বাক্য**।

'তিনি সান্ত্বনা দিলেন এবং দশ টাকা সাহায্য করিলেন।' 'ইন্দ্রনাথ সভায় ছিলেন কিন্তু বক্তৃতা করেন নাই।' 'তুমি অপরাধ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে দণ্ড লইতে হইবে।' 'হরি আর মধু যাইবে।' 'একাজ করেছ, কি মরেছ।' 'তুমি মিথ্যাবাদী, কাজেই বিশ্বাসের অযোগ্য।'

—ইহাদের প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া সরল বাক্য রহিয়াছে।

'আমি গেলাম, অনেকক্ষণ ব'সেও থাকলাম ; কিন্তু দেখা হ'ল না।' —তিনটি সরল বাক্য। প্রথম দুইটির মধ্যে 'এবং' উহ্য আছে।

'তিনি ধনী, কিন্তু দয়ালু; সুতরাং অনেকেই তাঁর কাছে যায় এবং পায়ও কিছু কিছু।' —চারিটি সরল বাক্য।

মন্তব্য : জটিল ও যৌগিকের মিশ্রণে যে বাক্য গঠিত হয়, তাহাকেই আমরা **মিশ্রবাক্য** (Compound-Complex) বলিবার পক্ষপাতী।

'তুমি যদি আমাকে আসিতে বল, আমাকে আসিতেই হইবে ; কিন্তু আসিলে যে আমার প্রভূত ক্ষতি হইবে তাহা তোমাকে আবার বলিতেছি।'

—দুইটি জটিল বাক্য 'কিন্তু'-যোগে একটি **মিশ্র**বাক্যে পরিণত হইয়াছে। সাহিত্যে ও বক্তৃতায় এইজাতীয় বাক্যের আধিক্য আকে।

বাক্যের রূপান্তরীকরণ

যে-কোন প্রকারের বাক্যকে অন্যপ্রকারে প্রবর্তিত করা যায়, **যদি তাহার মধ্যে রূপান্তরের যোগ্য উপাদান থাকে**।

'দরিদ্রকে সকলে উপেক্ষা করে'—একটি **সরল** বাক্য। এখানে 'দরিদ্র' = দরিদ্র ব্যক্তি ; কাজেই 'দরিদ্র'-র স্থলে বলা চলে 'যে ব্যক্তি দরিদ্র'। এখন যদি বলি 'যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহাকে সকলে উপেক্ষা করে', বাক্যটি **জটিল** হইয়া যায় এবং ইহার অপ্রধান বাক্য হয় '**যে ব্যক্তি দরিদ্র**'। দেখা যাইতেছে যে 'দরিদ্রকে'-র মধ্যে অপ্রধান বাক্য-নির্মাণের শক্তি রহিয়াছে অর্থাৎ **সরল বাক্যটিতে জটিল বাক্যে রূপান্তরের উপাদান রহিয়াছে**। কিন্তু, সরল বাক্যে 'রাম দরিদ্র'—ইহার মধ্যে রূপান্তরের উপাদান নাই বলিয়া ইহাকে জটিল করা চলে না। জোর করিয়া করিতে গেলে বলিতে হয় 'রাম এমন অবস্থাপন্ন যাহাকে লোকে দরিদ্র বলে' ; কিন্তু ইহা হাস্যাস্পদ, কারণ অবাঙলা।

সরল বাক্য : 'আমার নিষেধসত্ত্বেও সে চলিয়া গেল।'

যৌগিক বাক্য : 'আমি নিষেধ করিলাম, তথাপি সে চলিয়া গেল।'

—এখানে 'সত্ত্বেও'-র মধ্যে 'তথাপি'-র ভাব রহিয়াছে বলিয়া রূপান্তর সম্ভব হইয়াছে।

যৌগিক বাক্য : সে ধনী, কিন্তু হৃদয়বান্।

সরল বাক্য : ধনী হইলেও সে হৃদয়বান্।

—এখানে 'কিন্তু'-র অর্থ-বলে যৌগিক সরল হইয়াছে।

যৌগিক বাক্য : রাম ও লক্ষ্মণ বনে গেলেন।

সরল বাক্য : সলক্ষ্মণ রাম বনে গেলেন।

—ঠিক হইল না ; কারণ, 'সহ' অর্থ যৌগিক বাক্যটিতে নাই। তবু কষ্টেস্বষ্টে চলিতে পারে। কিন্তু 'আমেরিকা ও রাশিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে'—সরল বাক্যে পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।

বাক্যের অন্তর্গত সমাসবদ্ধ পদ, অসমাপিকা (বা সমাপিকা) ক্রিয়া, কৃৎ বা তদ্ধিত-প্রত্যয়ের অর্থ, অব্যয়ের অর্থ প্রভৃতিকে রূপান্তরের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সমাসবদ্ধ পদ : 'ছাত্রাবস্থায়' তখন একবার দিল্লী গিয়াছিলাম। (সরল)
'যখন ছাত্র ছিলাম', তখন একবার দিল্লী গিয়াছিলাম। (জটিল)

অসমাপিকা ক্রিয়া : বাড়ি 'আসিয়া' খাইতে বসিলাম। (সরল)
বাড়ি 'আসিলাম' ও খাইতে বসিলাম। (যৌগিক)

সমাপিকা ক্রিয়া : উপরের উদাহরণ উল্টাইয়া লইলেই বুঝা যাইবে।

কৃৎ-প্রত্যয়ের অর্থ : 'মুমূর্ষু' ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়া লাভ কি ? (সরল)
'যে ব্যক্তি মরিতে বসিয়াছে', তাহাকে ঔষধ দিয়া লাভ কি ? (জটিল)

তদ্ধিত-প্রত্যয়ের অর্থ : 'বৈদেশিক' দ্রব্যের উপর করস্থাপন উচিত।
'যে-সকল দ্রব্য বিদেশে প্রস্তুত', তাহাদের উপর করস্থাপন উচিত।

অব্যয়ের অর্থ : তাহার দণ্ড হইল, 'কারণ' সে অপরাধী।
অপরাধের 'জন্য' তাহার দণ্ড হইল।

সর্ব্বত্র এইভাবে বিচার করিয়া বাক্যের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কঠিন বলিয়া মনে হইলেও অভ্যাসে ইহা সহজ হইয়া আসিবে।

রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :

(i) নাস্তিককে কেহ বিশ্বাস করিও না। (সরল)
যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিও না। (জটিল)

(ii) যখন তুমি আসিবে, আমার জন্য একখানি পুস্তক আনিবে। (জটিল)
আসিবার সময় আমার জন্য একখানি পুস্তক আনিবে। (সরল)

(iii) তুমি যদি সত্য কথা বল, তোমাকে ক্ষমা করিব ((জটিল)
সত্য কথা বলিলে তোমাকে ক্ষমা করিব। (সরল)

(iv) লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাম বনগমন করিলেন। (সরল)
রাম বনগমন করিলেন ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইলেন। (যৌগিক)

(v) উপরে মেঘ নাই, অথচ জল পড়িল। (যৌগিক)—ক. বি. ১৯৪১
বিনা মেঘে জল পড়িল
বা
উপরে মেঘ না থাকাসত্ত্বেও জল পড়িল। } (সরল)

(vi) সেবাপরায়ণ ব্যক্তি অন্যের দুঃখ লাঘব করে, আপনি পরমানন্দ ভোগ করে। (যৌগিক)—ক. বি. ১৯৪১
সেবাপরায়ণ ব্যক্তি অন্যের দুঃখ লাঘব করিয়া আপনি পরমানন্দ ভোগ করে। (সরল)

(vii) যে যাহাকে ভালবাসে, সে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়া কাতর হইতে পারে না। (জটিল)—ক. বি. ১৯৪১
আপন প্রিয়পাত্রের শ্রী দেখিয়া কেহ কখনও কাতর হইতে পারে না। (সরল)

(viii) মহারাজ, আপনার জ্যারোপিত বাণ প্রতিসংহার করুন। (সরল)
মহারাজ, যে বাণ আপনার জ্যাতে আরোপিত করিয়াছেন, তাহা প্রতিসংহার করুন। (জটিল)

(ix) বহমান জল রুদ্ধ জল অপেক্ষা উপকারী। (সরল)
যে জল প্রবাহিত হয় তাহা রুদ্ধ জল অপেক্ষা উপকারী। (জটিল)

(x) যে বিপদ্ অবশ্যই ঘটিবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। (জটিল)
অবশ্যম্ভাবী বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। (সরল)

(xi) রামচন্দ্র অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। (সরল)
রামচন্দ্র প্রজাকে অপত্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন ও সেইভাবে তাহাদের পালন করিতেন। (যৌগিক)

(xii) জিজ্ঞাসু ছাত্রই সাধারণ ছাত্র অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করেন। (সরল)
যে ছাত্র জানিতে ইচ্ছুক তিনি সাধারণ ছাত্র যেরূপ উন্নতি লাভ করেন তাহা অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করেন। (জটিল)

(xiii) চিত্রখানি নিপুণ শিল্পীর বলিয়া মনে হয়। (সরল)
চিত্রখানি দেখিলে মনে হয় যে ইহা নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত। (জটিল)

(xiv) সন্ন্যাসী পার্থিব সুখকে সাধনার বাধা মনে করেন এবং এই কারণে পার্থিব সুখের প্রতি তাঁহার আসক্তি থাকে না। (যৌগিক)

পার্থিব সুখকে সাধনার বাধা মনে করায় ইহার প্রতি সন্ন্যাসীর আসক্তি থাকে না। (সরল)

এইবার **অনেকগুলি সরল বাক্যকে একটিমাত্র সরল বাক্যে** রূপান্তরিত করিয়া দেখাইতেছি ঃ

'দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র অশেষগুণশালী ছিলেন। দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়াছিলেন। এইজন্য রাণী কৈকেয়ী রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ী রামচন্দ্রের বিমাতা ছিলেন।' —দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রবেশিকা, ১৯৪০)

একটিমাত্র সরল বাক্য ঃ

রঘুবংশীয় অযোধ্যারাজ দশরথ রামচন্দ্রের বিমাতা রাণী কৈকেয়ীর অনুরোধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অশেষগুণশালী রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়াছিলেন।

নীচের বাক্যগুলি সকলেই সরল নয়; তবু ইহাদিগকে মাত্র একটি সরল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় ঃ

'রামহরির মৃত্যু হইল। তাঁহার প্রভূত অর্থ ও প্রচুর বিষয়সম্পত্তি ছিল। রামধন তাঁহার পুত্র। পিতার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই তাহার হাতে পড়িল। সে ছিল মূর্খ ও অমিতাচারী। অল্পকালের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি সে উড়াইয়া দিল।'

—ইহাতে ছয়টি বাক্য রহিয়াছে। বাক্যগুলির মধ্যে প্রথমটি **সরল**, দ্বিতীয়টি **যৌগিক**, তৃতীয়টি **সরল**, চতুর্থটি **জটিল**, পঞ্চমটি **যৌগিক**, এবং ষষ্ঠটি **সরল**।

ইহাদের **একটিমাত্র সরল বাক্যে রূপান্তর ঃ**

'রামহরির মৃত্যুর পর তাঁহার মূর্খ ও অমিতাচারী পুত্র রামধন তাঁহার প্রভূত অর্থ ও প্রচুর বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইয়া অল্পকালের মধ্যেই সব উড়াইয়া দিল।'

নিম্নের বাক্যটি জটিল। ইহাকে ছয়টি সরল বাক্যে ভাঙিয়া দিতেছি ঃ

'বিশ্বহিতে অনুপ্রাণিত, নিয়তধর্ম্মচিন্তা-নিরত, জ্ঞানপিপাসু নবীন যুবক-সন্ন্যাসী ভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে এমন বিনয়নম্র মধুরভাবে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।' —ক. বি. প্র. ১৯৩০

(১) জ্ঞানপিপাসু নবীন যুবক-সন্ন্যাসী নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (২) তিনি ছিলেন বিশ্বহিতে অনুপ্রাণিত। (৩) তিনি নিয়ত ধর্ম্মচিন্তায় নিরত

থাকিতেন। (৪) তাঁহার ভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তি ও বিনয়নম্র মধুরভাব সকলেই দর্শন করিয়াছিলেন। (৫) দেখিবামাত্র দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। (৬) সে প্রীতিরস বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

বাক্‌সংহতি

যেখানে একটিমাত্র সাধিত শব্দকে পদে পরিণত করিয়া বাক্যে প্রয়োগ করিলে বাক্য সুন্দর ও সুবোধ্য হয়, সেখানে অনাবশ্যকভাবে পদের সংখ্যাবাহুল্য সৃষ্টি করা অসঙ্গত। অল্পকথায় অধিক ভাবের প্রকাশই রচনার প্রধান গুণ এবং এই কৌশল সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করিয়া যিনি অনায়াসে প্রয়োগ করিতে পারেন, শিল্পীহিসাবে তাঁহার আসন উচ্চে। এইপ্রকার বাক্‌সংহতি বা 'বাচংযমতা' (আচার্য্য সুনীতিকুমার এই শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন—শব্দটি বাক্‌সংহতির যেমন একটি চমৎকার উদাহরণ, তেমনি পারিভাষিক শব্দরূপেও অতুলনীয়) শুধু সময়ের অপব্যবহার হইতেই বক্তা বা লেখককে মুক্তি দেয় না, ভাষাকে গাম্ভীর্য্যসুন্দর করিয়া তুলে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে বাচংযমতার ফলে বক্তব্য যেন শ্রুতিকটু হইয়া না পড়ে।

'ক্ষুধায় কাতর এবং পিপাসায় পীড়িত হইয়া তিনি এমন জল পান করিলেন যাহা পানের অযোগ্য এবং এমন বস্তু ভোজন করিলেন যাহা খাদ্যের অনুপযুক্ত ; ফলে বিষের ক্রিয়ায় তিনি জীবিত থাকিতেই মৃতের মত হইয়া পড়িলেন'—ইহার অর্থ সহজেই বুঝা যায় ; কিন্তু ভাষা অতীব শিথিল হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ জমাট বাঁধিতে পারে নাই। ইহাকে যদি এইভাবে বলা হয় ঃ

'**ক্ষুধাতুর** ও **পিপাসার্ত্ত** হইয়া তিনি **অপেয়** বারি পান এবং **অখাদ্য** বস্তু ভোজন করিলেন ; ফলে **বিষক্রিয়ায়** তিনি **জীবন্মৃতবৎ** হইয়া পড়িলেন'।

—বক্তব্য সংক্ষিপ্ত, সংহত, সুন্দর ও গম্ভীর হইয়া উঠে। এই উদাহরণের স্থূলাক্ষর শব্দগুলি তৎসম। খাঁটি বাঙলাতেও এইজাতীয় সংহতির উপযোগিতা দেখাইতেছি ঃ

'আমাদের পাড়ার যে জামাইটি শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে, সেই মিশির মত কালো জামাইটি আটপহর পরা যায় এমন একখানি কাপড় পরিয়া চারিটি রাস্তা যেখানে মিলিয়াছে সেইখানে আসিয়া, চলিতেছে এমন একখানি ট্রামে উঠিতে গিয়া, হাত দিয়া ধরিবার দণ্ডটি ধরিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল'

—বাক্যটি এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, দানা বাঁধিতে পারে নাই। কিন্তু যদি বলি ঃ 'আমাদের পাড়ার **মিশকালো ঘরজামাইটি** একখানা **আটপৌরে** কাপড় পরিয়া রাস্তার **চৌমাথায়** আসিয়া একখানি **চলন্ত** ট্রামে উঠিতে গিয়া **হাতল** ধরিতে না [illegible] পড়িয়া গেল'—প্রকাশটি আঁটোসাঁটো অথচ সুন্দর হইয়া উঠে।

কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাস জানা থাকিলে বাক্‌সংহতি বা বাচংযমতা সহজসাধ্য হয়।

কৃৎ-সাহায্যে ঃ যাহা করা উচিত—করণীয়, কর্তব্য।

তদ্ধিত-সাহায্যে ঃ ব্যাকরণ জানেন যিনি—বৈয়াকরণ।

সমাস-সাহায্যে ঃ বনে বাস করে যে—বনবাসী ;
শোভন রূপ যে নারীর—সুরূপা।

বাচংযমতার **বাক্‌-প্রসার ঃ**

কৃৎ-অর্থ ঃ দৃশ্য—যাহা দেখা যায়।
দুর্লভ—যাহা দুঃখে লাভ করিতে হয়।

তদ্ধিত-অর্থ ঃ শাক্ত—যাহার উপাস্য দেবতা শক্তি।
ঐতিহাসিক—যিনি ইতিহাস জানেন বা লেখেন।

সমাসের ব্যাসবাক্য ঃ অজাতশত্রু—যাহার শত্রু জন্মে নাই।
পরোপকারী—যে পরের উপকার করে।

বাক্‌সংহতি ও বাক্‌-প্রসারের কৌশল জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে এবং সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করিতে প্রচুর সাহায্য করিবে।

নিম্নে বাক্‌সংহতি বা 'বাচংযমতা'র কতকগুলি উদাহরণ দিলাম ঃ

(ক) কৃদন্ত

যাহা উড়িয়া যাইতেছে—উড্ডীয়মান
যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে উদ্যত—মুমূর্ষু
যুদ্ধ করে যে—যোদ্ধা
যিনি মুক্তি ইচ্ছা করেন—মুমুক্ষু
জয় করিবার ইচ্ছা—জিগীষা
উপকার করিবার ইচ্ছা—উপচিকীর্ষা
হনন করিবার ইচ্ছা—জিঘাংসা
গোপন করিবার ইচ্ছা—জুগুপ্সা
লাভ করিবার ইচ্ছা—লিপ্সা
তরিবার ইচ্ছা—তিতীর্ষা
পান করিবার ইচ্ছা—পিপাসা
ভোজন করিবার ইচ্ছা—বুভুক্ষা
জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা

যে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক—অনুসন্ধিৎসু
যাহার শুনিবার ইচ্ছা আছে—শুশ্রূষু
যাহার জয় করিবার ইচ্ছা আছে—জিগীষু
যাহার জানিবার ইচ্ছা আছে—জিজ্ঞাসু
যাহা বলা হইয়াছে—উক্ত
যাহা বলা হইবে—বক্ষ্যমাণ
যাহা প্রবাহিত হইতেছে—প্রবহমাণ*
যে পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছে—
রোরুদ্যমান
যাহা " " জ্বলিতেছে—জাজ্বল্যমান
" " " দীপ্তি পাইতেছে—দেদীপ্যমান
" " " দুলিতেছে—দোদুল্যমান
যে অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক—অনুচিকীর্ষু
যে (কষ্ট) সহিতে পারে—সহিষ্ণু

* বাঙলায় চলে ; সংস্কৃতে ভুল।

যাহা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না—অনির্ব্বচনীয়
যাহা নিবারণ করা যায় না—অনিবার্য্য
যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে—পণ্ডিতম্মন্য
যাহা সহজে হজম করা যায় না—দুষ্পাচ্য
যাহার নাশ আছে—নশ্বর
যাহা ভাঙিয়া যায়—ভঙ্গুর
যাহা জয় করা হইয়াছে—জিত
যাহা পূর্ব্বে ভস্ম ছিল না, এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে—ভস্মীভূত
যাহা ঘটিবেই ঘটিবে—অবশ্যম্ভাবী
যাহা চিবাইয়া খাইতে হয়—চর্ব্ব্য
যাহা চুষিয়া খাইতে হয়—চুষ্য
যাহা চাটিয়া খাইতে হয়—লেহ্য
যাহা পান করা হয়—পেয়
যাহা ভোজন করা হয়—ভোজ্য
পর (শত্রু)-কে তাপ (দুঃখ) দেয় যে—পরন্তপ
যাহা মর্ম্মকে পীড়া দেয়—মর্ম্মন্তুদ
সবই সহ্য করেন যিনি (স্ত্রী)—সর্ব্বংসহা
বসু (ধন) ধারণ করেন যিনি (স্ত্রী)—বসুন্ধরা
প্রিয় বাক্য বলেন যিনি (স্ত্রী)—প্রিয়ংবদা

যেখানে সহজে যাওয়া যায় না—দুর্গম
যে কাজ সহজে করা যায় না—দুষ্কর
যে নারী সূর্য্যের মুখ দেখে নাই—অসূর্য্যম্পশ্যা
ভিক্ষা করে যে—ভিক্ষু, ভিক্ষুক
ত্রাণ করে যে—ত্রাতা
হত্যা করে যে—হন্তা
বাড়িতেছে যাহা—বর্দ্ধমান
যাহা দেখা যাইতেছে—দৃশ্যমান
যাহা আলোচিত হইতেছে—আলোচ্যমান
যাহা ভাবী কালে হইবে—ভবিষ্যৎ
যাহা করা উচিত—কর্ত্তব্য, করণীয়
যাহা চিন্তা করা যায় না—অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়
মিষ্ট ভাষা বলে যে—মিষ্টভাষী
যাহা কাঁপিতেছে—কম্পমান
যাহা লম্বিত রহিয়াছে—লম্বমান
যাহা ভাবা যায় না—অভাবনীয়
পরের উপকার যে স্বীকার করে না—অকৃতজ্ঞ
যে উপকারীর উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে—কৃতঘ্ন
যে দুইবার জন্মগ্রহণ করে—দ্বিজ

(খ) তদ্ধিতান্ত

যিনি দর্শন জানেন—দার্শনিক
যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন—নৈয়ায়িক
যিনি বেদান্ত জানেন—বৈদান্তিক
যিনি বিজ্ঞান জানেন—বৈজ্ঞানিক
দশরথের পুত্র—দাশরথি
সুমিত্রার পুত্র—সৌমিত্রি
যাহা পঞ্চভূতে গঠিত—পাঞ্চভৌতিক
(যাহার বয়স) সর্ব্বাপেক্ষা অল্প—কনিষ্ঠ
(যাহার বয়স) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—জ্যেষ্ঠ

প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম
যিনি স্ত্রীর বশীভূত—স্ত্রৈণ
বিদেশ হইতে আগত—বৈদেশিক
যাহা লোকে অবিদিত—অলৌকিক
মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত—মৃন্ময়
হিরণ্যদ্বারা নির্ম্মিত—হিরণ্ময়
মৃতের তুল্য—মৃতকল্প
ছাত্রের তুল্য—ছাত্রকল্প
পুত্রের তুল্য—পুত্রকল্প

পৃথিবীতে জাত—পার্থিব
আত্মা-সম্বন্ধীয়—আধ্যাত্মিক
পরলোক-সম্বন্ধীয়—পারলৌকিক
ভারতে জাত—ভারতীয়
রাবণের পুত্র—রাবণি
পিতার পিতামহ—প্রপিতামহ
যাহা যুক্তিসঙ্গত নয়—অযৌক্তিক
যিনি বিষ্ণুর উপাসনা করেন—বৈষ্ণব
যাহা চক্ষু দিয়া দেখা যায়—চাক্ষুষ
গোরুর পুরীষ—গোময়

সমাসগত

পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত—আপাদমস্তক
কর্ণ পর্য্যন্ত বিশ্রান্ত—আকর্ণবিশ্রান্ত
জানু পর্য্যন্ত লম্বিত (বাহু)—আজানুলম্বিত
সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত—আসমুদ্রহিমাচল
যাহার অভিমান নাই—নিরভিমান
যাহার মমতা নাই—নির্ম্মম
যাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—বিপত্নীক
যাহা খুব দীর্ঘ নহে—অনতিদীর্ঘ
যাহা খুব শীতলও নহে, খুব উষ্ণও নহে—নাতিশীতোষ্ণ
যাহার শোভা নাই—শোভাহীন
কি করিতে হইবে তাহা যে বুঝিতে পারে না—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়
যে পরিণাম বুঝিতে (দেখিতে) পারে না—অপরিণামদর্শী
যে বিদেশে থাকে না—অপ্রবাসী
যাহার ঋণ নাই—অনৃণী (কিন্তু **'অঋণী'** বাঙলায় চলে, সংস্কৃতেও চলে)
যে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে—পরপক্ষাবলম্বী
যাহা সরোবরে জন্মে—সরোজ, সরসিজ
যাহা পূর্ব্বে ছিল (এখন নাই)—ভূতপূর্ব্ব
যাহার উপায় নাই—নিরুপায়
যাহার অন্য উপায় নাই—অনন্যোপায়
ঘৃতের অল্প গন্ধ যাহাতে—ঘৃতগন্ধি
পূতি গন্ধ যাহাতে—পূতিগন্ধি
শুভ্র দন্ত যাহার (স্ত্রী)—শুভ্রদন্তা, শুভ্রদন্তী
সুন্দর কেশ যাহার (স্ত্রী)—সুকেশা, সুকেশী
যাহার কোথাও ভয় নাই—অকুতোভয়
যাহার অনেক দেখাশুনা আছে—বহুদর্শী
যে ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কাজ করে না—অবিমৃষ্যকারী
সকল পদার্থ ভক্ষণ করে যে—সর্ব্বভুক্
যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই—অদৃষ্টপূর্ব্ব
যাহা পূর্ব্বে চিন্তা করা যায় নাই—অচিন্তিতপূর্ব্ব
যে ক্ষমার যোগ্য—ক্ষমার্হ
পদ্মের গন্ধ যাহাতে—পদ্মগন্ধি ('পদ্মগন্ধ'ও হয়)
যাহা জলে ও স্থলে চরে—উভচর (উভয়চর)
যাহা আকাশে (খে) চরে—খেচর
অল্প বয়স যাহার—অল্পবয়স্ক
এক গুরুর শিষ্য যাহারা—সতীর্থ (বাঙলায় চলে ; সংস্কৃতে 'সতীর্থ্য')
যে সত্যকথা বলে—সত্যবাদী
নাভিতে পদ্ম যাহার—পদ্মনাভ
কমলের মত অক্ষি যাহার—কমলাক্ষ
সু (শোভন) ধনুঃ যাহার—সুধন্বা
পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করে যে—জাতিস্মর
যাহার কিছুই নাই—অকিঞ্চন

যাহার স্বামী (ভর্ত্তা) বিদেশে (প্রবাসী) —প্রোষিতভর্তৃকা
যে আত্মহত্যা করে—আত্মঘাতী
যে পিতাকে হত্যা করিয়াছে—পিতৃহন্তা, পিতৃঘাতী
যে নারী পতিকে হত্যা করিয়াছে— পতিহন্ত্রী, পতিঘাতিনী
যে পরের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়— ছিদ্রান্বেষী
যাহার নাম কেহ জানে না—অজ্ঞাতনামা
যে চিরস্থায়ী নহে—অনিত্য, অশাশ্বত
যারা এক মাতার গর্ভে জন্মিয়াছে—সহোদর
যে ব্যক্তি দিনে একবার মাত্র আহার করে —একাহারী
যে মাছমাংস খায় না—নিরামিষাশী
যাহা বিনা যত্নে উৎপন্ন হয়—অযত্নসম্ভূত
যাহা স্বয়ং উৎপন্ন হয়—স্বয়ম্ভূ, স্বয়ংভূ
যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন—যুধিষ্ঠির
অর্থ নাই যাহার—নিরর্থক
যাহার দুইপ্রকার অর্থ—দ্ব্যর্থক
যিনি অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—অগ্রজ
যাহা মর্ম্ম স্পর্শ করে—মর্ম্মস্পর্শী
সঙ্গে সঙ্গে যাহার বুদ্ধি যোগায়— প্রত্যুৎপন্নমতি
যাহা সম্পন্ন করিতে বহু ব্যয় হয়—ব্যয়বহুল
বিনা ব্যয়ে যাহা হয় না—ব্যয়সাপেক্ষ
বিনা আয়াসে (পরিশ্রমে) যাহা লাভ করা যায়—অনায়াসলভ্য
পত্নীর সহিত—সপত্নীক
পুত্রের সহিত—সপুত্রক
যিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই—অকৃতদার
পথের রাজা—রাজপথ
অপত্য হইতে বিশেষ (পার্থক্য) না করিয়া —অপত্যনির্ব্বিশেষে
যাহা দেখা যায় না—অদৃশ্য
যাহা দেখা যায় নাই—অদৃষ্ট
যাহা শুনা যায় না—অশ্রাব্য
যাহা শুনা যায় নাই—অশ্রুত
যাহা পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই— অশ্রুতপূর্ব্ব
যাহা বলা যায় না—অবক্তব্য, অকথ্য
যাহা বলা হইয়াছে—উক্ত, কথিত
যখন অত্যন্ত দুঃখে ভিক্ষা পাওয়া যায়— দুর্ভিক্ষ
শিরে ধারণ করিবার যোগ্য—শিরোধার্য্য
যাহার অন্য কোন বিষয়ে মন নাই— অনন্যমনা
অন্ন ভক্ষণ করিয়া যে প্রাণধারণ করে— অন্নগতপ্রাণ

বাক্‌সংহতির কয়েকটি **বিশেষ উদাহরণ**

যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায়—ওষধি
যে নারীর স্বামী মৃত—বিধবা
যে নারী নিঃসন্তান (সন্তান হয় নাই)—বন্ধ্যা
কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত—বন্ধুর, উচ্চাবচ, উদ্‌ঘাতী
যে ঈশ্বরে বা পরলোকে বিশ্বাস করে না— নাস্তিক
যে কন্যা অবিবাহিতা—কুমারী
অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা—প্রত্যুদ্‌গমন
যে বিদেশে থাকে—প্রবাসী
ঘর্ষণ-জাত বা পেষণ-জাত গন্ধ—পরিমল
যে বৃহৎ বৃক্ষে ফল হয়, ফুল হয় না— বনস্পতি
পরিব্রাজকের ভিক্ষা—মাধুকরী

বিভিন্ন প্রাণীর বা অপ্রাণীর ধ্বনি

সিংহের	নাদ	ভ্রমরের	গুঞ্জন
হস্তীর	বৃংহণ, বৃংহতি	নূপুরের	নিক্কণ
অশ্বের	হ্রেষা	ধনুকের	টঙ্কার
ময়ূরের	কেকা	বীণার	ঝঙ্কার
বিহঙ্গের	কাকলী	বীরের	হুঙ্কার

কর্কশ ধ্বনি—ক্রেঙ্কার ("কাংস্য-ক্রেঙ্কার"—রবীন্দ্রনাথ ; গভীর ধ্বনি—মন্দ্র ("জীমূত-মন্দ্র—মধুসূদন) ; অব্যক্ত মধুর ধ্বনি—কলতান, কলধ্বনি (এগুলি বাঙলায় বহুপ্রযুক্ত, যদিও মূল শব্দটি কল)।

খাঁটি বাঙলায় বাক্সংহতি

বাড়ীর মালিক—বাড়ীওয়ালা
যাহার তালবোধ নাই—বেতালা
খাওয়ার জন্য যে খরচ—খাইখরচ
যাহাতে কোন ভেজাল নাই—নির্ভেজাল, নিভেজাল (খাঁটি)
কম বয়স যাহার—কমবয়সী
নিজেকে যে বড় মনে করে—হামবড়া
যাহার মেজাজ খারাপ—বদমেজাজী
যাহার চুল পাকিয়াছে—পাকাচুলো
যাহার খরচ নাই—নিখরচে
চোখ খাইয়াছে যে মেয়ে—চোখখাকী (এমনি—গতরখাকী, শতেকখাকী)
শতেক খোয়ার (কলঙ্ক) যে মেয়ের—শতেকখোয়ারী
যে মেয়ের ছেলেমেয়ে নাই—আঁটকুড়ী
গয়ার অধিবাসী—গয়ালী
ভোজপুরের অধিবাসী—ভোজপুরী
কাতর না হইয়া—অকাতরে
মুখ (কথা) মিষ্টি যার—মিষ্টিমুখো
বিড়ালের মত চোখ যে মেয়ের—বিড়াল-চোখী (এমনি—কটাচোখী, পিতলচোখী)

যে মেয়ের কপাল উঁচু—উঁচকপালী
রেশমে নির্ম্মিত—রেশমী (এমনি—পশমী, সূতী)
যে (পশু) কথা বলিতে পারে না—অবোলা
যে অনেকরকম বুলি বলিতে পারে—হরবোলা
ফেরী করে যে—ফেরীওয়ালা
যে গাছ অপর গাছের উপর জন্মে—পরগাছা
ঘুষিতে ঘুষিতে মারামারি—ঘুষোঘুষি (এমনি—হাতাহাতি, চুলোচুলি)
জল মিশানো (দুধ)—জ'লো (দুধ)
কদমের মত চেহারাওয়ালা মিঠাই—কদমা
বালির সহিত মিশ্রিত—বেলে
যাহা কাজের নয়—অকেজো
যে জামাই শ্বশুরের ঘরে থাকে—ঘরজামাই
পরের ভাতে যে পালিত হয়—পরভাতী
পরের ঘরে যে থাকে—পরঘরী
(প্রবাদ : 'পরভাতী ভাল, তবু পরঘরী ভাল নয়'।)
মাটি দিয়া তৈয়ারী—মেটে
ঢাকায় প্রস্তুত—ঢাকাই

বেনারসে প্রস্তুত—বেনারসী
ঝগড়া করা যাহার স্বভাব—ঝগড়াটে
সাপ খেলানো বৃত্তি যাহার—সাপুড়ে
সেতারে দক্ষ—সেতারী
তবলায় দক্ষ—তবলচি
খোলে দক্ষ—খুলে
হিসাব নাই যাহার—বেহিসাবী
গাঁজা খাওয়া অভ্যাস যাহার—গাঁজাখোর
(এমনি—আফিঙখোর, চণ্ডুখোর, গুলিখোর)
চালান-সম্বন্ধীয়—চালানী (কারবার)
যে কুস্তি করে—কুস্তিগীর
যে পাহারার কাজ করে—পাহারাওয়ালা
যে তীর নিক্ষেপ করে—তীরন্দাজ
(এমনি—গোলন্দাজ)
খুন করিয়াছে যে—খুনে
যাহাতে নুন দেওয়া হয় নাই (বা অল্প হইয়াছে)—আলুনে
যাহা ভাল সিদ্ধ হয় নাই—আসিদ্ধ (ভাত)
শহরে বাস করে যে—শহুরে
পাড়াগাঁয়ে বাস করে যে—পাড়াগেঁয়ে
যাহা দুইবার ফলে—দোফলা
দুই জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন—দো-আঁশলা
মিশির মত কালো—মিশকালো
যে কিছুতেই ছাড়ে না—নাছোড়বান্দা
যাহা পড়িয়া যাইতেছে—পড়ন্ত
যাহা বাড়িতেছে—বাড়ন্ত (গড়ন)
(কিন্তু 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' = ঘরে চাল নাই)
জমার চেয়ে খরচ বেশী—ফাজিল
তিন মোহানার মিলন যেখানে—তেমোহানী
চারি রাস্তার মিলন যেখানে—চৌমাথা
চৌকি (পাহারা) দেয় যে—চৌকিদার
কালোবাজার-সম্বন্ধীয়—কালোবাজারী

চোরা কারবার করে যে—চোরাকারবারী
মাগ্‌গির (মহার্ঘতার) জন্য যে ভাতা দেওয়া হয়—মাগ্‌গিভাতা
(বিবাহে) শয্যা তোলার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়—শয্যাতোলানী
যাহার (বিশেষতঃ যে মেয়ের) বিবাহ হয় নাই—আইবুড়
কপাল পুড়িয়াছে যাহার—পোড়াকপালী (মেয়ে)
গানে নৈপুণ্য আছে যাহার—গাইয়ে (এমনি —বাজিয়ে, নাচিয়ে, বলিয়ে, কইয়ে, লিখিয়ে)
যে পথ পায়ে চলিয়া যাইতে হয়—পায়ে-চলা (পথ)
চুমা খাওয়ার মতন করিয়া তরলবস্তুর পান —চুমুক
গোলাপের মতন রঙ যাহার—গোলাপী
(এমনি—বাদামী, আসমানী, জাফরানী, বেগুনী, খয়েরী)
(বড় বড) দাঁত যাহার—দেঁতো
গাছে থাকে যে—গেছো
হাট করে যে—হাটুরে
কাঠ কাটে যে—কাঠুরে
মেঘে ঢাকা (দিন)—মেঘলা
যাহাকে চোখে চোখে রাখা হয়—নজরবন্দী
যে সব জানে—সবজান্তা
যে জমিতে দুইবার ফসল হয়—দো (দুয়ো)-জমি
যাহার এখনও বালকত্ব কাটে নাই—নাবালক (ইহার বিপরীত—সাবালক)
যে সামলাইতে পারে না—অসামাল
আটপ্রহর যাহা পরা হয়—আটপৌরে
যে আপনার রঙ লুকায়—বর্ণচোরা

ভাবের বিচিত্র প্রকাশ

পূর্ব্বে যে বাক্যের রূপান্তরীকরণের কথা বলিয়াছি, ইহা তাহারই প্রকারভেদ। সরলকে জটিল বা জটিলকে সরল না করিয়া বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করাই এইজাতীয় রূপান্তরের বৈশিষ্ট্য। সরল জটিলের প্রয়োগও ইহাতে থাকিতে পারে ; কিন্তু মাত্র এইটুকুতেই ইহা সীমাবদ্ধ নয়, ইহার বাহিরেও নানা কৌশল আছে।

একটি উদাহরণে বক্তব্য পরিষ্কার হইবে ঃ

(i) **বিদ্বানের পূজা সর্ব্বত্র।**
(ii) বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজা পান।
(iii) বিদ্বান্ ব্যক্তিকে সকলেই পূজা করে।
(iv) যিনি বিদ্বান্, তাঁহার পূজা সর্ব্বত্র।
(v) এমন কোন স্থান নাই, যেখানে বিদ্বান্ পূজিত না হন।
(vi) বিদ্বান্‌কে পূজা করে না এমন স্থান জগতে নাই।
(vii) বিদ্বান্ যেখানে পূজিত হন না, এমন স্থান জগতে আছে কি ?
(viii) বিদ্বান্ যেখানেই যান, সেইখানেই পূজিত হন।
(ix) বিদ্বান্ সকল স্থানে সকলের পূজার পাত্র।
(x) এমন কোন স্থান আছে, যেখানে বিদ্বান্ পূজিত হন না ?
(xi) বিদ্বান্ যে দেশে যান, সকলের পূজা পান।

—স্থূলাক্ষর বাক্যটিকে জটিলবাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে, চতুর্থ রূপটি দিলেই কাজ শেষ হইয়া যাইত। আমাদের উদাহরণে আরও নয়টি রূপ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন-কোনটিতে ভাব কিঞ্চিৎ প্রসারলাভ করিয়াছে। কোন কোন বাক্য হইয়াছে জিজ্ঞাসাত্মক। কোথাও বা দুইটি নিষেধার্থক অংশ মিলিয়া ভাবে স্থাপনার্থক বাক্য সৃষ্টি করিয়াছে।

নীচের উদাহরণটি একটু অন্য ধরণের। ইহাতে প্রধানতঃ প্রতিশব্দের (শব্দ বা শব্দগুচ্ছ) সাহায্যে মূল বাক্যটিকে রূপান্তরিত করা হইয়াছে ঃ

(i) **রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হইয়াছেন।**
(ii) রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করিয়াছেন।
(iii) রবীন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নাই।
(iv) রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।
(v) রবীন্দ্রনাথ স্বর্গত হইয়াছেন।
(vi) রবীন্দ্রনাথ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।
(vii) রবীন্দ্রনাথ ভবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

(viii) রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে।
(ix) রবীন্দ্রনাথের জীবননাট্যে যবনিকাপাত হইয়াছে।
(x) রবীন্দ্রনাথ গতাসু হইয়াছেন।
(xi) রবীন্দ্রনাথের জীবনলীলার সমাপ্তি ঘটিয়াছে।
(xii) রবীন্দ্রনাথ সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।
(xiii) রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ দেহবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন।
(xiv) রবীন্দ্রনাথ জীবনসিন্ধুর পরপারে যাত্রা করিয়াছেন।
(xv) রবীন্দ্রনাথ মহাযাত্রা করিয়াছেন।
(xvi) রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হইয়াছে।
(xvii) রবীন্দ্রনাথ সংসারসীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।
(xviii) রবীন্দ্রনাথ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।
(xix) রবীন্দ্রনাথ সংসারের মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।
(xx) রবীন্দ্রনাথের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।
(xxi) রবীন্দ্রনাথ নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন।
(xxii) রবীন্দ্রনাথ মহানিদ্রার কোলে শান্তিলাভ করিয়াছেন।
(xxiii) রবীন্দ্রনাথের আত্মা দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।
(xxiv) রবীন্দ্রনাথের আত্মা দেহপিঞ্জর শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আর-একপ্রকার রূপান্তর আছে, তাহা এত ব্যাপক ও বিচিত্র নয়। বাক্যের কোন পদকে পদান্তরিত করিয়া বাক্যটির রূপান্তর ঘটাইতে হয় অথবা বাক্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয়। 'রামচন্দ্র **অযোধ্যার** রাজা ছিলেন' এই বাক্যের 'অযোধ্যার'-কে যদি 'অযোধ্যা' করা হয়, তবে বাক্যটি হইবে—'রামচন্দ্রের রাজ্য ছিল **অযোধ্যা**'।

(i) সাধুকে সকলেই বিশ্বাস করে।
(ii) আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না।
(iii) তুমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছ ?
(iv) তিনি কাব্যে অনুরাগী নহেন।
(v) রামবাবুর প্রচুর সম্পত্তি।

—ধরা যাক এই বাক্যগুলির প্রথমটিতে 'সাধুকে'-র স্থলে 'সাধু' লিখিতে হইবে, দ্বিতীয়টিতে 'আমার দ্বারা'-র স্থলে 'আমি' লিখিতে হইবে, তৃতীয়টিকে নির্দ্দেশাত্মক ও চতুর্থটিকে স্থাপনাত্মক করিতে হইবে এবং পঞ্চমটিতে 'সম্পত্তি'-র স্থলে 'সম্পত্তির' লিখিতে হইবে। তাহা হইলে বাক্যগুলি নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে :

(i) 'সাধু' সকলেরই বিশ্বাসভাজন।

(ii) 'আমি' এ কার্য্য পারিব না।

(iii) তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ কিনা বল।

(iv) কাব্যে তাঁহার অনুরাগের অভাব আছে।

(v) রামবাবু প্রচুর 'সম্পত্তির' মালিক।

বাক্যের অর্থান্তর

অনেক সময় একই বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের উপর উচ্চারণে জোর দিবার ফলে বাক্যটির অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

তুমি কি বই পড়িতেছ?—না, আর কেহ?

তুমি **কি** বই পড়িতেছ?—পাঠ্যপুস্তক? না, নাটক-নভেল? অথবা বইএর নাম কি?

তুমি কি **বই** পড়িতেছ?—না, মাসিকপত্র?

তুমি কি বই **পড়িতেছ**?—না, শুধু পাতা উল্টাইয়া যাইতেছ?

অন্যপ্রকারেও হয়। 'ই', 'ও', 'কেবল', 'শুধু' প্রভৃতি বিভিন্ন পদের সহিত যুক্ত হইয়া বা পূর্ব্বে বসিয়া বাক্যের অর্থান্তর ঘটায়।

ই

আমিই তোমাকে একথা বলিয়াছি—আর কেহ নহে।

আমি **তোমাকেই** একথা বলিয়াছি—আর কাহাকেও নহে।

আমি তোমাকে **একথাই** বলিয়াছি—অন্য কোন কথা নয়।

ও

রামও কবিতা লিখিতে পারে—অন্য যাহারা লেখে, তাহারা ছাড়া।

রাম **কবিতাও** লিখিতে পারে—শুধু প্রবন্ধ নয়।

রাম কবিতা **লিখিতেও** পারে—শুধু পড়িতে বা বুঝিতে নয়।

শুধু

শুধু আমি তাহাকে রবিকাব্য শুনাইয়াছি—আর কেহ নহে।

আমি **শুধু তাহাকে** রবিকাব্য শুনাইয়াছি—আর কাহাকেও নহে।

আমি তাহাকে **শুধু রবিকাব্য** শুনাইয়াছি—অন্য কাহারও কাব্য নয়।

আমি তাহাকে রবিকাব্য **শুধু শুনাইয়াছি**—ব্যাখ্যা করি নাই, বুঝাই নাই।

বাক্যে কয়েকটি অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ

আর

	অর্থ বা ভাব
(i) "আমি কবি যত কামারের **আর** কুমারের"। (প্রেমেন্দ্র)	এবং
(ii) এ ছাড়া কি **আর** কথা নাই ?	অন্য, অপর
(iii) "**আর**" তো ব্রজে যাব না, ভাই"। (গান)	পুনরায়
(iv) "খোকা আমার সে খোকা **আর** নাই তো !" (রবীন্দ্রনাথ)	এখন
(v) **আর** জন্মে তুমি আমার মা ছিলে।	গত
(vi) কালোবাজারীরা **আর** জন্মে কুকুর হবে।	আগামী
(vii) "কিসে **আর** কিসে, ধানে **আর** তুষে !" (প্রবাদ)	তুলনা
(viii) কলেজে পা দিলাম **আর** ঘণ্টা পড়ল।	সঙ্গে সঙ্গে
(ix) যা বাজার পড়েছে, সংসার **আর** চলে না।	ইহার পর
(x) ছেলের হাতের মোয়া **আর** কি !	বাক্যালঙ্কার অব্যয়
(xi) **আর** ভাই, তুমিও যেমন !	ঐ
(xii) হাতেই মার **আর** ভাতেই মার, জাপান আবার মাথা তুলবে।	অথবা

কি

(i) একথা **কি** সত্য ?	প্রশ্ন
(ii) "পদ্ম **কি** ফুটিল দূর্ব্বাদলে ?" (যতীন্দ্রমোহন)	সংশয় (বিস্ময়মিশ্রিত)
(iii) "আজি **কি** তোমার মধুর মূরতি হেরিনু শারদ-প্রভাতে !" (রবীন্দ্রনাথ)	বিস্ময় (আনন্দমিশ্রিত)
(iv) পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই—**কি** চমৎকার স্বাধীনতাই পেয়েছি আমরা !	বিদ্রূপ
(v) **কি** লেখাপড়ায়, **কি** খেলাধুলায়—সবেতেই ছেলেটি ভাল।	বাক্যালঙ্কার
(vi) **কি** আলোক, **কি** অন্ধকার, **কি** সৎ, **কি** অসৎ—সবই ব্রহ্মময়।	নিত্যসম্বন্ধ
(vii) এ কাজ করেছ **কি** মরেছ।	ফলজ্ঞাপক
(viii) শুধু গুজবের উপর নির্ভর ক'রে শহর ছেড়ে চ'লে যাব **কি** ?	বিবেচনা

না

(i) (ii)
সে **না**কি রাগ করিয়াছিল, তাই বলিল, "আমি বেড়াতে যাব **না**, তুমি যাও
(iii) (iv) (v) (vi)
না।" আমি বলিলাম, "**না** বললে ছাড়ছি **না**কি ?" সে বলিল, "যতই বল **না** কেন,
(vii) (viii)
আমি নাচার।" আমি বলিলাম, "অর্থাৎ কি**না** খোঁড়া। ন্যাকামি দেখ **না**।"

(i) সংশয়াত্মক অব্যয়

(ii) নিষেধাত্মক "

(iii) অনুজ্ঞাদ্যোতক "

(iv) বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত ('বললে' ক্রিয়ার কর্ম্ম) নিষেধার্থক অব্যয়

(v) কাহারও কাহারও মতে প্রশ্নার্থক অব্যয়।

মন্তব্য ঃ এই পঞ্চম প্রয়োগটির সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আছে ঃ শুদ্ধ 'না'-ও প্রশ্ন বুঝাইতে পারে। 'তুমি যাবে **না**।'—এই 'না' নিষেধার্থক ; কিন্তু 'তুমি যাবে **না** ?'—এই 'না' প্রশ্নার্থক। 'তুমি যাবে না ?' এবং 'তুমি যাবে নাকি ?' অর্থ ঠিক এক নয়। এই 'নাকি-র মধ্যে একটু বিকল্পের ভাব থাকে এবং এই বিকল্প ভাবটি প্রশ্নের সহিত জড়িত। 'তুমি যাবে নাকি ?' = 'তুমি যাবে ? না, যাবে না ?' কিন্তু 'ছাড়ছি নাকি ?'-তে ভাব নাই। এ 'নাকি'-তে প্রশ্নের সঙ্গে নিষেধভাবেরই প্রাধান্য। এখানে প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা রাখে না, বক্তার ইচ্ছাই এখানে কার্য্যকরী ; **'ছাড়ব না'** এই অর্থ ই এখানে শুধু স্পষ্ট নয়, প্রবল।

আমার মতে

(v) **প্রশ্নাকারে নিষেধগর্ভ অব্যয়।**

(vi) বাক্যালঙ্কারসূচক

(vii) ঐ

(viii) ঐ

এগুলি ছাড়া 'না' অন্যভাবেও ব্যবহৃত হয়।

(ix) ভাতক'টা **না** খেয়েই, জামাটা **না** গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

দ্রুততাজ্ঞাপক অর্থাৎ ত্বরাপ্রকাশক

(x) "জোড়া ভুরু যেন কামের কামান কে **না** কৈল নিরমাণ" (ভীমদাস)।

'কে **না** = অনেকটা 'কে **বা**'।

(xi) আহা, কত দুঃখই **না** পেয়েছ ! বাক্যালঙ্কার

(xii) "ঠাকুরঘরে কে ? **না**, 'আমি তো কলা খাই নি'।" ঐ

(xiii) "কত **না** দিনের কথা, কত **না** রূপের মাঝে" (রবীন্দ্রনাথ)। ঐ

(xiv) নেহাৎ ভালমানুষ কি**না**, তাই বাগে পাও। বাক্যালঙ্কার (কিন্তু একটু 'হেতু'-র ভাব আছে)

(xv) তুমি আসবে ? **না**, আমি যাব ? বিকল্পজ্ঞাপক

তো

(i) তাই **তো** বড় সমস্যার কথা। ভাবনাদ্যোতক

(ii) খেয়ে **তো** নিই, তারপর যা হয় হবে। বাক্যালঙ্কার

(iii) কথাটা হয়**তো** সত্যি। সম্ভাবনাদ্যোতক

(iv) কলকাতা যাও **তো** আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। (যদি যাও) তাহা হইলে।

(v) ওখানে কোথায় খুঁজছেন? এই **তো** আপনার কলম। নির্দ্দেশজ্ঞাপক

(vi) কাল আসছ **তো**? প্রশ্ন

(vii) "তাই **তো**, খোকা আমার সে খোকা আর নাই **তো**!" (রবীন্দ্রনাথ) অবধারণজ্ঞাপক

(viii) ধর **তো** রে, দিই বেটাকে দু'ঘা বসিয়ে।
দে **তো** একবার লাঠিগাছটা।
দেখ **তো** বাবা, গাইটা কোন্ দিকে গেল।
একগ্লাস জল দাও **তো**, মা। } অনুজ্ঞাপূরক

(ix) এই **তো**, তবে যে বললে 'পারব না'। সাফল্য বা কৃতকার্য্যতাদ্যোতক

(x) "তুমি **তো** মা ছিলে ভুলে, (আমি) পাগল নিয়ে সারা হই" (গান)। নিশ্চয়ার্থক

(xi) তুমি ভাই ভাই ক'রে মর, তোমার ভাই **তো** তোমার পানে ফিরেও চায় না। পরন্তু

ও

(i) সে **ও** তাহার ভাই পাঠশালে পড়ে। সংযোজক অব্যয়

(ii) **ও** নিতাই খুড়ো, যাচ্ছ কোথায়? সম্বোধন

(iii) বাইশ মণ তেল**ও** পুড়বে না, রাধা**ও** নাচবে না। নিশ্চয়ার্থক

(iv) **ও**, তাই নাকি? নির্দ্ধারণজ্ঞাপক

(v) তুমি**ও** চুরি করেছ! দৃঢ়তাজ্ঞাপক সংস্কৃত 'অপি'র সগোত্র।
(তুমি**ই** চুরি করেছ—নিশ্চয়তাজ্ঞাপক সংস্কৃত 'হি'-র সগোত্র)

যেন

(i) চোখ দুটি **যেন** পদ্মপলাশ, তারা দুটি **যেন** ভ্রমর। উৎপ্রেক্ষা

(ii) আমি **যেন** মাষ্টারমশাই, আর তুমি **যেন** আমার ছাত্র—কেমন? কল্পনা

(iii) "বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে **যেন** না করি আমি ভয়;
দুঃখে সুখে ব্যথিতচিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে **যেন** করিতে পারি জয়।" (রবীন্দ্রনাথ) প্রার্থনা

(iv) "লভি যদি পুন মানবজন্ম, হই **যেন** আমি হই গো হিন্দু (কুমুদরঞ্জন)।" কল্পনা
(v) তোমার **যেন** বংশে বাতি দিতে কেউ না থাকে। কামনা
(vi) মনে থাকে **যেন** বেলা তিনটায় ট্রেন। অনুজ্ঞার ভাব
(vii) তোমার ধূলোমুঠো ধরতে **যেন** সোনামুঠো হয়। আশীর্ব্বাদ
(viii) এমন ভাবে কথা বললে **যেন** কিছু জানে না। (অবজ্ঞার) ভান (করিল)
(ix) "পরশপাথর **যেন** ছুঁয়েছি, সোনা হলেম…কি সুখ ?" (বঙ্কিমচন্দ্র)
ধরিয়া লইলাম যে পরশপাথর ছুঁইয়াছি…
(x) গভীর রাত্রে কে **যেন** চাপাগলায় আমার নাম ধ'রে ডাকে। সন্দিগ্ধ অনুভূতি
(xi) "দেখে **যেন** মনে হয় চিনি উহারে" (রবীন্দ্রনাথ)। অস্পষ্ট অনুভূতি
(xii) ছেলে **যেন** সাপের পাঁচ পা দেখেছে। দেখিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবনা

মন্তব্য ঃ উপরের উদাহরণগুলিতে বিচিত্রভাবে প্রযুক্ত অব্যয়গুলির অর্থ দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তবু ঠিক অর্থ দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নাই ; কারণ, এ কাজ শুধু কঠিন নয়, কতকটা অসম্ভব। অনেক সময় এমন একটি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা থাকে, যাহা অনুভব করা যায় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উচ্চারণে কণ্ঠধ্বনির বৈচিত্র্যও অনেক কাজ করে। সূক্ষ্ম বিচারের পথে না গিয়া একটা স্থূল ধারণা দিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

অব্যয়ের বিশেষ্যবৎ প্রয়োগ

(i) বাবু একবার **হাঁ** বললে আর তাকে **না** করানো যায় না।
(ii) 'যদি কেরানি হতাম, দশটা-পাঁচটা আপিস করতে হ'ত'—ওসব **যদি-র** কথা ছেড়ে দাও ; তুমি কেরানিও নও, দশটা-পাঁচটা আপিসও করতে হয় না।
(iii) মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী বিভ্রাট ঘটায় **'যদি'** আর **'কিন্তু'**।
(iv) আর **'কিন্তু'** করবেন না বাবু, কিনে ফেলুন জমিটা।
(v) মনে করুন আপনার পা ভেঙে গেল—**দৈবাতের** কথা তো বলা যায় না।
(vi) সকল **কেন-র** উত্তর হয় না।

অব্যয়ের বিশেষণবৎ প্রয়োগ

(i) বউটি **আহা**ও নয়, **ছিছি**ও নয়। (খুব সুন্দরীও নয়, আবার কুৎসিতও নয়)

বাক্য-বিশ্লেষণ

বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকে। ইহাদের প্রসারক থাকিতে পারে। এইগুলিকে পৃথক্ করিয়া দেখান এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝানই **বাক্য-বিশ্লেষণ**।

বাক্যটি সরল, জটিল বা যৌগিক হইতে পারে। কাজেই বিশ্লেষণে বাক্যটির প্রকারও উল্লেখ করিতে হইবে।

(i) **'সূর্য্য উঠিয়াছে।'**—ইহা একটি সরল বাক্য।

উদ্দেশ্য—সূর্য্য (কর্ত্তা)। বিধেয়—উঠিয়াছে (সমাপিকা ক্রিয়া)।

(ii) **"সূর্য্য পূর্ব্বদিগন্তে উঠিয়াছে।"**—এইটি সরল বাক্য।

উদ্দেশ্য—সূর্য্য (কর্ত্তা)। বিধেয়—উঠিয়াছে (সমাপিকা ক্রিয়া)।

বিধেয়-প্রসারক—পূর্ব্বদিগন্তে।

(iii) **'অন্ধকার-দানবের নিধন সাধন করিয়া সূর্য্য পূর্ব্বদিগন্তে বিজয়-গৌরবে উঠিয়াছে।'**—এইটি সরল বাক্য।

উদ্দেশ্য—সূর্য্য (কর্ত্তা)। উদ্দেশ্য-প্রসারক—অন্ধকার···করিয়া।

বিধেয়—উঠিয়াছে (সমাপিকা ক্রিয়া)। বিধেয়-প্রসারক—পূর্ব্ব···গৌরবে।

জটিল বাক্য-বিশ্লেষণ

জটিল বাক্যে একটি প্রধান বাক্য ও এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য বা উপবাক্য থাকে। এইজাতীয় বাক্য-বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে :

(১) প্রধান বাক্যের নির্দ্দেশ। (২) অপ্রধান বাক্যের বা বাক্যাবলীর নির্দ্দেশ এবং প্রধান বাক্যের সহিত ইহা বা ইহারা কিভাবে অন্বিত তাহার নির্দ্দেশ। (৩) প্রধান ও অপ্রধান বাক্য যাহার দ্বারা সংযোজিত হইতেছে এমন কোন পদ বা পদাবলী থাকিলে তাহার নির্দ্দেশ। (৪) প্রধান ও অপ্রধান বাক্যের সরল বাক্য-বিশ্লেষণের পন্থায় পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষণ।

পর পর কাজগুলি করিতে হইবে।

(i) **'যে কাহিনী তোমাদিগকে শুনাইলাম তাহা রামায়ণে আছে।'**

প্রধান বাক্য—তাহা রামায়ণে আছে ; অপ্রধান বাক্য—যে কাহিনী তোমাদিগকে শুনাইলাম।

অপ্রধান বাক্যটি বিশেষণভাবাপন্ন এবং 'তাহা' পদের বিশেষণ।

প্রধান বাক্য-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য—তাহা (কর্ত্তা)। বিধেয়—আছে (সমাপিকা ক্রিয়া)।

বিধেয়-প্রসারক—রামায়ণে।

অপ্রধান বাক্য-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য—আমি (উহ্য, কর্ত্তা—প্রযোজক)। বিধেয়—যে কাহিনী তোমাদিগকে শুনাইলাম ('শুনাইলাম' প্রেরণার্থক সকর্ম্মক ক্রিয়া ; 'তোমাদিগকে' কর্ম্মরূপী প্রযোজ্য কর্ত্তা, 'কাহিনী' কর্ম্ম)।

(ii) **"ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্ত্তি বলে, 'আর পারি নাকো' "**—রবীন্দ্রনাথ।

প্রধান বাক্য—ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্ত্তি বলে। অপ্রধান বাক্য—'আর পারি নাকো' ; ইহা বিশেষ্যভাবাপন্ন এবং 'বলে' ক্রিয়ার কর্ম্ম।

প্রধান বাক্য-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য—কর্ত্রী (কর্ত্তা)। উদ্দেশ্য-প্রসারক—ঘরের, রুক্ষমূর্ত্তি।

বিধেয়—বলে (সমাপিকা ক্রিয়া)।

অপ্রধান বাক্য-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য—আমি (উহ্য—কর্ত্তা)। বিধেয়—পারি।

বিধেয়-প্রসারক—আর, নাকো।

(iii) **'অঙ্কটিকে তুমি যতটা সহজ ভাবিয়াছ, ততটা সহজ নয়।'**

প্রধান বাক্য—ততটা সহজ নয়। অপ্রধান বাক্য—অঙ্কটিকে…ভাবিয়াছ ; ইহা বিশেষণভাবাপন্ন এবং 'ততটা' পদের বিশেষণ।

যোগসাধক পদাবলী—'যতটা—ততটা'।

প্রধান বাক্য-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য—অঙ্কটি (উহ্য—কর্ত্তা)। বিধেয়—নয় (ক্রিয়াপদ)।

বিধেয়-প্রসারক—ততটা সহজ।

অপ্রধান বাক্য-বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য—তুমি (কর্ত্তা)। বিধেয়—অঙ্কটিকে ভাবিয়াছ (কর্ম্মসহ সমাপিকা সকর্ম্মক ক্রিয়া)।

বিধেয়-প্রসারক—যতটা সহজ।

যৌগিক বাক্য-বিশ্লেষণ

বাক্যস্থিত স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বাক্যগুলিকে

(১) পৃথক্ করিয়া দেখাইতে হইবে ; (২) সংযোজক বা বিযোজক অব্যয় দেখাইতে হইবে ; (৩) স্বতন্ত্র বাক্যের প্রত্যেকটিকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

(i) **"বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"**—সঞ্জীবচন্দ্র।

স্বতন্ত্র বাক্য—(ক) বন্যেরা বনে সুন্দর। (খ) শিশুরা মাতৃক্রোড়ে (সুন্দর)। সংযোজক অব্যয়—'এবং' (উহ্য)।

(ক)-এর বিশ্লেষণ ঃ

উদ্দেশ্য—বন্যেরা (কর্ত্তা)। বিধেয়—সুন্দর (কর্ত্তার বিশেষণ, সমাপিকা ক্রিয়া 'হয়' উহ্য)। বিধেয়-প্রসারক—বনে।

(খ)-এর বিশ্লেষণ ঃ

উদ্দেশ্য—শিশুরা (কর্ত্তা)। বিধেয়—সুন্দর (উহ্য—কর্ত্তার বিশেষণ, সমাপিকা ক্রিয়া 'হয়' উহ্য)। বিধেয়-প্রসারক—মাতৃক্রোড়ে।

ভাব-সম্প্রসারণ

ছন্দোময় বা ছন্দোহীন রচনাংশের স্বল্প পরিসরের মধ্যে নিহিত ভাবের বিশদীকরণের নাম **ভাব-সম্প্রসারণ**।

ভাবের সম্প্রসারণ (সঙ্কোচনও) আমরা অহরহঃই করিতেছি। সামাজিক মানুষের ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা তেমন অনুভব করি না। সাধারণ বুদ্ধি ও কিছু কল্পনা থাকিলে এ কাজ সুন্দরভাবেই করা যায়। সাহিত্যিক ভাব-সম্প্রসারণে এই বুদ্ধিকে আরও কিছু মার্জ্জিত ও ক্রিয়াশীল এবং কল্পনাকে আরও কিছু প্রসারিত করিতে হয়। অভ্যাস এদিকে প্রচুর সাহায্য করে।

ভাবের প্রকৃতি সকল রচনায় এক নয়। কোথাও তাহা স্থূল, কোথাও সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মের আবার পরিমাণ-তারতম্য আছে। এমন সূক্ষ্মভাবও সাহিত্যিকের রচনায় আছে, যাহা মাত্র অনুভবগম্য—কবিকেও সেখানে ভাষার অপেক্ষা ইঙ্গিতের, আভাষের আশ্রয়ই বেশী করিয়া লইতে হয় এবং সম্প্রসারককেও সোজা রাজপথের পরিবর্ত্তে বাঁকা পথে পরমকৌশলে চলিতে হয়। এইজাতীয় ভাবের সম্প্রসারণ আমাদের আলোচনা-সীমার বাহিরে।

স্থূল ভাব

"সংসার-সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা,
আশা তায় একমাত্র ভেলা।"—গিরিশচন্দ্র।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ভাব

"কহিলেন বসুন্ধরা, দিনের আলোকে
আমি ছাড়া আর কিছু পড়িত না চোখে।
রাত্রে আমি লুপ্ত যবে, শূন্যে দিল দেখা
অনন্ত এ জগতের জ্যোতির্ম্ময়ী লেখা।"—রবীন্দ্রনাথ।

সূক্ষ্ম ভাব

"দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করি ধরিব হে।"—রবীন্দ্রনাথ।

অতি সূক্ষ্ম ভাব

"বাঁশীর বাণী চিরদিনের বাণী—শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা—প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্ত্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

—মাত্র উদাহরণস্বরূপে শেষের অংশটি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা বর্ত্তমান গ্রন্থের অধিকারের বাহিরে।

উদ্ধৃতি তিনটির ভাব-সম্প্রসারণের পূর্ব্বে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা করিতেছি।

(ক) প্রদত্ত অংশটি বার বার পড়িয়া প্রচ্ছন্ন ভাবটিকে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাকে স্পষ্ট ধারণার বিষয়ীভূত করিতে হইবে। (খ) লেখক যদি ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা গ্রহণ করিয়া এবং প্রয়োজনমত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বক্তব্যটি যাহাতে প্রাঞ্জল হয় তাহা করিতে হইবে। (গ) প্রয়োজন হইলে দৃষ্টান্ত দেওয়া চলিবে এবং অন্য লেখকের রচনা হইতে সমভাবের উক্তিও উৎকলিত করা চলিবে। (ঘ) ভাষাকে অলঙ্কৃত করার প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে তাহা করা চলিবে। (ঙ) **ভাব-সম্প্রসারণের অর্থ কবিক্তির পরিপূরণ**—এই সত্যটি মনে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

এইবার আমাদের উদ্ধৃতি তিনটির ভাব সম্প্রসারিত করিয়া দেখাইতেছি:

(১) সংসার-সাগরে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা,
আশা তায় একমাত্র ভেলা।"

—ইহার অন্তর্নিহিত ভাব: পৃথিবীতে দুঃখজর্জ্জরিত মানবজীবনের একমাত্র সম্বল আশা। এই ভাবটির

সম্প্রসারণ

জীবনের যাত্রাপথে দুঃখ মানুষের নিত্যসহচর। সুখের জন্য মানুষকে প্রার্থনা করিতে হয়, সাধনা করিতে হয়। বহুসাধনায় সুখের কণামাত্রও যদি আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার উপর ভরসা করিতে পারি না—'হারাই হারাই সদা ভয় হয়' এবং

সত্যই 'হারাইয়া ফেলি চকিতে'। কিন্তু দুঃখ তেমন নয়; বিনা আহ্বানেই তাহার আবির্ভাব হয়। পলকে পলকে নব নব আঘাত হানিয়া দুঃখ আমাদের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিতে চায়। কিন্তু এত আঘাতসত্ত্বেও আমরা ভাঙিয়া পড়ি না, আমাদের মুখের হাসি মিলাইয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ, প্রচণ্ডতম দুঃখেও আমরা আশা হারাই না। আশা ভগবানের আশীর্ব্বাদ। আশার মন্ত্র সঞ্জীবনমন্ত্র—এই আশার সোনার কাঠির স্পর্শে মুমূর্ষুও জীবনের স্বপ্ন দেখে। জানি জীবনের অনেক আশা, অনেক কেন, অধিকাংশ আশাই পূর্ণ হয় না। দুঃখের আঘাত ও আশাভঙ্গের আঘাত মিলিয়া মানুষকে যখন নিঃশেষ করিতে চায়, তখন নূতন আশা আবির্ভূত হইয়া যাহা নিঃসহ তাহাকে সহনীয় করিয়া তোলে। দুঃখকে সে ধ্বংস করিতে পারে না, কিন্তু ভাবী আনন্দলোকের স্বপ্ন দেখাইয়া দুঃখের কঠোরতাকে সে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। তরঙ্গক্ষুব্ধ বিশাল সিন্ধুর পরপারে যাত্রীকে লইয়া যাইবার শক্তি ক্ষুদ্র ভেলার নাই; তবু, ক্ষীণ হইলেও, অবলম্বনহিসাবে তাহার একটা মূল্য আছে—অন্ততঃ এতটুকু সান্ত্বনাও সে দিতে পারে। আশাও তেমনি। দুঃখজর্জ্জরিত জীবনকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার শক্তি তাহার নাই, তবু মুক্তির একটা আশ্বাস সে দিতে পারে; সে আশ্বাস মিথ্যা হইলেও জীবনসংগ্রামে তাহার মূল্য বড় কম নয়।

(২) "কহিলেন বসুন্ধরা, দিনের আলোকে
আমি ছাড়া আর কিছু পড়িত না চোখে।
রাত্রে আমি লুপ্ত যবে, শূন্যে দিল দেখা
অনন্ত এ জগতের জ্যোতির্ম্ময়ী লেখা।"

—দিবালোকের দান অপেক্ষা রাত্রির অন্ধকারের দান অনেকগুণে অধিক মূল্যবান্ : ইহাই উদ্ধৃতিটির অন্তর্নিহিত ভাব।

সম্প্রসারণ

আলোক পৃথিবীর দৃশ্যসম্পদ্ অবারিত করিয়া দেয়; কিন্তু অন্ধকার তাহাকে আবৃত করিয়া রাখে। এই কারণে আলোক মানুষের প্রিয় এবং অন্ধকার অবাঞ্ছিত। জগতের বহু কবি আলোকের বন্দনা গাহিয়াছেন; কিন্তু অন্ধকারের প্রশস্তি অতি অল্প কবির কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছে। আলোক প্রকাশক, অন্ধকার আবরক—সাধারণ মানুষের এই যে ধারণা ইহা কিন্তু স্থূল বিচারের ফল এবং মাত্র আংশিকভাবে সত্য। দিনের আলোকে আমরা বসুন্ধরাকে দেখি; কিন্তু বসুন্ধরার সে কতটুকু? আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিকার সীমাবদ্ধ; এই সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে যাহা পড়ে, তাহা বসুন্ধরার একটি অতিক্ষুদ্র নগণ্য ভগ্নাংশমাত্র। পৃথিবীর মত, সূর্য্যের মত, এমন কি সূর্য্যের চেয়ে বহু লক্ষগুণে বৃহত্তর সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্ক মহাশূন্যে বিরাজ করিতেছে। সূর্য্য

আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে অভিভূত করিয়া ঐ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সন্ধ্যার আবির্ভাবে আমাদের নয়ন যখন সূর্য্যপ্রভাব হইতে মুক্তি পায়, তখনই প্রকাশ পায় ঐ নয়নমনোহর জ্যোতিঃপুঞ্জ। বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তুভের মত তাহারা ঘনতমসার বক্ষে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। অন্ধকারের এই দান মানুষের নিকট অতুলনীয়; কারণ, ইহা তাহার চিত্তকে প্রসারিত করিয়া সান্তসীমার বাহিরে অনন্তের অভিমুখী করিয়া দেয়। আলোক প্রকাশ করে খণ্ডকে, অন্ধকার সমগ্রকে। এই আলোক-অন্ধকারের আর একটা দিক্ রহিয়াছে। সত্য দুইপ্রকার—রূঢ় সত্য ও গূঢ় সত্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব সত্য এবং অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম সত্য। গূঢ় সত্য থাকে রহস্যের অন্ধকারে। তথাকথিত আলোকের দ্রষ্টা চর্ম্মচক্ষু তাহাকে দেখিতে পায় না, দেখিতে পায় মর্ম্মচক্ষু।

(৩) "দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করি ধরিব হে।"

—'বহুরূপী ভগবানের এক রূপ দুঃখ' এই নিগূঢ় তত্ত্বটি মানুষ যদি বুঝিতে পারে, তবে তাহার কাছে দুঃখ তাহার বিভীষিকা হারাইয়া বরণীয় হইয়া উঠেঃ ইহাই এই কবিতাংশটির অন্তর্নিহিত ভাব।

সম্প্রসারণ

দুঃখকে মানুষ ভয় করে। এত প্রচণ্ড তাহার আঘাত, এত তীব্র তাহার দাহ যে, বর্ত্তমান দূরে থাক, অতীত দুঃখের স্মরণেও মানুষ শিহরিয়া উঠে। এই কারণে দুঃখকে মানুষ যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতে চায়। দুঃখের প্রতি মানুষের ইহাই সাধারণ প্রতিক্রিয়া এবং স্থূল বিচারে এই প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা জানেন ঈশ্বর সর্ব্বময়—আলোকে অন্ধকারে, সুখে দুঃখে, শোকে শান্তিতে, ঐশ্বর্য্যে দারিদ্র্যে, জন্মে মৃত্যুতে, শীতে আতপে, ভাবে অভাবে সব-কিছুর মধ্যেই ভগবান্ বিরাজমান। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" উপনিষদের এই মহাবাণী তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে, শুধু অনুভব নয়, উপলব্ধি করিয়াছেন। ভগবান্ শুধু কান্তকোমল নহেন, তিনি রুদ্রকঠোরও বটেন। দুই রূপেই তিনি সুন্দর; তাই তিনি ভীষণ-সুন্দর! বরঞ্চ এই ভীষণের বেশেই তিনি সুন্দরতর। মানুষের জীবনে যদি শান্তি ও সম্পদ্, আরাম ও বিলাস থাকিত, মানুষ আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিত না। দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় যে আপন শক্তিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে-ই মানুষ হইয়াছে; কারণ, দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়া সে ভগবান্‌কেই বরণ করিয়াছে। ভগবান্ স্বয়ং কি দুঃখমুক্ত? সৃষ্টি কি তিনি ইচ্ছামাত্রেই করিতে পারিয়াছিলেন? উপনিষদ্ বলেন, "স তপঃ অতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা, সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"—তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে

এই যাহা কিছু রহিয়াছে তাহার সবই সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তপস্যাই দুঃখ। মানুষও বিনা তপস্যায় মহৎ কিছু করিতে পারে না। দুঃখবরণ সে ভগবানের কাছেই শিখিয়াছে। সর্ব্বদুঃখের উৎস স্বয়ং ভগবান্, এবং এই পরম দুঃখই তাঁহার পরম সম্পদ্। দুঃখেই দুঃখের শেষ, ইহার মঙ্গলময় কোন পরিণতি নাই—এইভাবে যাহারা বিচার করে, দুঃখকে ভয় করে তাহারাই। দুঃখকে নিবিড়ভাবে বক্ষে ধারণ করেন তিনিই, যিনি জানেন দুঃখের বেশে আসিয়াছেন আনন্দময় ভগবান্।

এইবার আদর্শহিসাবে কয়েকটি উদ্ধৃতির ভাব-সম্প্রসারণ করিয়া দিতেছি ঃ

(৪) "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?—
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?" —কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সম্প্রসারণ

যে স্বয়ং দুঃখবেদনার আঘাত জীবনে কোনদিন পায় নাই, দুঃখের মর্ম্ম সে জানে না। এই কারণে পরের দুঃখ বুঝিবার শক্তি তাহার থাকে না। ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া করুণ কণ্ঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে একমুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করে ; কিন্তু বিনিময়ে পায় লাঞ্ছনা। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই। ধনী বা তাহার পরিবারবর্গ অভাবের বেদনা, বুভুক্ষার জ্বালা কোনদিন ভোগ করে নাই ; ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের আনন্দস্রোতে তাহাদের জীবন প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে নিষ্ঠুরতার অপবাদ দেওয়া যায় ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বিচারে এ অপবাদ অমূলক হইয়া পড়ে। যদি কখনও দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নিরাশ্রয় পথের ভিক্ষুকে পরিণত হয় এবং দীর্ঘকাল দুঃখের দাবদাহে জ্বলিয়া-পুড়িয়া প্রিয়জনের অনেককে হারাইয়া আবার সমৃদ্ধিলাভ করে, তখন ব্যথিতের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। আমরা দুর্গত মানুষকে দান করি প্রধানতঃ দুইটি কারণে ঃ দুঃখীর দুঃখ দেখিলে চক্ষের পলকে আমাদের অতীত দুঃখের স্মৃতি জাগিয়া উঠে ; সেই মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগায় সহানুভূতি। ইহারই ফল দান। এ দানে আমরা সান্ত্বনা লাভ করি, আমাদের হৃদয়ভার লঘু হইয়া যায়। অথবা পরের দুঃখ নিমেষে কল্পনায় আত্মসাৎ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠি। এই আকস্মিক আঘাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কিছু দান করিয়া বিভীষিকার কারণস্বরূপ আর্ত্ত ব্যক্তিটিকে বিদায় করিয়া দিই এবং এইভাবে হৃদয়ভার লঘু করি। শেষোক্ত পন্থায় পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা, বোধ করি, না থাকিলেও চলে। কল্পনাপ্রবণ মানুষের পক্ষে ক্ষণিকের জন্য মনে মনে এই অবস্থা-বিনিময় অসম্ভব ব্যাপার নয়। কাজি নজরুল ইস্‌লাম দুঃখের জীবন্ত

আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে, রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন প্রধানতঃ কল্পনায়। কিন্তু কল্পনা যতই দূরপ্রসারিত হউক, তাহা কল্পনামাত্র। অভিজ্ঞতাজাত সমবেদনা হৃদয়ের ধন, তাহা অশ্রুসিক্ত। কল্পনায় বিষের জ্বালা যতই অনুভূত হউক না কেন, সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাছে সে কিছুই নয়।

(৫) "কে লইবে মোর কার্য্য ?—কহে সন্ধ্যারবি,
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল—স্বামি,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"—রবীন্দ্রনাথ।

সম্প্রসারণ

সকলে সমান শক্তির অধিকারী হইয়া জগতে আসে নাই। ক্ষুদ্র হউক বৃহৎ হউক, প্রত্যেকেই যদি আপনার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়, তাহাকে মহৎই বলিতে হইবে। জগতের মঙ্গলসাধন সকলেরই জীবননীতি। কর্ত্তব্যপালনের দ্বারা এই নীতিকে যে সার্থক করিয়া তুলিবে, বৃহৎক্ষুদ্রনির্ব্বিশেষে সে-ই ধন্য। সাগরে সেতুবন্ধন করিতে হনুমান্ প্রভৃতি মহাবীরগণ শ্রীরামচন্দ্রকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, পরিমাণে তাহা গুরুতর। ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালী যোগাইয়াছিল অতিক্ষুদ্র কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ড। হনুমান্ বিরক্ত হইয়া চপেটাঘাতে কাঠবিড়ালীর জীবননাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান্ রামচন্দ্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া পরমস্নেহে তাহার দেহে হাত বুলাইয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। আজও রামচন্দ্রের পঞ্চাঙ্গুলির রেখা কাঠবিড়ালীর দেহে বর্ত্তমান। রামায়ণের এই কাহিনী এই সত্যই প্রচার করিতেছে যে, কর্ত্তব্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে হনুমানের দানের মর্য্যাদা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর দানের মর্য্যাদা ন্যূন নহে। সূর্য্যকে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন যে উদ্দেশ্যে, মাটির প্রদীপও সেই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে; পার্থক্য এই যে, সূর্য্যের কর্ম্মক্ষেত্র সুপ্রশস্ত, সুবিশাল এবং প্রদীপের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। ক্ষুদ্র কুটীরকে আলোকিত করিয়া মাটির প্রদীপ মানুষের যে মঙ্গল সাধন করে তাহার ব্যাপকতা কম, কিন্তু মূল্য যথেষ্ট। স্বল্প শক্তি স্বল্প প্রতিভা লইয়া যে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আপন ক্ষুদ্রতার কথা ভাবিয়া তাহার লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। সে যদি আপন অধিকারসীমার মধ্যে নিষ্কুণ্ঠচিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়, মানুষের চিত্ত সে জয় করিবে। আপন ক্ষুদ্রতম পল্লীর সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ একজন নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর সাধনা মহাত্মা গান্ধীর মত বিশ্বের সম্মান অর্জ্জন করিতে পারিবে না সত্য; কিন্তু মানবজাতির এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ যে-সম্মান তাহাকে দিবে, গভীরতায় তাহা মহাত্মার প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা ন্যূন নহে।

(৬) "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"—সঞ্জীবচন্দ্র।

সম্প্রসারণ

সুন্দরের কোন স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না। চন্দ্র সুন্দর, কিন্তু রজনীর নীলাম্বরে; দিনের চন্দ্র অসুন্দর। 'স্বভাবসুন্দর' বলিয়া একটি কথা আছে। কিন্তু এখানে 'স্বভাব' শব্দের অর্থ কি? ইহা কি সুন্দর বস্তুটির নিজস্ব ভাব? না, যে পরিবেশের মধ্যে সে থাকে, সেই পরিবেশ? বৃন্ত হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া সুসজ্জিত গৃহে স্ফটিকনির্ম্মিত পুষ্পাধারে সযত্নে রক্ষিত শতদল সুন্দর। অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রভাতের রবিকরস্পর্শে স্মিতশুভ্র, আয়ত শ্যাম পত্রপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী মৃদুসমীরণে হিল্লোলিত নীল সলিলের বক্ষোবিহারী শতদলের নিকট ঐ বিচ্ছিন্ন শতদলের সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়। সংস্থান-সমাবেশেই সৌন্দর্য্যের সত্যকার বিকাশ। কলিকাতা মহানগরীর কৃত্রিম পরিবেষ্টনীতে নারী-প্রজাপতিগণের মধ্যে একজন সাঁওতাল রমণী একান্ত অসঙ্গত ও কদর্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু কঠোরকোমল ধূসরশ্যামল পার্ব্বত্য বনভূমির স্বাভাবিক পরিবেশে ঐ সাঁওতাল রমণীই এত সঙ্গত যে মনে হয় সে বুঝি বনভূমিরই একটি অঙ্গ, উহাকে বাদ দিলে বনভূমির অঙ্গহানি ঘটিবে। শিশুর সম্পর্কেও এই কথা। শিশুর আবির্ভাবে নারী মাতা হইয়া উঠে, শিশুজন্মেই নারীজীবনের সার্থকতা। জননীর ক্রোড় তাই শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ, এখানে শিশু সুন্দরতম। একস্থানে যাহা মানায় না, অন্যস্থানে তাহাই চমৎকার মানাইয়া যায়। শুধু বর্ণ নয়, শুধু গঠন নয়—বস্তুর সৌন্দর্য্যের নিয়ামক তাহার পরিবেশ।

(৭) "চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে।"—রবীন্দ্রনাথ।

সম্প্রসারণ

চলিত কথায় বলে 'দোষে গুণে মানুষ'। এমন মানুষ জগতে নাই, যিনি সর্ব্বগুণাধার এবং এমন মানুষও খুঁজিলে মিলিবে না, যাহার দোষই সর্ব্বস্ব। মানুষ কেন, অনেক বস্তুর সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। কুসুমে যেমন কীট আছে, তেমনি সৌরভ আছে। চন্দ্র কলঙ্কী; কিন্তু স্নিগ্ধমধুর জ্যোৎস্নাধারারও সে উৎস। পুষ্প কীটকে আপন মর্ম্মতলে সংগোপনে রাখিয়া বিকীর্ণ করিয়া দেয় তাহার মোহন গন্ধ। চন্দ্র কলঙ্ককালিমাকে আপন অঙ্গে লগ্ন রাখিয়া বিকীর্ণ করিয়া দেয় তাহার বিশ্বপ্লাবী জ্যোৎস্নালোক। মহতের ইহাই কাজ। নিজের দোষ দিয়া জগৎকে দূষিত তাহারা করে না; জগৎ তাহাদের গুণেরই ফল ভোগ করে। আপন জীবনের দোষত্রুটির জন্য যদি নিন্দাগ্লানির আঘাত তাহাদের নিকট আসে, নির্ব্বিকারচিত্তে তাহারা তাহা সহিয়া যায়; প্রতিশোধ লইবার কথা তাহাদের মনের কোণেও স্থান পায় না। চন্দ্র তাহার কলঙ্কের কথা জানে, 'কলঙ্কী' অপবাদ সে হাসিমুখেই সহ্য করে। অপবাদকারীর

মুখে আপন কলঙ্কের কালি নিক্ষেপ না করিয়া আলোকের বন্যায় তাহাদিগকে স্নান করাইয়া ধন্য করে এবং নিজেও ধন্য হয়। তীব্র হলাহল নীলকণ্ঠের কণ্ঠেই থাকিয়া যায়; জগৎকে তিনি দেন কল্যাণের অমৃত। আমার মধ্যে অপবিত্র, অসুন্দর যাহা আছে তাহা ঐকান্তিকভাবে আমাতেই থাকুক, জগৎ যেন তাহার ক্ষীণতম স্পর্শও না পায়; আমার জীবনে যাহা পবিত্র, যাহা সুন্দর, যাহা কল্যাণময় তাহা যত সামান্যই হউক না কেন, জগৎকে আমি যেন অকাতরে দান করিয়া যাইতে পারি—ইহাই প্রত্যেক মানুষের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

(৮) "বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইলা নগরে,
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞানলাভতরে;
সুন্দর গম্ভীর মূর্তি, শান্ত দরশন,
হেরি সবে ভক্তিভরে বন্দিল চরণ।
সবে কহে, 'শুনি তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
দু'একটি তত্ত্বকথা কহ মহাশয়'।
দার্শনিক বলে, 'ভাই, কেন বল জ্ঞানী ?
কিছু যে জানি না আমি এইমাত্র জানি'।"—কান্তকবি রজনীকান্ত।

সম্প্রসারণ

মহাসিন্ধু যতই গভীর ও বিশাল হউক না কেন, তাহার তলও আছে, কূলও আছে। কিন্তু জ্ঞানের মহাপারাবার কূলহীন তলহীন। কোন মানুষের পক্ষে যদি সহস্রবর্ষ পরমায়ু লইয়া পৃথিবীতে আসা সম্ভব হয় এবং যদি সে শৈশব হইতে নিরবচ্ছেদে জ্ঞানসাধনা করে, তাহার জ্ঞানের পরিমাণ অন্যের তুলনায় প্রচুর হইবে সন্দেহ নাই; তবু সে রহিবে জ্ঞানলোকের মাত্র প্রত্যন্তবাসী। এই মহাসত্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি নীরব; কিন্তু যে বুঝে নাই (অধিকাংশ মানুষই বুঝে নাই), সে শফরীর মত গণ্ডূষমাত্র জলে ফর্‌ফর্ করিয়া মরে। তাহার কত দম্ভ, কত অহমিকা, কত আস্ফালন! উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, 'যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ"—যিনি বলেন, 'আমি এত করিয়াও কিছু বুঝিলাম না', তিনিই বুঝিয়াছেন এবং যিনি বলেন, 'আমি সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি', তিনি কিছুই বুঝেন নাই। জ্ঞানরহস্য সম্বন্ধে এত বড় অবধারণা আর্য্য ঋষি ছাড়া আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। অবশ্য এযুগের মনীষিগণের কাহারও কাহারও কণ্ঠে ইহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যে শুনি নাই এমন নহে। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক মনস্বী নিউটন বলিয়াছেন—'জ্ঞানের মহাসিন্ধু এখনও আমার স্পর্শের বাহিরে সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে; আমি উহার কূলে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র'। প্রকৃত জ্ঞান এমনই অপরিমেয়, এমনই দুর্লভ। এই কারণেই জগতের সত্যকার মনস্বী ব্যক্তি অনেক কিছু জানিয়াও, আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার

করা দূরের কথা, জ্ঞানী বলিয়া ভাবিতেও লজ্জা ও কুণ্ঠা অনুভব করেন। কিন্তু "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" উন্মাদনা এত প্রচণ্ড যে, পণ্ডিতম্মন্য মূর্খের দল নিঃসঙ্কোচে আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—"Fools rush in where angels fear to tread" (দেবদূতের মত পবিত্রাত্মা মানুষ যেখানে পদার্পণ করিতেও শঙ্কিত হয়, মূর্খ সেখানে অবলীলাক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়ে)। সুধীসমাজ ইহাদিগকে উপহাস করে; কিন্তু এত প্রবল, এত সূক্ষ্ম ইহাদের জ্ঞান যে উপহাসকে ইহারা প্রশংসা বলিয়া মনে করে।

(৯) "জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।
দুটি যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে
ফুল কিনে নিয়ো হে অনুরাগী!
বাজারে বিকায় ফলতণ্ডুল,
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা।
হৃদয়-প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল,—
দুনিয়ার মাঝে সেই ত সুধা!"—সত্যেন্দ্রনাথ।

সম্প্রসারণ

মানুষের যেমন দেহ আছে, তেমনি আছে হৃদয়-মন। দুইএরই সুসমঞ্জস বিকাশে মানবজীবনের সার্থকতা। মানুষ যদি দেহসর্ব্বস্বই হইত, পশুর সে সগোত্র হইয়া যাইত। তাহা নয় বলিয়াই সে জীবজগতের মুকুটমণি। তবু দেহের চিন্তাই আগে করিতে হয়; কারণ হৃদয় থাকে দেহেরই আধারে। এই আধার যদি ক্ষীণ হইয়া যায়, হৃদয় আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। এই কারণেই শাস্ত্র বলিয়াছেন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। বিশেষ করিয়া হৃদয় লইয়া যাঁহাদের কারবার সেই কবিরাও দেহপুষ্টির কথা আগে চিন্তা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রজের রাখাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার সুখস্বপ্নে হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু "ননীছানা"-র আবশ্যকতা না মানিয়া পারেন নাই। এতবড় প্রেমিক কবি ওমর খইয়ামকেও সৌন্দর্য্যসাধনায় "সঙ্গে রবে সুধার পাত্র, অল্প কিছু আহার মাত্র" বলিতে হইয়াছে। একটিমাত্র পয়সা পাইলে তাহা দিয়া যদি ফুল কেনা হয়, উপবাসে দেহ মরিবে এবং হৃদয় দেহের পথেই মহাযাত্রা করিবে। দুটি পয়সা পাইলে, তবে দ্বিতীয়টি দিয়া ফুল কেনা চলে। আগে দেহ, পরে হৃদয়। তবে একথাও সত্য যে হৃদয় যদি অনশনে থাকে, আনন্দের উপাদান যদি সে না পায়, দেহের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। মনোবিজ্ঞানে ইহাকে 'Psycho-physical Parallelism' বলে। পশুদের এ বালাই নাই; মানুষের আছে। তাই, মানুষের দেহেরও খাদ্য চাই,

হৃদয়েরও খাদ্য চাই। দেহকে দিতে হইবে স্থূল ফলমূল; হৃদয়-মনকে দিতে হইবে সুকুমার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের সূক্ষ্ম অনুভূতিপন্থায় আনন্দ। মানুষের দেহমন যেন অর্দ্ধনারীশ্বর।

(১০) "কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি—
নিরমল নয়নের জলে
পাছে লোকে কিছু বলে!"—কামিনী রায়।

সম্প্রসারণ

চিরযুগই জগতে এমন একজাতীয় সঙ্কীর্ণমনা মানুষ থাকে, যাহাদের নিকট পবিত্র বলিয়া মহৎ বলিয়া কিছু নাই। তাহারা আপন বিকৃত মনের পাণ্ডুর আলোকে জগৎকে পাণ্ডুর দেখে। তাহাদের ধারণা বিশ্বের সকলেই তাহাদের মত হীন ও স্বার্থপর। দুর্ভাগ্যক্রমে এইপ্রকার নীচাশয়ের সংখ্যা জগতে নিতান্ত অল্প নয়। যে-সকল ব্যক্তি মহাপ্রাণ অথচ সবলচেতা, তাঁহারা ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াই স্বাধীনভাবে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যান। কিন্তু এমন লোকও আছেন, যাঁহারা উদার ও মহান্ হইলেও দুর্ব্বলচিত্ত, ইঁহারা ঐ সকল নীচ প্রকৃতির মানুষকে সত্য সত্যই ভয় করেন। লোক-নিন্দা, লোকলজ্জা, লোকভয় ইঁহাদের যাত্রাপথের গুরুতর বাধা। কোন মহৎ কার্য্য করিতে ইঁহারা যদি দুই পা অগ্রসর হন, তিন পা পিছাইয়া আসেন—'পাছে লোকে কিছু বলে' ইহাই ইঁহাদের ভয়। পরের বেদনায় হৃদয়বানের হৃদয় স্বভাবধর্ম্মেই কাঁদিয়া উঠে এবং সহানুভূতি-বিগলিত হৃদয় অশ্রুরূপে নয়নকোণে সঞ্চিত হয়। কিন্তু ঐ নির্ম্মল অশ্রু দেখিয়া লোকে নানা মন্তব্য করিতে পারে। কেহ হয়তো উহার মধ্যে গোপন স্বার্থ দেখিবে, কেহ বা উহার মধ্যে আবিষ্কার করিবে লোকচক্ষে ধূলি দিবার একটি কৌশলমাত্র, আবার কেহ বা উহাকে দেখিবে নারীসুলভ দুর্ব্বলতার অর্থহীন রূপায়ণরূপে। তাহারা পরিহাসের তীক্ষ্ণ শরজালে সহজসহানুভূতিশীল মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিবে। মানুষটি তাই প্রাণের ক্রন্দন প্রাণেই চাপিয়া রাখেন, নয়নপথে তাহাকে বাহির হইতে দেন না।

ভাব-সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যা

(পার্থক্য)

ভাব-সম্প্রসারণ (Amplification) ও ব্যাখ্যা (Explanation)-এর মধ্যে কি পার্থক্য তাহা বিশেষভাবে জানা উচিত।

ভাব-সম্প্রসারণে উদ্ধৃতিটির অন্তর্নিহিত ভাব প্রয়োজনমত যুক্তিতর্কের দ্বারা বিশদ করিয়া তুলিলেই চলে, কিন্তু **ব্যাখ্যায়** লেখকের ও প্রবন্ধ কথিকা বা কবিতার

নাম উল্লেখ করিতে হয়; কি প্রসঙ্গে অংশটির অবতারণা করা হইয়াছে তাহা বলিতে হয়; উদ্ধৃতির মধ্যে কোন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা অন্য কোন প্রকারের উল্লেখ (allusion) থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণ বিবরণ দিতে হয়; অলঙ্কার (উপমা প্রভৃতি) থাকিলে যথাসম্ভব তাহা ভাঙিয়া দেখাইতে হয়; বিশেষার্থে প্রযুক্ত পদ বা পদাবলীর টীকা লিখিতে হয়, প্রয়োজনমত বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যেরও উপর টিপ্পনী দিতে হয় এবং প্রয়োজন হইলে সমালোচনাও করিতে হয়।

ভাব-সম্প্রসারণের সহিত ব্যাখ্যার কিছু মিল আছে; কারণ, উভয়েরই উদ্দেশ্য ভাবের বিশদীকরণ। কিন্তু ব্যাখ্যার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভাব-সম্প্রসারণের নাই।

একটিমাত্র উদাহরণের ভাব-সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যা লিখিয়া উভয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতেছি ঃ

"শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে, লতা
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী!"

ভাব-সম্প্রসারণ

লতা তরুকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। তরুর অঙ্গে অঙ্গে নিজের ক্ষীণ-কোমল অঙ্গখানি শতপাকে জড়াইয়া আপন লতাজীবনের আনন্দ সে ভোগ করে। কবিগণ লতাকে তরুর বধূরূপে কল্পনা করেন। তরু আশ্রয়, লতা আশ্রিতা। লতা তাহার আশ্রয়-তরুটিকে নিজেই বাছিয়া লয়, অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। কাজেই বলা চলে যে লতা স্বয়ম্বরা বধূ। তরুটি যদি শুকাইয়া মরিয়া যায়, লতারও জীবনলীলার অবসান ঘটে। মানুষের মধ্যেও তাহাই। বরবধূর সম্পর্ক ঐ তরুলতার মত। বরকে অবলম্বন করিয়াই বধূর জীবন সার্থক হইয়া উঠে। এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে বধূ যেন বরের সত্তায় আপন সত্তা মিশাইয়া ফেলে। কাজেই বরের মৃত্যুতে বধূ জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। মৃতস্বামীরই চিতায় আপন জীবন আহুতি দিতেছে বা স্বামিহীন ব্যর্থ জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনায় অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করিতেছে এমন বধূও দেখা যায়। শুধু বরবধূ কেন? অন্যক্ষেত্রেও আশ্রয়দাতার মৃত্যুতে বা সর্ব্বনাশে আশ্রিতের জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল এমন ঘটনাও জগতে বিরল নয়।

ব্যাখ্যা

এই অংশটি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থের নবম সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসম্পাদনের জন্য ইন্দ্রজিতের শবদেহ যখন শোকযাত্রা-সহকারে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন স্বামীর চিতায় দেহবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পা

সহগামিনী ইন্দ্রজিৎপত্নীর অবস্থাবর্ণনপ্রসঙ্গে কবি এই সুন্দর দৃষ্টান্তটির অবতারণা করিয়াছেন।

প্রমীলার মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে; বরতনু পাণ্ডুর হইয়াছে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় তাহার প্রাণ ইতিপূর্ব্বেই স্বামীর সহিত দিব্যধামে মিলিত হইয়াছে; পড়িয়া আছে শূন্য দেহখানি। প্রমীলার এ অবস্থা খুবই স্বাভাবিক। যাহাকে সে জীবনের সর্ব্বস্বধনরূপে বরণ করিয়া তাহার অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়াছিল, সে-ই যখন চলিয়া গেল, তখন প্রমীলাজীবনের আর সার্থকতা কোথায়? তাহার সত্যকার মৃত্যু পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, স্বামীর চিতায় ভস্মীভূত হইবে শুধু দেহখানি। পতিব্রতা রমণীদিগের এইরূপই হইয়া থাকে। লতা তরুকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে—তরু তাহার বর; তাহার জীবনসর্ব্বস্বধন তরু শুকাইয়া গেলে নিরাশ্রয়া লতার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় না।

কবিকল্পনায় লতা ও তরু যথাক্রমে প্রমীলা ও ইন্দ্রজিৎ।

স্বয়ম্বরা বধূ ধনী: এই উক্তিটি দুই পক্ষেই সত্য। লতা তরুকে আপনি বরণ করে; প্রমীলাও ইন্দ্রজিৎকে নিজেই বরণ করিয়াছিল। লতা, প্রমীলা দুই-ই স্বয়ম্বরা।

ধনী নারীসম্পর্কে প্রযুক্ত শব্দ-বিশেষ। "ও **ধনী** কে কহ বাটে"—চণ্ডীদাস।

সুভাষিতাবলী

প্রবাদ

বাঙলায় অসংখ্য প্রবাদ রহিয়াছে। জাতির দীর্ঘকালের বহুমুখী বিচিত্র অভিজ্ঞতা কখন কে ভাষায় রূপায়িত করিয়াছিল, আমরা তাহা জানি না; কিন্তু অমূল্য পাথেয়রূপে এগুলিকে গ্রহণ করিয়া জীবনের যাত্রাপথে আমরা চলিয়াছি। বহুপ্রচারের ফলে জ্ঞানী ব্যক্তির বহু বাণীও প্রবাদের আকার ধারণ করিয়া সমাজে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, সত্য; কিন্তু অধিকাংশ প্রবাদই লৌকিক।

আমরা কতকগুলি প্রবাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়া দিতেছি:

মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার:

ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ করার কোন অর্থই হয় না। যদি মারিতেই হয়, তবে গণ্ডার মারিতে হইবে। ইহাতে কাজের মত কাজও হইবে, জনসমাজে শিকারীর সম্মানও লাভ করা যাইবে। গরীবের পর্ণকুটির লুট করিয়া আর্থিক লাভ কিছুই নাই, আছে শুধু কলঙ্ক। যদি লুট করিতেই হয়, তবে ধনীর ভাণ্ডারই লুটিতে হইবে। ইহাতে প্রচুর অর্থলাভের সহিত খ্যাতিলাভও যথেষ্ট হইবে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, কাজ যদি করিতেই হয়, কাজের মত কাজ করাই উচিত।

দশের লাঠি একের বোঝা ঃ

দশজন লোকের প্রত্যেকে যদি একগাছি করিয়া লাঠি হাতে তুলিয়া লয়, তাহার ভার প্রায় অনুভবযোগ্যই হয় না। কিন্তু ঐ দশগাছি লাঠি একত্র করিয়া যদি একজনের স্কন্ধে তুলিয়া দেওয়া হয়, উহাদের সম্মিলিত ভারে সে নুইয়া পড়িবে। লাঠির সার্থকতা সুকৌশল ও সহজ প্রয়োগে। এ প্রয়োগ তাহাদ্বারা মোটেই সম্ভব হইবে না। সমাজের বিচিত্র কার্য্যের ভার যদি বিভিন্ন ব্যক্তি যথাযোগ্যভাবে বণ্টন করিয়া লন, সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু একই ব্যক্তি যদি বিবিধ প্রকারের সমস্ত কাজই নিজে করিতে যান, কার্য্যসিদ্ধি তো হইবেই না, পরন্তু কার্য্যের ভারে তাঁহার অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সকল কাজের প্রতিভা সকলের থাকে না বলিয়াই সমাজে যোগ্যতানুসারে কার্য্যবণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গাছে কাঁটাল, গোঁফে তেল ঃ

কাঁটালের আটা অত্যন্ত চট্‌চটে। জল দিয়া তাহা ছাড়ান যায় না, তেল দিয়া ছাড়াইতে হয়। এই কারণে হাতে তেল মাখাইয়া কাঁটাল ভাঙাই নিয়ম। কাঁটাল খাইতে গেলে ঠোঁটে আটা লাগে। যাহাদের গোঁফ আছে, তাহাদের অবস্থা একটু কষ্টকর হইয়া উঠে। তৈলের সাহায্যে গোঁফের আটা উঠান গেলেও টানাটানিতে বেশ ব্যথা লাগে। আগে হইতে গোঁফে তেল মাখিয়া রাখিলে সঙ্কটের মাত্রা অনেক কম হয়। 'গোঁফে তেল'-এর ইহাই সার্থকতা। কিন্তু কাঁটাল যদি থাকে গাছে এবং তাহা আদৌ পাড়া হইবে কিনা তাহারও যদি স্থিরতা না থাকে, অথচ তাহারই আশায় গোঁফে যদি তেল মাখান হয়, তবে গুম্ফধারীর অবস্থাটা শোচনীয়ভাবেই উপহাস্য হইয়া উঠে। তেমনই যে কাজ এখনও হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহাও বলা যায় না, সেই কাজ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিলে লোকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে।

কালনেমির লঙ্কাভাগ ঃ

এটিরও তাৎপর্য্য তৃতীয়টির মত—ইংরেজী "Building a castle in the air"-শ্রেণীর এবং আমাদের 'আকাশকুসুম'-এর প্রায় সমগোত্র। তবে "কালনেমির লঙ্কাভাগ"-এর একটি পৌরাণিক সূত্র আছে। কালনেমি ছিল রাবণের মামা। বিশল্যকরণী আহরণ করিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিলে হনুমান্‌কে সে যদি নিহত করিতে পারে, লঙ্কারাজ্যের একটা অংশ পুরস্কারস্বরূপে সে পাইবে—ইহাই ছিল রাবণের প্রতিশ্রুতি। বেচারা মনের মতন করিয়া লঙ্কা মনে মনে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহারই ভোগের সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া ছিল। কিন্তু হনুমান্ আসিয়া সে স্বপ্ন ভাঙিয়া দিলেন—হতভাগ্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 'গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল'-ওয়ালাদের এমনি পরিণামই ঘটে।

ঘরের ঢেঁকি কুমীর :

ঢেঁকিকে সযত্নে আমরা ঘরে প্রতিষ্ঠিত করি। ধানকে চাউলে পরিণত করিবার যন্ত্ররূপে সে আমাদের প্রিয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত এই বস্তুটিকে ভয় করিবার কোন কারণই নাই। বরঞ্চ উপলক্ষবিশেষে তাহাকে আমরা দেবতার মত মর্য্যাদাও দিয়া থাকি—তাহার পূজা করিয়া থাকি। যাহার সহিত আমাদের দেহের ও মনের এত অকুণ্ঠ নৈকট্য সে যদি ছদ্মবেশী কুম্ভীর হয়, তাহার নিকট হইতে আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তেমনই যাহাকে লইয়া ঘর করি, যাহাকে প্রিয়জন জানিয়া ভালবাসি ও বিশ্বাস করি, সে যদি গোপনে আমার সর্ব্বনাশের আয়োজন করে—তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না :

সাধু ব্যক্তির যাহারা স্বগ্রামবাসী অথবা যাহারা সকল সময়েই তাঁহার সান্নিধ্যে থাকে, তাহারা তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়া থাকে। এ ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক। জগতে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু উচ্চ, তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, দূর হইতে সংস্কারহীন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যতটা সম্ভব, নিকট হইতে ততটা কখনও সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী চিনিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ-উপলব্ধি দূরের কথা, বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ শরজালে তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল। তাঁহাকে প্রথম চিনিল ইউরোপ। আজ যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা ভগবান্ বলিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না, সেই রামকৃষ্ণকেই আমরা এককালে বুজরুক বলিয়া উপহাস করিয়াছি।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে :

চোর চুরি করিয়া নিরাপদে প্রস্থান করিলে তখন গৃহস্বামী কি উপায়ে তাহাকে অনায়াসে ধরিতে পারা যাইত তাহা সহজেই নির্ণয় করিতে পারেন। ইহা মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয়। আকস্মিক আপদ্‌বিপদে মানুষ বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া যায়। বিপদ্ কাটিয়া গেলে বুদ্ধি আবার যখন প্রকৃতিস্থ হয়, তখন মানুষ কি উপায়ে বিপদ্ নিবারণ করিতে পারা যাইত, তাহা সহজেই আবিষ্কার করিতে পারে। অবশ্য, তাহাতে লাভ কিছুই হয় না ; তবু মানুষের জীবনে ইহা বারংবারই ঘটিয়া থাকে।

কালি কলম মন লেখে তিন জন :

শুধু কালিতেও লেখা যায় না, কলমেও লেখা যায় না। আবার লিখিবার ইচ্ছা ও অনুরাগ পূরাপূরি থাকাসত্ত্বেও কালিকলমের অভাব থাকিলে লেখা সম্ভব হয় না। লিখিতে হইলে তিনটির সমন্বয় চাই। জগতে সকল কার্য্যেরই মূলকথা এই। শুধু

উপায়-উপকরণ থাকিলেই কার্য্য উদ্ধার হয় না। আবার, উপায়-উপকরণের ঐকান্তিক অভাব ঘটিলে মনের ইচ্ছা ও আগ্রহ মনেই লয় পাইয়া যায়। তবে একথাও সত্য যে, ইচ্ছার অভাবে শুধু উপকরণে কার্য্যসিদ্ধি না হইলেও, মনের আগ্রহ প্রবল থাকিলে অনেকক্ষেত্রে উপকরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হয় না। লিখিতে কালি-কলম-মন তিনেরই প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য হইলেও মনের প্রয়োজনই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্।

জোর যার মুল্লুক তার ; যার লাঠি, তার মাটি ; বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ঃ

শক্তিমানের জয় সর্ব্বত্র। জীবনসংগ্রামে জয়ী তাহারাই যাহারা যোগ্যতম। জীবনকে ব্যর্থ করিবার জন্য অসংখ্য বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ত সক্রিয় রহিয়াছে। যে-সকল প্রাণী প্রবলতর প্রাণশক্তির দ্বারা এই বাধাকে অপসারিত করিতে, চূর্ণ করিয়া দিতে পারে, জগতে তাহারাই বাঁচিয়া থাকিবার, টিকিয়া থাকিবার অধিকারী। দুর্ব্বলের এখানে স্থান নাই। জীবনসম্পর্কে ইহাই প্রাথমিক এবং বিজ্ঞানসম্মত সত্য। এমনও দেখা যায় বৃহত্তর প্রাণী ক্ষুদ্রতর দুর্ব্বল প্রাণীকে ভক্ষণ করিয়া আপন দেহের পুষ্টিসাধনও যেমন করে, আপন অধিকারও তেমনি বিস্তৃততর করে। ইহার নাম 'মৎস্যন্যায়'। অসংখ্য ভোগ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ আমাদের এই বসুন্ধরা। যে বড় বড় দর্শনের বুলি কপচাইয়া প্রেমিক সাজিয়া, জ্ঞানী সাজিয়া, অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত সাধু সাজিয়া বসিয়া থাকিবে, ঈশ্বরদত্ত শক্তির সে করিবে অবমাননা ; ফলে, বসুন্ধরার অধিকার হইতে সে হইবে বঞ্চিত। যে বাহুবলে বসুন্ধরার উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবে, বসুন্ধরা তাহার ভোগ্যবস্তুর ভাণ্ডার হাস্যমুখে প্রসন্নচিত্তে তাহারই নিকট অবারিত করিয়া দিবে। জগতে ইহাই চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে এবং চলিবেও।

নাচতে না জানলে উঠানের দোষ ঃ

যে নৃত্যবিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, প্রাঙ্গণ যতই অসমতল হউক না কেন, আপন প্রতিভাবলে সেইখানেই সে নৃত্য করিয়া আপন শক্তির পরিচয় দিবে। কিন্তু যে নৃত্যবিদ্যায় পটু নয়, অথচ পরের নিকট আপন পটুত্বের বড়াই করে, তাহাকে নাচিয়া আপন নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে বলিলে সে উঠানের উপর দোষ চাপাইয়া নিজের ত্রুটি ঢাকিবার চেষ্টা করিবে। নিপুণ শিল্পীর যন্ত্র যেমনই হউক না কেন, তাহারই সাহায্যে সে আপন কৃতিত্বের অন্ততঃ আংশিক প্রমাণও দিতে পারে। কিন্তু এ বিদ্যা যাহার আয়ত্ত নহে, সে ভাল যন্ত্রপাতি পাইলেও কিছু করিতে পারিবে না। অথচ, মানুষের প্রকৃতি এমনি যে নিজের অজ্ঞতা সে স্বীকার করিতে চাহে না। স্বীকার করা দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত ভাবটিই লোকের কাছে জাহির করিয়া বাহবা লইতে চায়।

নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার ? ঃ

নেড়ামাথায় বেল পড়ার যে কি যন্ত্রণা তাহা যে-নেড়ার মাথায় বেল পড়িয়াছ

সে-ই জানে। দ্বিতীয়বার সে আর বেলতলায় যাইবে না। যে কার্য্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা করিলেই যে বিপদ্ হইবে এমন নয়। তাই মানুষ সে বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সচেতন থাকে না, থাকিলেও অনেক সময় তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। ফলে বিপদ্ ঘটিয়াও যায়। কোনও প্রকারে তাহা হইতে ত্রাণ পাইলে মানুষ সাবধান হয়—দ্বিতীয়বার সে কাজ করিতে সাহস করে না। তিক্ত অভিজ্ঞতাই মানুষকে সাবধানী করিয়া তোলে।

শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি ? ঃ

শ্যামকে রাখিতে হইলে রাধাকে কুল-ত্যাগ করিতে হইবে। অন্যদিকে, কুল রাখিতে গেলে শ্যামকে হারাইতে হইবে। শ্যাম ও কুল—ভগবান্ ও সংসার—পরস্পরবিরোধী। দুইটিকে একসঙ্গে বজায় রাখা সম্ভব নয়। রাধা কুলত্যাগ করিয়া শ্যামকেই রাখিয়াছিলেন ; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন কুল অপেক্ষা কৃষ্ণ বড়। মানুষ-মাত্রেরই জীবনে অনেক সময় এইরূপ উভয়সঙ্কট দেখা দেয়। কোন্‌টি করিব এবং কোন্‌টি করিব না, সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। দুইটি তুল্যমূল্য এই ধারণা হইলেই মানুষ সমস্যায় পড়ে। তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির দ্বারা যখন সে উভয়ের মধ্যে শ্রেয় বস্তুটিকে নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারে, তখনই সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হয় ততক্ষণ প্রশ্ন জাগে—শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি ?

যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল ; যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর ঃ

বুনো ওল ভাতে দিয়া কিংবা তাহার তরকারী রান্না করিয়া খাইলে গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অসহ্য প্রদাহ হয় (চলতি কথায় ইহাকে গলা-কুটকুট-করা বলে)। কোন কোন গাছের তেঁতুল এত ভীষণ টক যে খাইলে দাঁতগুলি আমলাইয়া যায় এবং বহুক্ষণ সে-দাঁত দিয়া কোন জিনিস চিবান যায় না। বুনো ওল খাইয়া গলা ধরিলে টক তেঁতুলের অম্বল খাইতে হয় ; ইহাতে গলা-কুটকুটানি অনেক কমিয়া যায়। অনেক সময় বাজার হইতে কেনা ওলকে বুনো বলিয়া সন্দেহ হইলে গৃহস্থেরা তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তেঁতুলের জলে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখে। ইহাতে ওলের প্রদাহিকা শক্তি হ্রাস পায়। ওলের সহিত তেঁতুলের এই সম্পর্ক—একটি রোগ, অপরটি ঔষধ ; একটি কুকুর, অপরটি মুগুর। অতিবড় পাজীকে অবিরত আঘাত না দিলে সে জব্দ হয় না। শয়তানকে শায়েস্তা করিতে হইলে আরও বেশী শয়তানীর আঘাত তাহাকে হানিতে হয়।

কানা পুতের নাম পদ্মলোচন ঃ

যাহার লোচনই নাই, তাহার পদ্মলোচন নাম শুধু অসঙ্গত নয়, উপহাস্যও বটে। তবে একটা কথা ঃ নাম একটা পরিচয়চিহ্নমাত্র ; নামধারীর রূপের বা প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকুক আর না-ই থাকুক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। সত্য ;

কিন্তু নামের বাহিরেও এমন অসঙ্গতি আমরা পদে পদে করি। যাহার যে গুণ নাই তাহার মধ্যে সেই গুণ আমরা দেখিয়া থাকি এবং পরের কাছে সাড়ম্বরে তাহা প্রকাশও করিয়া থাকি। ইহা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আমাদের স্নেহাধিক্যের বা পক্ষপাতিত্বের ফল। স্নেহ অন্ধ; তাই সে অঘটন ঘটায়। নিরপেক্ষ লোক এই অসঙ্গতি ধরিয়া ফেলে এবং বিদ্রূপ করিয়া বলে—'কানা পুতের নাম পদ্মলোচন'।

বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন ঃ

এমন অনেক লোক আছে যাহারা ঘরের বাহিরে যাইবার সময় পরিষ্কার একখানি কাপড় সুন্দরভাবে পরিয়া কোঁচাটি পরিপাটি করিয়া কুঁচাইয়া ঝুলাইয়া দেয়; দেখিলে মনে হয় সচ্ছল-পরিবারভুক্ত সৌখিন বাবু। কিন্তু সন্ধান লইলে জানা যায়—'ভাঁড়ে মা ভবানী'। নিজের অভাব ও দারিদ্র্য জনসমাজে গোপন করিবার এবং লোকের মনে বিপরীত ধারণা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই কোঁচার বাহারের পত্তন অনেকেই করিয়া থাকে। সাংসারিক অবস্থার ক্ষেত্রেই এই প্রবাদটির প্রয়োগ হইলেও বিদ্যা, চরিত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই প্রতারণার পথ ধরিয়া যাহারা চলে তাহাদেরও সম্পর্কে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয় ঃ

বাঘ সাধারণতঃ সন্ধ্যার মুখেই আহার-অন্বেষণে বাহির হয়। এই কারণে যেখানে বাঘের ভয় থাকে, লোক সন্ধ্যার আগেই সে স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হইয়া যায় আর। যতই সে সাবধান হউক না কেন, ঘটনাচক্রে পথে তাহার দেরী হইবেই এবং বাঘের জায়গাটিতেই হইবে তাহার সন্ধ্যা। যে কাজ করিলে বিপদের সম্ভাবনা, মানুষ যথাসাধ্য তাহা এড়াইয়া যাইতে চায়; কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, পাকেচক্রে সেই কাজই করিতে তাহাকে বাধ্য হইতে হয়।

ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় ঃ

ছোট একটি ঢিল দিয়া যদি কেহ অপরকে আঘাত করে আঘাতকারীকে বড় একটি ঢিল দিয়া সে প্রত্যাঘাত করিবে—ইহাই জগতের নিয়ম; কারণ, "মেরেছ কলসীর কানা তাই ব'লে কি প্রেম দিব না" বলিবার লোক জগতে বিরল। পরের অনিষ্ট করিয়া নিজে অক্ষত থাকা যায় না। কৃতানিষ্ট ব্যক্তি অনিষ্টকারীর গুরুতর ক্ষতি করিবেই।

গাড়ীর ওপর না', না'য়ের ওপর গাড়ী ঃ

জলে ভাসাইবার জন্য নৌকাকে গাড়ীতে করিয়া কারখানা হইতে নদীর ধারে লইয়া যাইতে হয়। আবার গাড়ীকে নদী পার করিতে হইলে তাহাকে নৌকায় তুলিতে হয়। কাহারও অহঙ্কার করিবার কিছু নাই; কারণ, ক্ষেত্রবিশেষে উভয়েই

উভয়ের উপর নির্ভরশীল। মানুষের সম্পর্কেও এই কথা। আজ তুমি বড় আছ, ছোট তোমার দ্বারে সাহায্যার্থী। তাহাকে প্রসাদ-কণিকা দিয়া তোমার অহঙ্কারের সীমা নাই। অদৃষ্টের লীলারহস্য কেহই জানে না। কাল এমন হইতে পারে যে উহার সাহায্য বিনা তোমার অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। উহার প্রসাদকণিকালাভের উদ্দেশ্যে তোমাকে উহার দ্বারপ্রান্তে ভিক্ষুকের মত দাঁড়াইতে হইবে। ইহার নাম "গাড়ীর ওপর না', না'য়ের ওপর গাড়ী"।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়ঃ

ঘরে আগুন লাগায় গোঁজে বাঁধা যে গোরু কতক পুড়িয়া কোনরকমে দড়া ছিঁড়িয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, পোড়ার যে কি জ্বালা তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে। আকাশে রক্তবর্ণের মেঘ দেখিলে সে তাহাকে আগুনের শিখা বলিয়া মনে করে এবং সভয়ে তাহার পানে তাকাইয়া ছুটিয়া পলায়ন করে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। বিপদের তীব্র জ্বালাময় অভিজ্ঞতা যে মানুষের আছে, তাহারও মানসিক অবস্থা এইরূপ হয়। বিপদ্ যেখানে সত্য নয়, কাল্পনিকমাত্র, সেখানেও সে ভয়ে শিহরিয়া উঠে এবং আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়।

ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়াঃ

পরের দয়ার দান মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন যাহার দিন যায় না, ভিক্ষার চাউল ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিবার অধিকার তাহার নাই। যথাযোগ্য মূল্য দিয়া যদি সে চাউল কিনিত অথবা দৈহিক শ্রমের বিনিময়রূপে তাহা সে অর্জ্জন করিত, তাহা হইলে চাউলের গুণসম্বন্ধে বিচার করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহার থাকিত। সকল বস্তুর সম্বন্ধেই এই কথা। যাহা অর্জ্জন করিতে হয় না, অন্যের অনুগ্রহরূপে আসে, তাহা নির্ব্বিচারেই গ্রহণ করিতে হয়।

অতিবাড় বেড়ো না ঝড়ে প'ড়ে যাবে, অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়াবেঃ

বটবৃক্ষের মত বনস্পতির দেহে ঝঞ্ঝাঘাত গুরুতরভাবেই লাগে। তাহাতে তাহার দুইএকটি শাখাপ্রশাখা ভাঙিয়া যাইতে পারে; কিন্তু বৃক্ষটি ভাঙিয়া পড়ে না। কারণ, তাহার মূল, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা বলিষ্ঠ এবং প্রাণশক্তি প্রচুর। কিন্তু যে-সকল গাছের গঠন শিথিল ও দুর্ব্বল তাহারা বেশী বাড়িয়া উঠিলে ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাত সহিতে পারে না, ভাঙিয়া পড়িয়া যায়। যেমন—পেঁপেগাছ, ভেরেণ্ডাগাছ ইত্যাদি। ছাগলে ছোট গাছ মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে সত্য; কিন্তু তুলসী প্রভৃতি গাছ ছাগলে স্পর্শও করে না। মানুষের মধ্যেও যাঁহারা সত্য সত্য বড় (বিবেকানন্দ, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি), তাঁহাদের কখনই পতন হয় না। যাঁহারা ছোট অথচ তুলসীর মত সদ্গুণসম্পন্ন, তাঁহারা সার্থকজীবনই যাপন করেন। পতন হয় তাহাদেরই, যাহারা সত্যকার বড় নয়, পরন্তু নিজের ওজন বুঝে না, সীমার বাহিরে চলিয়া যায়,

আত্মাভিমান যাহাদের অস্বাভাবিক, দম্ভ গগনস্পর্শী। ধ্বংস হয় তাহাদেরই যাহারা অতিছোট অর্থাৎ ছোট ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির ; সামান্য লোকও তাহাদিগকে অবজ্ঞা করে, সমাজের আবর্জ্জনাবোধে ঘৃণার চক্ষে তাহাদের দেখিয়া থাকে।

খেলতে জানলে কানা কড়িতেও খেলা যায় ঃ

যে-কড়ির পিঠের দিক্‌টা ভাঙা তাহার নাম কানাকড়ি ঃ ইহার দ্বারা 'চিৎ' 'উপুড়' প্রভৃতি ভাল করিয়া করা যায় না। মানুষের মধ্যে যাহারা বেশ কাজের নয়, তাহাদিগকে কানাকড়ি বলা হয়। তবু, কড়িখেলার বিদ্যাটি যে আয়ত্ত করিয়াছে, এই কানাকড়ি লইয়াও সে কোন রকমে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু কড়িখেলার কৌশল যে জানে না, ভাল কড়ি দিলেও সে জিতিতে পারিবে না। কাজ করিবার উপকরণগুলি বা যন্ত্রগুলি যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়, তবু পাকা লোকে তাহারই সাহায্যে কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবে। খুব ভাল না হইতেও পারে ; কিন্তু কাজ যে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অজ্ঞলোকের হাতে উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি দিলেও তাহার প্রয়োগ-কৌশল সে জানে না বলিয়া কাজ কিছুতেই সম্পন্ন করিতে পারিবে না। যদি বা কিছু করে, হয়তো তাহা 'শিব গড়িতে বাঁদর' হইবে অথবা 'ছিল ঢেঁকি হ'ল তুল, দেখতে দেখতে নির্ম্মূল' হইয়া যাইবে।

দশচক্রে ভগবান্ ভূত ঃ

রাজার প্রশ্রয়ে ভগবান্ নামে এক ব্যক্তি অতিবাড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল ; সকলকেই সে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠায় তাহারা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া প্রচার করিয়া দিল যে ভগবানের মৃত্যু হইয়াছে। রাজাকেও একথা শুনান হইল এবং রাজা তাঁহার প্রিয়পাত্রের মৃত্যুতে অতীব দুঃখিত হইলেন। কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে ভগবানের রাজবাড়ীর ত্রিসীমানায় পা বাড়ানও অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন রাজা পথে দূর হইতে ভগবানের কণ্ঠধ্বনি শুনিলেন— ভগবান জানাইতেছে যে তাহার মৃত্যু মিথ্যা কথা। কিন্তু অনুচরবৃন্দ রাজাকে বুঝাইয়া দিল ঐ ভগবান্ জীবিত ভগবান্ নয়, তাহার প্রেতাত্মা। রাজা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন ও গৃহে ফিরিলেন। জনগণের সমর্থনেই জীবনের সার্থকতা, বিরোধিতায় জীবন ব্যর্থ। ইহারা মিলিতভাবে চক্রান্ত করিলে হয়কে নয়, নয়কে হয় করিয়া দিতে পারে।

কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ ঃ

পৌষ-মাস ; মা লক্ষ্মী ঘরে আসিয়াছেন ; গোলাভরা সোনার ধান, মুখভরা হাসি—এই এক চিত্র। ইহার পার্শ্বের চিত্রটি ঠিক বিপরীত—কঙ্কালসার বুভুক্ষু, মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত, শুষ্ককণ্ঠের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ অস্ফুটে বাহির হইয়া শূন্যে মিলাইয়া

যাইতেছে। একদিকে সম্পদ্, অন্যদিকে বিপদ্; একদিকে উৎসবানন্দের কলকল্লোল-মুখরিত শোভাযাত্রা, অন্যদিকে মর্ম্মন্তুদ হাহাকারমুখর শোকযাত্রা। আলোক-অন্ধকারের মত পরস্পরবিরোধী এই ঘটনাবলী একই সঙ্গে ঘটিতেছে। ইহাই জগৎ, ইহাই জীবন।

যার কর্ম্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে :

মানুষের প্রকৃতি-অনুগত যে কাজ, তাহা সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে; কিন্তু কাজটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেই বিভ্রাট্ ঘটায়। কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে তাঁহার

"আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা;
থাকুক তোমার পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু, শিব সা"।

ভাববিলাসী স্বপ্নাতুর কবি রবীন্দ্রনাথকে যদি পাটকলের বড়বাবু করিয়া পাঠান হইত এবং বড়বাবু ঝুনঝুনওয়ালাটিকে কাব্য লেখার ভার দিয়া শান্তিনিকেতনে আনা হইত, তবে পাটকল ও শান্তিনিকেতন দুটিরই অপমৃত্যু ঘটিত। ভগবান্ যাহাকে যে কাজের ভার দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, সে সেই কাজ করিলে তাহারও মঙ্গল, দশেরও মঙ্গল।

ভাব-সঙ্কোচন

ভাবের যেমন সম্প্রসারণ করিতে হয়, তেমনি প্রয়োজন হইলে তাহার সঙ্কোচ-সাধনও করিতে হয়। ভাব-সঙ্কোচনের অর্থ মূলভাবটিকে কুঁচকাইয়া ছোট করিয়া তাহার অঙ্গহানি করা নয়। ভাবটি ঠিকই থাকিবে; কেবল তাহার প্রকাশকে সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে।

এই কাজ তিন প্রকারে করা যায়: **সংক্ষেপীকরণ** (Summarising), **সারাংশলিখন** (Substance-writing) ও **গূঢ়ার্থ-লিখন বা মর্ম্মোদ্‌ঘাটন** (Giving purport বা Central idea)।

(ক) সংক্ষেপীকরণ

মূল উদ্ধৃতিতে লেখকের যাহা যাহা বলিবার থাকে, সংক্ষেপীকরণে সেগুলি সবই রাখিতে হয়; শুধু প্রকাশ করিতে হয় নিজের ভাষায় স্বল্পপরিসরের মধ্যে।

(খ) সারাংশলিখন

উদ্ধৃতিটি বার বার পড়িয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটির স্পষ্ট ধারণা করিতে হয়। প্রধান ভাবের সহিত কিছু অপ্রধান ভাবও উহাতে থাকিতে পারে। এই অপ্রধান ভাব বর্জ্জন করিতে হয়। উদ্ধৃতির ভাষায় অলঙ্কার থাকিলে সারাংশলিখনে তাহার পরিহার বাঞ্ছনীয়। সারাংশলিখনের জন্য উদ্দিষ্ট উদ্ধৃতিতে প্রধান ভাব সাধারণতঃ

একাধিক থাকে। সবগুলিই এরূপক্ষেত্রে বজায় রাখিতে হয় ; কেবল প্রকাশ করিতে হয় স্বল্পপরিসরে এবং সম্পূর্ণ নিজের ভাষায়।

উভয় (ক ও খ) কার্য্যেই মূলটির মধ্যে প্রত্যক্ষ উক্তি থাকিলেও বাঙলাভাষার প্রকৃতি-অনুযায়ী তাহাকে পরোক্ষেই প্রকাশ করিতে হয়।

(গ) মর্ম্মোদ্ঘাটন

উদ্ধৃতিটি বার বার অতীব মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাহার কেন্দ্রগত সূক্ষ্ম ভাবটি অতি সংক্ষেপে, সম্ভব হইলে একটিমাত্র বাক্যে, প্রকাশ করিতে হয়। এ কাজটি কিছু কঠিন ; কিন্তু অভ্যাসে আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

আমরা একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার তিনভাবের সঙ্কোচন দেখাইয়া দিতেছি। মনোনিবেশসহকারে তুলনায় পাঠ করিলে পার্থক্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে :

১। "দেবতা-মন্দিরমাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা-দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে,—'গৃহ মোর নাই,
একপাশে দয়া ক'রে দেহ মোরে ঠাঁই।'
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে—
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে!'
সে কহিল, 'চলিলাম'—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে—'প্রভু, মোরে কি ছল ছলিলে!'
দেবতা কহিল,—'মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে'।"

—রবীন্দ্রনাথ।

সংক্ষেপীকরণ : এক প্রবীণ ভক্ত মন্দিরে বসিয়া দিনরাত্রি মালা জপ করিত। একটা সন্ধ্যায় এক নগ্নপ্রায় ধূলিধূসর ভিক্ষুক ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া একটু আশ্রয় প্রার্থনা করিল। ভক্ত অপবিত্রজ্ঞানে সসঙ্কোচে তাহাকে দূর করিয়া দিল। চলিয়া যাইবার প্রাক্কালে ভিক্ষুক সহসা দেবমূর্ত্তি ধারণ করিল। ইহাতে বিমূঢ় ভক্ত দেবতার এ ছলনার কারণ জানিতে চাহিলে দেবতা বলিলেন যে তিনি দীনবেশে দ্বারে দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইয়া ফিরেন ; যে দরিদ্রকে আশ্রয় দেয়, তিনি তাহারই ঘরে থাকেন।

সারাংশলিখন ঃ এক ভক্ত মন্দিরে মালাজপে রত ছিল। এমন সময় একদা সন্ধ্যায় এক দীন ভিক্ষুক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঐখানে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করিল। ভক্ত অপবিত্রজ্ঞানে তাহাকে দূর করিয়া দিল। ভিক্ষুক সহসা দেববেশ ধারণ করিলে ভক্ত এ ছলনার কারণ জানিতে চাহিল। দেবতা বলিলেন, যে দরিদ্রকে আশ্রয় দেয়, তিনি তাহারই ঘরে থাকেন।

মর্ম্মোদ্‌ঘাটন ঃ দরিদ্র-সেবাই প্রকৃষ্ট ঈশ্বর-সেবা।

মন্তব্য ঃ সকল রচনারই উক্তরূপে ত্রিবিধ ভাব-সঙ্কোচন সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক রচনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মর্ম্মের অভাব থাকে বলিয়াই তাহার উদ্‌ঘাটনেরও প্রয়োজন হয় না। এইজাতীয় লেখার ভাব-সম্প্রসারণও চলে না।

২। "আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে ;
হের ঐ ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে মা এসেছে ঘরে
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে ;
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে।
তাই বুঝি আঁখি ছলছল
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মা'র মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে, 'মাগো, এ কেমন ধারা ?
এত বাঁশী, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন' ?"

—রবীন্দ্রনাথ (পাটনা প্র. ১৯৪০)

সারাংশলিখন ঃ আনন্দময়ী জননীর আগমনে দেশে আনন্দ-উৎসবের প্লাবন বহিতেছে। দরিদ্রঘরের মাতৃহারা এক কন্যা মা দেখিতে ধনীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালিকার চক্ষু অশ্রুসজল। যাঁহার এত ঐশ্বর্য্য, যাঁহাকে ঘিরিয়া এত উৎসব আনন্দ, তিনি যদি তাহার জননী, তবে তাহার মলিন বসন কেন এই কথা সে মাকে অভিমানভরে জিজ্ঞাসা করিতেছে।

৩। এদেশপ্রবাসী সাহেবমাত্রেই প্রায় শিকারী, অল্পবিস্তর শিকারদক্ষ। সাহেবদের প্রায় সকলেরই কাছে বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলি থাকে ; কিন্তু নিরীহ, নির্জ্জীব, নিরাশ্রয় কৃষক ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের আত্মরক্ষার্থ কি আছে ? তাঁহারা নিরস্ত্র, অস্ত্রচালনা করিতেও জানেন না ; যাঁহারা জানিতেন তাঁহারাও ভুলিয়া যাইতেছেন ; অতএব তাঁহাদের ভীতি ও দুর্গতি কেবল অনুভবনীয়। (ক. বি. প্র. ১৯৪২)

সংক্ষেপীকরণ ঃ এদেশপ্রবাসী সাহেবদের প্রায় সকলেই শিকারী ; তাহাদের প্রায় সকলেরই বন্দুক প্রভৃতি আছে। কিন্তু দরিদ্র অসহায় কৃষক ও মধ্যবিত্তগণের আত্মরক্ষা করিবার কোনও অস্ত্র নাই ; অস্ত্রের প্রয়োগও তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের ভীতি ও দৈন্য বর্ণনাতীত।

৪। "বিদ্যাসাগরের বাহিরটা ছিল বজ্রের মত, কিন্তু ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন-ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বৈরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব—এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। বিদ্যাসাগরের বিশেষ অসাধারণত্ব এই যে তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের মত জ্ঞান করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া পারিতেন না। বায়ুপ্রবাহে দ্রুম ও সানুমানের মধ্যে দ্রুমে চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান্ চঞ্চল হয় না। এক্ষেত্রে বোধ করি সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান্‌ই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়।"—রামেন্দ্রসুন্দর।

সারাংশলিখন ঃ বাহিরে বিদ্যাসাগর ছিলেন কঠোর, অন্তরে ছিলেন কোমল। আপন সুখদুঃখসম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন ; কিন্তু পরের দুঃখে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত, তিনি অশ্রুপাত না করিয়া পারিতেন না। এইখানেই ছিল তাঁহার অসাধারণত্ব। কঠোর পর্ব্বত আপন বক্ষের বারিধারায় বিশ্বের কল্যাণ সাধন করে। তেমনি বাহিরে কঠোর বিদ্যাসাগরও অন্তরের করুণায় পরের মঙ্গল করিতেন।

সংক্ষেপীকরণ ঃ বিদ্যাসাগর বাহিরে ছিলেন কঠোর, কিন্তু অন্তরে কোমল। অশ্রুপাত বিজ্ঞনিন্দিত হইলেও পরের দুঃখে অশ্রুমোচন প্রাচ্যের ধর্ম্ম। এবিষয়ে বিদ্যাসাগর পূরাপূরি প্রাচ্য ছিলেন—নিজের সুখদুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া পরের দুঃখে অশ্রুমোচনই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। পর্ব্বত কঠোর ; কিন্তু তাহারই বক্ষোনিঃসৃত বারিধারায় বিশ্বের মঙ্গল হয়। বাহিরে কঠোর বিদ্যাসাগরেরও অন্তরের করুণায় পরের কল্যাণ সাধিত হইত।

৫। "আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী-'পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"—কামিনী রায়।
(এলাহাবাদ বি. প্র. ১৯৪৪)

সারাংশলিখন ঃ স্বার্থপরতা মানবজীবনের ধর্ম্ম নহে। পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই সত্যকার জীবনধর্ম্ম।

৬। "এই কশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিল দুহুঁ হিন্দুমুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপরায়,
যাঁর সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাঙলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব;
আত্মার সাথে হবে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধর্ম্মী মানুষ মিলিবে—নহে এ স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতিকেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়।"—সত্যেন্দ্রনাথ।

সংক্ষেপীকরণ ঃ ভক্ত তুলসী এই কাশীধামে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এইখানে রচিত কবীরের দোঁহা হিন্দুমুসলমানের মিলন ঘটাইয়াছিল। বাঙলার নবজীবনের উদ্গাতা রাজা প্রতাপরায়ের এই কাশীধামে দেহান্তর হইয়াছিল। কাশী মাঙ্গল্য-নিকেতন। মনে হয়, এই কাশীতে একদিন নিখিল মানবের আত্মিক মিলন ঘটিবে এবং কাশীই হইবে বিশ্বের ভক্তিকেন্দ্র।

৭। "জীবন-সংগ্রামের একটি প্রধান দিক্ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙালী সকল দিকের সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে। এইরূপ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া উন্নতির সকল প্রকার পথ হইতে বিতাড়িত হইলে, অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বাঙালীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। মানুষ যদি খাইতে না পায়, রোগজীর্ণ দুর্ব্বল দেহে যদি স্বাস্থ্যের আনন্দ অনেকদিন ধরিয়া আস্বাদন না করে, যুবকের মুখের হাসি না ফুটিতেই যদি

মিলাইয়া যায়, তবে বিষাদক্লিষ্ট দেহভার সে আর কতদিন বহন করিতে পারিবে? তাই আজ বাঙলার চারিদিকে হাহাকার; এই দেশব্যাপী করুণ আর্ত্তনাদেও যদি বাঙালী যুবকের মোহ না ঘুচে, এই ঘোর দুর্দ্দিনেও যদি সে চাকরীর মায়ায় এবং উৎকট ভোগের অনাচারে মজিয়া থাকে, তবে তাহার সে দুর্ভাগ্য বর্ণনা অপেক্ষা নীরব অনুভূতির দ্বারা সমধিক বুঝিতে পারা যাইবে!"—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

সারাংশলিখন: জীবন-সংগ্রামে বাঙালী পরাজিত। উন্নতির সর্ব্বক্ষেত্র হইতে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিতাড়িত হইতে থাকিলে জাতির অস্তিত্বলোপের আশঙ্কাই স্বাভাবিক। অনাহারক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ, নিরানন্দ দেহের ভার মানুষের পক্ষে বেশীদিন বহন করা সম্ভব নহে। দেশে আজ হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতেও যদি বাঙালী যুবকের চৈতন্য না জাগে, দাসত্বের মায়া তথা হীন ভোগাসক্তির মোহ না কাটে, তবে তাহার দুর্ভাগ্য মাত্র অনুভবনীয়।

৮। "দারিদ্র্যের কষাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা কাঁদে ভগ্নী মোর,
বিলাসেতে মগ্ন আমি;—কই ঝরে নয়নের লোর?
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন;—
একটিও দীপ আমি নাহি কেন করি প্রজ্বালন?
কোটিকণ্ঠে রোগে শোকে, শুনি, উঠে তীব্র আর্ত্তনাদ;
আমি হাসি 'হা! হা!' ক'রে—নাহি চিন্তা, নাহিক বিষাদ!
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয়;
দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, প্রেমে—বচনেতে নয়।
বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হ'য়ে গেছে প্রাণ;
কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি স্ফূর্ত্তি, অন্তর্য্যামী, কর মোরে দান।
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাই পরমেশ—
সত্য সত্য বুঝি যেন জননীরূপিণী মোর দেশ।"

—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

সারাংশলিখন: স্বদেশের কোটি কোটি নরনারী যখন অজ্ঞতায় অন্ধ, দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত, রোগভারে ম্রিয়মাণ, কবি তখন বিলাসের জীবন যাপন করিতেছেন, অথচ নিজেকে দেশপ্রেমিক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাই তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার দেশপ্রেম কপট। সত্যকার দেশভক্তি বচনে নয়—ত্যাগে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, প্রেমে। ভগবানের নিকট তাঁহার প্রার্থনা দেশকে যেন তিনি জননীরূপে বুঝিতে পারেন এবং কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি ও স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।

ভাবের পুনঃপ্রকাশ

অন্যের রচনায় ভাব আর একপ্রকারে প্রকাশ করা যায়। ইহাতে ভাব সঙ্কুচিতও হয় না, সম্প্রসারিতও হয় না; আবশ্যক অনাবশ্যক বা প্রধান অপ্রধান, সমস্ত কবিচিন্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজের ভাষায় তাহা পুনরায় প্রকাশিত করিতে হয়। ইহাকে ইংরেজীতে বলে 'Reproduction of ideas'; আমরা বলিব **ভাবের পুনঃপ্রকাশ**। ইহাতে নূতন রচনাটি মূল অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়া গেলেও তাহা দূষণীয় হয় না।

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর ;
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি,—সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কল-বসন,
মগ্ন হ'য়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ-পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব ;—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরি পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন,—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।"—রবীন্দ্রনাথ। (ক. বি. প্র. ১৯২৯)

লৌহ, প্রস্তর, কাষ্ঠ আধুনিক সভ্যতার উপাদান। এ সভ্যতা কঠোরনিষ্ঠুর; মানুষের দেহকে ইহা ভোগায়তনে পরিণত করে, কিন্তু নিরবশেষে গ্রাস করিয়া ফেলে তাহার অন্তরাত্মাকে। ইহার লীলাভূমি নগর—প্রকৃতির সর্ব্বস্পর্শবর্জ্জিত কৃত্রিম শুষ্ক কঠিন নগর। এ নগর চাহি না। ফিরিয়া আসুক অতীতের সেই অরণ্য—সেই পুণ্যচ্ছবি তপোবন, পবিত্র চিন্তায় নির্ম্মল জীবনের স্পর্শে শুভ্রোজ্জ্বল সেই দিনগুলি; সেই সন্ধ্যাস্নান, সেই গোচারণ, সেই সামগীতি। আজিকার সভ্যতায় দেহের জন্য মহামূল্য নব নব পরিচ্ছদ, পবিত্র ভোজ্যের আয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু আত্মার প্রসারের কোন উপায় নাই। আরণ্য-সভ্যতায় দেহের জন্য ছিল সামান্য নীবার-মুষ্টি ও বল্কল-বসন; কিন্তু আত্মার প্রসারের জন্য ছিল সমাহিত চিত্তে মহাতত্ত্বসমূহের আলোচনা। সেই জীবনই ফিরিয়া আসুক। আজিকার এই দেহবাদসর্ব্বস্ব ক্রূর সভ্যতা চাহি না। আমি চাহি অন্তরের স্বাধীনতা, মহতী কল্পনার অবাধ প্রসার, পরিপূর্ণ আত্মশক্তি।

আমি চাহি সকল বাধা ছিন্ন করিয়া আপন প্রাণে বিশ্বের প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতে, বিশ্বমানবের সহিত আত্মার আত্মীয়তা স্থাপন করিতে।

অনুবাদ

প্রথমেই জানিয়া রাখা ভাল যে অনুবাদ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এক ভাষা হইতে অন্যভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে দুইটি ভাষারই অন্তঃপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা আবশ্যক। ভাষামাত্রেরই প্রকাশভঙ্গীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইংরেজী বাক্যের পদবিন্যাস সর্ব্বাংশে বাঙলা বাক্যের পদবিন্যাসের মত নয়। ইংরেজ সকর্ম্মক ক্রিয়ার পরে কর্ম্ম বসায়, আমরা বসাই আগে—'I have read the book'-কে 'আমি পড়িয়াছি বইখানি' বলিলে বাঙলায় ইংরেজী বলা হইবে, অনুবাদ হইবে না। ইংরেজীতে 'Introductory *There*' আছে, 'Impersonal *It*' আছে, আমাদের নাই—আমাদের 'এক ছিল রাজা'-কে ইংরেজ বলিবে 'There was a king' এবং ইংরেজী 'It is raining'-কে আমরা বলিব 'বৃষ্টি হইতেছে'। 'A tree is known by its fruit'-কে আমরা বলিব 'গাছ চেনা যায় ফলে' ('ফলেন পরিচীয়তে')—আমাদের কাছে এই 'A' অবান্তর। 'The cow is a domestic animal' আমাদের ভাষায় 'গোরু গৃহপালিত পশু'—'The' বা 'a'-র প্রতিশব্দ নিষ্প্রয়োজন।

বাঙলার সত্তাবাচক ক্রিয়াপদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে না। (কোথাও উহ্য থাকে, কোথাও বা প্রয়োগ করিলে হয় অর্থবিভ্রাট্ ঘটে, না হয় শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে); ইংরেজীতে প্রধান বাক্যে এইজাতীয় ক্রিয়াপদ উল্লিখিত থাকে। 'He is my father' বাঙলায় 'তিনি আমার পিতা'। The way is long ; but my legs are weak and my mind is weaker still = পথ দীর্ঘ ; কিন্তু আমার চরণ দুর্ব্বল এবং আমার মন দুর্ব্বলতর—কোথাও is-এর প্রতিশব্দ নাই। আমাদের 'আপনি' আছে, 'তিনি' আছে ; ইংরেজীতে তুমি-ও You, আপনি-ও You, সে-ও He, তিনি-ও He। ইংরেজী Emphatic 'It'-এর কাজ বাঙলায় নিশ্চয়ার্থক 'ই'-র দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়—'It is you who did it'-এর বঙ্গানুবাদ 'তুমিই একাজ করিয়াছিলে' ('ইহা তুমি, যে একাজ করিয়াছিল' বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বাঙলা অক্ষরে লেখা ইংরেজী)।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—Faithful translation ; ইহার অর্থ 'আক্ষরিক অনুবাদ' নয় ; পরন্তু এমন অনুবাদ, যাহাতে মূলের ভাষায় নিবদ্ধ ভাবধারা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে প্রকাশ পাওয়ায় অনুবাদটি নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। একটি উদাহরণ দিতেছি :

In recent years, and for the first time, a children's literature is slowly growing up in Bengal—a literature of Indian stories and legends illustrated with Indian pictures. But the beginnings are still small and

local, and the need is national. This task must not be postponed to some more convenient season or relegated to the leisure moments of busy men, to be dealt with when the claims of public office and affairs have been satisfied.

আক্ষরিক অনুবাদ (Literal translation): সাম্প্রতিক বর্ষগুলিতে, এবং প্রথম সময়ের জন্য, একটি শিশুগণের সাহিত্য ধীরে ধীরে বাঙলাদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—ভারতীয় চিত্রসমূহের দ্বারা উদাহৃত ভারতীয় গল্পসকল ও পৌরাণিক কাহিনীগুলির একটি সাহিত্য। কিন্তু আরম্ভসকল এখনও ক্ষুদ্র ও স্থানীয়, এবং আবশ্যকতা জাতীয়। এই কর্ত্তব্য অবশ্যই কোনও সুবিধাজনক ঋতু পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা যাইবে না অথবা সরকারী আফিস এবং কার্য্যাবলীর দাবী সন্তুষ্ট হইলে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত মানুষগণের অবসর মুহূর্ত্তগুলির উপর অর্পণ করা হইবে না।

নির্ভরযোগ্য অনুবাদ (Faithful translation): সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে বাঙলাদেশে প্রথম শিশুসাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে—এ সাহিত্য ভারতীয় কথা ও কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং ভারতীয় চিত্রের দ্বারা বিশদীকৃত। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রয়াস এখনও সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, যদিচ এ অভাব জাতীয় অভাব। এ কার্য্য অধিকতর সুযোগপূর্ণ সময়ের প্রতীক্ষায় কোনও ক্রমেই স্থগিত রাখা চলে না; অথবা এমন কর্ম্মব্যস্ত ব্যক্তিগণের হস্তেও ইহার ভার অর্পণ করা চলে না, যাঁহারা সরকারী বা সাধারণের শত কার্য্যের দাবী মিটাইয়া আপন অবকাশমত এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন।

—ইহারই সত্যকার অনুবাদ:

এইখানে একটা কথা বলিতে চাই। ইংরেজীর বাঙলা অনুবাদকে ছাত্র এবং অছাত্র অনেকেই Retranslation বলেন। ইহা গুরুতর ভুল। Retranslation-এর বাঙলা প্রতিশব্দ **পুনরনুবাদ**। ইংরেজীতে লিখিত কোন কিছুকে প্রথমে বাঙলায় অনুবাদ করিয়া এই অনুবাদকে আবার যদি ইংরেজীতে অনুবাদ করি, তবে তাহা হয় Retranslation:

Original (ইংরেজী):	There was once a kingdom called Kosala.
Translation (বাঙলা):	একসময়ে কোশল নামে একটি রাজ্য ছিল।
Retranslation (ইংরেজী):	Once upon a time there was a kingdom Kosala by name (এইটিকে যে ঠিক প্রথমটির মতই হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।)

ইংরেজী হইতে বাঙলা অনুবাদকে Translation বলিতে হইবে—Retranslation বলা কোনমতেই চলিবে না। এত বড় একটা ভুল যে কেমন করিয়া স্কুলকলেজে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

Rama said to Lakshman—"My stepmother Kaikeyi has all along loved me even as my own mother Kowsalya has done. Our esteemed father has ever been full of affection for me. It is strange that the punishment of exile has come from my own beloved parents who are my best well-wishers on the earth. Lakshman, don't you see in this unusual event the hand of God ? I take it to be divine dispensation, over which no one has any hand, and as such I am bound to go to the forest." (ক. বি. ১৯২৭)

অনুবাদঃ রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমার জননী কৌশল্যার মতই আমার বিমাতা কৈকেয়ী আমাকে এতাবৎকাল স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের পূজনীয় পিতৃদেবের চিরদিনই আমার প্রতি গভীর স্নেহ। পৃথিবীতে যাঁহারা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী, বিস্ময়ের কথা—নির্ব্বাসনদণ্ড আসিল সেই আমার পরমপ্রিয় পিতামাতার নিকট হইতে! লক্ষ্মণ, এই অসাধারণ ব্যাপারে তুমি কি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইতেছ না? আমি ইহাকে বিধির বিধান বলিয়াই মনে করি; ইহার উপর কাহারও কোনও হাত নাই; এই হেতু আমি বনে যাইতে বাধ্য।"

Lakshman replied in a firm tone—"If it wert God's dispensation it would not be possible for us to change the course of events. But permit me to use my arms, and you will see that I shall conquer the kingdom by force and instal you on the throne of Ayodhya in no time. When we can get over our present trouble by our own power, why should we act like cowards and suffer this wrong by accusing Providence ?" (ক. বি. ১৯২৭)

অনুবাদঃ লক্ষ্মণ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"ইহা যদি বিধির বিধানই হইত, ঘটনাপ্রবাহের পরিবর্ত্তনসাধন আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু আমাকে অস্ত্রপ্রয়োগের অনুমতি দিন, দেখিবেন আপন বাহুবলে এ রাজ্য জয় করিয়া আমি অবিলম্বে আপনাকে অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব। যখন আপন শক্তিতে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারি, তখন কেন আমরা কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করিব, বিধাতার নামে দোষারোপ করিয়া কেন আমরা এই অন্যায় সহ্য করিব?"

It was the last day of Asadh. The sky was overcast with clouds. A shower was imminent. The pedestrian was every now and then looking at the dark sky. There was a deep shadow of fear on his face. He was alone. From where he was, the nearest human habitation was not less than two miles off. He quickened his pace. But scarcely had he gone a quarter of a mile, it began to rain cats and dogs.

অনুবাদঃ আষাঢ়ের সংক্রান্তি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বর্ষণ আসন্ন। পথিক মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণ আকাশের পানে চাহিতেছিল। তাহার মুখমণ্ডলে শঙ্কার এক গভীর

ছায়াপাত হইয়াছিল। সে ছিল একা। যেখানে সে ছিল, সেখান হইতে নিকটতম লোকালয়ের দূরত্ব এক ক্রোশের কম নয়। সে তাহার পদক্ষেপ দ্রুততর করিল। কিন্তু এক মাইলের সিকি অংশ যাইতে না যাইতেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

All this time the Pandavas had been standing amongst the crowd disguised as Brahmins ; but suddenly Arjuna advanced and lifted the bow ; and a cry of astonishment ran through the assembly at seeing a Brahmin attempt to compete a Swayamvara. Some there were who jeered at Arjuna, and said, "Shall a Brahmin do this great thing which all the mighty Rajas have failed to do ?" Others cried :—"Unless the Brahmin knew his own strength and skill, he would not make the essay".

অনুবাদ ঃ এতক্ষণ পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সহসা অর্জ্জুন অগ্রসর হইয়া ধনুখানি উত্তোলন করিলেন। একজন ব্রাহ্মণকে স্বয়ম্বর-প্রতিযোগিতায় প্রয়াসী হইতে দেখায় একটা বিস্ময়ের কোলাহল সভার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ অর্জ্জুনকে বিদ্রূপ করিল; বলিল, "মহাবাহু নৃপতিগণের প্রত্যেকে যাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন, সেই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন একজন ব্রাহ্মণ ?" কেহ কেহ আবার উচ্চকণ্ঠে কহিল, "আপন শক্তি ও নৈপুণ্যসম্বন্ধে ব্রাহ্মণের যদি জ্ঞান না থাকিত, তবে এ উদ্যম তিনি করিতেন না।"

To the north of Benares, between the Himalayas and the Ganges, stretches the country now known as Oudh, whose name long ago was Kosala. In the whole world perhaps can be few other lands so beautiful as was this, for it abounded in corn, in cattle, and in forests, and all its people were prosperous and in peace. Kosala had great rivers, fair place of pilgrimage, and noble cities. Though she was surrounded on every side by powerful kings, she was the jewel among those kingdoms. (ক. বি. ১৯১৮)

অনুবাদ ঃ বারানসীর উত্তরে, হিমাচল ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ ব্যাপিয়া অযোধ্যা (আউধ) নামে একটি প্রদেশ রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে ইহার নাম ছিল কোশল। ইহা যেমন সুন্দর ছিল, তেমন সুন্দর প্রদেশ সমগ্র পৃথিবীতে, বোধ করি, খুব অল্পই আছে ঃ শস্যসম্পদে, গবাদি পশুতে এবং বনভূমিতে ইহা ছিল পরিপূর্ণ এবং ইহার অধিবাসিগণ ছিলেন সমৃদ্ধ ও শান্তিময়। কোশলে ছিল বহু বিশাল নদী, মনোহর তীর্থক্ষেত্র এবং মহিমময়ী মহানগরী। যদিও এ প্রদেশ চতুর্দ্দিকে পরাক্রান্ত নৃপতিবৃন্দের দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তথাপি ইহা ছিল ঐ রাজ্যসমূহের রত্নস্বরূপ।

Long ago two little boys were kept in prison by a cruel king of France. Henry the elder boy was eight years old and his brother Francis was just six. They had done no wrong ; but the king hated

them because their father had been a rebel. So he shut them up in two cages, and there he left them. Henry tried to cheer up Francis; but the little boy would only cry. The cages were so made that the boys could neither stand up nor lie down at ease. (ঢাকা, ১৯২২)

অনুবাদ ঃ দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ফরাসীদেশের এক নিষ্ঠুর রাজার দ্বারা দুইটি ক্ষুদ্র বালক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ হেনরীর বয়স ছিল আট বৎসর এবং তাহার ভ্রাতা ফ্রান্সিসের ছয়। তাহারা কোনও অপরাধ করে নাই; কিন্তু তাহাদের পিতা বিদ্রোহী ছিলেন বলিয়া রাজা তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। দুই ক্ষুদ্র পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। হেনরী তাহার ভাইকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু ক্ষুদ্র শিশু শুধু ক্রন্দন করিত। পিঞ্জর দুইটি এমনভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে বালকদ্বয় তাহার ভিতর স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতেও পারিত না, শয়ন করিতেও পারিত না।

When you go to a foreign country you will be more comfortable if you quietly watch the customs and the manners of the people among whom you are living. You may thereby even try to improve your own. No matter what small mistakes you may make at first, your politeness will be respected. Moreover it will not be long before you succeed in feeling quite familiar with the customs which in the beginning seemed so strange to you. In these days of continual travelling, however, people are becoming accustomed to menners quite different from their own. One should respect the customs of others. (পাটনা, ১৯৪০)

অনুবাদ ঃ বিদেশে গিয়া যাহাদের মধ্যে তোমরা বাস করিবে তাহাদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার যদি ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর, অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবে। ইহাদ্বারা তোমরা তোমাদের নিজের আচার-ব্যবহারেরও উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। হয়তো প্রথম প্রথম তোমাদের সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিবে; তাহাতে ক্ষতি নাই—তোমাদের ভদ্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। প্রথমদিকে যে-সকল আচার-আচরণ তোমাদের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে, অনতিকালমধ্যেই সেগুলিকে সুপরিচিত বলিয়া অনুভব করিতে পারিবে। আজিকার এই অবিশ্রাম ভ্রমণের যুগে মানুষ তাহার নিজের রীতিনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্যের রীতিনীতিকে সম্মান করা সকলের কর্ত্তব্য।

People living on the plains have strange ideas about the Himalayas. They think that a mountain is just a huge cone-shaped mound of rock, or earth, or stone, mostly stone, and that the Himalayas are just a big type of this sort of mountain. The Himalayas are not one peak, or mass, or even a cluster of peaks or masses but a whole vast chain, range or series of mountains. If India can be conceived as a house, the Himalayas are like a boundary wall for this house, a vast

snow-capped boundary glittering like silver. Of the 1,100 peaks of the Himalayas, only two have been successfully scaled up till now. Man has shown great courage and heroism in the attempt to conquer these stupendous mountains. But in this conflict between man and nature, man has failed. (ক. বি. প্র. ১৯৪০)

অনুবাদ ঃ যে-সকল মানুষ সমভূমিতে বাস করে, হিমালয়-সম্বন্ধে তাহাদের অদ্ভুত ধারণা আছে। তাহারা মনে করে, পর্ব্বত কঠিনীভূত মৃত্তিকাস্তরে, বা মৃত্তিকার, বা প্রস্তরখণ্ডের—প্রধানতঃ প্রস্তরখণ্ডেরই—মোচার আকৃতিবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড স্তূপমাত্র এবং হিমালয় এইজাতীয় পর্ব্বতের একটি বিরাট্ প্রকারভেদমাত্র। হিমালয় একটিমাত্র শৃঙ্গ বা বস্তুপিণ্ড নয়, অথবা এমন কি শৃঙ্গ বা বস্তুপিণ্ডের পুঞ্জীভূত সমষ্টিও নয়; পরন্তু ইহা শৈলরাজির একটি অখণ্ড শৃঙ্খল বা মালা। ভারতবর্ষকে যদি একটি গৃহরূপে কল্পনা করা যায়, হিমালয় হয় ইহার প্রাচীর-বেষ্টনী—রজতের মত দীপ্তিমান্ তুষারশীর্ষ সীমাপ্রাকার। হিমালয়ের এগার শত শৃঙ্গের মধ্যে মাত্র দুইটিতে মানুষ সাফল্যের সহিত আরোহণ করিতে পারিয়াছে। এই বিরাট্ শৈলমালাকে জয় করিবার অভিযানে মানুষ প্রভূত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির সহিত মানুষের এই সংঘর্ষে মানুষ হইয়াছে পরাজিত।

The most memorable names in American history are those of George Washington and Abraham Lincoln. They are great in the true sense of the word. They loved their country purely and passionately better than themselves and gave their lives to its service. They thought nothing of their own glory ; to the last they were simple and true. Americans may well be proud of two such patriots. From them everyone may learn what real greatness means. Their work has made America what it is. (ক. বি. প্র. ১৯৩০)

অনুবাদ ঃ আমেরিকার ইতিহাসে দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও এ্যাব্রাহাম্ লিংকল্ন্। 'মহান্' কথাটি তাঁহাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সার্থক। দেশের প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা ছিল শুদ্ধ ও গভীর আবেগময়। নিজেদিগকে অপেক্ষা দেশকে তাঁহারা অধিক ভালবাসিতেন এবং ইহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নিজেদের গৌরবগরিমার কথা তাঁহারা মোটেই চিন্তা করিতেন না। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা সরল ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এইপ্রকার দুইজন দেশ-প্রেমিকের জন্য আমেরিকাবাসী সত্যই গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। সত্যকার মহত্ত্ব কাহাকে বলে তাহা প্রত্যেকেই তাঁহাদিগের নিকট শিখিতে পারে। আজিকার আমেরিকা তাঁহাদেরই সাধনার সিদ্ধিরূপ।

ভাষার রূপান্তরীকরণ

বাক্যকে নানাভাবে রূপান্তরিত করার উপায় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় **সাধুভাষাকে চলিতভাষায় এবং চলিতভাষাকে সাধুভাষায় পরিবর্ত্তন।**

বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলার কথ্যভাষায় পার্থক্য আছে। চট্টগ্রাম ও বাঁকুড়ার ভাষায় পার্থক্য এত বেশী যে একে অপরের কথা বুঝিতেই পারে না। অথচ সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের জন্য রচিত। এই কারণে ইহার ভাষা এমন হওয়া উচিত যাহা সকলের বোধগম্য হইবে। সাহিত্যিকগণ বহু সাধনায় বাঙলাভাষার একটি পরিমার্জ্জিত মান বা standard সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তৎসম শব্দের প্রয়োগবাহুল্য এবং বাঙলা ব্যাকরণের অনুগত পরিপূর্ণ শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের ব্যবহার—প্রধানতঃ এই দুইটি উপায়ের দ্বারা সাহিত্যের ভাষাকে তাঁহারা সর্ব্বজনগ্রহণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। একটা উদাহরণ দিতেছি ঃ

"তে কইল আঁয়ার বায়র কহুয়া চায়রে কতাইন্ খায় ও কতাইন্ ফেলায় আর আঁই উয়াসে মরির্" (গ্রিয়ারসনের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)—চট্টগ্রামের এই বাঙলার অর্থ পশ্চিমবঙ্গের সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে। আবার,

'সে বললে আমার বাবার চাকরবাকরে কত ফেলিয়ে ছড়িয়ে খায় আর আমি মরি উপোস ক'রে'—পশ্চিমবাঙলার এই ভাষার অর্থ বুঝাও চট্টগ্রামবাসীর পক্ষে কঠিন।

কিন্তু

"সে কহিল, আমার পিতার কত বেতনগ্রাহী দাস প্রয়োজনাধিক খাদ্য পাইয়া থাকে, আর আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি" (গ্রিয়ারসনের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)—এই সংস্কৃতানুগ পরিমার্জ্জিত সাধু বাঙলার অর্থ বঙ্গবাসিমাত্রেই বুঝিতে পারে।

সাধুভাষা হইলেই যে তাহাকে ঐকান্তিকভাবে সংস্কৃতের অনুগত হইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। নিম্নের উদাহরণটি হইতে বুঝা যাইবে যে, তৎসম শব্দ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের প্রয়োগে এবং বিভক্তিগুলির পূর্ণরূপের ব্যবহারে সুন্দর সাধুভাষার সৃষ্টি করা যায় ঃ

৭ই জুলাই। আজ স্যার পি. সি. রায় আমাদের ইস্কুল দেখিতে আসিবেন। তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। কিন্তু মনে মনে আমার মনের মতন করিয়া তাঁহার একখানি ছবি আমি আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম। যাঁহার অত নাম, তাঁহার চেহারাখানিও যে ঠিক নামের মতই হইবে ইহাই ছিল আমার ধারণা। স্যার পি. সি. রায়—খুব লম্বাচওড়া গড়ন, ফর্সা রঙ, মুখে একটু হাসির আমেজ যেন লাগিয়াই আছে, গলায় যেন মেঘের আওয়াজ! সাড়ে সাতটায় খেয়াঘাটে পৌছিলাম। ঠিক আটটায়

তাঁহার ইষ্টিমার ঘাটে আসিয়া লাগিবে। ঘড়ির কাঁটা যেন আর সরে না। হঠাৎ শুনা গেল জাহাজের বাঁশী। একটু পরেই জাহাজ দেখা গেল। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—স্যার পি. সি. রায়কী জয়! দেখিতে দেখিতে জাহাজ আসিয়া প্ল্যাটফরমের পাশে নোঙর করিল। কয়েকজন কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগের ভিতর একজন ছিলেন আমার ছবিখানির মত; ভাবিলাম উনিই স্যার প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু ভুল ভাঙিতে দেরী হইল না। মন খারাপ হইয়া গেল—ময়লা রঙ, রোগা, মাথার চুলে কতকাল একটু তেল পড়ে নাই, মুখে কাঁচাপাকা কিছু দাড়ি (রবীন্দ্রনাথের দাড়ি মনে পড়িয়া গেল), খদ্দরের কাপড়জামা কোনরকমে একটু সাবান দিয়া কাচা, ক্যাম্বিশের জুতায় এক জায়গায় একটা তালি লাগান রহিয়াছে—ইনিই স্যার পি. সি. রায়!

"বারাণসীসমতুল ভাগীরথী-উভকূল"-এর কথ্যভাষা অনেকাংশে সাধুভাষার নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই কথ্যভাষাকে কিছু মার্জ্জিত করিয়া বর্ত্তমানে বাঙলাসাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে। সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হওয়ায় এবং সাধু-সজ্জনকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাকেও একপ্রকার সাধুভাষা বলা যায়। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে **ইহাতে ক্রিয়াপদের কথ্যরূপই ব্যবহৃত হয়, সর্ব্বনামপদে বিভক্তির পূর্ণ বৈয়াকরণ রূপ থাকে না এবং তদ্‌ভব, অর্দ্ধতৎসম, দেশী ও বিদেশী শব্দের প্রাধান্য থাকে।** তাই বলিয়া, তৎসম শব্দ বর্জ্জন করাই ইহার রীতি নয়। শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই মুখের কথায় অসংখ্য তৎসম শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সাহিত্যে

(i) **সংস্কৃতানুগ** সাধুভাষা :

পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র সীতালক্ষ্মণসমভিব্যাহারে বনগমন করিয়াছিলেন।

(ii) **সাধারণ** সাধুভাষা :

পিতৃসত্য পালন করিতে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন।

(iii) **চলিত** সাধুভাষা :

পিতৃসত্য পালন করতে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে গিয়েছিলেন।

(১) **সাধুভাষার চলিতভাষায় রূপান্তর :**

সাধুভাষাকে **চলিতভাষায়** রূপান্তরিত করিতে হইলে

(i) ক্রিয়াপদগুলির চলিত রূপ দিতে হইবে; (ii) সর্ব্বনামপদের কথ্যরূপ দিতে হইবে; (iii) তৎসম শব্দগুলিকে সাধ্যমত অতৎসমে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে; (iv) দীর্ঘ সমাস থাকিলে প্রয়োজনমত তাহা ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; (v) দীর্ঘ

জটিল বাক্যকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল বাক্যে ভাঙিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে পরিবর্ত্তিত রূপটির ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইবে, যেন নিকৃষ্ট কথ্যভাষা (খেলো ভাষা) হইয়া না পড়ে। উদাহরণ ঃ

(ক) তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তরণীখানি সহসা নিমজ্জিত হইল। (সাধুভাষা)

—এটিকে যদি এইভাবে চলিতরূপ দেওয়া হয় ঃ

ঢেউয়ের দমাদ্দম ঘা বরদাস্ত করতে না পেরে না'খানা ভুক্ ক'রে ডুবে গেল।

—তাহা হইলে সাহিত্যের ভাষা তো হইবেই না, অধিকন্তু প্রকাশ হইবে অতীব নিকৃষ্ট (vulgar)। লিখিত হইবে ঃ

ঢেউয়ের ঘা সইতে না পেরে নৌকোখানা হঠাৎ ডুবে গেল।

(খ) "চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ—সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা নীলপীতপুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে!" —বঙ্কিমচন্দ্র।

চলিতভাষা ঃ চারিদিকে যোজনের পর যোজন জুড়ে সবুজ ধানের ক্ষেত—মা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনজোড়া পীতাম্বর শাড়ী! তার ওপর তালগাছের সার—হাজার হাজার, তারপর হাজার হাজার তালগাছ,—সরল তাদের দেহ, সুন্দর পাতাগুলি, কি তাদের রূপ—এগুলি মায়ের অলঙ্কার। মাঝখানে বিরূপা নদী, নীল তার জল; হলদে ও নীলফুলে ভরা সবুজ ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বিরূপা ব'য়ে চলেছে—নরম গালচের ওপর কে নদী এঁকে দিয়েছে!

(গ) "এইরূপ নানা কারণে গমনে বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার আর অধিকদূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এইস্থলেই যাহা বলিতে হয় বলিয়া, প্রতিগমন করুন।" —ঈশ্বরচন্দ্র।

চলিতভাষা ঃ এমনি নানান কারণে যাওয়ায় দেরী হচ্ছে দেখে শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন ক'রে বললেন, ভগবন্! আর আপনার বেশীদূর সঙ্গে আসার দরকার নাই; এইখানেই, যা বলতে হয় ব'লে ফিরে যান।

(ঘ) এই বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালী স্মৃতির আদেশ দিয়াছে, নব-দর্শনের উদ্ভাবন করিয়াছে, গার্হস্থ্য, সমাজ ও সন্ন্যাসকে স্তরে স্তরে বিন্যাস করিয়াছে, রাজদণ্ডকে নিয়মিত করিয়াছে, প্রজাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছে, 'মৎস্যন্যায়' দূরীভূত করিয়াছে, সমগ্র ভূভারতে বাঙ্গালার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আর এক অতি অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। (বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় প্র. ১৯৪০)

—এই অংশটিকে সরল কথ্যবাঙলায় ('Simple Colloquial Bengali') রূপান্তরিত করিতে বলা হইয়াছে। যদি এই নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, তবে রূপান্তরটি এমনি হইবে :

আর কারুর সঙ্গে মেলে না এমনতর একটা রূপ—এই রূপটিকে ধ'রেই বাঙালী স্মৃতির হুকুম দিয়েছে, নতুন দর্শন খুঁজে বার করেছে, ঘর সমাজ আর সন্ন্যাসকে ধাপে ধাপে সাজিয়েছে, রাজাকে আপন খেয়ালখুসিমত ক্ষমতা চালাতে দেয় নাই, প্রজাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে, বড়রা ছোটদের ধ'রে ধ'রে গিলে খেয়ে নিজেরা যে মোটা হচ্ছিল তা বন্ধ করেছে, দুনিয়ার মতন এই যে ভারত তার সবটাকেই এনেছে নিজের মতে, আর গ'ড়ে তুলেছে এমন একটা সাহিত্য যা আগে কখনও ছিল না।

—কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ইহাতে বক্তব্যের গৌরব তথা গাম্ভীর্য্য ধ্বংস হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে, আমার মনে হয়, ক্রিয়াপদের চলিত রূপ দিয়া এবং তৎসম শব্দের সম্ভবমত সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াই রূপান্তর করা উচিত। ইহার ফলে নবরূপটি হইবে এইপ্রকার :

চলিতভাষা : সেই বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় ক'রেই বাঙালী স্মৃতির আদেশ দিয়েছে, নব্যদর্শনের উদ্ভাবন করেছে, গার্হস্থ্য, সমাজ ও সন্ন্যাসকে স্তরে স্তরে সাজিয়েছে, রাজদণ্ডকে নিয়মিত করেছে, প্রজাশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে, 'মৎস্যন্যায়' দূর করেছে, সারাভারতে বাঙলার প্রভাব বিস্তার করেছে, আর গ'ড়ে তুলেছে অতি অপূর্ব্ব এক সাহিত্য।

—এমনি চলিত লিখনশৈলী (style) অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বহু উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

('নব্যদর্শন'-এর 'নব্য'-র স্থলে 'নতুন' লিখিতে গেলে 'নব্য' যে 'modern' ভাবটি বহন করে তাহা পাওয়া যায় না।)

(ঙ) পূর্ব্বদিগ্ বলয়ের কজ্জলকৃষ্ণ নিবিড় তিমিররাশির বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া নবময়ূখমালী আবির্ভূত হইলেন। সহসা কাননভূমির দ্রুমরাজির শীর্ষে শীর্ষে কে যেন কাঞ্চনকিরীট স্থাপন করিয়া দিয়া গেল। বিহঙ্গকুলের তন্দ্রাভঙ্গ হইল। তাহাদের কলকণ্ঠে সমগ্র বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। পদ্মদীর্ঘিকার কাকচক্ষুবৎ কৃষ্ণসলিলে পদ্মিনী স্মিতমুখে নয়নোন্মীলন করিল।

চলিতরূপ : পূর্ব্বদিগন্তের কাজলকালো ঘন আঁধারের বুক চিরে নবারুণ আবির্ভূত হলেন। সহসা বনের তরুগুলির মাথায় মাথায় কে যেন সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেল। পাখীদের ঘুম ভাঙল। তাহাদের কলকণ্ঠে সারা বন মুখরিত হ'য়ে উঠল। পদ্মদীঘির কাকচক্ষুর মতন কালো জলে পদ্মিনী হাসিমুখে চোখ মেলে চাইল।

(২) চলিতভাষার সাধুভাষায় রূপান্তর ঃ

আগেই বলিয়াছি যে সাধুভাষামাত্রই তৎসম শব্দাবলীর দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়। উদাহরণ দিয়া ইহা দেখাইয়াও দিয়াছি। চলিতভাষাকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করিতে (i) ক্রিয়াপদগুলির ও সর্ব্বনামপদগুলির পূর্ণ বিভক্তিরূপ দিতে হইবে, (ii) প্রয়োজনমত কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের আশ্রয় লইতে হইবে এবং (iii) তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম, দেশী বা বিদেশী শব্দকে তৎসম শব্দে পরিবর্ত্তিত করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলে, তাহা করিতে হইবে।

(ক) **চলিতভাষা ঃ** সন্ধ্যে হয় হয়। তার আগেই সামনের জঙ্গলটা পেরুতে না পারলে হয়তো আজ বাঘমহারাজের পেটে আশ্রয় নিতে হবে। সন্ধ্যের মুখেই ওরা বেরোয় শিকারের খোঁজে। একলা চলেছি। হাতে বন্দুক একটা আছে। কিন্তু হঠাৎ যদি তিনি সামনে এসে দাঁড়ান, কি হবে ওতে? আগে থেকে তিনি যদি নোটিস দেন, একটা গাছেটাছে উঠে বন্দুক ছুঁড়ে দেখতে পারি। কিন্তু বিনা নোটিসেই যদি আসেন, হাতের বন্দুক হয়তো খ'সেই পড়বে।

সাধুভাষা ঃ সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। তাহার পূর্ব্বেই সম্মুখের বনটা পার হইতে না পারিলে, হয়তো আজ ব্যাঘ্রমহারাজের উদরে আশ্রয় লইতে হইবে। সন্ধ্যার মুখেই উহারা শিকারের সন্ধানে বাহির হয়। একা চলিয়াছি। হাতে বন্দুক একটা আছে। কিন্তু হঠাৎ যদি তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, উহাতে কি হইবে? পূর্ব্ব হইতে যদি তিনি নোটিস দেন, একটা গাছে কিংবা অন্য কিছুতে উঠিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া দেখিতে পারি। কিন্তু বিনা নোটিসেই যদি আসেন, হাতের বন্দুক হয়তো খসিয়াই পড়িবে।

(খ) **চলিতভাষা ঃ** ইংরেজ কবি কাউপার বলেছেন, ঈশ্বর তৈরী করেছেন পাড়াগাঁ আর মানুষ করেছে শহর। কাথাটা ঠিক। পাড়াগাঁয়ের আকাশ, বাতাস, মাটি, বনজঙ্গল, গাছপালা, মাটির ঘরের ওপর খড়ের ছাউনি, মানুষগুলো—সবই যেন পরস্পরের সঙ্গে কেমন খাপ খেয়ে আছে। আর শহরে? মাথার ওপরে ধোঁয়ায় ঢাকা ময়লা আকাশ, পায়ের তলায় পাথুরে রাস্তা, না আছে গাছপালা, না আছে পাখীর গান, দিনরাত খট্‌খট্ ঘস্‌ঘস্ দুম্‌দাম্ ঘ্যাচ্‌ঘ্যাচ্ আওয়াজ—কানে তালা ধ'রে যায়, মানুষগুলো যেন কাজ-করা কল, বসন্তকাল এল কি গেল কেউ জানে না, পক্ষটা কেষ্ট কি শুক্ল বোঝবার জো নেই।

সাধুভাষা ঃ ইংরেজ কবি কাউপার বলিয়াছেন, পল্লীগ্রাম ভগবানের সৃষ্টি এবং নগরী মানুষের। কথাটা সত্য। পল্লীগ্রামের আকাশ, বাতাস, মাটি, বন, তরুলতা, মাটির ঘর ও তাহার খড়ের আচ্ছাদন, মানুষগুলি—সমস্তই যেন পরস্পরের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু নগরীতে? মাথার উপর ধূম্রধূসর মলিন আকাশ, পদতলে প্রস্তরময় পথ; তরুলতা নাই; বিহঙ্গকাকলী নাই; দিনরাত্রি খট্‌খট্ ঘস্‌ঘস্

দুম্‌দাম্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ বিচিত্র শব্দ—কর্ণ বধির হইয়া যায় ; মানুষগুলো যেন কাজ করিবার যন্ত্র ; বসন্তকাল আসিল কি চলিয়া গেল কেহ জানে না ; পক্ষটা কৃষ্ণ কি শুক্ল বুঝিবার উপায় নাই।

(গ) **চলিতভাষা :** মড়া পুড়িয়ে ওরা যখন ফিরছিল, তখন সকাল হ'য়ে এসেছে, গাঁ ঢোকার মুখেই এক তাজ্জব ব্যাপার—যাকে ওরা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে এল সে-ই ওদের সামনে দাঁড়িয়ে! চোখের ভুল নয়, সকলেরই একসঙ্গে চোখের ভুল হয় না। হেসো না, সত্যি। আমি আপন চোখে দেখেছি—আমিও ওদের দলে ছিলাম।

সাধুভাষা : শবদাহ করিয়া উহারা যখন ফিরিতেছিল, তখন প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। গ্রামপ্রবেশের মুখেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—যাহাকে উহারা পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া আসিল সে-ই উহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া! দৃষ্টিবিভ্রম নয়। একসঙ্গে সকলের দৃষ্টিবিভ্রম অসম্ভব। হাসিয়ো না, সত্য। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—আমিও উহাদের দলে ছিলাম।

চলিতভাষা : দেখ, ফের যদি ফরফর কর একটি চড়ে তোমাকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেব। তোমার মতন নেমকহারামকে কেমন ক'রে ঠিক শায়েস্তা করতে হয় তা আমার দস্তুরমত জানা আছে।

সাধুভাষা : দেখ, পুনরায় যদি আস্ফালন কর, একটি চপেটাঘাতে তোমাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিব। তোমার মত কৃতঘ্নকে কেমন করিয়া সমুচিত শিক্ষা দিতে হয় তাহা আমার রীতিমত জানা আছে।

অনুশীলনী

(মধ্যে মধ্যে উত্তর-সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে।)

[এক]

১। বাঙলাভাষার উপাদানসম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

২। তদ্‌ভব, তৎসম ও অর্দ্ধতৎসম—ইহাদের সংজ্ঞা নির্ণয় কর এবং প্রত্যেকটির চারিটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। (ক) সমাসের সংজ্ঞা কি ?

(খ) সমাস ও সন্ধির পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

(গ) কর্ম্মধারয়, দ্বিগু, সপ্তমীতৎপুরুষ, ব্যতিহার বহুব্রীহি—ইহাদের প্রত্যেকের চারিটি করিয়া চলিত বাঙলা উদাহরণ দাও।

৪। মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ কাহাকে বলে ? প্রত্যেকের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৫। কৃৎ-প্রত্যয়, তদ্ধিত-প্রত্যয় ও সমাসের প্রয়োজনীয়তা কি ?

৬। উদাহরণদ্বারা নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মের অর্থপার্থক্য বুঝাইয়া দাও :—

অংশ, অংস ; গিরিশ, গিরীশ ; সাক্ষর, স্বাক্ষর ; বলি, বলী ; চুত, চ্যুত ; নীড়, নীর ; দ্বিপ, দ্বীপ ; উপাদান, উপাধান ; তরণী, তরুণী ; মন, মণ ; সকল, শকল ; সপত্নী, স্বপত্নী ; দূত, দ্যূত ; অশিত, অসিত ; শুচি, সূচী ; শীত, সিত ; নিরাশ, নিরাস ; শিকার, স্বীকার ; প্রকৃত, প্রাকৃত ; শক্ত, সক্ত ; আহুতি, আহূতি ; শ্বশ্রূ, শ্মশ্রু ; মন্দ, মন্দ্র ; আহরণ, আহার ; অধ্যয়ন, অধ্যায় ; উদ্ভিদ্, উদ্ভেদ (ভেদ করিয়া উঠা, ফুঁড়িয়া উঠা) ; শুক, শূক (শুঁয়াপোকা) ; মিলন, মীলন (মুদ্রণ, বুজিয়া যাওয়া) ; নাকি, নাকী ; পাণ, পান ; বর্ষা, বর্শা ; কুট, কূট ; অভিনেতৃবর্গ, অভিনেত্রীবর্গ (১ পুং, ২ স্ত্রীং) ; কুজন, কূজন ; অশীলতা, অসিলতা (১ শীলতার অভাব, ২ তরবারি) ; প্রযোজন, প্রয়োজন (১ প্রয়োগকরণ, ২ আবশ্যকতা) ; ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনা (১ বর্ণবিশেষ বা রাঁধা তরকারি, ২ সূক্ষ্মভাবের সাঙ্কেতিক প্রকাশ) ; উপকার, উপকরণ (১ হিত, ২ উপাদান)।

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানানে **যদি কোন ভুল থাকে,** সংশোধন করিয়া লেখ এবং যেগুলি ঠিক আছে, পৃথক্ তালিকায় সেগুলিকে সাজাও :—

অনুমত্যানুসারে, কৌতুহল, সান্তনা, অদ্ভূত, প্রিয়ম্বদা, মধ্যাহ্ণ, গগণ, আশীষ্ (শুদ্ধরূপ আশিস্), কালিদাস, দেবিদাস, অবনি, রবিন্দ্রনাথ, হরিনাম, পরিনাম, প্রণাশ, প্রনষ্ট, অনিষ্ট, ঘনিষ্ট, সতন্ত্র (সহযোগে বহুব্রীহিসমাসে), সম্মানীয় (সম্+'মা' ধাতু+অনীয়—এই গঠনে ইহা শুদ্ধ), অর্পণা, পৌরহিত্য, উচিৎ, কুৎসিৎ, সাক্ষ্যাৎ, আকাঙ্খা, পক্ক, মহতাশ্রয়, সত্বা, সত্ত্ব, কীর্ত্তিবাস, নীরন্ধ্র, শিরোশোভা, অচিন্ত্যনীয়, ভৌগলিক, পুঙ্খানুপুঙ্খ, কিসলয়।

৮। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—

জন্ম, সঞ্চয়, কৃশ, শাদা, উত্তমর্ণ, দেনাদার, পশ্চাৎ, সত্য, গুরু, অনুগ্রহ, গরিষ্ঠ, ঘৃণা, কৃতজ্ঞ, উৎকৃষ্ট, ঐহিক, অনুরক্ত, আবির্ভাব, আদি, কোমল, অন্ধকার, গৃহী, প্রতিকূল, উত্তম, বাদী, স্থাবর (সম্পত্তি বুঝাইতে ইহার বিপরীতার্থক শব্দ 'অস্থাবর' ; অন্যত্র 'জঙ্গম'), অপমান, শীতল, আকর্ষণ (বিকর্ষণ), বিসর্জ্জন (আমন্ত্রণ), উত্থান, জাগ্রত (সুপ্ত), আরোহণ (অবরোহণ), অনুলোম (বিলোম বা প্রতিলোম), উর্দ্ধ, বিরহ, শূন্য, পুণ্য, বিয়োগ (সংযোগ), সহযোগী (প্রতিযোগী), বিধি, ভূত, বর্দ্ধমান (ক্ষীয়মাণ), দীর্ঘ, প্রত্যক্ষ, পরার্থ, বিদ্বান্, সংক্ষেপ, উপকার, অন্তর্।

৯। এমন দশটি বাক্য রচনা কর যাহাদের প্রত্যেকটিতে বিপরীতার্থক শব্দযুগ্ম সমাসবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে।

(যেমন **জন্মমৃত্যু** ভগবানের হাত ; **হ্রস্বদীর্ঘ**-জ্ঞান না থাকিলে মানুষ কাজ

করিতে অকাজ করিয়া বসে ; "**আদি-অন্ত** হারিয়ে ফেলে **শাদাকালোর** আসন মেলে প'ড়ে আছে আকাশটা খোসখেয়ালী"—রবীন্দ্রনাথ ; মানবজীবনে **সুখদুঃখ** চক্রবৎ আবর্ত্তিত হয় ইত্যাদি)।

১০। অঙ্ক, গুণ, কর, দণ্ড, বাস—এই বিভিন্নার্থক শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে লইয়া তিনটি করিয়া বাক্য রচনা কর, যেন প্রত্যেক বাক্যে শব্দটির অর্থ পৃথক্ হয়।

[যেমন, (১) 'প্রফুল্ল' নাটকের পঞ্চম **অঙ্কে** প্রফুল্লর মৃত্যু হইয়াছে।

(২) ক্রন্দনরত শিশুকে জননী **অঙ্কে** তুলিবামাত্র সে শান্ত হইল।

(৩) রামধন **অঙ্কে** কাঁচা।

১ নাটকীয় পরিচ্ছেদ, ২ কোল, ৩ গণিত।]

১১। পরলোক, শ্রদ্ধেয়, কঠিন, নিষ্কলঙ্ক, ঈশ্বর, আসক্ত, পেট, জঙ্গল, শহর, সাহেব, মামলা, সর্ব্বজন, নিরক্ষর, নিষ্ঠা, বিপ্লব, হিংসা, নিষেধ, উক্ত, অনূদিত—ইহাদের মধ্যে বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক পরিবর্ত্তিত রূপ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

(যেমন 'পরলোক' বিশেষ্য ; বিশেষণে 'পারলৌকিক'—**পারলৌকিক** মঙ্গলের নিমিত্ত সকলের পুণ্যসঞ্চয় করা উচিত।)

১২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অনুক্ত অংশ পূরণ করিয়া দাও :—

(ক) ঊষার কিরণ পূর্ব্বাকাশে — হওয়াতে দিগন্তরেখা যেন অগ্নিশিখায় — হইয়া উঠিল। পাখীদের — বৃক্ষের অন্তরাল হইতে রাজবন্দীদের — ন্যায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। কে সে রাজা যার — বন্দনাগীতি — সর্ব্বত্র নানাকণ্ঠে — হইতেছে ?

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্র. ১৯৪৭)

(**উঃ** ঊষার কিরণ পূর্ব্বাকাশে **প্রকাশিত** হওয়াতে দিগন্তরেখা যেন অগ্নিশিখায় **উদ্ভাসিত** হইয়া উঠিল। পাখীদের **কাকলী** বৃক্ষের অন্তরাল হইতে রাজবন্দীদের **বন্দনাগীতির** ন্যায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। কে সে রাজা যার **পবিত্র** বন্দনাগীতি **অহরহ** সর্ব্বত্র নানাকণ্ঠে **ধ্বনিত** হইতেছে ?)

(খ) সাধু — চলিতে — এ পৃথিবীতে — সময়ে নিন্দা — হইতে হয় এবং — রূপ কষ্টে — হয়। যাঁহারা মানুষ — ভগবান্‌কে — ভয় করেন, তাঁহারা — আমাদিগের মধ্যে পাগল — পরিচিত হন।

(যথাক্রমে বসাইয়া লও : ভাবে, গেলে, অনেক, প্রাপ্ত, নানা, পড়িতে। অপেক্ষা, অধিক, সাধারণতঃ, বলিয়া।)

(গ) তুমি — গিয়া গুরুজনদিগের — করিবে ; সপত্নীদিগের — প্রিয়সখীব্যবহার

—। সৌভাগ্যগর্ব্বে — হইবে না। মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে — হয় ; বিপরীতকারিণীরা কুলের —।

১৩। এককথায় প্রকাশ কর :—

(ক) যে নারী সূর্য্যকে কখনও দেখে নাই (অসূর্য্যম্পশ্যা)। পরলোকে যাহার বিশ্বাস নাই (অবিশ্বাসী, নাস্তিক)। এ পর্য্যন্ত যাহার শত্রু হয় নাই (অজাতশত্রু)। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে (পণ্ডিতম্মন্য)। কি করিতে হইবে তাহা যে বুঝিতে পারে না (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়)। ব্যাকরণ যিনি ভাল জানেন (বৈয়াকরণ)।

(ক. বি. প্র. ১৯২৮)

(খ) বাড়ীর অধিকারী (বাড়ীওয়ালা)। রেশমে নির্ম্মিত (রেশমী)। চালান-সম্বন্ধীয় (চালানী)। পাগলের ভাব (পাগলামী)। গাছে উঠিতে পটু যে (গেছো, গাছুড়ে)। সাপ ধরিতে পটু যে (সাপুড়ে)। শান্তিপুরে উৎপন্ন (শান্তিপুরে)। পাহারার কাজ করে যে (পাহারাওয়ালা)। দাঁত আছে যার (দেঁতো)। সেতারে দক্ষ (সেতারী)। যে কুস্তি করে সে (কুস্তিগীর)। যে তীর নিক্ষেপ করে সে (তীরন্দাজ)। যে মোকদ্দমায় আসক্ত (মামলাবাজ)। যে গাড়ী চালায় সে (গাড়োয়ান)। (পাটনা প্র. ১৯৩০)

(গ) যে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করে। যে দুইবার জন্মগ্রহণ করে। যাহার কোথা হইতেও ভয় নাই। (এলাহাবাদ প্র. ১৯২৭)

(ঘ) যাহা কখনও নষ্ট হয় না। পদ্মের গন্ধ যাহাতে। রাবণের পুত্র। যে রাতে দেখে না। যাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। যাহা জলে ও স্থলে চরে। যাহার তালবোধ নাই। যাহাতে কোন ভেজাল নাই। পৃথিবীসম্বন্ধীয়। কম বয়স যাহার। যে নিজেকে বড় মনে করে। পিতার পিতামহ। (ঢাকা প্র. ১৯৩৬)

১৪। নীচের বাক্যগুলিতে উদ্ধৃতিচিহ্নমধ্যবর্ত্তী অংশ এককথায় প্রকাশ কর :—

আমার এ আনন্দ 'বাক্যে প্রকাশ করা যায় না'। 'অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা' না থাকিলে জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব। নেপোলিয়নের অপরিমিত 'জয়ের অভিলাষ' য়ুরোপে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছিল। মানুষের মৃত্যু 'ঘটিবেই ঘটিবে'। 'যুক্তিসঙ্গত যাহা নয় এমন' কথা বলা অসঙ্গত। উপত্যকাভূমি 'কোথাও নত কোথাও উন্নত'।

(ঢাকা প্র. ১৯৩২)

১৫। যোগ্যতা, আসক্তি ও আকাজ্ক্ষা কাহাকে বলে ?

১৬। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার অর্থ বুঝাইয়া দাও।

১৭। শব্দ ও পদের পার্থক্য কি ?

১৮। 'বাক্য' কাহাকে বলে ? বাক্য কয়প্রকার ? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

১৯। উদ্দেশ্য ও বিধেয় কি ?

২০। নিম্নলিখিত বাক্য কয়টির উদ্দেশ্য ও বিধেয় স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দাও :—

(ক) রাম রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

(খ) সকল অনর্থের মূল তুমি।

(গ) এবম্প্রকার সারগর্ভ হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রগণ সকলেই বিদ্বান্ ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

(ঘ) তুমি আমাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে কেন ?

২১। জটিল বাক্য বিশ্লেষণ করিবার নিয়ম কি ?

২২। নীচের বাক্য দুইটি বিশ্লেষণ কর :—

(ক) পরের মন্দ যে করিবে, তাহারই মন্দ আগে হইবে।

(খ) সাপখেলা দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলাম ; কিন্তু সাপুড়িয়া তখন সাপগুলিকে ঝাঁপির মধ্যে পূরিয়া ফেলিয়াছে।

২৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি কি প্রকারের তাহা বলিয়া সবগুলি মিলাইয়া একটিমাত্র সরল বাক্যে পরিণত কর :—

(i) হিমাচল পর্ব্বতের রাজা।

(ii) ইহার শিখরদেশ অত্যুন্নত এবং সর্ব্বদা তুষারে আচ্ছাদিত।

(iii) হিমাচলকে যে দেবতা বলা হয়, তাহা মিথ্যা নহে।

(iv) ইহার শীর্ষে যাহারা উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

২৪। নিম্নলিখিত বাক্যসমষ্টিকে একটি সরল বাক্যে পরিণত কর :—

প্রতাপসিংহ চিতোরের রাণা ছিলেন। তাঁহার খুব প্রতাপ ছিল। তিনি মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ আজীবন চলিয়াছিল। স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। (এলাহাবাদ প্র. ১৯৪৬)

২৫। নিম্নলিখিত নিষেধাত্মক বাক্য চারিটিকে অর্থ ঠিক রাখিয়া স্থাপনাত্মকরূপে পরিবর্ত্তিত কর :—

(i) অভ্যাস না থাকিলে এ কাজ করা যায় না।
(ইঃ অনভ্যাসে এ কাজ অসাধ্য)।

(ii) যাহার চক্ষু নাই, রসসম্বন্ধে তাহার ধারণা নাই।

(iii) এ কথা না বলিলে তোমাকে ছাড়িব না।

(iv) মা বলিয়াছেন, এ কাজ তুমি করিও না।

২৬। নীচের বর্ণনাত্মক বাক্য দুইটিকে, অর্থ ঠিক রাখিয়া, জিজ্ঞাসাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত কর :—

(i) সুন্দরকে কলুষিত করে এমন নিষ্ঠুর জগতে নাই। (জগতে আছে কি ?)

(ii) এ কাজে হাত দেওয়াই বোধ করি তোমার পক্ষে অনুচিত হইয়াছিল।

২৭। নীচের বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলির (Idioms) প্রত্যেকটিকে লইয়া একটি করিয়া বাক্য রচনা কর :—

(ক) ডুমুরের ফুল, কলুর বলদ, হাতের পাঁচ, উত্তমমধ্যম, রাঘব বোয়াল, ডান হাতের ব্যাপার, লম্বা দেওয়া, সরিষার ফুল দেখা। (ক. বি. প্র. ১৯৪০)

(খ) একচোখা, পোয়াবারো, গোবর গণেশ, হাতের পাঁচ, সোনায় সোহাগা, কথার কথা, ব্যাঙের সর্দ্দি, সাতসতেরো। (ক. বি. প্র. ১৯৪১)

(গ) কাঁচা হাত, হাতের পাঁচ, মুখনাড়া দেওয়া, মুখ চূণ করা, বড় মুখ, মাথা ধরা, হাত ধরা, মনে লাগা। (ক. বি, প্র. ১৯৪৩)

(ঘ) পায়া ভারি, ঠোঁটকাটা, আক্কেল-সেলামী, অমাবস্যার চাঁদ, পুকুরচুরি, টনক নড়া। (ক. বি. প্র. ১৯৪৪)

(ঙ) দোহারা, তালকাণা, রগচটা, নেই-আঁকড়া, হাড়-হাবাতে।

(ক. বি. প্র. ১৯৪৫)

(চ) সাতসতেরো, বড় মুখ, ঠোঁটকাটা, চিনির বলদ, পোয়াবারো, ডুমুরের ফুল।

(ক. বি. প্র. ১৯৪৭)

(**উত্তর :** ওই সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা কয়টি আমার **হাতের পাঁচ** ; উহাতে আমি হাত দিব না। **উত্তমমধ্যম** পাইলে অতিবড় বদমায়েসও ঠাণ্ডা হইয়া যায়। পুলিশ যখন আসিল, চোর তখন **লম্বা দিয়াছে**। টাকার সঙ্গে একটু বুদ্ধি থাকলে **সোনায় সোহাগা**। কি বলেছ খোকাকে—আহা, বেচারা **মুখ চূণ ক'রে** ব'সে রয়েছে। ছেলেটির রঙ ফর্শা, গড়ন **দোহারা**। **হাড়-হাবাতের** 'নাই নাই' কখনও ঘুচবে না। ওকে অনুরোধ করতে গেলে তোমার **বড় মুখ** ছোট হ'য়ে যাবে। আর **সাতসতেরো** ভাবতে পারি না, যা হ'ক একটা ক'রে ফেলি। বাকীগুলির জন্য এই পুস্তকের ইডিয়ম্‌-অংশ দ্রষ্টব্য।)

২৮। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

(i) আশঙ্কা করিতেছি আগত কল্য আমার দাদা পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে বাড়ী আসিবেন।

(ii) পদ্ম জলীয় গাছ ; কিন্তু বাষ্প জলজ পদার্থ।

(iii) নিরপরাধিনী সীতাকে রাবণ নির্জাতীত করিয়াছিল।

(iv) পরীক্ষার্থীগণের সাবধানতা হওয়া উচিৎ।

(v) মহতাশ্রয় সকলের গ্রাহ্যনীয় ও সতুপদেশশ্রবন আবশ্যকীয়।

(vi) তিনি না আসিলে তথাপি আমাদের উৎশব নির্ব্বিঘ্নসহকারে হইবে।

(vii) মহারাজ দুষ্মন্ত সকুন্তলাকে পাণীগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(viii) যেমন বীজ রোপন করিবে তেমনি শষ্য পাইবে।

(ix) তোমার কৃপাবারিতে আমার মনাকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

(x) "সুকেশিনী শিরোশোভা কেশের ছেদনে"।

(xi) বিহঙ্গের কেকাধ্বনিতে, ভ্রমরের কাকলিতে, হস্তীর হ্রেষায়, সিংহের বৃংহাণ বন মুখরিতা হইল।

(xii) তাঁহার জন্মবার্ষিক উপলক্ষ্যে তিনি বহুব্যায়ে একটি সাংঘাতিক ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সময় সংক্ষেপ বলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা সত্তেও আমার যাইবার সাবকাশ হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহার পার্শ্বে ছুটিলাম।

(ক. বি. প্র. ১৯৪৬)

(xiii) বিদ্বান্ বেক্তি কখনো কুৎসিৎ কথা বলে না।

(xiv) তাঁহার বক্তিতায় উচ্ছাসের বন্যা প্রকাশিত হইল।

২৯। নিম্নলিখিত প্রবাদ (সুভাষিত)-গুলির ভাব বিবৃত কর ঃ—

(i) দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

(ii) ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

(iii) দশের লাঠি একের বোঝা।

(iv) ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বহেন।

(ক. বি. প্র. ১৯৪৬)

[**উত্তর ঃ** (iv) ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ধূলামুঠা ধরিলে তাহা সোনামুঠা হইয়া যায়। সে যে কাজই করুক না কেন, ঐ কাজের অনুকূল এমন অবস্থা আপনা হইতেই সৃষ্ট হইয়া যায় যে সাধারণ মানুষের ধারণা হয়, কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছে। ঐ অদৃশ্য শক্তিই ভগবান্। বস্তুতঃ ঘটেও তাহাই; কারণ, গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। ভগবানের কৃপা ভিন্ন কেহ ভাগ্যবান্ হইতে পারে না।]

(v) গাছে কাঁটাল, গোঁফে তেল।

(vi) কালনেমির লঙ্কাভাগ।

(vii) ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

(iii) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

[বাকীগুলির জন্য এই পুস্তকের 'প্রবাদ' (সুভাষিত)-অংশ দ্রষ্টব্য।]

৩০। ভাব-সম্প্রসারণ কর :—

(ক) সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার,
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার।

(খ) মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।
(এলাহাবাদ প্র. ১৯৪৭)

(গ) আর্ত্তের সেবা করিলে তাহার মুখমণ্ডলে একটু স্বচ্ছন্দতার সহিত কৃতজ্ঞতার যে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ খেলিতে থাকে, তাহা সৌন্দর্য্যের একশেষ। (ক. বি. প্র. ১৯৪২)

(ঘ) চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?
(দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্র. ১৯৪০)

(এই পুস্তকের 'ভাব-সম্প্রসারণ'-অংশ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) আপন যতনে লাভ যখন যা হয়,
যাচিত রতন তার তুল্যমূল্য নয়।
যদ্যপি বল্কল পর, রহ উপবাসী,
হ'য়ো না হ'য়ো না তবু পরের প্রত্যাশী।
(ক. বি. প্র. ১৯৩৬)

(চ) কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কি রে ?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে,
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।

(ছ) রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্য্যামী।
(দুইটিই ক. বি. প্র. ১৯৩৪)

৩১। নিম্নোদ্ধৃত অংশটির ভাব সুস্পষ্ট করিয়া লিখ :—

অন্তরের সে সম্পদ্ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত ; তাই সর্ব্বগায়ে

ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন ;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর ; নাহি ধ্যানবল,
শুধু জপ-মাত্র আছে ; শুচিত্ব কেবল
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার।

(এলাহাবাদ প্র. ১৯৪৬)

(এখানেও ভাব-সম্প্রসারণ করিতে হইবে)

৩২। নিম্নোদ্ধৃত অংশের ভাব নিজের ভাষায় লিখ :—

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে ;
সার্থক জনম মাগো,
তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধনরতন
আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে।

(ক. বি. প্র. ১৯২৬)

(এই উত্তর কি ভাবে করিতে হইবে তাহার জন্য এই পুস্তকের 'ভাবের পুনঃপ্রকাশ' বা Reproduction of Ideas অংশ দ্রষ্টব্য।)

৩৩। নিম্নলিখিত অংশটির সারমর্ম্ম (Substance) নিজের ভাষায় লিখ :—

মানুষের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ অতি দুর্ব্বল পশু, সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে ; সেই দলের নাম সমাজ। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে

সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙ্গিয়া যায়। যে পাশবপ্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থ মানুষ সেই পাশবপ্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। সহজাত সংস্কারের অভাবে অতীতের অভিজ্ঞতায় ভর করিতে হয়। এইজন্য বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম ধর্মবুদ্ধি; ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম। ইহা সমাজরক্ষার অনুকূল, ইহা লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত দুই টানাটানির ব্যাপার। উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। (এলাহাবাদ প্র. ১৯৪৭)

৩৪। বাংলায় অনুবাদ কর :—

(ক) Alexander the Great had a portrait of himself painted which showed him riding upon his favourite horse. When the picture was finished, Alexander visited the studio, but found fault with the painting as being not life-like and he particularly complained of the horse. The artist suggested that the animal itself should be brought in. When the horse saw the painting, it neighed at the animal in the picture, as though it were a real one. 'Sir', said the artist, 'your horse appears to be a better judge of painting than you are.'

(এলাহাবাদ প্র. ১৯৪৭)

(খ) For a moment I stood thunder-struck. I looked at the footprint. There it was : I could see the marks of the toes, heel and all. How it came there, I could not imagine. Full of terror, hardly knowing what I did, I fled home, mistaking every bush and tree for some one chasing me. I could not sleep, nor dared I stir out of my castle for days, lest some savage should capture me. However, I gained a little courage and went with much dread to make sure that the footprint was not my own. Mine was not nearly so large. A stranger, may be a savage, must have been on shore, and fear again filled my heart. (ক. বি. প্র. ১৯৪১)

(গ) When I was able to struggle no longer, I found myself within my depth (দাঁড়ান জল). By this time the storm was almost over. I waded nearly a mile in the shallow water before I got to the shore, which was about eight o'clock in the evening. I could not discover any sign of houses or inhabitants, at least I was in so weak a condition that I did not observe them. I was extremely tired, and with that and the heat of the weather, found myself much inclined to sleep. I lay down on the grass, which was very short and soft, and slept sounder than ever I remember to have done in my life. When I awoke it was just daylight. (ক. বি. প্র. ১৯৪২)

(ঘ) From the reign of Emperor Akbar, when Bengal was annexed to the Mughal empire to the time of the conquest of Chatgaon during

the viceroyalty of Saista Khan, Arrakan pirates both Magh and Feringi used constantly to come by the water-route (জলপথে) and plunder Bengal. They carried off the Hindus and Muslims, male and female, great and small, few and many, that they could seize, pierced the palms of their hands, passed thin canes through the holes and threw them one above another under the deck of their ships. In the same manner as grain is flung to fowls, every morn and evening they threw down uncooked rice from above to the captives as food.

(ঢাকা প্র. ১৯৪৩)

(ঙ) We cannot expect to be happy if we do not lead pure and useful lives. To be good company for overselves, we must store our minds well, fill them with pure and peaceful thoughts, with pleasant memories of the past and reasonable hopes for the future. We must, as far as may be, protect ourselves from self-reproach, from care and from anxiety. We shall make our lives pure and peaceful by resisting evil and by placing restraint upon our appetites.

(এলাহাবাদ প্র. ১৯৪০)

(চ) An ass saw a wolf approaching to seize him, and immediately pretended to be lame. The wolf inquired the cause of his lameness. The ass said that he trod with his foot upon a sharp thorn, and requested the wolf to pull it out. The wolf consented, and the ass with his heels kicked his teeth into his mouth and galloped away. The wolf said, "I am rightly served, for why did I attempt the art of healing when my father taught me the art of a butcher ?"

(ক. বি. প্র. ১৯২৫)

(ছ) Indian civilisation has been like a big tree which, though very old, has still green leaves, bears fruit and gives shelter to many persons. Historians tell us that many influences have gone to the making of Indian civilisation (ভারতীয় সভ্যতার গঠনের মূলে বহু প্রভাব বিগুমান রহিয়াছে). The people who lived at Mohenjo-daro contributed something to it (কিছু দান করিয়াছে). Then came the Aryans who laid the foundations of it and practically perfected it (কার্যতঃ পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিলেন). The Dravidians also left their mark on it. Then the Persians, the Greeks, and the Moghuls added something to it. The English brought with them their own culture, the traces of which we find everywhere in India today. Many influences in this way, from within as well as without, have had an effect on Indian civilisation, but it has retained its two characteristics (আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে).

(ক. বি. প্র. ১৯৪৫)

(জ) In the battle of Zutphen, Sir Philip Sydney was seriously wounded, and was obliged to retire to his tent, in order to have his wound examined. By the time he had reached his tent, he not only felt great agonies from his wound, but heat of the weather and the fever which the pain produced, had caused an unbearable thirst. So, he begged his attendants to fetch him a little water. Some water was immediately brought to him. But as he was raising the cup to his lips, he chanced to see (দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন) a poor (হতভাগ্য) English soldier who also had been seriously wounded in the same battle, and lay upon the ground turning his dying eyes eagerly upon the water (তাহার মুমূর্ষু নয়নের দৃষ্টি ঐ জলে সাগ্রহে নিবদ্ধ করিয়া). The generous Sydney instantly passed the cup to the soldier, saying, "Thy necessity is greater than mine." (পাটনা প্র. ১৯৪•)

৩৫। নীচের অংশগুলিকে সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :—

(ক) ছেলেমেয়েদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে লেখাপড়া শেখা একটা তপস্যা। পরীক্ষায় পাস করাকেই যারা লেখাপড়া শেখার একমাত্র মাপকাঠি ব'লে ভাবে, তারা তক্‌মা পায় কিন্তু শিক্ষিত হয় না।

(খ) আগে যে যতগুলো ইংরেজী কথা জানত সরকারী চাকরিতে তার তত টাকা মাইনে হ'ত। ইংরেজ আমলের গোড়ার কথা বলছি। এখনও তাই নয় কি? যে যতবার জেল খেটেছে তার তত শ' টাকা মাইনে; তার ওপর ভাতা আছে নানান ধরণের; আরও কত কি আছে।

(গ) তোমার মত এত বড় কঞ্জুষ চোখে আর কোনদিন পড়ল না। পরকে না দাও, নিজে পেটে খাও—তাও না। চেহারা দিন দিন দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে, চোখ ঢুকেছে কোটরে—অথচ টাকার কুমীর হ'য়ে ব'সে আছ।

৩৬। নীচের অংশগুলিকে চলিতভাষায় রূপান্তরিত কর :—

(ক) এতৎসম্পর্কে অদ্য কিছু কহিতে পারিব না। বহু অনুসন্ধানের প্রয়োজন। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে বহু মূল্যবান্ তথ্য হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বহু রহস্যের দ্বার তখন উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা।

(খ) বিশ্ববাসীর মঙ্গলকল্পে যিনি নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করেন, বিশ্ববাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহার মাণিক্যসিংহাসন। যে পরমঙ্গল-সাধনার মূলে স্বার্থবোধ ফল্গুধারার ন্যায় প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কলুষকালিমালিপ্ত।

৩৭। নিম্নলিখিত অংশগুলি সংশোধনপূর্ব্বক সাধুভাষায় পরিবর্ত্তিত কর :—

(i) ঘরপালিত গবাদি জানোয়ারের চরিত্র অনেকটা বদলে যায়।

(ii) তাহার গেরুয়ারঞ্জিত দামী পট্টবস্ত্রখানি খানিকটা স্থানে কে কাদা লেপন করিয়া দিয়াছে।

(iii) ইঞ্জিন্‌কে চালায় এবং তার জোর বর্দ্ধিত করিয়া দেয় জলজ বাষ্প।

(iv) যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন বস্তু বলিয়া দ্রৌপদীর আরেকটা নাম যাজ্ঞসেনী।

(v) তিনি অঙ্গীকার করিলেন যে চুলবন্ধন না করিয়া তিনি জলাহার করিবেন না।

[**উত্তর-নির্দেশন ঃ**

(i) গৃহপালিত গবাদি পশুর চরিত্র অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।]

ভূমিকা

ইংরেজীতে যাহাকে essay বলা হয় বাঙলায় তাহাকেই নিবন্ধ বলিতেছি। 'প্রবন্ধ' না বলিয়া আমরা 'নিবন্ধ' বলারই পক্ষপাতী। কেন, আপাততঃ ছাত্রগণ সেই জটিল বিচার হইতে দূরে থাকুক ইহাই বাঞ্ছনীয়।

নিবন্ধের একটা ধরাবাঁধা সংজ্ঞানির্দ্দেশ বাস্তবিক দুরূহ। উহার বিষয়, বিষয়বস্তু, বিন্যাস, গঠনবৈশিষ্ট্য, প্রকাশভঙ্গী ও শক্তি বিচিত্র। তথাপি এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিবন্ধের একটি মূলসূত্র নিহিত রহিয়াছে। একই বিষয়ের কয়েকটি নিবন্ধ আলোচনা করিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। 'গোরু'-সম্বন্ধে পাঁচজনকে যদি লিখিতে দেওয়া হয়, দেখা যাইবে পাঁচটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ হইয়াছে। বিষয় এখানে এক অর্থাৎ গোরু; কিন্তু এক একটি নিবন্ধের বিষয়বস্তু এক এক রকমের হইতে পারে। কারণ, গোরু-বিষয়টি-সম্বন্ধে তথ্য ও ভাববস্তু অসংখ্য। উহাদের কয়েকটি আমার নিবন্ধে স্থান পাইল, তোমার নিবন্ধে পাইল না। আবার এমন কতকগুলি বস্তুও থাকিতে পারে যাহা আমার ও তোমার সকলেরই নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে যে এক ভাবুক লেখক ভাবদৃষ্টিতে দেখিয়া গোরুকে এমন এক অপূর্ব্ব রূপ দিলেন, যাহা তুমি, আমি বা আমাদের বাকী তিনজন কল্পনাও করি নাই। অথচ আমাদের সকলেরই রচনা গোরু-বিষয়ে নিবন্ধ। একই বিষয়ে ভিত্তি হইলেও, আকারে প্রকারে ইহারা কত পৃথক্। আমি হয়তো 'গোরু চতুষ্পদ জন্তু' বলিয়া আরম্ভ করিয়া উহার আকৃতি, প্রকৃতি, জীবৎকাল, উপকারিতার কথা বলিয়া, জ্যামিতির Q. E. D. 'র মত 'অতএব আমাদের গো-সেবা করা উচিত' বলিয়া নিবন্ধ শেষ করিলাম। তুমি হয়তো 'গবেষণা' শব্দটির উৎসপথে একেবারে প্রাচীন ভারতের তপোবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়া 'গোধন' ঋষিকন্যাদের 'দুহিতা' নামের কারণ ইত্যাদি আলোচনা করিতে করিতে গোরুকে এক মহিমময়রূপে আধুনিক চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিলে। আর একজন হয়তো রাখালবেশে ভগবান্ কৃষ্ণের গোচারণের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া 'গোকুল', 'গোলোক' প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া গোরু যে ভগবানের চেয়ে বড়, অপূর্ব্ব বাগ্‌ভঙ্গীতে যুক্তিপরম্পরায় তাহা সপ্রমাণ করিল। সকলেরই রচনা নিবন্ধ; কোনটি বস্তুভারাক্রান্ত, কোনটি বস্তু-অবস্তুর মিশ্রণে গঠিত; কোনটি-বা তথ্যভারমুক্ত ভাবমূর্ত্তি। যেভাবেই হউক, একই বিষয় বিভিন্ন চিত্তে বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবের উদ্রেক করিবে এবং তদনুসারে সে বিষয়ের নিবন্ধগুলির বিষয়বস্তু বা ভাববস্তুও পৃথক্ হইতে বাধ্য। তাহা হইলেই নিবন্ধের স্বরূপে নিবন্ধকার বা লেখকের

ব্যক্তিস্বরূপটিরও প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ নিবন্ধে এই ব্যক্তিগত সুরটিই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অতএব নিবন্ধরীতি বলিয়া কোন একটা ধরাবাঁধা ছাঁচ নাই। এ সত্যটি প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্য স্মরণযোগ্য। প্রাণি-সম্বন্ধে লিখিতে গেলে উহার উপযোগিতা, অপকারিতা, আকৃতি ও প্রকৃতিসম্বন্ধে কতকগুলির ভাব আপনা হইতেই আসিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল প্রাণি-নিবন্ধকেই এই আকৃতি-প্রকৃতি ও উপকারিতা-অপকারিতার ছাঁচে ফেলিতেই হইবে এমনও কোন কথা নাই। একটা বস্তু-সম্বন্ধে আমার মনে কতকগুলি তথ্য ও ভাব আছে। সেগুলিকে যুক্তির বাঁধনে পারম্পর্য্য রাখিয়া সুবিন্যস্ত ও উপভোগ্যরূপে রূপায়িত করিতে পারিলেই সত্যকার নিবন্ধ হইবে। ইহাতে তথ্যের ভাগ কতটা, কতটাই-বা কল্পনার ভাগ থাকিবে তাহা সম্পূর্ণ রচয়িতার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনার সঙ্গতিবোধের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু নিবন্ধের মধ্যে যাহা অবশ্যই থাকিবে তাহা হইল যুক্তির অনিবার্য্য বেগ। আবোল-তাবোল বিশেষণবহুল কতকগুলি মিষ্টিকথার গালভরা বুক্‌নি ঝাড়িয়া গেলেই চলিবে না। বলার কথাটিকে যুক্তির খাতে সহজভাবে প্রবাহিত করিয়া দিতে হইবে। একটি কথার পরে আর একটি যেন আপনা হইতেই আসে, অনেকটা অনিবার্য্যভাবেই আসে—এমনভাবে লিখিতে পারাই উৎকৃষ্ট কৃতিত্ব। ইহাতে লেখায় একটা প্রাঞ্জলতা আসে। মনে রাখা প্রয়োজন প্রাঞ্জলতার সমস্যাটি ভাষাগত নহে, মূলতঃ চিন্তাগত। তোমার চিন্তা যদি পরিষ্কার হয়, ভাষায় তোমার একটা পরিচ্ছন্নতা অবশ্যই আসিবে। সে ভাষা সংস্কৃতবহুল বা লঘুকথার সমবায়—যাহাই হউক না কেন, বলার কথাটি দেখিবে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিখ্যাত রোমান বক্তা সিসিরো বলতেন—Have something to say and words will flow—অর্থাৎ বলার মত কিছু যদি তোমার থাকে, তবে তোমার ভাষা আপনা হইতেই স্রোতের মত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সুতরাং চিন্তা ও কল্পনার বিকাশ-সাধনই নিবন্ধরচনার মূলসূত্র। দুইদশখানি পুস্তক ও নিবন্ধ পড়িয়া মনটিকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করিয়া লইতে হইবে। তারপর নিয়মিত অভ্যাসে চিন্তার ধারাবাহিকতা আসিবে, কল্পনায় সঙ্গতি আসিবে। এইরূপ সুবিন্যস্ত চিন্তার মধ্যেই আছে নিবন্ধরচনার যাদুমন্ত্র।

এইবার নিবন্ধের অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিবন্ধের মধ্যে একটা যুক্তির বাঁধন চাই। বাক্যগুলি এমন হইবে যে একটিও যেন এদিক-ওদিক না করা যায়। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেমনভাবে বাঁধা—তাহা হইতে যেমন একটি অংশও ছিন্ন করা যায় না—ঠিক তেমনি একটা সংহতি থাকা চাই নিবন্ধে। উহাতে এমন শিথিল অংশ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, যাহাকে ইচ্ছা করিলেই ছিঁড়িয়া বাদ দেওয়া যায়।

সুসংবদ্ধ এইরূপ নিবন্ধের মধ্যে এখন আদি, মধ্য ও অন্তের নিপুণতা থাকা চাই। আরম্ভ হইবে যথার্থ ই আরম্ভ—হঠাৎ খাপছাড়াভাবে কথা পাড়িলে চলিবে না। সুকৌশলে সুন্দরভাবে আরম্ভ করিয়া বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং অবশেষে এমনভাবে প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করিতে হইবে যাহাতে সমগ্র নিবন্ধটি অখণ্ড বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিবন্ধরচনা-সম্বন্ধে ইহার অতিরিক্ত বলা নিষ্প্রয়োজন। এইবার উপস্থিতমত শিক্ষকমহাশয়ের নির্দ্দেশে হাতেকলমে শিক্ষা করাই বিধেয়।

এই পুস্তকে যেসকল নিবন্ধ দেওয়া হইল, তাহাদের সম্বন্ধে দুইএকটি কথা বলিব। নিবন্ধগুলি আদর্শস্বরূপেই দেওয়া হইল। ইহাদের অনেকগুলি বিষয়বস্তুর ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্ দিয়া গতানুগতিকতাবর্জ্জিত বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু ছাত্রদের এই নূতন আদর্শের ছাঁচে চালিত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামি হইতে মুক্ত স্বচ্ছ চিন্তা ও কল্পনা অনুপ্রাণিত করা।

তবে পরীক্ষার্থীদের এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাদের নিবন্ধ যেন একেবারে তথ্যবস্তুহীন মুক্তাত্মা কাব্য হইয়া না যায়। বস্তু ও কল্পনার, তথ্য ও ভাবের সংমিশ্রণে গঠিত মধ্যপন্থী নিবন্ধই ছাত্রগণের পক্ষে শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

উদ্ভিদ্-প্রসঙ্গ

ধান্য

ধান বাঙলার প্রাণস্বরূপ। শুধু বাঙলার কেন, পূর্ব্ব-এশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসীর ইহাই প্রধান খাদ্যশস্য। পৃথিবীর এই অঞ্চলে তাই বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে ধানের বহুল চাষ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার ধান্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাঙলার সকল জেলায় ধানচাষের পদ্ধতি এক নয়। অনেক জেলায় একপ্রকার ধান কাটা হয় শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে। তাহার নাম আশু বা আউশধান। চৈত্র-বৈশাখমাসে এই ধান বুনিতে হয়। তিনমাস কালের মধ্যেই আউশধান পাকিয়া যায়। আউশধান যে-সময় বুনিতে হয় সেই সময় বা তাহার কিছু পরে আমনধানের বীজও বপন করা হয়। অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে বর্ষার পূর্ব্বে ইহা সরাসরি বুনিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে জল একটু দেরীতে আসে তাহাতে ধানের চারা প্রস্তুত করিয়া রোপণ করা হয়। আউশ-ধান বা পাটের ফসল উঠিয়া গেলে ঐসকল জমিতেই এরূপে দ্বিতীয়বার আমনধানের চারা লাগানো হয়। আমনধান অগ্রহায়ণ-পৌষে উঠে। পশ্চিম-বাঙলার অধিকাংশ স্থানে আউশ ও আমনধানের চাষ বর্ষাকালে প্রায় একই সঙ্গে হইয়া থাকে। আমন-ধান পৌষমাসে কাটা হয়; কিন্তু আউশ কাটা হয় শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে। বাঙলাদেশে সাধারণতঃ এই দুইপ্রকার ধানের চাষই প্রচলিত। তবে কোন কোন অঞ্চলে 'বোরো'-নামক তৃতীয়প্রকার ধানেরও চাষ করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ধানচাষ-সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় রুশিয়াদেশে নাকি একই জমিতে বৎসরে তিনচার বার পর্য্যন্ত ধান উৎপন্ন করিবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বাঙলাদেশে কিন্তু আবহমানকাল ধরিয়া প্রচলিত পদ্ধতিই চলিয়া আসিতেছে। এদেশে শত শত বৎসর ধরিয়া লাঙল-গোরুর সাহায্যেই জমির চাষ হয়। অপ্রচুর গোবর ও ছাইয়ের সার ব্যতীত উর্ব্বরতাবর্দ্ধক অন্য কোন বস্তুর ব্যবহার এদেশে নাই বলিলেই চলে। ধানচাষের জন্য এদেশে প্রধানতঃ আকাশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। সময়মত ও নিয়মিত বারিপাত হইলে শস্য ভাল হয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা অসময়ের বৃষ্টি ধানচাষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাহা ছাড়া পঙ্গপালের আক্রমণও এক ভয়াবহ বিঘ্ন। বিজ্ঞানসম্মত জলনিষ্কাশন ও জলনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এবং পঙ্গপাল-বিনাশের উপায় উদ্ভাবিত না হইলে এ অবস্থার প্রতীকার নাই।

সূক্ষ্মতর তারতম্য-অনুসারে ধানের অশেষপ্রকার ভেদ ও নামের বিভিন্নতা রহিয়াছে। কোন কোন ধান অতিশয় সুচারু ও সূক্ষ্ম, তাহাদের চাউলও সুগন্ধি এবং

সুস্বাদু। কোন কোন ধান আবার নিতান্ত স্থূল ; তাহাদের চাউল দুষ্পাচ্য। কিন্তু মোটা কাপড়েই যেমন সাধারণ বাঙালী তুষ্ট, মোটা ভাতেই তেমনি তারা পরিপুষ্ট।

তবে বাঙালীমাত্রই 'ভেতো'। এইজন্য শক্তুজীবী অবাঙালীর নিকট বাঙালী অবজ্ঞাভাজন হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অগৌরবের কিছু নাই। মনে রাখিতে হইবে দুর্দ্ধর্ষ জাপানীও অন্নজীবী। সে যাহাই হউক, বাঙালীর নিকট ধন ও ধান্য প্রায় অভিন্ন। ধানের এমন অংশ নাই যাহার কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই। ধানের গাছকে বিচালি ও খড় বলা হয়। গোরুর খোরাক হইতে ঘরের ছাউনি পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কার্য্যে তাহার বিচিত্র ব্যবহার। আর ধান? তাহার খুদকুঁড়া হইতে তুষটি পর্য্যন্ত কিছুই ফেলা যায় না। মোট কথা, ধানের প্রত্যেক অংশ বাঙালী-জীবনে আবশ্যক, কোন কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। এই বিশাল দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখশোক তাই ধানের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

শুধু সুখদুঃখের কথা কেন, বাঙালীজীবনের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই ধান্য-দূর্ব্বা অপরিহার্য্য। বরণ করিবার সময় বা বিদায় দিবার বেলায়, পূজাপার্ব্বণে এবং অশেষবিধ মঙ্গলাচরণে দূর্ব্বার সহিত ধান্য চাই—ইহা না হইলেই নয়। আশীর্ব্বাদ-ভাজনের মস্তকে ও গুরুজনের পদপ্রান্তে যখন যেরূপ যুক্তিযুক্ত সেইরূপ ধান্য-দূর্ব্বা স্থাপন করিয়াই বাঙালীচিত্তের স্নেহাশিস ও শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদিত হয়। বস্তুতঃ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের বিচিত্র লীলায় ধান্য বাঙলায় একটা অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। কবিকুল ইহার গুণগানে মুখর। তবে তাহার কারণ ভিন্ন। উপ-যোগিতার কথা নহে—ধানের সুচারু দৃশ্য ও বৃদ্ধির পরিপূর্ণ রূপটাই সৌন্দর্য্যপিপাসু কবিচিত্ত অধিকতর মুগ্ধ করে। দিগন্তবিস্তারী শ্যামল ধান্যক্ষেত্র মৃদুমন্দ বায়ুস্পর্শে দুলিয়া দুলিয়া যখন লহরীচঞ্চল হইয়া উঠে, তখন পুলকবিস্ময়ে হৃদয় ভরিয়া যায়, কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তান উঠে, "এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে"। আবার শরতের সূচনায় স্বর্ণশীর্ষ পরিপক্ক ধানের অপরূপ সৌন্দর্য্যদর্শনে মনে হয় বসুন্ধরা যেন সত্যই "পরেছে কিরীট কনক-কিরণে" এবং তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই "মধুর মহিমা হরিতে হিরণে"।

ধানের সহিত বাঙলার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান জড়িত আছে। তাহার নাম নবান্ন। নূতন ধান উঠিলে বেশ একটু ঘটা করিয়াই এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাঙালী প্রথম নবান্ন গ্রহণ করে। ধান যে বাঙালীর নিকট কত আশা, আনন্দ ও সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্যোতনা করে, ইহা তাহারই প্রমাণ। যখন "মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর, আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার," তখন সত্যই আনন্দের সীমা থাকে না। এ-সকলই এই সত্য প্রতিষ্ঠা করে যে, ধান শুধু বাঙালীর উদরপূর্ত্তির উপকরণমাত্র নহে—উহা তাহার অনেক সুখ ও আনন্দ এবং মঙ্গল-অনুষ্ঠানের প্রতীক ও অঙ্গও বটে

———

কদলীবৃক্ষ

কদলীকে বৃক্ষ বলা হয় কেবল তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবারই জন্য। কিন্তু কদলী বৃক্ষ না হউক, কলাগাছ গাছ তো বটে এবং গাছহিসাবে তাহা এত উপেক্ষার বস্তুও নহে। বস্তুতঃ এই অবহেলিত অনাদৃত উদ্ভিদ্‌টি বাঙালীর পরম বন্ধু। উপকারিতার কথা ছাড়াও কলাগাছ আমাদের নিকট একটু সমীহ এবং আরও একটু মর্য্যাদা ন্যায্যভাবেই দাবী করিতে পারে।

শাখা-প্রশাখাহীন সরল সুডৌল কদলীকাণ্ড। প্রাংশু তাহার উন্নতি, মসৃণ চারুদেহ। দীর্ঘায়ত পত্রাবলী শীর্ষে তাহার অপরূপ শ্যামশোভা বিকশিত করে। কিন্তু কদলীবৃক্ষের শোভা এককে নহে, ঐক্যে। তাল, শাল বা অশ্বত্থের ন্যায় তাহারা গর্ব্বোদ্ধত বিশালতা লইয়া একাকী বিরাজ করে না। একে অন্যের মূলে ভর করিয়া পরস্পর পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন হইয়া একত্রে যেন পরমপ্রীতিতে তাহারা অবস্থান করে। কলাগাছ নাই বাঙলায় এমন স্থান নাই। হিংসাদ্বেষ-জর্জ্জরিত বাঙালীসমাজের মধ্যে অবস্থিত কদলীগুচ্ছ যেন উপেক্ষিত আদর্শের ন্যায় বিরাজমান।

কলাগাছ এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই হয়। তবে নূতন মাটিতেই উহার ফলন ভাল। তাই পুকুর কাটিয়া তাহার পাড়ে বা নূতন মাটিতে ভরাট করিয়া বাড়ী বাঁধিয়া চতুর্দ্দিকে কলাগাছ রোপণ করা হয়। ইহার একটা অন্যতম উদ্দেশ্যও অবশ্য আছে। কলাগাছ গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মিয়া শিকড়জালে মাটি আবদ্ধ করিয়া রাখে। প্রবল বর্ষায় নূতন মাটি তাহাতেই ধ্বসিয়া পড়িতে পারে না।

কলাগাছের উপকারিতার অন্ত নাই। উহার কাণ্ডদ্বারা (বর্ষাপ্রধান অঞ্চলে) একপ্রকার ভেলা প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গের অনেকস্থলে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলে এইরূপ ভেলাই প্রধান সহায়। আবার ফাল্গুন-চৈত্রমাসে জলাশয়গুলি যখন শুষ্কপ্রায় হইয়া আসে, তখন জল-পরিশোধনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কলাগাছ জলে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কলাগাছের মধ্যে যে একপ্রকার ক্ষার আছে, তাহারই ক্রিয়ায় সম্ভবতঃ এরূপে জলশোধন হইয়া থাকে। রাসায়নিক সোডা এদেশে অল্পদিন হইল প্রচলিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কলার খোলা পোড়াইয়া এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় ক্ষার নিষ্কাশন করা হইত এবং তাহার দ্বারাই তখন এদেশে জামাকাপড় পরিষ্কার করা হইত। কদলীর এই বিরঞ্জনী (bleaching) গুণ এদেশের সর্ব্বজনবিদিত। হিন্দুগণ কদলীবৃক্ষকে বিশেষ পবিত্র মনে করে; হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে বা শ্রাদ্ধ-পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে কলার বাসনারচিত 'পেটো' বা ডোঙায় অন্ন রক্ষিত হয়। আর কলাপাতা, উহা তো ভোজের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এমন অনেক শিশু আছে, যাহাদের ধারণায় কলাপাতায় খাওয়াই নিমন্ত্রণাহার, অন্যথায় অশেষ আয়োজনসত্ত্বেও ভূরিভোজও সে মর্য্যাদা পায় না। শিশু-কল্পনায় কলাপাতার এতই

আভিজাত্য। সামাজিক আচারেও কলার পাতা ও গাছ প্রয়োজন। মঙ্গলঘট-স্থাপনে, তোরণ-নির্ম্মাণে বা দুর্গাপূজায় 'কলাবৌ' প্রভৃতিতে কলাগাছ না হইলেই নয়। ব্যাবহারিক প্রয়োজনের কথা এইখানেই শেষ হয় না। কলার ফুল বা মোচা এবং কাণ্ডের সার বা থোড় উপাদেয় খাদ্য। আর কদলী স্বয়ং? উহা কেবল মর্কটেরই প্রিয় নহে, মানুষেরও অতি উপাদেয় খাদ্য, দেবতারও নৈবেদ্য। এমন কি কলাগাছের মূলটি পর্য্যন্ত মানুষের প্রয়োজনে আসে। রথযাত্রার সময় পূর্ব্বদেশে বহুস্থলে রথচক্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য কলাগাছের গুঁড়ি ব্যবহৃত হয়।

আকার ও স্বাদের বিভিন্নতা-অনুসারে কদলীর প্রকারভেদ রহিয়াছে। মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁটালী প্রভৃতি নানাপ্রকার তাহাদের নাম। একশ্রেণীর কলা আছে, যাহা কাঁচা অবস্থায় খাইতে হয়। তাহার নাম কাঁচকলা। কাঁচকলা চিরকালই কাঁচা থাকে এমন নয়, তাহাও পাকে। তবে মানুষের প্রয়োজনে তাহা পাকিবার সময় পায় না। কাঁচকলা একাধারে আহার ও ঔষধ। ইহা ধারক ও রক্তবর্দ্ধক। কবির কাব্যেও "রসিক রসাল কদলী" স্থান পাইয়াছে—"তুমি যুগে যুগে বর্ত্তমান, বৃন্দাবনে মোহনবাঁশী, বাঙলাতে 'মর্ত্তমান'।"

কিন্তু এহেন যে কলা, তাহা কেন যে বাগ্‌ধারায় কুখ্যাতি লাভ করিল তাহা বলা দুষ্কর। মানুষ ক্রোধ বা আস্ফালন প্রদর্শন করিবার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া ধরে। লোকে বলে কদলীপ্রদর্শন করিল। কিছুই খাওয়াইবার সম্ভাবনা যখন বিন্দুমাত্র নাই, তখন লোকে কলা খাওয়াইবার কথা বলে এবং বাদানুবাদে প্রতিবাদে প্রচণ্ড রূঢ়তা প্রদর্শন করিবার জন্য উচ্চারণ করে 'কাঁচকলা'। কলার পোড়াকপাল, মানুষের জন্য এত করিয়াও বাঙলায় তাহার সুরাহা হইল না। কেবল ঝগড়া-বিবাদে, অশুভ ইঙ্গিতে ও যত সব অলক্ষুণে ব্যাপারে তাহার উল্লেখ হয়। মানুষ যে কত বড় কৃতঘ্ন প্রাণী ইহা তাহারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

পাট

পাটের প্রাচীন ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে। কবে কিরূপে এবং প্রথম কোন্ দেশে যে পাটচাষ প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পাট যে ভারতবর্ষেরই বিশেষ একটি উদ্ভিদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। চীন ও জাপানেও পাটচাষ হয়। কিন্তু তাহা পরিমাণে সামান্য। ভারতবর্ষেও পূর্ব্বে পাট অল্পই উৎপন্ন হইত। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় যখন রুশীয় শণের অভাব দেখা দেয়, তখন ইংরেজ বণিকের আগ্রহাতিশয্যেই এদেশে পাটচাষ বিস্তার লাভ করে। বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্যহিসাবে পাট-উৎপাদন তাই শতাব্দীকাল যাবৎ ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান কালে পাটই ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানী-পণ্য। বাঙলার ইহা সর্ব্বপ্রধান সম্পদ্। কারণ, সমগ্র ভারতবর্ষের মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগই বাঙলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইজন্য ইহা বাঙলার প্রায় একচেটিয়া পণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

পাটচাষ যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য। অন্য যে কোন ফসল অপেক্ষা উহার উৎপাদন অধিকতর শ্রমসাপেক্ষ তো বটেই। সাধারণতঃ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যে জল ও আবহাওয়া বিবেচনা করিয়া পাটের বীজ বপন করিতে হয়। ভাদ্র-আশ্বিনমাস পাট কাটার সময়। কাটা হইলে গুচ্ছে গুচ্ছে বাঁধিয়া পাটগাছ ভেলার মত করিয়া স্তরে স্তরে সজ্জিত হয় এবং স্থির জলায় তাহাকে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এরূপে ভিজিয়া ভিজিয়া পাট যখন পচে, তখন তাহাকে ডাঙায় তুলিয়া ছাড়াইতে হয়। আঁশ হয় পাট, নির্আঁশ গাছ হয় পাঁকাটি। তারপর পাটকাচার পালা। জলের মধ্যে আছড়াইয়া সজোরে কাচিয়া কাচিয়া এইবার পরিষ্কৃত পাটের তন্তু শুভ্রবরণ করিতে হয়। তাহাকে আবার ভারা বাঁধিয়া পর পর কয়েকটি রোদে শুকাইয়া লইয়া সুকৌশলে গাঁইট বাঁধিয়া তবে ঘরে তুলিতে হয়। বলা বাহুল্য, দীর্ঘ শ্রম ও বহু ব্যয়ের ফলে এই পাট যখন গৃহাভ্যন্তরে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয় তখন চাষীর মুখে হাসি, বুকে বল জাগিয়া উঠে।

পাটের অশেষ উপযোগিতা। উহার পাতাটি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁকাটি পর্য্যন্ত বিভিন্ন অংশ বিচিত্র ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়। কচিপাতা ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া অথবা শাকহিসাবে উপকারী খাদ্য। পাঁকাটি জ্বালানীরূপে, ঘরের বেড়া বাঁধিতে ও অনুরূপ অসংখ্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পাট হইতে দড়িদড়া, সুতলি, চট, থলিয়া, কার্পেট, ক্যাম্বিস্ প্রভৃতি নানাপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হয়। কাগজ, নকল রেশম, এমন কি নাইট্রো সেলুলোস্ ও কাঁচকড়াজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনেও পাটের প্রয়োজন। আর্জ্জেন্টিনা দেশে পাট হইতে একপ্রকার চটিজুতা ও স্যাণ্ডাল কারুশিল্পের রমণীয় নিদর্শন। বস্তুতঃ পাটের ব্যবহার ও উপযোগিতার কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

কেহ কেহ পাটকে 'স্বর্ণতন্তু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মূল্যের দিক্ দিয়া বাঙালীর নিকট পাট স্বর্ণতুল্যই বটে। বাঙলার সমবেত ও সাংবৎসরিক ক্রয়শক্তির অধিকাংশ এই পাটব্যবসায় হইতেই সংগৃহীত হয়। শতসহস্র মণ কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য প্রতিবৎসর বিদেশে রপ্তানী হয় এবং বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা এদেশে আমদানী হয়। বাঙালীমাত্রই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই বিপুল অর্থের অংশভাগী, তাই পাট ভাল হইলে এবং ভাল দর পাওয়া গেলে দেশের সকলেরই মঙ্গল। ইহাতে রাজার ভাল, প্রজারও ভাল। উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-কবিরাজ, ময়রা-মুদী,

সেকরা-মোদক—এক কথায় সকল বাঙালীরই তখন উপার্জ্জন বৃদ্ধি পায়। যে বৎসর পাটের বাজারে মন্দা দেখা দেয়, সে বৎসর আবার তেমনি বড়ই দুর্বৎসর। বাঙালীর ঘরে ঘরে তখন অভাব-অনটন দেখা দেয়। চাষীর ভাত জোটে তো কাপড় জোটে না, জমিদার খাজনা পায় না, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় সকল বিষয়েই মন্দা দেখা দেয়। দেশ যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। পাটের সহিত এইরূপে বাঙালীর সুখদুঃখ ওতপ্রোত-ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। অন্তিম বিচারে অবশ্য পাটকে উপলক্ষ করিয়া বাঙালীর সুখ অপেক্ষা দুঃখের বোঝাই বাড়িয়া উঠিয়াছে বেশী। কারণ, পাট নামে মাত্র বাঙালীর একচেটিয়া পণ্য। প্রকৃতপক্ষে বণিকের কুটিল চক্রান্তে ব্যবসাটি একান্তভাবে বিদেশীরই করায়ত্ত। তাহার ফলে পাটের বাজার তাহাদেরই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ও পাটের দর তাহাদের কূটকৌশলে নির্দ্ধারিত হয়। যাহারা উৎপাদন করে তাহারা উপযুক্ত মূল্য পায় না—কেবল বিল ছেঁচিয়াই মরে, কই খায় অন্যে।

পাট দেশের অন্যতম একটি অনিষ্টেরও কারণ। আজ বাঙলার ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার প্রকোপ সম্ভবতঃ পাটচাষেরই সমসাময়িক। পাটের ক্ষেত মশকের 'ডিপো'-স্বরূপ। পচা পাট খালবিল ও বদ্ধ জলাগুলিকে যখন বিষাইয়া দেয়, তখন পানীয়সঙ্কট তো আছেই, উপরন্তু মশকের উপদ্রব দুঃসহ হইয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এই কারণে বাঙলার পূর্ব্বাঞ্চলে প্রতিবৎসর মহামারী সৃষ্টি করে।

বাঙলা আজ বিভক্ত। পাটচাষ প্রধানতঃ পূর্ব্বাঞ্চলেই বিস্তৃত অথচ ব্যবসায়-কেন্দ্র কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল। ইহার ফলে পাটের ভবিষ্যৎ যে বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিবে, একথা বলাই বাহুল্য। একে তো পৃথিবীব্যাপী পাটের বিকল্প (substitute) আবিষ্কার ও ব্যবহার-বিষয়ে অশেষ গবেষণা চলিতেছে, তাহার উপর এই কৃত্রিম ব্যবধান। ভবিষ্যৎ বড়ই অশুভ—শুধু পাটের নহে, পাটের উপর একান্ত নির্ভরশীল উভয় বঙ্গের অর্থনীতি এবং সমাজ-জীবনেরও বটে।

একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের আত্মকথা

বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া দুই শতাব্দী কাটিয়া গেল, কিন্তু আমি একস্থানেই স্থির রহিয়াছি। শত নিদাঘের দাবদাহ আমাকে বিশুষ্ক করিতে পারে নাই ; ঝটিকার প্রলয় তাণ্ডব আমি উপেক্ষা করিয়াছি ; ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়ন আমার সম্মুখে ব্যর্থ হইয়াছে।

আমি বটবৃক্ষ। শাল, তাল, তমাল, দেবদারু, অশ্বত্থ প্রভৃতি বনভূমির বিরাট্, বিশাল মহীরুহকুল আমারই বান্ধব ও জ্ঞাতিভাই। অশ্বত্থ আবার আমার 'পালটি

ঘর', কারণ বট-অশ্বত্থের বিবাহ দিয়া সেকালের বহু পুণ্যকামী হিন্দু আমাদের সংযোগ-সাধন করিয়াছেন। তথাপি আমি একক, আমি স্বতন্ত্র—অন্যান্য মহীরুহের সঙ্গে আমি সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিবার সুযোগ পাই নাই। আমি অতীতের সাক্ষী—অতীতের মতই "মুখর দিনের চপলতা মাঝে" আমি স্থির হইয়া রহিয়াছি। অতীতের মতই আমি "বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত" হইয়া বহন করিতেছি। আমি অচেতন নহি, ভাষাহীন নহি।

সাধারণ মানুষ বহুকাল আমাকে অচেতন বলিয়াই ধরিয়া রাখিয়াছিল। এই দেশেরই মনীষী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একদিন বিস্মিত জগতের সম্মুখে প্রমাণ করিয়া দিলেন—আমাদেরও প্রাণ আছে। শুধু তাহাই নহে, মানুষের মত আমরাও সুখদুঃখ অনুভব করি। তাই যাহার প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে, তাহার ভাষা থাকা একেবারে অসম্ভব নহে। তবে সেই ভাষা মানুষের জগতের প্রচলিত অসংখ্য ভাষার একটিও নহে। আমাদের ভাষা শুধু সে-ই শুনিতে পারে—"যে শোনে, যাহার আছে গো কাণ", সে-ই শুধু বুঝিতে পারে, "যে বুঝে, যাহার আছে গো প্রাণ"। বৈদিকযুগের আর্য্য ঋষিগণ আমাদের প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন; ওষধি, বনস্পতি, মহীরুহ সকলের উদ্দেশে তাঁহাদের বন্দনাগীতি আজিও ধরাতল হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

সমগ্র উদ্ভিজ্জগতের কথা তুলিয়া আমার লাভ নাই। আমার নিজের কথা, নিজের অনুভূতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। অতি শৈশবের কথা কাহারও মনে থাকে না, আমারও নাই। কোন্ বৃক্ষ-জননীর অসংখ্য বীজের একটি অতি-ক্ষুদ্র বীজ কোন্ অজানা পাখীর মুখ হইতে এখানে পড়িয়া গিয়াছিল, তারপর অঙ্কুর হইতে ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিলাম, কেহ সেই অ-খ্যাত দিনের অতি-তুচ্ছ কাহিনী লিখিয়া রাখে নাই। অথবা হয়তো সুদূর অতীতের কোন পুণ্যকামী ব্যক্তি দেশের ও দশের কল্যাণ কামনা করিয়া গ্রামের প্রান্তে এই দীঘির পাড়ে অতি শৈশবাবস্থায় কত সমারোহে আমাকে 'প্রতিষ্ঠা' করিয়া থাকিবেন, সেই ঘটনা মনে রাখিবার মত আজ কেহই বাঁচিয়া নাই। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সকলে 'বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা' ব্যাপারটাকে কু-সংস্কারের অঙ্গ বলিয়াই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছিল। সুখের বিষয়, নবযুগের অরুণ প্রভাতে স্বাধীন ভারতে তোমরা সেদিন 'বন-মহোৎসব' সম্পাদন করিয়া আমাদের উদ্দেশে পুনরায় অঞ্জলি দান করিয়াছ। তোমাদের কার্য্যে আমার গৌরব বাড়িবে না, তোমাদেরই বিগতশ্রী ফিরিয়া আসিবে, তোমরাই সমৃদ্ধ হইবে।

আত্মকথা বলিতে আরম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে কথার 'খেই' হারাইয়া ফেলিতেছি। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া সংসারের কত কিছু দেখিলাম। কত ভাঙা-গড়ার বিচিত্র কাহিনী আমার মর্ম্মতলে প্রবেশ করিয়াছে। কিছু বলিতে গেলেই কত রকমের কথা মনে পড়িয়া যায়। বহুশত বিহগের কাকলী আমাকে আনন্দ

বিতরণ করিয়াছে, অযুত মেঘমালা আমাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিয়াছে, কত বসন্তের সমীরণ আমাকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। মনে পড়ে তোমাদেরই কাহারও পিতামহের প্রপিতামহী টুকটুকে বউটি সাজিয়া পাল্‌কী চড়িয়া প্রথমে যেদিন স্বামীর ঘর করিতে চলিয়াছিল, তাহার পাল্‌কীখানি বেহারা ক'জন আমার ছায়ায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। লুকাইয়া সেই মুখখানি দেখিয়া লইয়াছি—চক্ষে তাহার বিদায়ের অশ্রু, মুখে তাহার মিলনের হাসি। মেঘ-রৌদ্রের খেলার মত তাহার হাসি-কান্নার দৃশ্যখানি আমার বড়ই ভাল লাগিল। কখনও বা দেখিয়াছি কোন বৃদ্ধের শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থা; শববাহকের দল শব নামাইয়া এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। কখনও বা গভীর নিশীথে ডাকাতের দল কোন্ গ্রামে হানা দিবে তাহা নিয়া জটলা করিয়াছে, অথবা লুণ্ঠনের মালের বখরা লইয়া নিজেরাই মারামারি করিয়া পরস্পরের মাথা ভাঙিয়াছে। আমারই শীতল ছায়ায় রাখাল বালকের দল দুপুরবেলায় মহানন্দে কাল কাটাইয়াছে; কোন দেশ হইতে বেদের দল আসিয়া 'ডেরা' তুলিয়াছে অথবা কোন গৃহছাড়া সন্ন্যাসী ধূনি জ্বালিয়াছে।

অপরাহ্ণের দিকে আমার তলদেশ আরও কোলাহল-মুখর হইয়া উঠিত। গ্রামের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন—প্রতিবেশীর কুৎসা হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর তত্ত্বকথা পর্য্যন্ত। যুবকের দলও মাঝে মাঝে আসিয়া জুটিত। তাহাদের আলোচনা হইতে সমসাময়িক অনেক ঘটনার কথা জানিতে পারিয়াছি—বর্গীর দল পনের মাইল দূরে কোন্ গ্রামে হানা দিয়াছে, অথবা নীল-কুঠির সাহেবেরা কোন্ কোন্ গ্রামে অত্যাচার করিয়াছে, অথবা আরও পরবর্ত্তী কালে বিদ্রোহী সিপাহীগণ কোন্ শহরের সাহেবদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে। কখনও শুনিতাম, রাজা রামমোহন রায় নাকি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দুদিগকে ম্লেচ্ছ করিয়া তুলিয়াছেন, অথবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের প্রচলন করিয়া হিন্দু-সমাজটার সর্ব্বনাশের আর কিছুই বাকী রাখেন নাই। কখনও শুনিয়াছি কাব্যের আলোচনা। প্রাচীনপন্থীর দল বলিতেছেন, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের মত কবি জন্মিবে না—আর নবীনপন্থীর দল উত্তর দিলেন, মাইকেল ও নবীন সেন, এঁরাই তো কবি। একদল বলেন—মিল নাই, ছন্দ নাই, তাই কি আবার কাব্য? তারপর ব্যঙ্গের সুরে কেহ-বা "ছুছুন্দরীবধ কাব্য" হইতে খানিকটা বলিয়া গেলেন। অপর পক্ষে উচ্ছ্বাসভরে হয়তো "প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ" বা "লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন" অথবা পলাশীর রণক্ষেত্রে মোহনলালের উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী আবৃত্তি করিলেন। প্রাচীন-নবীনের লড়াই চিরকালই চলিতেছে।

আমাকে কেন্দ্র করিয়া এখানে রথের দিনে ও গাজনের দিনে মেলা বসিয়াছে—কত লোকের আনাগোনা, আর কতই না আনন্দ-কলরব। আমারই তলায় চাঁদোয়া

খাটাইয়া গ্রামের বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে কবিগান, কথকতা ও যাত্রাগানের আয়োজন করা হইত। তোমরা আজকাল ছায়াচিত্র লইয়াই মত্ত রহিয়াছ—খাঁটি মানুষটাকে দেখিতে পাও না, তার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিতে পাও না। আমি শুনিয়াছি নিধুবাবুর টপ্পা, হারু ঠাকুর, লোকা ধোপা, ভোলা ময়রা ও আণ্টুনী ফিরিঙ্গির চমৎকার কবির লড়াই। আমি দেখিয়াছি গোপাল উড়ে এবং আরও কত সম্প্রদায়ের যাত্রা। আমার চলিবার শক্তি নাই, তাই এত সুদীর্ঘ জীবনেও ছায়াচিত্র দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। কিন্তু তাই বলিয়া আমার দুঃখ নাই; যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহারই স্মৃতিভারে আমার চিত্ত ভরপূর।

আমার কাহিনী ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইতেছে। যত বলিতে চাই, ততই যেন বলিবার বিষয় আরও বিপুলতর হইয়া উঠে। বর্ত্তমান যুগে তোমরা যাহা দেখিতেছ তাহার অনেক কিছুই আমি না-দেখিতে বা না-শুনিতে পারিলেই তৃপ্তিবোধ করিতাম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশব্যাপী যে রক্ত-গঙ্গা বহিয়া গিয়াছে, পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে বিকট বীভৎস লীলা প্রকাশ পাইয়াছে, মহাযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া যে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে—আমার দুইশত বৎসরের অভিজ্ঞতায় উহাদের তুলনা মিলিবে না। তোমরা হয়তো আমাকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। ভূষণ্ডী কাকের গল্প জান কি? গল্প শুনিয়া আমার কথার অর্থ বুঝিয়া লইবে; ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে উহার ঠোঁট দুইটা ভিজাইয়াছিল মাত্র, আর পঞ্চাশের মন্বন্তরে উহা নর-রক্ত আকণ্ঠ পান করিয়াছে।

আমার জরা নাই বার্দ্ধক্য নাই, তথাপি একদিন আমাকেও মরিতে হইবে। হয়তো সহসা বজ্রপাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিয়া যাইবে, অথবা একটা প্রলয়-ঝঞ্ঝা আমাকে উৎপাটিত করিবে। বিদায়ের ক্ষণে মাটির এই পৃথিবী, আকাশের ঐ সূর্য্য ও সর্ব্বত্র-পরিব্যাপ্ত বায়ুর উদ্দেশে আমার শেষ প্রণতি জানাইয়া বলিব—তোমরা আমার ইহজীবন সার্থক করিয়াছ, আমি সহস্র সহস্র প্রাণীকে ছায়াদান করিতে পারিয়াছি।

———

প্রাণি-প্রসঙ্গ

গোরু

প্রাচীন ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন ছিল গোধন। বড় বড় রাজার ঐশ্বর্য্য তখন অনেক পরিমাণে তাঁহাদের গোসংখ্যার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু গোরুর সে মর্য্যাদা আর নাই। নিঃস্বার্থ বন্ধুহিসাবে গোরু আজও মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া যাইতেছে। আজও মনুষ্যসমাজে তাহার চেয়ে বেশী আদরে ক্বচিৎ কোন প্রাণী অবস্থান করে। মানুষের পরিবারে থাকিয়া মানুষেরই সহিত হৃদয়-সম্পর্কে জড়িত হইয়া আজও এদেশে গোরু দেবতার সম্মান হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই।

গোরু একটি সুদর্শন প্রাণী। সুরচিত তাহার চতুষ্পদ, খুরগুলি দ্বিধাভিন্ন। আনত কর্ণ মক্ষিকাতাড়নে প্রায় সদা-স্পন্দমান, শীর্ষে শৃঙ্গদ্বয় বিচিত্র ভঙ্গীতে বক্র, কখনও-বা সরল। আবার এমন গোরুও আছে যাহার শৃঙ্গ অদৃশ্য। গোরুর চক্ষু দুইটি বড়ই সপ্রতিভ। নাসারন্ধ্র তাহার বিলোল ও বিস্ফারিত। দীর্ঘ লাঙ্গুলসীমায় একগুচ্ছ লোম—উহাই পুচ্ছ। মশকাদি তাড়ন করিবার জন্য ইহাই তাহার প্রধান সহায়। তিব্বতদেশে চমরী নামে খ্যাত একপ্রকার গোরু আছে। তাহাদের পুচ্ছ অজস্র ও চিক্কণ লোমরাজিদ্বারা রচিত। চমরীর পুচ্ছেই দেবপূজার চামর প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোরুর গলদেশে সম্মুখের পদদ্বয় হইতে চিবুক পর্য্যন্ত কোমল এক মাংসখণ্ড লম্বমান থাকে—তাহাকে 'গলকম্বল' বলে। পৃষ্ঠ ও স্কন্ধদেশের সন্ধিস্থলে সুচারু ককুদ্ শক্তিও সৌন্দর্য্যের রমণীয় নিদর্শনস্বরূপ বিরাজ করে।

গোরুর প্রকৃতি শান্ত। নিরীহ নির্ব্বিরোধভাবেই ইহারা থাকিতে ভালবাসে। এমন কি প্রকাণ্ড বলীবর্দ্দটি পর্য্যন্ত শক্তির তুলনায় নির্জ্জীবই বলিতে হইবে। পুরাকালে অবশ্য ষাঁড়ের লড়াই বহুপ্রচলিত ছিল। সুবিখ্যাত রোমের প্রেক্ষাচক্র (Amphitheatre) হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশের মাঠে-প্রান্তরে সর্ব্বদাই ষাঁড়ের লড়াই হইত এবং তাহা সাধারণের নিকট বিশেষ উপভোগ্যও ছিল। কিন্তু এই লড়াইটা বাস্তবিক মানুষেরেই সৃষ্ট—নচেৎ মুক্ত অবস্থায় ষাঁড়ে ষাঁড়ে অকারণে এরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ বড় একটা দেখা যায় না। বস্তুতঃ গোরুর মধ্যে হিংসা ও হিংস্রতা নাই বলিলেই চলে। বৎসপ্রসবের পর গাভী কিছুকাল চঞ্চল থাকে। সন্তানস্নেহে তাহার স্বভাব তখন একটু উগ্রতা লাভ করে, কিন্তু তাহাও স্বল্পস্থায়ী হয়। অপত্যস্নেহ গোরুর মধ্যে এক প্রবল প্রবৃত্তি। এ বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা তাহার স্নেহমমতা কিছুমাত্র কম নয়। শুধু আপন অপত্যের প্রতি কেন, গৃহের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিই গোরুর প্রগাঢ় মমত্ব রহিয়াছে—এমন বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। পুরাতন গৃহস্বামীর নিকট হইতে নূতন ক্রেতার

গৃহে যাইবার সময় গোরুকে অশ্রুবর্ষণ করিতেও দেখা গিয়াছে। এমনই কোমল তাহার প্রাণ, মমতায় তাহা এতই ভরপূর।

গোরুর উপকারিতা বর্ণনাতীত। শৈশব হইতে মানুষ তাহারই দুগ্ধে পরিপুষ্টি লাভ করে। দধিদুগ্ধ, ছানামাখন, ক্ষীরসর, ঘৃতননী প্রভৃতি অসংখ্য উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য গোমাতার দান। গোময়টি পর্য্যন্ত পরিহার্য্য নয়। ঘরবাড়ী পরিচ্ছন্ন করিয়া গোবরছড়া দেওয়া এদেশের পল্লীগ্রামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এরূপ অসংখ্য কার্য্যে গোবর পবিত্র বস্তু বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া জ্বালানী প্রস্তুত করিতে ও ক্ষেত্রের সারহিসাবে গোময়ের প্রয়োজনীয়তা তো আছেই। জীবজগতে ইহা কি বিস্ময়কর নহে যে গর্ব্বোদ্ধত মানুষ একটি প্রাণীর পুরীষ পর্য্যন্ত সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং সেই জীবটি হইল এই গোরু? কাজে-কাজেই গোরু সম্মানার্হ এবং দেবজ্ঞানে পূজিত। তাহার উপকারিতার কথার শেষ নাই। শৃঙ্গ, চর্ম্ম, অস্থি, খুর প্রভৃতি গোদেহের প্রত্যেক অংশই মানুষের উপকারে আসে। পাদুকা, ছুরির বাঁট, ক্ষেতের সার প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্যে তাহাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। লাঙল চালাইতে গোরু, শকট টানিতে গোরু, বোঝা বহন করিতে বা ধান মাড়াইতে সব সময় চাই গোরু। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণও এমন কথাও বলিয়াছেন যে ইহলোক-পরলোকের মধ্যবর্ত্তী বৈতরণী পার হইতে পর্য্যন্ত চাই গোরুর লাঙ্গুলাশ্রয়।

কিন্তু সেকাল আর একাল—অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আগে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে গো-শব্দ উচ্চারণ করিয়া নমঃ বলিতে হইত। বর্ত্তমানে গোরু কথাটা প্রায় গর্দ্দভেরই তুল্য মূর্খতাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচিত্র কি? পাশ্চাত্ত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশে কর্ষণে ট্র্যাক্টর, বহনে মোটরযান এবং অনুরূপ বহু কার্য্যে জীবের স্থান দানবে অধিকার করিয়াছে। গোরুর মর্য্যাদা তাই ক্ষীয়মাণ। কিন্তু যন্ত্রদানব এখনও দুধ দেয় না—ভবিষ্যতেও দিবে কিনা বলিতে পারি না। যতদিন তাহা সম্ভব না হইবে ততদিন অন্ততঃ মাতার সম্মান গোজাতির প্রাপ্য, একথা যেন কৃতঘ্ন মানুষ না ভুলে।

অশ্ব

বনের পশুর সহিত মানুষের প্রথম সম্পর্ক ছিল অহি-নকুলের সম্বন্ধ। সুদূর অতীতে তাই আদিম মানুষ নাকি ঘোড়ার মাংস খাইত এবং আহার্য্য-হিসাবেই এই পরমবন্ধুকে মানুষ একদা নৃশংসভাবে হত্যা করিত। কালক্রমে কখন অশ্ব মানুষের প্রীতিভাজন হইয়া উঠে, তাহার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে মিশরীয় সভ্যতার পূর্ব্বে যে অশ্ব মানুষের সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানব-

সভ্যতার প্রথম প্রদোষে অশ্বই সম্ভবতঃ প্রধান আশ্রয় হইয়া থাকিবে। তাই বেদ-পুরাণ রামায়ণ-মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রাচীন গ্রন্থে অশ্বের উল্লেখ ও উপযোগিতার কথা প্রচুর। বস্তুতঃ সেই সুপ্রাচীন কালেই মানবজীবনে অশ্ব যে অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইউরেশিয়ার উত্তরাঞ্চলের অধিবাসিগণ নাকি শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে—সব সময় অশ্বপৃষ্ঠেই জীবন যাপন করিত। জীবিত অবস্থায় বাহনহিসাবে উহাই ছিল তাহাদের একান্ত সম্বল। মানুষ তাহার দুগ্ধ খাইত এবং তাহা হইতে কৌমিস্ (Koumis)-নামক সুরা প্রস্তুত করিত। মৃত অবস্থায় ঘোটকই আবার তাহাদের আহার্য্য-সংস্থান করিত। সভ্যতর জাতির নিকট অবশ্য অশ্ব কেবল ব্যাবহারিক জীবনের উপকারী বন্ধুই মাত্র ছিল না—তাহার কল্পনার আকাশচারী বাহনও ছিল উহাই। রূপকথা-বর্ণিত পক্ষিরাজ ঘোড়া, সমুদ্রোত্থিত উচ্চৈঃশ্রবা, সূর্য্যের সপ্তাশ্ব, আরও কত শত কাল্পনিক অশ্বকে বাহন করিয়া মানুষের মন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

অশ্বের সহিত মানুষের এই যে এত ঘনিষ্ঠতা, তাহার কারণ উপযোগিতা তো বটেই—উহার সুঠাম আকৃতিও বটে। জীবরাজ্যে ঘোটকের ন্যায় সুচারু গঠনের প্রাণী খুব বেশী নাই। বলিষ্ঠ সুডৌল দেহভার তাহার সুদৃঢ় পদচতুষ্টয়ের উপর ন্যস্ত। অবিচ্ছিন্ন খুরগুলি যেন এক একটি নিরেট নিটোল উপলখণ্ড। আনত সুচারু গ্রীবা; অংসোপরি কেশরদাম। পুচ্ছ তাহার লীলাচঞ্চল একগুচ্ছ মসৃণ কেশ। আয়ত চক্ষু দুইটি সদাবিলোল—কেমন মায়াময়! বাস্তবিক অশ্বের দেহসৌষ্ঠব তুলনাহীন: অসীম শক্তির আধার সুপুষ্ট এই দেহটিকে সে এমন একটা মহনীয় ভঙ্গীতে ধারণ করে যে, ইংরেজীতে তাহাকে noble বলিয়াই বর্ণনা করিতে হয়—বাঙলায় বোধহয় এই রূপ ধরিয়া দিতে পারে এমন কোন প্রতিশব্দ নাই।

অশ্বের আকৃতি যেমন, প্রকৃতিও তেমনি নানাদিক্ দিয়া আকর্ষণীয়। উদ্দাম গতি ও ভয়লেশহীন চিত্ত যেমন তাহাকে মহিমময় করিয়া রাখে, নিরীহ বশ্যতা তেমনি তাহাকে সকলের প্রিয় করিয়াছে। অশ্বের প্রভুভক্তিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডারের 'বুকাফেলাস্', রাণা প্রতাপের 'চৈতক' এই প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগের মহিমাতেই ইতিহাস-পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে। শক্তির সহিত প্রীতি, ভক্তির সহিত ত্যাগ মিলিয়া অশ্বকে সত্যই অপরূপ মাহাত্ম্যে মণ্ডিত রাখিয়াছে।

উপকারিতার বিচারে গোরুর পরেই ঘোড়ার স্থান। এক হিসাবে ঘোড়াকে গোরু অপেক্ষা অধিকতর উপকারী বলা যায়। মানুষ আজ আর ঘোড়ার দুধ বা মাংস খায় না। ভারবহন করিতে বা গাড়ী টানিতে, দুর্গম দুস্তর পথের দ্রুত বাহনহিসাবে বা সেনাঙ্গরূপে অশ্ব মানুষের শ্রেষ্ঠ সেবক। এই যন্ত্রযুগেও উহার উপযোগিতার শেষ

নাই। বাঁধাপথে বিশেষ অবস্থায় যন্ত্ররথ চলিতেও পারে—অশ্বের গতি পথের শাসন মানে না। দুর্গম শৈলশিখর আর জলজঙ্গল ভাঙিয়া সে মানুষকে লইয়া যায় গন্তব্যস্থলে। রেল, মোটর, জাহাজ, বিমান জল-স্থল-অন্তরীক্ষ আজ চষিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু তাহাদের চলা সুগম করিতে রীতিমত অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন করিতে হয়। নিরীহ অশ্ব অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বিশেষ কাজে লাগিবে না—কিন্তু অদ্যাবধি তাহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। বহুস্থানে কৃষিকার্য্যে আজও অশ্বের ব্যবহার হয়—ট্র্যাক্টর এখনও তাহাদিগকে কৃষিক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে অশ্বের অন্যতর উপযোগিতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিরামজাতীয় নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য অশ্বের প্রয়োজন হয়। ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির সার্থক ঔষধের কথা ভাবিলে তাই অশ্বের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হয়। বস্তুতঃ এই সুদৃশ্য প্রাণীটি জীবনে মরণে মানুষের পরম বন্ধু। উহার কেশর ও পুচ্ছের কেশদাম হইতে কতপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হয়। বেহালাদি তারযন্ত্রের ছড় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষতস্থান সেলাই করার উপকরণহিসাবে বিচিত্র উহার প্রয়োগ।

অশ্বারোহণ স্বাস্থ্যপ্রদ উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। তাহা ছাড়া, অশ্বারোহণের আনন্দও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কখনও টগ্‌বগাইয়া, কখনও বা প্রচণ্ডবেগে প্রায় মাটিতে বুক মিশাইয়া বিভিন্ন চালে ইহা ছুটে। এই বেগ ও দুলিয়া-ফুলিয়া দুর্মদ গতির মধ্যে কি যেন এক মত্ত নেশা রহিয়াছে। দেখিলেও হৃদয় দুলিয়া উঠে, পঙ্গু দর্শকও মাতিয়া উঠে উত্তাল প্রাণচ্ছন্দে।

উষ্ট্র

প্রকৃতি উহার বিভিন্ন পরিবেশের শাসনে জীবজগতে সীমাহীন বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছে। জীব এই নির্ম্মম প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যরক্ষার জন্য ক্রমাগত চেষ্টায় এক একটি এক একরকম হইয়া উঠিয়াছে। অস্তিত্বরক্ষার এই দীর্ঘ প্রয়াসেই আরবদেশের মরুপ্রান্তরে উষ্ট্রের উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

খেয়ালী প্রকৃতির সৃজনলীলায় যেন সৌন্দর্য্যপিপাসা গৌণ, বৈচিত্র্যবিলাসই যেন উহার প্রধান প্রেরণা। কিম্ভূতকিমাকার উষ্ট্রের কদাকার গঠন দেখিয়া এই কথাটিই যেন বার বার মনে জাগে। কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ এই অদ্ভুত প্রাণীটির মস্তিষ্কটা নেহাৎ ক্ষুদ্র, গ্রীবা অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ। শীর্ণ দীর্ঘ চতুষ্পদের অগ্রভাগ কেমন ভূতের পায়ের মত ঘুরিয়া বাহিরের দিকে মোড় ফিরিয়াছে। সূচ্যগ্র ওষ্ঠাধর আর

উল্টানো একটা লাঙলের মত মুখাবয়ব তাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য দাবী করিতে পারে না। তাহার উপর গতিটি তাহার আরও চমৎকার। সেইজন্য বোধ হয় গজেন্দ্রগমনের যেমন সুখ্যাতি রহিয়াছে, উটের মত চলার তেমনি অশেষ অখ্যাতি। দুলিয়া দুলিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে কেমন একটা লক্ষীছাড়া ভঙ্গিতে উহার চলন।

বস্তুতঃ উটের কোন সৌন্দর্য্য নাই—আছে কেবল উপযোগিতা। মরুপথে চলিতে তাহার ন্যায় বন্ধু মানুষের আর কেহ নাই। বালুকার্ণবের আতপ্ত বিক্ষোভ ভাঙিয়া অবলীলায় চলে এই সজীব মরুপোত। তাহার দেহগঠনে যেন এই উপযোগিতার কথাটাই প্রাধান্য পাইয়াছে। তাহার পাকস্থলীতে তাই একটা বৃহৎ জলাধার রহিয়াছে। ইহাতে তিনদিনের প্রয়োজনীয় জল উট অনায়াসে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। তাহা ছাড়া উটের আহারও সামান্য, রুচির কোন বালাই নাই। কোমল তৃণে তাহার লালসা নাই, কণ্টকাকীর্ণ লতাগুল্ম যত তিক্ত, যত বিস্বাদই হউক না, উট সাগ্রহে তাহাই ভক্ষণ করে। এটুকুও যদি না জোটে তাহাতেও বিশেষ আপত্তি নাই, দুই-চারদিন অনাহারেও উটের কষ্ট হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করিয়া ইহা অনেক মুনিঋষিদেরও হার মানাইয়া দিয়াছে। বাস্তবিক নিরম্বু উপবাসে উটের সমকক্ষ আর কেহ নাই। উপবাস ভঙ্গ করিয়া পারণ করিতে মানুষের চাই কচি কচি ফলমূল আর স্নিগ্ধ নেয়াপাতি ডাব। উট কিন্তু, লোনা ঘোলা যাহাই হউক, কয়েক ঢোক জল গিলিতে পারিলেই তৃপ্ত। অন্য কোন আহার না জুটিলে উট উহার পৃষ্ঠ-ককুদে সঞ্চিত চর্ব্বি খাইয়াও কিছুকাল থাকিতে পারে। অতএব বুভুক্ষু মানবের নিকট উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধনার মাহাত্ম্যপ্রচারে উটের আদর্শ কেন যে এতকাল বিজ্ঞাপিত হয় নাই তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

বস্তুতঃ Plain living-এর ঐ এক মহিমময় নিদর্শন। High thinking উটের মাথায় আসে কিনা জানি না। তবে উট নেহাৎ আকাটও নয়। মানুষের আকার ইঙ্গিত সে চমৎকার বুঝে। তাল লয় বুঝিবার মত সূক্ষ্মবোধও উহার যথেষ্ট। রণবাদ্যের সহিত লয় রাখিয়া নিয়মিত পদক্ষেপে উহা চলিতে পারে। এজন্যই পূর্ব্বে উহা বহুল পরিমাণে যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত।

কষ্টস্বীকারে উট অদ্বিতীয়। ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্লেশ তো বটেই, তাহা ছাড়া দৈহিক পরিশ্রম সহিতেও তাহার ন্যায় ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু জীব নিতান্ত বিরল। তবে উট যুযুৎসু জীব নহে, উহা নিরীহ নিরামিষাশী প্রাণী। অবসর পাইলেই স্তিমিতনেত্রে সে রোমন্থন করে। বশ্যতাই উহার স্বভাবসিদ্ধ। এই গুণের জন্যই মরু-অঞ্চলে উহার আদর এত বেশী।

উট কেবল ভারবাহী পশুই মাত্র নহে। উহার দুগ্ধও মানুষের পেয়, আরবদেশে উহার মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণের রীতি আছে। তাহা ছাড়া উটের লোম দিয়া নানাপ্রকার

পরিধেয় ও বুরুশ প্রস্তুত হয়, উহার চর্ম্মদ্বারা পাদুকা নির্ম্মিত হয়। জীবনে মরণে এরূপে উষ্ট্র মানুষের পরম বন্ধু।

এই উপকারী জন্তুটি কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। একদা কেবল আরবদেশই ছিল ইহাদের জন্মভূমি। বর্ত্তমানে উত্তর-আফ্রিকা, ক্যানারিস্, পশ্চিম-এশিয়া এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যথেষ্ট উট দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া-মহাদেশেও উটের আমদানী হইয়াছে। মধ্য-এশিয়ায় দুইটি ককুদ্-বিশিষ্ট একপ্রকার উট দেখিতে পাওয়া যায়। জীববিদ্যায় তাহাদিগকে ব্যাক্‌ট্রীয় বলিয়া অভিহিত করা হয়।

উটের আয়ুষ্কাল চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর। স্তন্যপায়ী অন্যান্য অনেক জন্তুর ন্যায় ইহারাও একবারে একটিমাত্র শাবক প্রসব করে।

———

কুকুর-বিড়াল

বাড়ীর মেনী বিড়ালটা আর জলি নামে কুকুরটার মধ্যে সেদিন ভারী ঝগড়া বেধে গেল। তাদের প্রখর বাগ্‌বিতণ্ডা ঠিক ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত। জলি বলল —দেখ মেনী, এ তোর জাতেরই দোষ। এত আদর পেয়েও তোর যদি স্বভাব যায়। সেই হাঁড়ি থেকে চুরি ক'রে খাবি, পাত থেকে মাছ নিয়ে পালাবি।

মেনী—হয়েছে, খুব হয়েছে। ও রে আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! নিজে যেন আর দোষ করেন না। বলি, তোর অত চোখ টাটায় কেন? চুরি করি—বেশ করি। করব না? একশবার করব—খেতে না পেলেই করব। আদর! বলি কে আদরটা করছে আমায়? গিন্নী তো অষ্টক্ষণ ঝাঁটা বাগিয়েই আছেন। কর্ত্তা পেলেই ফুটবল খেলেন। ঝি-বেটীর পর্য্যন্ত কি দাপট! কেন—আমি কি জলে ভেসে এসেছি নাকি? তোর মত আমারও কি খাবার-পরবার আর আদর পাবার অধিকার নেই?

জলি—তা আর নেই? দিনরাত নষ্টামি নিয়ে আছ। এটায় মুখ দাও, ওটায় মুখ দাও—কত শত সাংঘাতিক ব্যামো ছড়িয়ে দাও তুমি। তার বদলে আদর পাবে না! শ্রীমুখের প্রসাদ খেয়েছ কি বাস্—ডিপ্‌থেরিয়া। তোমার মত এত হিতৈষী প্রাণীকে মানুষ কোলে নিয়ে সোনার চামচে ক'রে যে ছানামাখন খাওয়ায় না, সত্যিই এ মস্ত অন্যায়।

মেনী—নে নে, ঠাট্টা রাখ। নিজের কথা ভেবেছিস্ কখনও? তোর দাঁতে তো আরও সাংঘাতিক বিষ। তাই ব'লে তো আদরের কোন ত্রুটি হয় না। রোজ সাবান মাখিয়ে চান করানো—তাতেও যদি নোঙরামি যেত। বলি স্বভাব কি তোরই গেল? এখনও দেখি কায়দা পেলেই জুতো চিবোস্।

জলি—দেখ মেনী, মুখ সামলে কথা বল্‌বি। জুতো খাই আর যা-ই করি, প্রভুর সেবায় যে দিনরাত খাটছি সেটা ভাবিস্? আদর অমনিতেই করে না—আদর করে যোগ্যতাগুণে বুঝলি?

মেনী—বড়াই রাখ। রাত জেগে চোর তাড়ানো, আর ন্যাজ নেড়ে মন যোগানো—এই তোর কাজ। প্রভুর পা-চাটা জীব, লজ্জা করে না বলতে যে, পেটের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিলি পরের কাছে? তার বদলে পেলি শুধু শেকলে বাঁধা পরাধীন জীবন। তবু তোর বড়াই?

জলি—উপকারীর উপকার করা তোর কাছে লজ্জার হতে পারে—হতে পারে শেকলের সংযম তোর কাছে অবাঞ্ছিত। কিন্তু চাই না তোর মত উঞ্ছবৃত্তি নিয়ে বাঁচতে—চাই না তোর উচ্ছৃঙ্খল মুক্তি।

মেনী—বেশ তো, তোর রুচি নিয়ে তুই মর গে যা; আমাকে নিয়ে কেন তোর মাথাব্যথা? গালভরা বড় কথা আমারও যে জানা নেই তা ভাবিস্ নে। আর উপকারের প্রশ্নই যখন তুল্‌লি, তখন জিগ্যেস করি—উপকার আমি কি ওদের কিছুই করিনি, না করি না? ইঁদুরের উৎপাত কে কমাল? কে তাড়াল ছুঁচো আর নেংটি ইঁদুরের দল? অবশ্য তাই নিয়ে বড়াই করতে চাই নে আমি; বাঘ যাকে মাসী বলে, কুকুর তাকে খোঁটা দেয়—সেই দুঃখেই ব'লে ফেল্‌লাম কথাগুলো।

জলি—এতে আর খেদের কি হ'ল? হ্যাঁ, সত্যিই তো, এদিক দিয়ে তুই সত্যিই সাধুবাদ পেতে পারিস্। ছ্যাচড়ামি ছেড়ে দিয়ে যদি এমনিতর পরের হিতে জীবন কাটাতে পারিস্, বলবার কিছু থাকে না।

মেনী—না না বন্ধু, না—সব রকমই আমি দেখেছি। বড়কর্ত্তা আজ নেই। বড় আদর ক'রেই একদিন তিনি আমায় এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে আজ আমার এ দশা কেন? একটা কাঁটা খেতে দেবে না, একটু শোবার জায়গা দেয় না এরা। আমি না হয় একটু পরিচ্ছন্নতাবিলাসী। ধব্‌ধবে ফুটফুটে বিছানাটি না হ'লে ঘুমটা আমার জমে না—একথা সত্যি। কবোষ্ণ উনুনের পাশটি আমার আমেজে চোখ বুজিয়ে আনে। কিন্তু সত্যি ক'রে বল্ তো, এগুলো কি দোষ না গুণ?

জলি—ভালকে খারাপ বলব কেন? তুই একটু বাবু আছিস্—তা থাক। তবে এই যে চুরিটা করিস্, এইটাই বরদাস্ত করতে পারি না।

মেনী—বরদাস্ত করতে পারি না তুই যে খেতে পাস্, সইতে পারি না এত লাথিগুঁতো খেয়েও যে তুই বেঁচে আছিস্—বল্, বল্ থামলে হবে কেন? তুই কি বুঝবি ক্ষুধার জ্বালা কি ভীষণ বস্তু? এই দেখ (পায়ের একটা থাবা তুলে) কি নরম, তুল্‌তুলে এই থাবাটা। নখ লুকিয়ে আছে কোমল খোলের ভেতর। কিন্তু যখন ক্ষুধার

দাবদাহ পাগল ক'রে তোলে আমায়—রাগে দুঃখে দেহমন যখন বিদ্রোহ করে মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে—তখনই মাত্র নখগুলো ভীষণ হ'য়ে ওঠে—

ইতিমধ্যে প্রভুর আদেশ শোনা গেল—"জলি ছোঁ"। জলিও অমনি মেনীর উপর করল আক্রমণ। মেনীর দেহটা হঠাৎ একটা ত্রিভুজের মত হ'য়ে গেল। গায়ের লোমগুলো খাড়া—পিঠটি সেই ত্রিভুজের শীর্ষ। তারপর—গ্যঁ—ও—ও—গ্যাঁ—ফ্যাঁচ্ —ফোঁ। এবার লম্বা হ'য়ে আর বার গুড়িশুড়ি মেরে মেনী জলিকে রীতিমত ঘাবড়ে দিল এবং পরক্ষণেই তড়িৎগতিতে কাছের গাছটিতে উঠে পড়ল। হতভম্ব জলি ফিরে গিয়ে প্রভুর পায়ের তলায় লেজ নাড়ছে।

পক্ষী

পাখীর রাজ্য জল-স্থল-অন্তরীক্ষে বিস্তারিত। কাহারও বাস স্থলে, কেহ থাকে জলে, আর অবশিষ্ট অধিকাংশ খেচর। স্থলচারী পাখীর বক্ষ-পঞ্জরের গঠন অনেকটা সমতল, কিন্তু আকাশচারী পাখীর বুকের হাড়গুলি নৌকার খোলের মত বিন্যস্ত। বক্ষপঞ্জরের গঠনভেদে পক্ষিকুল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর পাখীর মধ্যে উটপাখী, কিউই, এমু ও (অধুনালুপ্ত) মোয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাখীগুলিকে ১৪টি বিভিন্ন জাতি ও প্রায় ১১,০০০ উপজাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

পাখা আছে বলিয়াই পাখীর নাম পক্ষী। কিন্তু সকল পাখীই উড়িতে পারে না। উটপাখী, কিউই প্রভৃতি সমতলপঞ্জর পাখীগুলির উড়িবার শক্তি নাই। ইহাদের মধ্যে পেঙ্গুইন-নামক পাখীর পাখাগুলি দাঁড়ের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এদেশে সচরাচরদৃষ্ট পাখীর মধ্যে হাঁসজাতীয় পক্ষীগুলি কেবল জলে ও স্থলে চলিতে পারে, আকাশে উড়িতে পারে না।

পাখীর রক্ত স্বভাবতঃই উষ্ণ। হৃৎপিণ্ড তাহার চারিটি অলিন্দে বিভক্ত। বর্ণ, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পক্ষিগণ সীমাহীন বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। সুচারু নীড় নির্ম্মাণ ও যাযাবর প্রকৃতি উহাদের মধ্যে সাধারণ প্রবৃত্তি।

জীবজগতে মনোহারিত্বের দিক্ দিয়া পাখীর মত প্রাণী নাই। বিচিত্রবর্ণ ময়ূরের মত কত শত অনুরূপ পাখী রহিয়াছে। বিধাতার সূক্ষ্ম কারুখচিত মসৃণ পালকে তাহাদের দেহ আবৃত। নীল লোহিত সবুজ প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় রঙের বর্ণালী, চঞ্চু-গঠনের সীমাহীন বৈচিত্র্য আর সুকুমার দেহসৌষ্ঠব, সুখস্পর্শ পেলবতা আর মায়াময় সমুজ্জল চক্ষু—ইহাই পাখীদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্যসুরমায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু পাখীর প্রধান আকর্ষণ তাহার মধুর কাকলীতে। কোকিলের কুহুস্বর যেমন আসন্ন বসন্তের বাণী বহন করে, তেমনি অসংখ্য সঙ্গীতকুশলী পক্ষীর মধুর কূজন মর্ম্মলোকে অমিয়ধারা বর্ষণ করে। এমন কি কলাপীর কর্কশ কেকারবও বর্ষার

আগমনীরূপে মাধুর্য্যপূর্ণ। তাহা ছাড়া উদাস নিদাঘমধ্যাহ্নে কেহ ডাকে 'বউ কথা কও', নির্ম্মেঘ আকাশের কোলে চাতক ডাকে 'ফটিক জল'। দোয়েল গায়, কোয়েল ডাকে—মূক প্রকৃতির অনবচ্ছিন্ন মৌন ভাঙিয়া সঙ্গীতের আসর জমে। পাখীর কূজনে স্থলে আর গগনে উঠে স্বরমূর্চ্ছনা।

সত্যই পাখী যেন মূর্ত্তিমান্ আনন্দ। মানুষের নিকট এইজন্যই ইহারা চিরকাল প্রিয়। ইহা ভিন্ন পাখীর অন্যতম উপযোগিতা যে নাই এমন নয়। আমাদের অলক্ষ্যে লোকালয়ের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রশত্রুর বিনাশসাধনে পাখী সর্ব্বদা তৎপর। কীটপতঙ্গ, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার সরীসৃপ ও যে-সকল প্রাণী মানুষের পরম অনিষ্টকারী, পাখী তাহাদিগকে খাইয়া ফেলে। ময়ূর খায় সাপ, আর কাক, চিল, ডাহুক প্রভৃতি পাখী শস্যাশী বহু কীটপতঙ্গ উদরস্থ করিয়া মানুষের পরম উপকার সাধন করে। শকুনি-গৃধিনীজাতীয় পাখীগুলি মৃত পশু-পক্ষীর গলিত শব ভক্ষণ করিয়া লোকালয়ের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখে। এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চড়াই পাখী পর্য্যন্ত খুদকুঁড়া শস্যকণা কুড়াইয়া কুড়াইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সাজাতীয় কীট প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া লোকালয়ের পরিচ্ছন্নতারক্ষায়, সামান্য হইলেও, সাধ্যমত প্রয়াস করে। পল্লীগ্রামের মানুষ পাখীর কৃপায় ঘড়ির সাহায্য না লইয়াও চলিতে পারে। প্রহরে প্রহরে ঐক্যতানে পাখী সদলে ডাকিয়া উঠে—সময়ের পরিমাণ করিবার আর কোন অসুবিধা থাকে না।

পাখীদের এই নির্ভুল সময়জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্মিত হইতে হয় তাহাদের নীড়-নির্ম্মাণে নিপুণতা দেখিয়া। বাবুই পাখীর দোদুল্যমান নীড়গুলির প্রবেশপথ নিম্নে; অথচ অভ্যন্তরস্থ অণ্ড বা শাবকাদি প্রচণ্ড ঝড়ের বেগেও কক্ষচ্যুত হয় না। পাখী যে কত বড় শিল্পী ইহা তাহারই অতুলনীয় নিদর্শন।

কোন কোন পাখীর অনুকরণ-ক্ষমতা বিস্ময়কর। মানুষের কণ্ঠ অবিকল নকল করিয়া পোষা পাখী আমাদের অবাক্ করিয়া দেয়। ময়না, টিয়া, শালিক, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখীগুলি এই অনুকরণ-শক্তির জন্য মানুষের নিকট বিশেষ আদর পাইয়া থাকে।

পাখীর বুদ্ধিবৃত্তিও ন্যূন নহে। কাকের ধূর্ত্ততা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। এমন কি নিরীহ পায়রাগুলি পর্য্যন্ত শিক্ষা পাইলে ইঙ্গিত বুঝিতে পারে। পূর্ব্বে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য পায়রার কণ্ঠে ক্ষুদ্র চিরকুট বাঁধিয়া দূরদেশে প্রেরণ করা হইত। শিক্ষার গুণে উহা যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইত। পাখীর বুদ্ধিসম্বন্ধে এরূপ বহুতর উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মানুষের উপকার-অপকারের বিবেচনায় পাখীমাত্রই যে সাধু তাহা কিন্তু সত্য নয়। কোন কোন পাখীর নষ্টামিও যথেষ্ট। এই যে কাক প্রত্যূষে মানুষের ঘুম ভাঙায়, তাহার অত্যাচার কে না অবগত আছে? চিলের ছোঁ বাস্তবিক পরস্বলোলুপ নিকৃষ্ট আচরণ। অবশ্য মানুষের মধ্যেও এই চিলবৃত্তির উদাহরণ কম নাই।

কিন্তু মোটামুটি ভাবে পাখীর দোষ অপেক্ষা গুণই অধিক। মানুষের নৈবেদ্য-রচনায় সে নিত্যনিয়ত তাহার অণ্ড ও শাবক ডালি দিতেছে। হাঁস, মুরগী, পায়রা, তিতির প্রভৃতি কত শত পাখী লালসা-পরায়ণ মানুষের উপাদেয় ভোজ্য। অতএব সঙ্গীতে, শিল্পে, সেবায়, আত্মদানে ও মনোহারিত্বে বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি এই পাখী। মানুষ এসকল বিচার করিয়া যেন উহাদের প্রতি সদয় আচরণ করে।

কাক

কাক নাই এমন দেশ নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহাদের অস্তিত্ব। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুইপ্রকার কাক দেখিতে পাওয়া যায়—দাঁড়কাক ও পাতিকাক। দাঁড়কাক ঘনকৃষ্ণবর্ণ এবং আকারেও বেশ বড়। পাতিকাক ইহার তুলনায় ছোট, বর্ণটাও তত কালো নয়। কণ্ঠের চতুঃপার্শ্বে তাহার ফ্যাকাশে ছাইরঙের একটা প্রশস্ত বেষ্টন। পাতিকাকের রব অতিশয় কর্কশ কিন্তু দাঁড়কাকের স্বর একেবারে কটু নহে।

ইউরোপখণ্ডের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং উত্তর-আফ্রিকার কোথাও কোথাও 'চাউ' নামে অভিহিত একপ্রকার কাক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের পদদ্বয় ও চঞ্চু রক্তবর্ণ। ম্যাগপাই-নামক আর এক একশ্রেণীর কাক আছে, যাহাদের পক্ষদ্বয় ও বক্ষে শ্বেতবর্ণের ছোপ। ইহা ছাড়া আরও নানাপ্রকার ও নানান রঙের কাক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কাক কেবল কালো—একথা সত্য নয়। কিছু কিছু বর্ণমাধুর্য্যের দাবী তাহারও আছে।

কাকের প্রকৃতি বড় সাধু নয়। চৌর্য্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ। মানুষের নিকট এই কারণেই ইহা চিরকাল বিরক্তিভাজন এবং সেইজন্যই আবার মানুষের বিচারে পক্ষিকুলে কাক, হংসমধ্যে বকের মত, নিতান্ত অন্ত্যজ বিবেচিত হয়। কিন্তু সংস্কার-মুক্তভাবে আলোচনা করিলে কাকের স্থান অনেক উচ্চে নির্দ্দেশ করিতে হয়; কারণ, বুদ্ধি ও অনুভূতির প্রাখর্য্যে ইহা সকল পাখীর সেরা। মানুষ-হেন শ্রেষ্ঠ জীবকেও অবলীলায় ঠকাইয়া, ব্যতিব্যস্ত করিয়া, কাক তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রমাণ নিত্যই দিতেছে। অথচ মানুষের এত নিকটে আসিলেও তাহাকে সহজে ধরিবার উপায় নাই। মানুষ যাহার সহিত আঁটিয়া উঠে না, তাহাকে অপবাদ দিয়া গায়ের ঝাল মিটায়। তাই লোকে বলে কাক ধূর্ত্ত। ইহা অবশ্যই সত্য। কিন্তু কথাটা যে ঘৃণাচ্ছলে ব্যবহৃত হয় ইহাই অন্যায়।

কাকের আর একটি গুণ হইল সংঘবদ্ধতা। একের বিপদে তাহারা সকলে আসিয়া জুটে। যেন 'সকলেরই তরে সকলে' তাহারা, প্রত্যেকে তাহারা পরের তরে। শক্তি তাহাদের অবশ্যই নগণ্য। তবে বিক্ষোভপ্রদর্শনে তাহারা কমিউনিষ্টদিগকেও

হার মানাইয়া দেয়। কেবল গলার জোরে কেমন করিয়া মানুষকে বিব্রত করিয়া দিতে পারা যায়, সহস্র কাকের সমবেত চীৎকার তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

কাকের সন্তানস্নেহ, স্বজাতিপ্রীতি ও অন্যান্য সুকুমার বৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। পক্ষিসমাজে কোন পাখীর মধ্যেই দুষ্টামি-নষ্টামির সহিত এত গুণের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাকের অনিষ্টকারিতা-সম্বন্ধে মানুষমাত্রের একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে। কিন্তু মানুষের উপকারসাধনে তাহার প্রয়াস কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নয়। প্রত্যুষে নিয়মিত-ভাবে মানুষের ঘুম ভাঙায় কাক। শহরে পক্ষিবর্জ্জিত প্রাসাদারণ্যে পাখীর ডাকের কিছুমাত্র মর্য্যাদা নাই, কিন্তু ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কাকের রব না হইলে ঘড়িকেও সকলে বিশ্বাস করিতে পারে না। ঘড়ির অগ্রপশ্চাৎ হয়, কাকের ভুল হয় না। সময়ানুবর্ত্তিতার যন্ত্র অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেয় এই কাক। সে অঘড়ির ঘড়ি, সঘড়ির ক্রনোমিটার।

কাক কালো, কোকিলও কালো। কিন্তু মধুর স্বরের জন্য কোকিল সর্বত্র আদৃত, আর কাক চিরঘৃণিত। অথচ উপযোগিতা বিচার করিলে কোকিল তথা অন্য অনেক পাখী হইতে কাকের মর্য্যাদাই বেশী হওয়া উচিত। আবর্জ্জনা, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর, পোকামাকড় প্রভৃতি বিনাশ করিয়া সে লোকালয়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদা তৎপর। তাই একটা গল্প আছে যে, কাক তাড়াইয়া দিয়া শুধু কোকিল পুষিয়া জনৈক রাজা নাকি দেশের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

পিপীলিকা

পিপীলিকা বড় বিস্ময়কর প্রাণী। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মূক এই কীটের জীবনপদ্ধতি অনেকাংশে মানুষেরও অপেক্ষা শ্রেয়। অবশ্য তাহাদের মধ্যেও ভালমন্দ দুই-ই আছে। পিপীলিকার মধ্যে অগণ্য প্রকারভেদ। প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, প্রায় দুই হাজার প্রধান প্রধান শ্রেণীতে ইহারা বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণী আবার স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক—এই তিনজাতীয় পিপীলিকা লইয়া গঠিত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একটি করিয়া রাণী রহিয়াছে। এই রাণী-পিপীলিকা আকারে অন্যান্য সকল হইতে একটু পৃথক্—মাথাটা তাহার বেশ বড়। সকলের মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহার মাথাটা বড় হইয়াছে কিনা বলা শক্ত। তবে পিপীলিকার মধ্যেও যে মাথার কাজ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। স্ত্রী-পিপীলিকাগুলি পুরুষ-পিপীলিকাদের অপেক্ষা আকারে কিছু বড়। নপুংসকগুলি হইল বন্ধ্যা স্ত্রী-পিপীলিকা। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পাখা আছে, কিন্তু নপুংসক পিপীলিকার কোন পাখা নাই। ডিম ফুটাইবার সময় কোন কোন-

জাতীয় স্ত্রী-পিপড়ার পাখা পড়িয়া যায়। এই ডিমগুলিকে লার্ভা বলা হয়। লার্ভা হইতে কীটাশু নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার লালনপালনের ভার নপুংসক-পিপীলিকার উপর বর্ত্তে। আয়ার হাতে শিশুভার ন্যস্ত করিয়া এরূপে পিপীলিকা-মেয়েরা আবার নির্ভার জীবন যাপন করিতে থাকে।

পিপীলিকারাজ্যে স্ত্রীগণেরই প্রাধান্য। সে-রাজ্যে রাজা নাই, আছে কেবল রাণী এবং সে-রাণীর শাসনও বড় কড়া। বিচিত্র সে সমাজ। স্ত্রী-পুরুষ কেহ সেখানে কাজ করে না, কেবল শ্রমিকদলই অহর্নিশ খাটিয়া মরে। পরশ্রমজীবিপ্রধান পিপীলিকা সমাজে সাম্যনীতি নাই। কাজেই পরস্বলোলুপতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় অবশ্যম্ভাবী ফলই সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি গোষ্ঠীর পিপীলিকা এক এক সময় অন্য গোষ্ঠীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং জয়লাভ করিলে বিজিতের সকল সম্পদসহ ডিম ও শাবকগুলিকে লুঠ করিয়া লয়। এই ডিম ও শাবক হইতেই অবশেষে দাসশ্রেণীর পিপীলিকার উদ্ভব হয়। দাস পিপীলিকারা আজীবন সমাজ সেবায় লিপ্ত থাকে। ঘরবাড়ী পরিষ্কার করা, আহার্য্য সংগ্রহ করা ও অন্যান্য নানাবিধ দৈনন্দিন কাজ তাহাদেরই করিতে হয়।

পিপীলিকার কাজ অতিশয় নিপুণ ও সুশৃঙ্খল। গৃহরচনায় তাহাদের দক্ষতা আমাদের স্থাপত্য-কৌশলের তুল্য মর্য্যাদা দাবী করিতে পারে। বিচিত্র কক্ষশ্রেণী-সমন্বিত সুবিন্যস্ত গৃহ, সুচারু পথ ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি যাবতীয় পৌর ব্যবস্থা তাহাদের আবাসস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এসকল পিপীলিকার কর্ম্মকুশলতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সমাজ-ব্যবস্থার দিক্ দিয়াও পিপীলিকা জীবজগতে একমাত্র মানুষেরই তুলনীয়। কর্ম্মবিভাগ-অনুসারে উহাদের শ্রেণীবিভাগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে উহাদের সমাজজীবন মানুষের সদৃশ। মনুষ্যসমাজের ন্যায় পিপীলিকাদিগের মধ্যেও কিছু কিছু কৃষিকার্য্যের প্রচলন আছে। বর্ষার পূর্ব্বে তাহারা ছত্রজাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদের আবাদ করিয়া থাকে; বর্ষার পরে এই উদ্ভিদ্ তাহাদের আহার্য্য হয়। পিপীলিকারা আবার একপ্রকার গোরুও পালন করে। এই গোরু 'এফাইডিস'-নামক বিশেষ ধরণের একপ্রকার পতঙ্গ। শুঁয়াদ্বারা সুড়সুড়ি দিয়া উহাদের দোহন করিতে হয়। অবশ্য গোরুর মত বাঁট তাহাদের নাই। উহাদের দেহ হইতে একপ্রকার মিষ্ট রস বাহির হয়। উহাই পিপীলিকার নিকট দুধ।

বিজ্ঞানবুদ্ধিতে যে পিপীলিকা বড় কম যায় না তাহার আরও প্রমাণ আছে। একজাতীয় পিপীলিকা বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় স্ব-গোষ্ঠীর কতকগুলি পিপীলিকার পরিপাক-শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়া উহাদের উদরে খাদ্যরস সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই জীবন্ত সঞ্চয়ভাণ্ডার হইতে আবশ্যকমত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের আর ভাবনা থাকে না।

সঞ্চয়প্রবণতাই পিপীলিকার উল্লেখযোগ্য প্রবৃত্তি। ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব্ব হইতেই ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত বস্তু কখনও উহারা অযথা অপচয় করে না। পিপীলিকার আর একটি গুণ হইল সংঘবদ্ধতা। একতার বলে উহারা শতে শতে মিলিয়া উহাদের অপেক্ষা শতগুণ বড় মৃত কীটপতঙ্গ বহন করিয়া লইয়া যায়। সামরিক শৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহাদের গতিবিধি। নীরব কর্ম্মে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমী তাহারা। কথা তাহারা জানে না; পরস্পর পরস্পরের শুঁয়াস্পর্শে, কি ভাষায় জানি না, উহারা বাণী বিনিময় করে।

পিপীলিকার জীবনকথা সংক্ষেপে বলা যায় না। ক্ষুদ্র পরিসরে যতটুকু বলা হইল তাহা হইতেই উহাদের সংগঠনক্ষমতা, বুদ্ধি, কর্ম্মকুশলতা, মিতব্যয়, সঞ্চয়, শৃঙ্খলাবোধ ও নিরলস শ্রমশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র কীট—কিন্তু কি সুন্দর গুছান জীবন উহাদের। মানুষ যদি তাহাদের গুণগুলি আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারিত তবে সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইত সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পিপীলিকা আমাদের গুরুস্থানীয়। তাহাদিগকে আদর্শ করিলে আমাদের জীবন-পদ্ধতিও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

মানুষের রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য পিপীলিকার হাত হইতে মুক্ত রাখা অসাধ্য। তাহারা, কেমন করিয়া জানি না, ইহার গন্ধ পাইবেই এবং অবিলম্বে দলে দলে ইহার ভোগে লাগিয়া যাইবে। লোকে বলে পিপীলিকা খনার জিভ খাইয়াছিল বলিয়া এই শক্তি লাভ করিয়াছে।

মধুমক্ষিকা

প্রাণিতত্ত্বের বিচারে পিপীলিকা, বোলতা, ভ্রমর প্রভৃতি কীটপতঙ্গ মৌমাছির সমগোত্র। ইহাদের মধ্যে মধুপায়ী, মধুস্রষ্টা মক্ষিকাই চলিত ভাষায় মৌমাছি বলিয়া পরিচিত।

ইহাদের মধ্যে অশেষ শ্রেণীবৈচিত্র্য রহিয়াছে। কয়েকটি শ্রেণী সদলে সংঘবদ্ধ-ভাবে বাস করে, কয়েকটি আবার ভূগর্ভে গৃহ রচনা করিয়া একক জীবন যাপন করে। কিন্তু মৌমাছি বলিতে সাধারণতঃ যাহাদের বুঝায়, তাহারা দলবদ্ধভাবেই থাকে। বৃক্ষাগ্রে, এমন কি মঠমন্দিরের গাত্রেও উহারা উহাদের সুদৃশ্য চক্র নির্ম্মাণ করে এবং তাহাতে শতসহস্র একত্র হইয়া বসবাস করে।

প্রতি চক্রবাসী মৌমাছিগুলিকে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের মধ্যে একজন থাকে রাণী মাছি, একদল পুংমাছি এবং তৃতীয় শ্রেণী হইল শ্রমিক মাছির দল। শ্রমিক মাছিগুলি আসলে বন্ধ্যা স্ত্রীমাছির ঝাঁক। ইহারাই অপরূপ মধুচক্র নির্ম্মাণ করে এবং ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিয়া লইয়া ঐ চক্ররন্ধ্রে সঞ্চয় করিয়া রাখে। শ্রমিকদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মাছিগুলি সাধারণতঃ বাহিরের কাজে রত থাকে, অল্পবয়স্কদের উপর চক্ররক্ষার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হয়। পুরুষ মাছিগুলির

বড় একটা মর্য্যাদা নাই। বস্তুতঃ প্রয়োজনবোধে উহাদিগকে মারিয়াই ফেলা হয়। প্রতিবৎসর শরৎকালে এইরূপ পুরুষনিধনযজ্ঞ পাইকারীভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।

মৌচাকনির্ম্মাণের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ উহা মধুর আধার, দ্বিতীয়তঃ রাণীমাছির ডিমগুলি রক্ষার জন্যও উহার প্রয়োজন। প্রতি রন্ধ্র এক একটি ষট্-কোণ কক্ষবিশেষ। এইরূপ অযুত কক্ষ-সম্বলিত এক একটি মধুচক্র। প্রতি কক্ষে মধুর মধ্যে রাণীমাছির এক একটি ডিম রাখা হয় এবং এই ডিম লার্ভা-অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই শ্রমিক মাছিগুলি রন্ধ্রগুলিকে মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এ অবস্থায় লার্ভা পিউপা-অবস্থায় পরিণতি লাভ করে এবং আরও কিছুকাল পরে পিউপা হইতে পূর্ণাবয়ব মৌমাছির জন্ম হয়। লার্ভা হইতে মৌমাছির জন্ম পর্য্যন্ত প্রায় তিন সপ্তাহকাল অতিবাহিত হয়।

এক একটি মৌচাকে যখন মাছির সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া আর স্থানসঙ্কুলান হয় না, তখন নবীন আর একটি দলের সৃষ্টি হয়। উহারা আবার আর একটি রাণীকে নেত্রী বানাইয়া পৃথক্ হইয়া নূতন চক্র নির্ম্মাণ করে।

মৌমাছির দেহগঠন প্রায় এজাতীয় অন্য মক্ষিকারই মত। চারিটি করিয়া ইহার ডানা, একটি হুল। এই হুলটি বড়ই বিষময়। ক্রুদ্ধ হইলে মৌমাছি হুল ফুটাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই রন্ধ্রপথে একপ্রকার জ্বালাময় অ্যাসিড ঢালিয়া দেয়। উহারই বিষ-ক্রিয়ায় দুঃসহ জ্বালা অনুভূত হয়।

অতএব মৌমাছি শুধু মধুরই পরিবেষণ করে না, কখনও কখনও বিষের ইন্‌জেকশনও চালায়। তবে অমৃতেরই সহিত থাকে বিষ এবং নির্ব্বিষ সুখও সংসারে নাই। এই সত্য মনে রাখিয়া মৌমাছির বিচার করিতে হইবে। তাহার গুণের পরিমাণটাই অধিক। সঞ্চয়, শ্রম ও শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, রচনানৈপুণ্য ও বাধ্যতা মৌমাছিকে মানুষের নিকট আদর্শ শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। উহাদের ঐক্য ও অনলস জীবনপদ্ধতি সত্যই অনুকরণীয়।

জীবের প্রতি মৌমাছির দানটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধুর উপকারিতা অশেষ। ঔষধ ও পথ্যরূপে মানুষের অপরিসীম কল্যাণ সাধন করে মধু। তাহা ছাড়া, এমন স্বাদু বস্তুই বা কি আছে ? দ্বিতীয়তঃ, মৌমাছিপ্রস্তুত মোমের ব্যবহারের অন্ত নাই। ঔষধপত্রের ধারক (base) হিসাবে বিচিত্র ইহার প্রয়োগ। ইহাই আবার মোমশলাকারূপে আলোক ধারণ করে। ইহাই দেয় বহুবস্তুর প্রচ্ছদের চাকচিক্য।

মৌমাছির নিকট মানুষ তাই ঋণী। মানুষই অবশ্য মৌমাছির নিকট হইতে মধুসংগ্রহকে ঋণগ্রহণ বলিয়া প্রচার করে না, প্রচার করে উহার নিঃস্বার্থতা। আসলে কিন্তু মানুষ মৌমাছির সম্পদ্ সবলেই কাড়িয়া লয় এবং এই চৌর্য্যের শাস্তি সময় সময় ভীষণ হুলজ্বালায় দুঃসহ হইয়া উঠে। মৌমাছি মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে মধু সঞ্চয় করে একথা তাই বিশ্বাসের অযোগ্য। সে যাহাই হউক, এই ক্ষুদ্র মক্ষিকার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হয় ; কারণ, তাহাদের অনবচ্ছিন্ন সঞ্চয়টুকু না হইলে মানুষের বড় একটা অভাব থাকিয়া যাইত।

খনিজ সম্পদ্

লৌহ

লৌহ বর্ত্তমান যন্ত্রযুগের ভিত্তিস্বরূপ। কোন্ সুদূর প্রাচীনকালে ইহার ব্যবহার মনুষ্যসমাজে প্রচলিত হয়, তাহা আজও সুনির্দ্দিষ্টভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। কেহ বলেন, তাম্রযুগের পর আসে লৌহযুগ, কেহ বলেন, ব্রঞ্জ-যুগের পর লৌহযুগ। আবার কেহ কেহ লৌহের আবির্ভাবকে ব্রঞ্জের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মত প্রকাশ করেন। সে যাহাই হউক, আনুমানিক হিসাবে প্রায় আট হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষ লৌহের ব্যবহার প্রথম আয়ত্ত করিয়াছিল—এরূপ সিদ্ধান্ত বিসংবাদিত নয়।

ধাতুসমূহের মধ্যে লৌহের ন্যায় এত বিপুল পরিমাণে অন্য কাহারও অস্তিত্ব নাই। পৃথিবীর প্রত্যেক উনিশ ভাগ মাটির একভাগ লৌহ। তাহা ছাড়া জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, এমন কি মনুষ্যরক্তে পর্য্যন্ত লৌহ বিদ্যমান। সর্ব্বব্যাপী, তাই সর্ব্বশক্তিমান্ এই লৌহ। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে বিশুদ্ধ লৌহ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। কেবল উল্কাপিণ্ডের লৌহই অনেকাংশে অবিমিশ্র। নচেৎ মিশ্রিত অথবা যৌগিক পদার্থরূপে লৌহ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আমরা যে লৌহ দেখি বা ব্যবহার করি, তাহা নৈসর্গিক বস্তু নহে—প্রস্তরাদি নানাবিধ পদার্থ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া উহাকে ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে।

বিশুদ্ধ অবস্থায় লৌহ কিন্তু কালো নয়, বরং রূপার ন্যায় শুভ্রকান্তি। গঠন সূক্ষ্ম সূত্রগুচ্ছের ন্যায়। এই কারণেই লৌহ এত শক্তি ধরে।

লৌহের ব্যাবহারিক উপযোগিতা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এ যুগের মানুষের গতিস্থিতি, সুখশান্তি, দুঃখভয়—এক কথায় সব কিছুই অনেক পরিমাণে লৌহের উপর নির্ভর করে। বিচিত্রযানবাহন অযুতরূপে যে আজ মানুষকে স্থলে জলে আর গগনে গগনে দুর্ম্মদ বেগে লইয়া বিহার করিতেছে, তাহা কিন্তু লৌহেরই দান। লৌহেরই কঠিন বন্ধনে আকাশচুম্বী প্রাসাদ আজ মেঘের কোলে মাথা তোলে। লৌহের যন্ত্ররথই আজ মেঘেরও উর্দ্ধদেশে পাখা মেলে। লোহার অর্ণবযান সাগরবক্ষে নাগরদোলায় দোল খাওয়ায়। লোহার পথে লোহারই গাড়ী মানুষকে বহন করে দেশ-দেশান্তরে। লোহা লাঙলের ফাল, লোহাই কাস্তে কোদাল কুঠার খড়্গ, লোহা সব। শস্য-উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় দৈনন্দিন কাজে রহিয়াছে এই অয়স্কান্তমণির যাদুলীলা। তার-পেরেক, তালাচাবি, কড়া চাটু বেড়ি খন্তি হাতা চামচ, ছুরি কাঁচি বঁটি দা, ক্ষুর—অনন্ত তালিকা। লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা মানব-জীবন!

লৌহ কৃষ্ণ—একথা মিথ্যা। বিচিত্র তাহার বর্ণ। লৌহ-অক্সাইড-সংযোগেই তো রবার আদি বস্তু রক্তবর্ণ ধারণ করে ; লোহা হইতে প্রস্তুত হয় বিখ্যাত প্রুসিয়ান নীল রঙ। বস্তুতঃ এরূপ অসংখ্য বর্ণের উৎস লৌহ।

লৌহের রাসায়নিক ব্যবহারেরও অন্ত নাই। পুরাকাল হইতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইহার প্রয়োগ বহুল। আয়ুর্ব্বেদে লৌহ ও লৌহসংশ্লিষ্ট দুইশত পঁয়ষট্টি-প্রকার ঔষধের নামোল্লেখ আছে। এযুগেও এলোপ্যাথিশাস্ত্রে লৌহঘটিত কতপ্রকার ঔষধের যে ব্যবহার হয় তাহার কোন ইয়ত্তাই নাই।

আরোগ্যদায়ী, শ্রমলাঘবকারী, সুখদ ও অপরিহার্য্য যে এই লৌহ, তাহা কিন্তু আবার মানুষের অশেষ দুঃখেরও কারণ। যুদ্ধবিগ্রহের অস্ত্ররূপে বিপুল প্রাণনাশ লোহার শাণিত দংষ্ট্রাই সহজ করিয়া তুলিয়াছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরকপূর্ণ প্রকাণ্ড লৌহ-গোলক কত শত নগর-বন্দর আর নিরীহ প্রাণীর চকিতে বিলোপ সাধন করে। কিন্তু তাহাও তত হানিকর নয় যত হানিকর লৌহের অপর একটা পরোক্ষ প্রভাব। যন্ত্রযুগের ভিত্তি রচনা করিয়া লৌহ তাহার উপর যে সভ্যতা গড়িয়াছে, তাহাতে হৃদয়হীনতা যেন অপরিহার্য্যরূপেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। লৌহদানবের এই নিষ্করুণতা মানুষের আত্মাকে পিষিয়া মুমূর্ষু করিয়া দিয়াছে। লোহার কুহকে ভুলিয়া জগৎ আজ যন্ত্রপূজারী, আত্মা আজ তাই ম্রিয়মাণ। অদূর ভবিষ্যতে এই লৌহ ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন মানুষকে কোথায় লইয়া যাইবে সেকথা ভাবিতে গেলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পাথুরে কয়লার আত্মকাহিনী

আমি কালো। কিন্তু কালোরও রূপ থাকে। তোমাদের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ "কালো মেয়ের কালো হরিণচোখ" দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; তাহার নাম দিয়াছিলেন "কৃষ্ণকলি"। আমার রূপ নাই—আমি পিণ্ডাকার, কদর্য্য এবং কালো। রূপের জগতে আমি চিরন্তন কলঙ্ক।

কিন্তু এমন কুৎসিত কালো তো আমি ছিলাম না। তোমার দ্বারপ্রান্তের অশ্বত্থগাছটি যখন নববসন্তে রক্তাভ পত্রপুঞ্জে ভরিয়া উঠে, লক্ষ্য করিয়াছি তুমি তাহার পানে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া থাক। উঠানের বাতাবিলেবুর গাছটি যখন ফুলে ফুলে ছাইয়া যায়, সন্ধ্যাবেলায় মধুমদির গন্ধ যখন বাড়ীর ও বাহিরের বাতাসকে মাতাল করিয়া তোলে, তোমার আনন্দের সীমা থাকে না। আমিও একদিন অমনি একটি গাছ ছিলাম—কি গাছ ভুলিয়া গিয়াছি। অনেক কালের কথা—হাজার বৎসরেরও বেশী। সমস্ত কি আর মনে থাকে? তবে গাছ যে ছিলাম, একথা ধ্রুব সত্য।

হঠাৎ একদিন ভূমিকম্পে অথবা অমনি এক প্রচণ্ড খণ্ডপ্রলয়ে আমার জীবন্ত সমাধি হইল। মাটির নীচে কি অন্ধকার! গরমও তেমনি! মাটির চাপে, ভূগর্ভের তাপে, হয়তো আমার কোন অজ্ঞাত জন্মান্তরীণ পাপে আমি বিকৃত হইতে লাগিলাম। কোথায় আমার সবুজ পাতা! কোথায় রক্তিম কিসলয়! কোথায় বা বিচিত্র বল্কলে ঢাকা বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রসারিত শাখাপ্রশাখা, গন্ধনন্দিত কুসুমরাজি, রসমধুর ফল! ক্রমে ক্রমে আমি অহল্যার মত পাষাণ হইয়া গেলাম। আমার উপর নূতন মাটিতে আবার আমার স্বজাতি নবীন তরু জন্মগ্রহণ করিল; দিনে দিনে বাড়িয়া আমারই মত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাহারও আমারই মত পাতাল-প্রবেশ হইয়া গেল। আমার বুকের উপর হইল তাহার মৃত্যুশয্যা। এমনি করিয়া তাহারও উপর নূতন তরুর অন্তিম শয়ন রচিত হইল।

এইরূপ বহুবার হইয়া গেল। আজও ইহার বিরাম নাই। এই যে সেদিন 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র এক গূঢ় প্রচণ্ড ভাবাবেগ উত্তর-আসামে সহসা এক প্রলয় মহাকাব্যে রূপায়িত হইল, তাহারও রসনিষ্পত্তিতে সাহায্য করিয়াছে আমার সংখ্যাহীন হতভাগ্য স্বজাতি! কিন্তু থাক সে কথা। নূতনেরাও পরিণত হইল পাথরে। এই প্রস্তরীভূত অবস্থার নাম, তোমাদের পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, ফসিল্ (Fossil)। আমাদের মৃত্যু একসঙ্গে হয় নাই বলিয়া আমাদের পরিবর্ত্তনও এক-রকম নয়। আমাদের শ্রীঅঙ্গের রঙ কৃষ্ণঠাকুরের মত হইয়া গেলেও আমরা যে অনেক কাল পরে পরে আসিয়াছি, জ্ঞানী মানুষ তাহার চিহ্ন পাইলেন এবং প্রত্যেককে এক একটি স্তরে ফেলিলেন।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম—দেহখানি যখন কৃষ্ণঠাকুরের মত কালো হইল, ভাবিলাম, তবু ভাল। রূপ না থাক, রঙে তো আমি এবং স্বর্গের দেবতা এক—শুধু কৃষ্ণ নন, কালীও। এ কি কম সান্ত্বনা?

একপ্রকার আনন্দেই দিন কাটিতেছিল। সহসা একদা সবিস্ময়ে দেখি প্রকাণ্ড ইস্কুরুর (screw) মত কি একটা আমাকে লক্ষ্য করিয়া মাটির নীচে আমার তিমিরলোকে প্রবেশ করিতেছে। আগন্তুকটি কে তাহা নিরূপণ করিবার পূর্ব্বেই আমার শ্রীঅঙ্গে এমন জোরে খোঁচা মারিল যে অঙ্গের সেই অংশটি চূর্ণ হইয়া গেল—চক্ষে সরিষার ফুল দেখিলাম। পরে জানিয়াছি আমাকে আবিষ্কার কারবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আমার রাজ্যে মানুষের চরণধূলি পতিত হইতে লাগিল। শুনিলাম আমাকে লইয়া উহাদের নাকি পরম প্রয়োজন, সুতরাং আমাকে বাহিরে অর্থাৎ লোকালয়ে যাত্রা করিতে হইবে। আমার বিরাট্ বপু কাটিয়া ভাঙিয়া মানুষ আমাকে বাহিরে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিল।

পৃথিবীর যে-বুকটির উপর একদিন পরম সুখে পরম মহিমায় উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেইখানেই আবার আসিলাম। কিন্তু এ কি রূপে আসিলাম! লজ্জায় শ্যাম তরুরাজির দিকে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না।

যেখানে নির্ব্বিঘ্নে এতকাল বাস করিতেছিলাম, তাহার নাম খনি।

মানুষ আমাকে পোড়াইবে—ইহাই নাকি আমাকে লইয়া তাহার প্রয়োজন। আমার বুকের রক্ত নাকি আলকাতরা, বেঞ্জিন, টারপিন, প্যারাফিন। এই রক্ত বাহির করিতেও মানুষ আমার উপর কি অত্যাচারই না করিতেছে!

আমার জীবনে এইটুকু সান্ত্বনা যে আমি পরের উপকারের জন্য আপনাকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেছি।

এতকাল ধরিয়া এমন নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত করিয়াও মানুষ আজও আমাকে শেষ করিতে পারে নাই। আমি নাকি ধরিত্রীর মতই বিশাল। মাত্র ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আমার যতটুকু অংশ মাটির তলদেশ হইতে মানুষ বাহিরে আনিয়াছে, তাহার ওজন চার হাজার একশত আটান্ন কোটি মণেরও উপরে (১৫৪ কোটি টন)। তোমাদের এই ভারতবর্ষের জঠর হইতে আমার কতখানি বৎসর বৎসর বাহির করা হয় জান? প্রায় সাতষট্টি কোটি মণ। এদেশের যেখানে আমার বাস, তাহাদের মধ্যে রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ধানবাদ, দিশেরগড়, কোডার্ম্মার নাম সকলেই জানে।

আজকাল আমাকে তুলিবার জন্য একপ্রকার বিদ্যুচ্চালিত যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে। যন্ত্রটি একটি ইস্পাতনির্ম্মিত বাক্স। উহার দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, প্রস্থ ২৮ ইঞ্চি ও উচ্চতা ১৬ ইঞ্চি এবং ওজন ২,৪০০ পাউণ্ড।

ঐ যে মহার্ঘ প্রস্তর, মানুষের পরম ঐশ্বর্য্যবিলাসের চরম উপকরণ, অধিকাংশ লোকই যাহাকে দেখিবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত, শুধু নাম শুনিয়াছে—হীরক, সে আমারই ভাই—আমারই কঠিনতম, উজ্জ্বলতম রূপান্তর! ভারতের গৌরব কোহিনূর বৃটিশরাজের মুকুটভূষণ! তোমরা তাহা ফিরিয়া পাওয়ার দাবী করিবে না?

হীরক আমার ভাই—ইহা আমার কম গৌরবের কথা নহে। তবু একটু ঈর্ষ্যা হয় বৈ কি। তবে, আমার জীবন বিশ্বাহতে উৎসর্গীকৃত, হীরকের তাহা নহে।

পেট্রোল

বিশেষজ্ঞদিগের মতে জীবদেহের বিয়োজনপ্রক্রিয়ায় খনিজ তৈলের উৎপত্তি হয়। নানা কারণে ভূগর্ভে জীবজন্তুসহকারে এক একটা স্থান সমাধি লাভ করে। তারপর যুগযুগান্তর ধরিয়া বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। তাহারই ফলে

পেট্রোলের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বস্তুতঃ পেট্রোলসৃষ্টি-সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য মত নাই। উহার জন্মরহস্য আজও অবগুণ্ঠিত।

বর্ত্তমান যুগে পেট্রোলের দান অপরিসীম। অথচ শতাব্দীকাল পূর্ব্বেও মানুষ ইহার বাণিজ্যিক প্রয়োগের কথা বড় একটা জানিত না। বিগত শতকের মধ্যভাগে লর্ড প্লেফেয়ার সর্ব্বপ্রথম পেট্রোলিয়মের শোধনপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া যখন উহার অশেষ ব্যাবহারিক সম্ভাবনা প্রতিপন্ন করেন, তখনও পর্য্যন্ত মানুষ ভাবিতেই পারে নাই কি উপায়ে বসুন্ধরার সুগভীর জঠর হইতে এই তৈল নিষ্কাশন করা সম্ভব। কিন্তু স্বনামখ্যাত কর্ণেল ই. এল. ড্রেক কিছুকালের মধ্যেই একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পেনসিল্‌ভেনিয়ায় একটি রীতিমত কূপ খনন করিয়া ফেলিলেন। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধরণীপৃষ্ঠে চুয়াইয়া চুয়াইয়া যে পরিমাণ তৈল উঠিত, তাহা লইয়াই মানুষ প্রয়োজন মিটাইত। ড্রেক সাহেবের আবিষ্কারের ফলে বিপুল বিপ্লব ঘটিয়া গেল। তৈল-উত্তোলনের অভূতপূর্ব্ব হিড়িকে মানুষ মাতিয়া উঠিল। অষ্ট্রেলিয়া-আবিষ্কারের পর স্বর্ণসন্ধানের জন্য যে মত্ততা দেখা গিয়াছিল, তৈলের জন্য এই নবীন উদ্দীপনা একমাত্র তাহার সহিত তুলনীয়। আজ হইতে ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর পূর্ব্বের এই ঘটনা। তারপর এই নাতিদীর্ঘ সময়ে যে কল্পনাতীত বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার শতাংশের বিবরণই মহাভারততুল্য বিপুল গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার টেক্সাস, কালিফোর্নিয়া, পেনসিল্‌ভেনিয়া, ইউরোপের রুমানিয়া, রুশিয়া, এশিয়ায় ইরাক, ইরাণ, ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আজ লক্ষ লক্ষ টন তৈল উঠিতেছে।

তৈল-উত্তোলনের জন্য যে কূপ ব্যবহৃত হয় তাহাকে বিশেষ ধরণের নলকূপ বলা যায়। যেস্থলে এই কূপ খনিত হয়, সেস্থলে চতুষ্কোণ একটি সমুচ্চ মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মঞ্চ ১৩০ হইতে ১৫০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। উহার শীর্ষ হইতে পাখীর সাহায্যে খননকারী যন্ত্রসমন্বিত একটি নল ভূতলে অবনমিত হয়। যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে ঘূর্ণায়মান গতি সঞ্চারিত করা হয় এবং তাহারই শক্তিতে এই নলগঠিত তৈলকূপ পৃথিবীর কুক্ষিগত তৈলসঞ্চয়ে গিয়া পৌছে। তারপর শোধন করিয়া সেই তৈল নিষ্কাশন করা হয়। প্রথমে পঙ্কিল ক্রুড অয়েল অপরিষ্কৃত অবস্থায় বড় বড় গহ্বরে সংগ্রহ করিয়া পরে বিবিধ প্রক্রিয়ায় উহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বিশুদ্ধ পরিস্রুত ক্রুড অয়েল তখন পেট্রোলে পরিণত হয়।

কখনও কখনও খনি হইতে তুলিয়া পেট্রোলিয়ম পাইপযোগে শত শত মাইল দূরে লইয়া যাইতে হয়। ইরাকের সুবিখ্যাত কিরকুক্ (Kirkuk) প্রান্তর হইতে এরূপ দুইটি পাইপ লাইন-প্যালেষ্টাইনের হাইফা ও সিরিয়ার ত্রিপলী বন্দর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই উভয় লাইনের দৈর্ঘ্য সহস্রাধিক মাইল। উহা স্থাপনের জন্য এক কোটি পাউণ্ড অর্থ ও দশ সহস্র শ্রমিকের অহর্নিশ পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে। পৃথিবীর

বিভিন্ন স্থানে তৈল সংগ্রহের জন্য যে বিপুল প্রয়াস ও অর্থ নিয়োগ করা হইয়াছে, ইহা হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাওয়া যায়।

তথাপি কেবল খনিজ তৈল লইয়াই মানুষের তৃষ্ণা মিটে নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আজ শেল (shell) ও কয়লা হইতেই পেট্রোল প্রস্তুত হইতেছে।

পেট্রোল মানবসমাজে কিরূপ অনন্যসাধারণ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, উপরোক্ত বিবরণ হইতেই তাহা অনুমান করা যায়। ইহার উপযোগিতার আর সীমা-পরিসীমা নাই। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে তৈলই প্রধান সম্বল—যন্ত্রসভ্যতার গতিস্থিতি ইহার অভিষেক ব্যতীত সম্পূর্ণ অচল। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জুড়িয়া যে মানুষের আজ অবাধ গতি—মরুপ্রান্তর গিরিকান্তার ভেদ করিয়া যে তাহার বাধাহীন অবিরাম পরিক্রমা—তাহা সকলই পেট্রোলের কৃপায় সম্ভব হইয়াছে। পেট্রোলচালিত যান-বাহন আজ স্থানকালের বিপুল ব্যবধান হ্রস্ব করিয়া দিয়াছে। মেঘের দেশে পাখা মেলিয়াছে তৈলপ বিমান, সাগরবক্ষে নাগরদোলায় নিঃশঙ্কভাবে চলে তৈলপোত। তাহা ছাড়া অযুতপ্রকার কলকারখানা আর যন্ত্রপাতির তৈলই একান্ত সম্বল। শুধু কি তাই? পেট্রোলজাত কেরোসিনও ঘরে ঘরে জ্বালে দীপশিখা, পেট্রোলজাত তৈলসেকই সঞ্চার করে যাবতীয় যন্ত্রচক্রের গতি।

জগৎময় তাই তেলের জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিজের চরকার জন্য তো বটেই, পরের মন রাখিতেও চাই তেল। তেল দিয়া কেহ রাজনৈতিক সিংহের কৃপা সঞ্চয় করে, তেল না দিলে আবার কাহারও উপর শ্বেতভল্লুকের ভয়ঙ্কর নখর উদ্যত হইয়া উঠে। আর যাহাদের শক্তি অসীম, তাহারাও তেল পাইতে গায়ের তেল মজাইতে কুণ্ঠিত নহে। মোট কথা, তেল চাই-ই চাই। তেল চাই নৌবহরের জন্য, তেল প্রয়োজন বিমানবাহিনীর নিমিত্ত, তেল চাই যান্ত্রিক স্থলসৈন্যের জন্য। আর রেল, মোটর, ডায়নামো হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সেলাইয়ের কল ও তড়িৎ-পাখার জন্য পর্য্যন্ত সময় সময় তেল না হইলেই নয়। অতএব তৈলাৎ পরতরং ন হি।

বিজ্ঞানের দান

বিজ্ঞানের দান

ওম্ (Ohm), র‍্যান্‌ট্‌জেন্ (Rontgen), আইন্‌ষ্টাইন্ (Einstein) প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত মনীষী যে জার্ম্মানীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, সেই জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন নগরীর রাজপথে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন রাত্রিতে আলোক দিবার ব্যবস্থা হইতেছিল, তখন ধর্ম্মযাজকগণ কঠোরভাবে তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন—ভগবান্ দিনে আলোক ও রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছেন; মানুষের এতবড় স্পর্দ্ধা যে রাত্রিকে আলোকিত করিয়া সে ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, খোদার উপর খোদকারী! ইংলণ্ডেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, যখন ষ্টিফেন্‌স্ (Stephens) সাহেব চলন্ত ইঞ্জিনের পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। প্রতিবাদিগণ আজ নিরস্ত হইয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণের মত বিজ্ঞানসৃষ্ট ভোগবিলাসের আয়োজনগুলিকে পরমানন্দে সম্ভোগ করিতেছেন।

বিংশ শতাব্দী যে বিজ্ঞানের যুগ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পশ্চিম ভূখণ্ডে ইহার সূচনা ও প্রসারের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। উল্লেখযোগ্য সূচনা হয় প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের জয়যাত্রা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়, বলিতে গেলে, উনবিংশ শতাব্দীতে। এই স্বল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞান যে সর্ব্বগ্রাসী প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। এই দ্রুত গতি যদি অব্যাহত থাকে, তবে আগামী দুইশত বৎসরে মানুষের পৃথিবী যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তার অতীত, হয়তো-বা কল্পনারও অতীত।

বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ আজ কি পাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন মানুষের বিজ্ঞানসাধনার কিছু পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে। জলেস্থলে বিভক্ত হইয়া আমাদের পৃথিবী একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করার পরে ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রাণীর এখানে জন্ম হয় এবং আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে ভোগ করিতে থাকে। এমন একটা সময়ে আবির্ভাব হয় জীবসৃষ্টিধারার শেষ প্রাণী বুদ্ধিমান্ মানুষের। সে যে কতকাল আগের কথা তাহা কেহই জানে না। ভূতত্ত্ববিদ্, প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ লক্ষ লক্ষ বৎসরের কল্পনাই করিয়া থাকেন—এক্ষেত্রে লাখের কম তাঁহাদের কথাই নাই। মানুষের বুদ্ধি সেদিন আজিকার মত ছিল না, সহজাত সংস্কারের কিছু উর্দ্ধে তাহার স্থান ছিল। সেই বুদ্ধিবলেই সে জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়, বৃহত্তম প্রাণীটি পর্য্যন্ত তাহার বশ্যতা

স্বীকার করে। আত্মরক্ষার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে কৌশল মানুষ আবিষ্কার করিয়াছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের মূলরূপ, বলিতে গেলে, তাহারই মধ্যে নিহিত।

কৌতূহল মানুষের জন্মসংস্কার। বর্ত্তমান অত্যুন্নত যুগেও ইহার শেষ নাই। বিশ্বরহস্যেরও যেমন সীমা নাই, তৎসম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের তথা তাহা নিবৃত্ত করিবার বাসনা ও সাধনারও তেমনি সীমা নাই। বিচিত্র নৈসর্গিক ঘটনা প্রাচীন মানুষকে ভয়মিশ্র বিস্ময়ে যেমন বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে, তাহার রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিবার বাসনাকেও তেমনি উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। এখানে একদিকে যেমন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গোলমিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, আয়ুর্বিজ্ঞানের তেমনি সৃষ্টি হইয়াছে। সংখ্যার দশমিক তত্ত্ব ও বীজগণিতের জন্য পাশ্চাত্য জগৎ আমাদের নিকট ঋণী এবং বহু মনীষী এ ঋণ নিষ্কুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদকে কেন্দ্র করিয়া রসায়নশাস্ত্র এদেশে যে প্রভূত উন্নতি করিয়াছিল, বিবিধ ধাতু-উপধাতুর প্রয়োগ পুটপাক-পদ্ধতি, মকরধ্বজ-প্রস্তুত-প্রক্রিয়ায় পারদগন্ধকের কজ্জলী ও ক্যাটালেটিক এজেণ্টরূপে (cataletic agent) স্বর্ণের প্রয়োগ তাহার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা আমাদের প্রতিভার সহজ স্ফুরণ ব্যাহত করায় আজ আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসাধকের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছি না সত্য, কিন্তু স্বাধীন ভারত অচিরকালের মধ্যেই যে উজ্জ্বলতর মহিমার কিরীট মস্তকে ধারণ করিবে এবিষয়ে সংশয় করি না।

আজিকার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধির গৌরব যে পাশ্চাত্য জগতের প্রাপ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। উত্তাল সিন্ধুর প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি আজ মানুষের প্রতিভার কাছে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত মাথা নীচু করিয়াছে—জাহাজ আজ শুধু তাহার বুকের উপর দিয়া সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছে না, প্রয়োজনমত তাহার মর্ম্মতল বিদীর্ণ করিয়া কুম্ভীরের মত গোপন যাত্রা সম্পন্ন করিতেছে। দানবীয় শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন আজ লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া সহস্র সহস্র যাত্রী ও লক্ষ লক্ষ টন মাল লইয়া পৃথ্বীবক্ষ কম্পিত করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। উত্তুঙ্গ মহাগিরিশৃঙ্গ আজ আর মানুষের যাত্রাপথের বাধা নয়—বিমান মানুষের উর্দ্ধগগনচারী বিহঙ্গে পরিণত করিয়াছে। স্থলপথে রেলইঞ্জিনের সহিত সার্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে মোটরগাড়ী, মোটরসাইকেল। দেশদেশান্তরের ব্যবধান আজ অবলুপ্ত। আজ সকলেই সকলের নিকট-প্রতিবেশী। স্থির-ইঞ্জিনের সাহায্যে সর্ব্বদেশে চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কারখানা। মানুষ আজ পৃথিবীর বুকের রক্ত তুলিয়া আনিয়া তাহাকে বিচিত্র ইঞ্জিনের খাদ্যে পরিণত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ঊষরতম মরুকে সরসশ্যামল জনপদে তথা কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অসাধ্যসাধন করিয়াছে বিদ্যুৎশক্তি। এই মহাশক্তি আবিষ্কারে

এবং ইহাকে বিচিত্র ব্যাপকভাবে কার্য্যে নিয়োজিত করার ব্যাপারে মানুষ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের বজ্র আজ মানুষের ঘরে দাসত্ব করিতেছে। ঘরের আলোক, পাখার বাতাস হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতম পরমাণুবোমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইহার বিচিত্র লীলা। আজ আর পাখার বাতাসে আমরা সন্তুষ্ট নহি; ঘরকে 'এয়ার কণ্ডিশন্‌ড্' করিয়া ভগবানের দেওয়া শীতগ্রীষ্মকে আমরা অর্থহীন করিয়া দিতেছি। এ্যাটমের অন্তর্নিহিত একটি ইলেক্‌ট্রনকে নিউট্রনের সাহায্যে গূঢ় বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় 'ফিশন' (fission) করিয়া চক্ষের নিমেষে মানুষ 'হিরোসিমা,' 'নাগাসাকি' নগরী দুইটিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে—লক্ষ লক্ষ মানুষের বহুকালের তপস্যায় রূপায়িত, যুগযুগান্তরের সাধনালব্ধ সংস্কৃতির ধারক দুইটি নগরী, অসংখ্য শিশু-তরুণ-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত নরনারী কিছু অনুভব করিবার আগেই মুহূর্ত্তে মিথ্যায় বিলীন হইয়া গেল মানুষের দিব্যপ্রতিভার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ একটি পরমাণুবোমার আঘাতে! আবার যদি বিশ্বসংগ্রাম হয়—হইবেই, তবে কাল কিংবা দুইদিন পরে—বিজ্ঞানের দানের মহিমা বুঝিবার মত মানুষ সেদিন সম্ভবতঃ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকিবে না একথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইন্‌ষ্টাইন বলিয়াছেন। কিন্তু, তাই বলিয়া বিজ্ঞানের প্রসাদে যাহা পাইয়াছি তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইব না কেন, আরও অনেক আশাই-বা না করিব কেন? ঘরের রেডিও যন্ত্রখানির একটি চাবি ঘুরাইতেই যখন শুনি 'B. B. C. calling,' পুলকিত হইয়া উঠি—নিখিলভুবন তাহার প্রাণের কথাটি আমাকে বলিবার জন্য আমার ছোট্ট কাঠের বাক্সটির ভিতর অব্যক্ত আকুলিবিকুলি করিতেছে; শুধু একটু কানমলার অপেক্ষা, অমনি সে একগাল হাসিয়া হয় গান শুনাইয়া আমাকে চরিতার্থ করিবে, না হয় কোন মধুর অমায়িক বাণিজ্যিক স্বার্থসম্পর্ক ভারতের সহিত পাতাইয়াছে তাহা জানাইয়া আমাকে সে রোমাঞ্চিত করিবে! যানবাহনগুলি জগতের সহিত আমাদের দৈহিক সম্পর্ক পাতাইয়াছে, রেডিও পাতাইয়াছে মর্ম্মের সম্পর্ক। এই যন্ত্রটির গঠনের মূলে যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি রহিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। মানুষের কণ্ঠধ্বনির বা যন্ত্রধ্বনির প্রতি সেকেণ্ডে ১,১৪২ ফুট গতিবেগকে বিদ্যুৎ-চুম্বকশক্তির যোগে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিবেগে যিনি রূপান্তরিত করিয়াছেন, তিনি প্রণম্য। আমেরিকার সেনেট হলে বসিয়া যাঁহারা সভাপতির বক্তৃতা শুনিতেছেন, তাঁহাদের চেয়ে আগে শুনিতে পাই আমরা—আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্য। তারপর র‍্যাডার। এই আবিষ্কার শত্রুবিমানের গোপন অভিসার ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে—তাহার অবস্থান, দিক্, দূরত্ব, গতিবেগ সবই ধরা পড়িয়া যায় এই যন্ত্রটিতে। কলের গান, মুখর ছায়াছবি, আলোকচিত্রণ আজ আমাদের আর বিস্ময় সৃষ্টি করে না, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে বলিয়া। বিজ্ঞানের নিকট আধুনিক মানুষের ঋণ যে অপরিসীম তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরাধীনতায় মৃতপ্রায় ভারতীয়গণের মধ্যেও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমেই আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কথা মনে পড়ে এবং মন ব্যথিত হইয়া উঠে। তরুলতার চেতনাসম্পর্কে তাঁহার আবিষ্কার জগৎ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বেতারসম্পর্কে তাঁহার গবেষণা ও প্রাথমিক সিদ্ধির কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে—মার্কনিকে সকলেই জানিয়াছে, কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে চিনে নাই। রসায়নক্ষেত্রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, বসু-আইনষ্টাইন-তত্ত্বের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বাঙলার গৌরব। আলোক-সম্পর্কে 'রমণ-এফেক্ট' (Raman-Effect) জগতে সম্মানিত এবং যাঁহার নামে এই তত্ত্বের নামকরণ সেই সি. ভি. রমণ মদ্রদেশের অধিবাসী—ভারতীয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক। ইনি বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের যে অসামান্য উপকার হইয়াছে ও হইতেছে ইহা অবিসংবাদিত সত্য হইলেও ভাবনারও কারণ আছে। বর্ত্তমানযুগ বিজ্ঞানের যুগ; কিন্তু বিজ্ঞানযুগ যন্ত্রযুগের নামান্তর। বিজ্ঞান মানুষকে যে পরিমাণ ভোগবাদী করিয়া তুলিতেছে, আত্মিক বিকাশের পথকে সেই পরিমাণে কণ্টকিত, সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছে। আত্মার দিক্‌টিকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া মানুষ যদি বিজ্ঞানের এই বহির্মুখী সিদ্ধিকেই একমাত্র সিদ্ধি বলিয়া মানিয়া লয়, প্রতিটি মানুষ যন্ত্রে পারণত হইবে এবং মানবতার হইবে অপমৃত্যু।

মুদ্রাযন্ত্র

বিজ্ঞানের এক হাতে সুধাপাত্র, অন্য হাতে রহিয়াছে বিষভাণ্ড। যেমন অনস্বীকার্য্য ইহার কল্যাণশক্তি, তেমনই অনস্বীকার্য্য ইহার ধ্বংসশক্তি। যাহাদ্বারা জগতের মানুষের সভ্যতার অশেষ উন্নতি করা যায়, তাহার দ্বারাই আবার পৃথিবীর মহতী ক্ষতি করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিমানপোত। মানুষের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিতে, সমগ্র পৃথিবীবাসীদের একাত্মীয়তা-সূত্রে বাঁধিতে ইহা অপেক্ষা আর কোন মহত্তর আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীতে হয় নাই। কিন্তু ইহার অপব্যবহারে পৃথিবীর যে কত ক্ষতি হইতে পারে তাহার পরিচয় বহন করিতেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎস ইতিহাস। বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান মুদ্রাযন্ত্র-সম্বন্ধেও এই মন্তব্য আংশিকভাবে প্রযোজ্য। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণশক্তি-সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যতা এই মুদ্রাযন্ত্রেরই সৃষ্টি—আধুনিক যুগের কাব্য, সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি পরিচয় বহন করিতেছে সুস্পষ্টরূপে মুদ্রাযন্ত্রের অসীম কল্যাণশক্তির। অন্যদিকে ইহার অপব্যবহারে জগতের যে প্রচুর অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে, আধুনিক ইতিহাস তাহারও সাক্ষ্য দেয়।

মানবজাতির সভ্যতার প্রসার আরম্ভ হইয়াছে পৃথিবীর শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শিল্পযন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস তাই বিবিধ আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর ইতিহাস। মানুষ নিত্যই আগাইয়া চলিয়াছে—সে নিত্য-নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছে, অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছে বারংবার; জীবনযাত্রা সহজ ও সমৃদ্ধ করিতে সে তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। এইরূপ ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই সে মুদ্রাযন্ত্র-আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছে। মানুষের আবিষ্কৃত শিল্পযন্ত্রসমূহের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য।

প্রাচীনকালে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। সেই সময় গ্রন্থাদি হাতে লিখিত হইত। লেখকের নিকটই পাণ্ডুলিপি থাকিত। অনেকে তাহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সে ছিল অতি কঠিন প্রয়াস। অনেকক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়া যাইত। নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত এইরূপই চলে। নবম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম চীনদেশে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। কাষ্ঠখণ্ড খোদিত করিয়া মুদ্রাঙ্কনকার্য্য সম্পন্ন হইত। ধীরে ধীরে ইহা সমগ্র সভ্যদেশে ছড়াইয়া পড়ে। চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবন হইতেছিল, তখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়। এই 'রেনেসাঁস' আরম্ভ হইয়াছিল জার্ম্মানীতে; তাই ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জার্ম্মানীতেই প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বই মুদ্রিত করেন পিটারসোফার। ইংলণ্ডে ১৪৭৬ সালে উইলিয়ম ক্যাক্সটন ইহার প্রচলন করেন এবং অচিরেই সমস্ত ইংলণ্ডে ইহার ব্যবহার সুরু হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে মুদ্রাযন্ত্রের দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। ১৭৩০ সালে উইলিয়ম জেড্ নামে এক স্বর্ণকার 'ষ্টেরোটাইপ' আবিষ্কার করেন। আর্ল অব্ ষ্ট্যানহোপ ইহার আরও উন্নতি করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে 'বাষ্পীয়' মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়। 'টাইমস্ অব্ লণ্ডন' পত্রিকা অফিসে সর্ব্বপ্রথম ১৮১৪ সালে 'বাষ্পীয়' মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। ১৮২৭ সালে কার্ডপার ও অ্যাপেলগাথ একটি চারসিলিণ্ডার মুদ্রাযন্ত্র তৈয়ারী করেন; এই যন্ত্রটি এক ঘণ্টায় পাঁচ হাজার কপি ছাপিতে পারে। ১৮৬৬ সালে 'টাইমস্ অব্ লণ্ডন' অফিসেও 'ওয়াল্টার প্রেস' স্থাপন করা হয়। ইহার সাহায্যে এক ঘণ্টায় পনর হাজার কপি ছাপাইতে পারা যাইত। বর্ত্তমানে 'লিনো-টাইপ' এবং 'বৈদ্যুতিক মুদ্রাযন্ত্র' আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মুদ্রাযন্ত্র মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। মানব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির কীর্ত্তি-বহনকারী গ্রন্থরাজি মুদ্রাযন্ত্র না হইলে সাধারণের প্রায় অপরিচিতই থাকিত। সভ্যমানুষকে বাঁচিতে হইলে তাহার দেহের এবং মস্তিষ্কের জন্য খোরাক প্রয়োজন।

দেহের জন্য প্রয়োজন খাদ্যের এবং মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজন গ্রন্থরাজির। এই গ্রন্থরাজি আজ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বিশ্ববাসীর সহজলভ্য হওয়ায় জ্ঞানপ্রচার বাধাহীন হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ অতি অল্পব্যয়ে আজ রাশি রাশি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাইতে পারে। আজ ভারতবাসী পৃথিবীর সকল লেখকের রচনাই পাইতে পারে সুলভে। গ্রন্থপাঠের অধিকার আজ কেবল মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। এই অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র জ্ঞানবিস্তারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক।

মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সংবাদপত্রের প্রচার ছিল না। এক প্রদেশের সংবাদ অন্য প্রদেশের অধিবাসীর জানিবার কোন সুবিধা ছিল না। সংবাদ পাঠান হইত লোক-মারফত—কাশ্মীরের সংবাদ বাঙলা দেশে পৌছিতে লাগিত দুই মাস। সংবাদ পৌছিলেও জনসাধারণ তাহা জানিতে পারিত না। আজ যে-কোন দেশের সংবাদ সর্ব্বজনগোচর হয় অতি অল্পসময়ে সংবাদপত্র-মারফত। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচনের ফলাফল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রচারিত হইল পৃথিবীর সর্ব্বত্র। ইহা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে।

বিজ্ঞান মানুষকে উন্নত করিয়াছে—সে তাহার জীবন সহজ ও সরল করিয়াছে। মানুষের আত্মপ্রকাশের দ্বার আজ খুলিয়া গিয়াছে। তাই আধুনিক মানুষ যাহা বলিতে চায়, তাহা প্রচারিত হয় দিকে দিকে অতি অল্পসময়ে। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনা আজ উপভোগ করে সমগ্র বিশ্ববাসী; সেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র। মুদ্রাযন্ত্র কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকদের বিশ্বের দরবারে টানিয়া আনিয়াছে।

মুদ্রাযন্ত্র পৃথিবীর সকল জনসাধারণকে একাত্মীয়তার সূত্রে বাঁধিতেছে। আজ মানুষ বলিতে পারে—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে'। কারণ এক দেশের মানুষ অন্য দেশের আচার, ব্যবহার, জীবনযাত্রা-প্রণালী, সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি জানিতে পারে মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায়। ইহাতে তাহার মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়াছে, সে অন্য দেশবাসীকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে—তাই সে আজ সকলকে স্বীকার করিতেছে তাহার আত্মীয় বলিয়া। তাই পৃথিবীর কোন কোণে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে সমগ্র বিশ্বে সাড়া পড়িয়া যায়—বিশ্বের সকল মানুষ ছুটে সাহায্য করিবার অভিলাষে।

অবশ্য মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং প্রচলনে বিশ্বের কিছু অনিষ্টও হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের অপব্যবহারেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ ইহার সাহায্যে পৃথিবীর ক্ষতি করিতে চাহিয়াছে নানাপ্রকার কুনীতিপূর্ণ গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া। শুধু তাহাই নহে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি মুদ্রাযন্ত্রকে বাহন করিয়া বিচিত্র 'প্রোপাগ্যাণ্ডা'-প্রচারে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছে এবং তাহাদের অজ্ঞাতসারেই তাহাদিগকে

সত্যের পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিজের কূটমতের অনুবর্ত্তী করিয়া তুলিতেছে। রেডিও এই অনাচারকে আরও সহজ করিয়া তুলিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী দুই তরফ হইতেই এইজাতীয় অপপ্রচার মুদ্রাযন্ত্রের মারফত হইয়া থাকে। অবশ্য এ অপরাধ মুদ্রাযন্ত্রের নয়, যন্ত্রীর অর্থাৎ যন্ত্রনিয়ন্তার। তবু ইহার অপকারশক্তি কল্যাণশক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

কাগজ

মানবসভ্যতার কোন্ সুদূর অতীতে যে মানুষ প্রথম লিখিতে শিখিল, তাহার সঠিক ইতিহাস দুর্জ্ঞেয়। মানুষ তাহার মনের কথাকে সর্ব্বযুগের সকল মানবকে শুনাইবার জন্য না জানি কত দীর্ঘপ্রয়াস করিয়াছিল। কতপ্রকার আঁকজোক, প্রস্তরফলকে আর কচ্ছপের খোলায়, অস্থিখণ্ড আর ধাতুর পাতে দুর্ব্বোধ কত শত বিচিত্র চিহ্ন আঁকিয়া সে মনের কথাকে অমর করিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। এই আকুল আবেগ ও এই সুদীর্ঘ প্রয়াস অবশেষে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিল কাগজ-আবিষ্কারের শুভপ্রভাত হইতে।

কিন্তু সর্ব্বপ্রথম কখন কিরূপে এই আবিষ্কার ঘটিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্ভবতঃ প্রাচ্যেই সর্ব্বপ্রথম কাগজের আবিষ্কার ঘটে। যীশুখ্রীষ্টের কিছুকাল পরেই চীনদেশে কাপড় হইতে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষে অবশ্য তখনও কাগজ প্রস্তুত হইত না। ভূর্জ্জপত্র ও তালপাতাই তখন লিপিকার্য্যে কাগজের স্থান অধিকার করিয়াছিল। এদিকে গ্রীস প্রভৃতি দেশে পশুচর্ম্ম এবং মিশরে প্যাপিরাস্-নামক গাছের ছাল লিখনকার্য্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই Papyrus কথাটি হইতেই ইংরেজী paper কথাটির উদ্ভব।

আমাদের দেশে কাগজের আমদানী হয় তুর্কীগণের ভারতবিজয়ের পর। কাগজ কথাটি ফরাসী কাযগদ্ হইতে সৃষ্ট। প্রাচীন চীনভাষায় কাগজকে tsie বা 'ৎসিয়ে' বলা হইত। তাহা হইতে সংস্কৃত শয়ঃ শব্দ উদ্ভূত হইয়া কিছুকাল প্রচলিত থাকে এবং তাহার পর অপ্রচলিত হয়। কাগজের ইতিহাস-বর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থ, পুস্তক ও পুঁথি, এই শব্দগুলি-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। পূর্ব্বে বৃক্ষপত্রলিখিত পুস্তক এদেশে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত বলিয়া বইয়ের নাম গ্রন্থ হইয়াছে। মধ্যযুগে ফরাসীদেশে লেখার জন্য যে মেষচর্ম্ম ব্যবহৃত হইত তাহাকে 'পোস্ত' বা পুস্ত বলা হইত। তাহা হইতেই পুস্তক কথাটির উদ্ভব বলিয়া মনে হয়। আবার 'পুস্তক' ও 'পুস্তিকা' হইতে যথাক্রমে 'পোথী' ও 'পুথী' কথার সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রন্থের অন্যতম নাম কেতাব বা কিতাব। এই শব্দটি পুস্তক-শব্দের বর্ণবিপর্য্যয়ের ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে আরবগণই চীন হইতে কাগজের ব্যবহার ও উৎপাদনবিধি জানিয়া লইয়া দেশে দেশে প্রচার করিতে থাকে। ইউরোপখণ্ডে কাগজ-ব্যবহার শিক্ষা দেয় স্পেনীয় মূরগণ। কাগজ তখন হাতেই তৈয়ারী হইত। ছিন্নবস্ত্রাদির মণ্ড হইতে সেকালে এদেশে যে তুলট কাগজ প্রস্তুত হইত, আজিও তাহা কোষ্ঠী ও নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুলট কাগজ ভিন্ন অন্যপ্রকার হাতের তৈয়ারী কাগজও এযুগে একেবারে অদৃশ্য হয় নাই। নেপাল ও তিব্বতে হাতের কাগজ বহুপ্রচলিত, এমন কি বিলাতে পর্য্যন্ত hand-made কাগজের পুস্তকাদির রাজসংস্করণ মুদ্রিত হইয়া থাকে।

কাগজের কল-আবিষ্কার মানুষের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে যখন বিপুল পরিমাণে কাগজ-উৎপাদন সম্ভব হয় এবং তৎপর রাসায়নিক কাষ্ঠমণ্ড-প্রস্তুতের জন্য সাল্‌ফেট-পদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে, তখন এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ টন কাগজ আজ প্রত্যেক দেশে ব্যবহৃত হয়। লাল নীল সবুজ বাদামী—কত শত রঙ-বেরঙের মোটা-মিহি শক্ত-মসৃণ রুক্ষ-সূক্ষ্ম রকমারী কাগজ আজ বাজার ছাইয়া আছে। কাগজের মিলে এই বিচিত্র সম্ভার কিরূপে উৎপন্ন হইতেছে তাহা রীতিমত একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। কাঠ, পাট, শণ, বাঁশ, ঘাস, ছেঁড়া কাপড়চোপড় ও কাগজপত্রই হইল কাগজের মূল উপাদান। উহাদিগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম মণ্ডে পরিণত করা হয় এবং তাহার পর সেই মণ্ড হইতে বিচিত্র প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রঙের কাগজ প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমান মানুষের জীবনে কাগজের উপযোগিতা সম্পূর্ণ অমেয়। পুস্তক, খবরের কাগজ, ছবিছাপা, বিজ্ঞাপন আর নিত্যনৈমিত্তিক অগণ্য লেখার কাজে কাগজের অজস্র ব্যবহার। দেওয়ালপঞ্জী ও দেওয়াল-আচ্ছাদন-রূপে, ফুলপাতা আর অসংখ্য শিল্পসজ্জায়, তোরণে নিশানে, ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র কাগজ। ঠোঙা-থলে, মোড়ক-মলাট, ম্যাপ-নক্সা, খাম-কার্ড, টিকিট-টাকা—কাগজের জিনিসের তালিকা অশেষ। কাগজের ঘুড়ি আকাশে উড়ে, কাগজের নলে শরবত পান করা যায়, কাগজের আধারে কেক, আইস্‌ক্রীম, সন্দেশ পরিবেষণ করা হয়। বস্তুতঃ কাগজে কি না হয়? খোকার দুধ গরম হইতে ডন্ কুইকসটশ্রেণীর পণ্ডিতগণের মাথা গরম এবং গরমে ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডায় গরম করিতে কাগজই মাত্র সমর্থ। অতিদাহ্য কাগজ বিদ্রোহের আগুন ধারণ করে, আবার তাহাই পরমশান্তি ও প্রগাঢ়-জ্ঞানের সঞ্চয় সযত্নে ধরিয়া রাখে। বস্তুতঃ কাগজের ন্যায় প্রয়োজনীয় এযুগে আর কোন বস্তুই নহে।

বিমানপোত

'স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র পুষ্পকরথে চড়িয়া মর্ত্ত্যভ্রমণে বাহির হইলেন।' পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও মানুষ এই ঘটনাকে হাসির কথা মনে করিত। আমাদের পুরাকালের সাহিত্যে বহুবার পুষ্পকরথের উল্লেখ দেখা যায় এবং বহু আকাশ-ভ্রমণের মনোরম কাহিনী পড়া যায়। পূর্ব্বে আকাশভ্রমণের কথা অবিশ্বাস্য মনে হইত—আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা অতি স্বাভাবিক মনে হয়।

বস্তুতঃ মানুষের সভ্যতার ইতিহাস প্রকৃতির উপর তাহার ক্রমবর্দ্ধমান কর্ত্তৃত্বের ইতিহাস। এক শতাব্দী পূর্ব্বেও যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, আজ সেসকল ব্যাপারই অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠিতেছে। জল, স্থল, আকাশ—প্রকৃতির এই তিনটি বিশিষ্ট অংশই আজ মানুষের কর্ত্তৃত্বাধীনে। প্রথমে সে রেলগাড়ী ও জলযান আবিষ্কার করিল—ইহাদ্বারা পৃথিবীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব অনেকখানি কমাইয়া দিল। মানুষ অনায়াসে আজ চব্বিশঘণ্টায় একহাজার মাইল অতিক্রম করিতে পারে কিন্তু মানুষের আবিষ্কারী প্রতিভা ইহাতে ক্ষান্ত হইল না। দূরত্ব আরও কমাইতে হইবে। জল ও স্থল তো অধিকারে আসিয়াছে—এইবার আকাশেরও উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে হইবে। সুতরাং আবার প্রচেষ্টা সুরু হইল—অমানুষিক প্রচেষ্টা ও অসীম প্রতিভার ফলে মানুষ আকাশ-বিজয়ে সমর্থ হইল। তিন ঘণ্টায় একহাজার মাইল অতিক্রমণীয় হইল।

অবশ্য বহুপ্রাচীনকাল হইতেই মানুষের আকাশে উড়িবার ইচ্ছা। সে নানাভাবে, নানা-উপায়ে চেষ্টা করিয়াছে পাখীর ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতে। কখনও সে মোমের পাখা লাগাইয়া উড়িতে চেষ্টা করিয়াছে, কখনও-বা উচ্চ প্রাসাদশিখর হইতে লাফ দিয়া উড়িতে চাহিয়াছে। সাহসী মানুষ বারংবার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আকাশকে জয় করিতে চাহিয়াছে। ফ্রান্সে বেলুনের সাহায্যে আকাশে উড়িবার চেষ্টা বহুবার হইয়াছে—বহু মানুষ ইহাতে প্রাণ হারাইয়াছে; কিন্তু মানুষের উৎসাহ অদম্য—সে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় নাই। অবশেষে ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অরভিল্ রাইট্ এবং উইলবার রাইট্-নামক দুই ভাই তাঁহাদের নিজেদের তৈয়ারী বিমানপোতে উড়িয়া সমস্ত বিশ্বকে চমকিত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম আকাশভ্রমণ মাত্র ১২ সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল এবং উক্ত সময়ে তাঁহারা একশ কুড়ি ফুট ভ্রমণে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইদিনই তাঁহারা আরও তিনবার আকাশে উঠিলেন এবং শেষবার উনষাট সেকেণ্ড আকাশে ছিলেন। মানুষের আকাশবিজয়ের প্রচেষ্টা এতদিনে সফল হইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ২৪½ মাইল এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৭৭½ মাইল আকাশভ্রমণ করেন।

রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাফল্য সমগ্র বিজ্ঞানজগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। সভ্যমানুষ এ বিরাট্ আবিষ্কারকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাইল বটে, কিন্তু তখনও সে ইহার কল্যাণময় রূপকে সঠিক বুঝিতে পারে নাই। বিমানপোত যে কোনদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যানে পরিণত হইবে, এ সম্ভাবনা তখনও সুদূরপরাহত ছিল। ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিকগণ নানাপ্রকার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে ইহার গতিবেগ বাড়িল এবং বর্ত্তমান সময়ে বিমানপোতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রুতগামী এবং সর্ব্বতোগামী যান। আজকাল পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাওয়া অত্যন্ত সহজ হইয়াছে। সকালবেলা আহারাদি সারিয়া কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া অপরাহ্নে দিল্লী পৌছান যায়। পৃথিবীর সকল স্থানেই এখন 'এয়ার-সার্ভিস' খোলা হইয়াছে। আতলান্তিক মহাসাগর অতি অল্পসময়ের মধ্যে আজকাল অতিক্রম করা হয়। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কবহ্যাম, লিণ্ডবার্গ, মলিসন, ডোনাল্ডসন, ক্যারোল ও সিপারের নামই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ডোনাল্ডসন ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ঘণ্টায় ৬১৬ মাইল অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। ক্যারোল ও সিপার একাদিক্রমে ত্রিশ দিন ছয় ঘণ্টা শূন্যে ভ্রমণ করিয়া সমস্ত জগৎকে হতবাক্ করিয়া দিয়াছেন। বিমানপোতের উন্নতি এতদূর হইয়াছে যে কমাণ্ডার বার্ড বিমানে করিয়া দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

শুধু যানবাহনের ক্ষেত্রেই নয়—বিমানপোত আধুনিক যুদ্ধব্যবস্থার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। প্রথম মহাযুদ্ধেই বিমানপোতের ব্যবহার সুরু হইয়াছিল—কিন্তু তখনও ইহার শিশু-অবস্থাই ছিল। প্রথমে সামরিক উপকরণাদি বিমানপোতের সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইত। কিন্তু মানুষের উদ্ভাবনীশক্তি ইহাতেই ক্ষান্ত হয় নাই। বর্ত্তমানে বিমানপোত হইতে বোমাবর্ষণ করা হয় শত্রুপক্ষের উপর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমস্ত লণ্ডনশহর প্রবল বোমাবর্ষণে প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশের লোকেদেরও ইহার স্বল্প অভিজ্ঞতা হইয়াছে কলিকাতায় বোমাবর্ষণের পর। শুধু বোমাবর্ষণই নয় আজকাল দুই পক্ষের বিমানপোতে আকাশ লড়াই পর্য্যন্ত হইতেছে। ইহা হইতে মনে হয় যে ভবিষ্যতের যুদ্ধ বিমানাশ্রয়ী হইবে। নৌযুদ্ধ এবং স্থলযুদ্ধের দিন সমাপ্তির পথে। কারণ মানুষ কিছুতেই সময় নষ্ট করিতে চায় না। তাহাকে যাহা কিছু করিতে হইবে তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। ধীরে সুস্থে সৈন্য সাজাইয়া, হাতীর পিঠে চড়িয়া, বিপুল রণসম্ভার লইয়া যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। উহা আকবরের সময় হয়তো চলিত—কিন্তু বর্ত্তমানকালে অচল। বিলাস করিয়া মরা বা মারা আর তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই সে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যানে চড়িয়া যুদ্ধ করিবে—মুহূর্ত্তের মধ্যে বোমাবর্ষণ করিয়া সমস্ত শত্রুপুরী ছারখার করিয়া দিবে—হয় সে ধ্বংস হইবে, না হয় শত্রুকে ধ্বংস করিবে।

বিমান হইতে বোমাবর্ষণের ফল যে কী রকম মারাত্মক তাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের দেখাইয়াছে। বিমানপোত ধ্বংস করিবার জন্য মানুষ অনেকরকম চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। অতি-অল্প বিমানপোতই বিমানধ্বংসী কামানদ্বারা নষ্ট করা যায়। এই মহাযুদ্ধই ইহা সুপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। বোমা-বর্ষণের ফলে সমগ্র নগর, প্রান্তর সবই নষ্ট হইয়া যায়—উর্ব্বর জমি অনুর্ব্বর হইয়া ওঠে, আর প্রাণহানির তো কোন সীমাই থাকে না। যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও অথর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে জীবনীশক্তির অভাবে অবশেষে মৃত্যুকে আশ্রয় করে। বিমান-যুদ্ধের ফলে সাধারণ নাগরিকদের জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। সামরিক হইতে বেসামরিক ক্ষতি হয় বেশী—সৈন্যবাহিনী হইতে নির্দ্দোষ জনসাধারণ বেশী লাঞ্ছনা ভোগ করে। 'হিরোশিমা'র কাহিনীই ইহার উপযুক্ত প্রমাণ। সভ্যনামধারী মানুষের ইহা বর্ব্বরতম কীর্ত্তি।

আজ বিজ্ঞানের কল্যাণময়ী শক্তি সর্ব্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু মানুষ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু। যে স্বার্থপর—সে চায় অন্যকে দাবাইয়া নিজের উন্নতি, নিজদেশের উন্নতি এবং নিজশ্রেণীর উন্নতি। প্রত্যেকেই আপন আপন উন্নতি চায়, সুতরাং বিরোধ এখানে নয়। বিরোধ উপস্থিত হয় তখন যখন মানুষ অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজের উন্নতির চেষ্টা করে। তাই অন্যকে সংহার করিতে হইবে—অন্যের অধিকার খর্ব্ব করিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমান সভ্যতার স্ব-রূপ। মানুষ সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব—প্রতিদিনই দিকে দিকে বিস্তৃত হইতেছে তাহার বিচিত্র উদ্ভাবনীশক্তি। সে প্রতিদিনই নূতন নূতন সৃষ্টিতে ব্যস্ত। তাহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিরই একটা শুভরূপ আছে—অথচ তাহার স্বার্থপর বুদ্ধি সেই রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাই যাহা হইতে মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রস্তুত হইতে পারিত, তাহা হইতে প্রস্তুত হয় মৃত্যুবিষ। তাই আজ বিমানপোত সামরিক কার্য্যের জন্যই বেশী ব্যবহৃত হয়। মানুষ আজ বিজ্ঞানকে অন্য মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে—অমানুষিক নিষ্ঠুরতা সে দেখাইতেছে তাহার আত্মীয়জনের প্রতি। সভ্যতা-ধ্বংসের জন্য বিমানপোতের ব্যবহার সত্যই অত্যন্ত দুঃখের। বিমানপোতের আবিষ্কার সভ্যজগতের বিরাট্ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু ইহা যদি শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির সৃষ্টিই করে তাহা হইলে ইহার মূল্য কোথায়?

অথচ বিমানপোতকে জগতের শান্তিপ্রতিষ্ঠার কাজে অত্যন্ত ভালভাবে ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমানপোতের উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী; এই বিরাট্ পৃথিবীকে একসূত্রে বাঁধিবার কাজ বিমানপোতই করিতে পারে। ইহা দূরত্ব এবং উচ্চতাকে করিবে অস্বীকার—চিলিদেশের মানুষের সঙ্গে বাঙলাদেশের মানুষের হইবে আলিঙ্গন, সমগ্র পৃথিবী রূপান্তরিত হইবে একটি বিরাট্ পরিবারে। মানুষে

মানুষে বিভেদের প্রধান কারণই হইল একের অন্যসম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা-দূরীকরণ বিমানপোতের দ্বারা সম্ভব। তাই বিমানপোতই ভবিষ্যৎ শান্তির প্রধান বাহক ও অগ্রদূত হইবে—এ আশা করা শান্তিপ্রিয় সুস্থমনা মানুষের অসঙ্গত নহে।

বেতার

বেতার (wireless) নামটির মধ্যে কিছু সত্য ও কিছু মিথ্যা আছে ; সেই কথাই প্রথমে বলিতেছি। প্রেরকযন্ত্রের (transmitter) সাহায্যে প্রেরিত ধ্বনি গ্রাহকযন্ত্রে (receiver) আসিবার সময় পথে টেলিগ্রাফের মত কোন তারকে বাহন করিয়া আসে না। নামটি এই দিক্ দিয়া সার্থক। কিন্তু যন্ত্রে ও উহার বাহিরে সূক্ষ্মস্থূল বহু তারের জটিল সমাবেশ। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে এরিয়াল হইতে হেড্‌ফোন্ বা লাউডস্পীকার পর্য্যন্ত বিচিত্র তারের খেলা। কোথাও একটু কাটিয়া গেলেই যন্ত্র বিকল ; বিনা চিকিৎসায় তাহার মুখ খুলিবে না। বেতার নাম এখানে অর্থহীন।

বেতার উদ্ভাবনসূত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম করা যায় না ; ইহা বহু বৈজ্ঞানিকের বহুবর্ষব্যাপী সাধনার সমষ্টিগত ফল। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল (Clerk Maxwell) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাড়িতচৌম্বিক (electromagnetic) তরঙ্গের অস্তিত্ব গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন। ইহা চব্বিশ বৎসর পরে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হাইনরিখ্‌ হার্তজ্‌ (Heinrich Hertz) তাঁহার ল্যাবরেটরিতে নিজের উদ্ভাবিত সূক্ষ্মযন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গ উৎপাদন করেন। এই তরঙ্গের অপর নাম রেডিওতরঙ্গ। ইতালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনি (Marconi) এই তরঙ্গের ব্যাবহারিক প্রয়োগের দ্বারা সঙ্কেতে সংবাদ আদানপ্রদান সম্ভব করিয়া তুলেন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। পরাধীন বাঙলার বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র স্বাধীন গবেষণায় এই দিকে যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, স্বার্থদুষ্ট ইংরেজ-প্রমুখ পাশ্চাত্য জাতিগুলি আজ তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ইতালীর মার্কনি চাহিবামাত্র সসম্মানে ইংলণ্ডে 'ব্রিটিশ পেটেণ্ট্‌' পাইলেন, আর প্রায় সমকালেই জগদীশচন্দ্রের সাধনা ও সিদ্ধি তাঁহার আপন দেশ ভারতে ইংরেজ-শাসকের উপেক্ষা লাভ করিল! মার্কনি যতদূর করিয়াছিলেন, তাহার উপর বহুমুখ গবেষণার ফলে আজ বেতারের যে আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে মার্কনিরও তাহা ছিল কল্পনার অতীত। তত্ত্বের দিক্ দিয়া বেতার আজ অতীব জটিল হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাল্‌ভ (valve) প্রভৃতির উদ্ভাবনায় যন্ত্রনির্ম্মাণ একহিসাবে সহজসাধ্যই হইয়াছে।

ধ্বনি বায়ুর কম্পন। ইহা ক্রমবিস্তারশীল বৃত্তের আকারে তরঙ্গরূপে চলে। ইহার গতিবেগ সেকেণ্ডে মাত্র এগারশত বিয়াল্লিশ ফুট। চলিতে চলিতে তুর্ব্বল হইয়া অল্পদূরেই ইহা মিলিয়া যায়। কাজেই ইহাকে অবিকৃতরূপে প্রেরণ করা সম্ভব নহে। কিন্তু ঐ বায়ু-তরঙ্গকে যদি বিদ্যুৎ-তরঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার গতিবেগ হয় সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল (ত্রিশ কোটি মিটার); কারণ ইহাই আলোক ও বিদ্যুৎতের তরঙ্গগতির বেগ। ফল হয় এই যে আমেরিকার সেনেট সভায় সভাপতির বক্তৃতা পিছনের বেঞ্চির সদস্যদের শোনার আগেই আমরা কলিকাতায় শুনি আমাদের গ্রাহকযন্ত্রে! সূর্য্যের কাছে যদি বেতারবার্ত্তা পাঠান যায়, আট মিনিটেই সূর্য্যদেব তাহা শুনিয়া ফেলিবেন!

রেডিও-প্রেরকযন্ত্রে এই কাজই করা হয়। মানুষের কণ্ঠ, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতিকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে তড়িৎকম্পনে (oscillation) মিশ্রিত করিয়া এরিয়্যাল-সাহায্যে মহাশূন্যে (space ; æther নয়) প্রেরণ করা হয়। ঐ এরিয়্যাল হইতেই উৎপন্ন চুম্বকচাপ-সহকারে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ শূন্যপথে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এ তরঙ্গ ক্ষীণ ও তুর্ব্বল। আমাদের গ্রাহকযন্ত্র এরিয়্যাল-মারফত উহাকে গ্রহণ করিয়া ভাল্‌ভ্‌ ও অন্যান্য আঙ্গিকের সাহায্যে শক্তিবৃদ্ধি করিয়া লাউড্‌স্পীকারের মুখে উহা বাহির করিয়া দেয়। এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। ধ্বনি তাহার উচ্চতানীচতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই বিদ্যুৎ-তরঙ্গে মিশে। গ্রাহকযন্ত্রের কাজ ধ্বনিকম্পনকে বিদ্যুৎকম্পন হইতে পৃথক্ করিয়া লাউড্‌স্পীকারের মারফত পরিবেষণ করা। বিদ্যুৎকম্পনের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ ; কিন্তু আমাদের কান শুনিতে পায় মাত্র কুড়ি হইতে ষোল হাজার পর্য্যন্ত। ইহা আবার নরমস্বর ও চড়াস্বরের শেষ সীমা ; অনেকের কান এত নীচেও নামে না, এত উচ্চেও উঠে না।

আরও তুইপ্রকার বেতারযন্ত্র সম্প্রতি উদ্ভাবিত হইয়াছে: টেলিভিশন্ (Television) ও র‍্যাডার (Radar)। তুইটিই বেতারজগতে যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমটির সাহায্যে কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বক্তাকেও দেখা যায়। দ্বিতীয়টির সাহায্যে শত্রুবিমানের শুধু আগমন নয়, কোথায় কতদূরে কিভাবে সে রহিয়াছে, তাহাও সহজে ধরা যায়। নাম হইতে ইহার স্বরূপ বুঝা যাইবে: Radar = *R*adio *A*ngle, *D*irection *A*nd *R*ange (R, A, D, A, R প্রথম অক্ষরগুলির যোগফল)।

পৃথিবীর দেশদেশান্তরের ব্যবধান যদি কিছু নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া থাকে, তবে সে বেতারযন্ত্র। বিচিত্র দেশ বিচিত্র ভাষা লইয়া আমাদের গৃহে নিত্য আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছে! সুপ্রয়োগে বেতারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষার বাহনে পরিণত করা যায়। মনীষিগণের চিন্তাধারা, যোগ্য এবং তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারা

দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির সর্ব্বভৌম নিরপেক্ষ আলোচনা রসিকের মুখে চতুঃষষ্টি-কলাবিদ্যার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়, কৌতুক-হাস্য, বিচিত্র সঙ্গীত প্রভৃতির দ্বারা বেতার-কর্ত্তৃপক্ষ অতি-সহজ ও সরল পন্থায় দেশের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন।

কিন্তু সকল দেশেই বেতার সরকারী নিয়ন্ত্রণে বন্দী। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে বেতার আজ সরকারী প্রোপাগ্যাণ্ডার বাহনে পরিণত হইয়াছে। বাঙলার বেতারকেন্দ্র কলিকাতা; কিন্তু দিল্লীর অঙ্গুলিহেলনে তাহাকে উঠিতে-বসিতে হয়, বাঙালার এখানে স্বাধীনতা নাই। তবু উহারই মধ্যে যতটুকু করা যায়, তাহাও অনেক ক্ষেত্রে হয় না, পরিচালকগণের কাহারও কাহারও অযোগ্যতার ফলে অথবা আত্মীয়পোষণের উগ্রলালসায়। যাহার গলা নাই, কণ্ঠ চলে যন্ত্রের বিপরীত মুখে, 'তাল'-তলা দিয়া কস্মিন্‌কালে যাহার গতিবিধি নাই, সেও আমাদের রেডিওশিল্পী! যাহার ভাষাজ্ঞানের অভাব, বিষয়-সম্বন্ধেও ভাসা-জ্ঞান, উচ্চারণ শুধু অশুদ্ধ নয়, কদর্য্য—সেও দাঁড়ায় কলিকাতাকেন্দ্রে মাইক্রোফোনের সম্মুখে। এইসব লইয়া বহু আলোচনা সাময়িকপত্রে হইয়াছে; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। ইউরোপ আমেরিকায় বহু এমেচার (amateur) বেতারকেন্দ্র রহিয়াছে। সরকারের অনুমোদনে এগুলির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা। এ ব্যবস্থার বহুমুখী উপকারিতা আছে। দেশের তরুণতরুণীগণ বিদ্যাটি আয়ত্ত করিবার সুযোগও যেমন পায়, গবেষণাদ্বারা ইহার উন্নতিসাধনেরও সুযোগ তেমনি পায়। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বা সমাজিক কোন ক্ষতি না করিয়া এমেচারগণ স্বাধীনভাবে চিন্তাধারার পারস্পরিক বিনিময়ের দ্বারা আত্মার উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করেন। দেশেরও ইহাতে প্রচুর লাভ। আমরাও আমাদের দেশে এই ব্যবস্থার দাবী করি এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ব্যবস্থার শুভঙ্কর পরিবর্ত্তন চাই।

চলচ্চিত্র—নির্ব্বাক্ ও সবাক্

আজকাল রাস্তায় বাহির হইলেই সর্ব্বপ্রথমে নজরে পড়ে দেওয়ালের গায়ে বড় বড় পোষ্টারগুলি। নানাপ্রকার চিত্র ও কথাসম্বলিত পোষ্টার—নগরের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু পোষ্টারের মিছিল। কোন পোষ্টারে চার্লি চ্যাপলিনের রহস্যঘন হাসি, নীচে লেখা—'মঁসিয়ে ভার্দু—গ্লোব'; কোনটিতে ছবি বিশ্বাস এবং চন্দ্রাবতী দেবীর চিত্র, নিচে লেখা—'দুইপুরুষ—চিত্রা'। শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে যতগুলি চলচ্চিত্র দেখান হয় সকলেরই বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় রাস্তায় রাস্তায় প্রাচীরে প্রাচীরে। শুধু পোষ্টারই নয়, সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় থাকে চলচ্চিত্রের মনোহর বিজ্ঞাপন, চিত্রগুলির বিচিত্র সমালোচনা; নানা চিত্তাকর্ষক ছবিদ্বারা আহ্বান করা হয় মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে।

চলচ্চিত্র বিংশ শতাব্দীর পৌরজীবনে অপরিহার্য্য অঙ্গ। একশ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ নাটক দেখিতে যাইত। মানুষের আনন্দোৎসবে যাত্রা, নাটক, কবিগান ছিল অপরিহার্য্য। আজ এসকলের স্থান লইয়াছে চলচ্চিত্র। বর্ত্তমান মানুষের অনেক কাজ। সে ধীরে-সুস্থে কিছু করিতে পারে না কারণ তাহার সময় নাই। তাহার এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাকে খাইতে, আনন্দ করিতে, কাজ করিতে এবং ঘুমাইতে হইবে। তাই সারারাত্রি জাগিয়া নাটক দেখা তাহার পক্ষে আজ আর সম্ভব নয়। সে কাজ করিবে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম করিবে, আবার কাজ করিবে। সে একস্থানে বসিয়া নাই, ছুটিয়া চলিয়াছে; তাই সারাদিনের কর্ম্ম্যস্ততার পর দুই ঘণ্টার কোন প্রেক্ষাগৃহে গিয়া চলচ্চিত্র দেখিয়া সে মনকে প্রফুল্ল করে। আজ চলচ্চিত্রের আবেদন মানুষের কাছে এত বেশী যে, ছোটবড় প্রত্যেকটি শহরেই প্রেক্ষাগৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্ব্বজনস্বীকৃত।

চলচ্চিত্রকে ইংরেজীতে বলা হয় সিনেমা। সিনেমা শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে 'কিনেম্যাটোগ্রাফ্' হইতে—যাহার অর্থ চলমান চিত্র। সাধারণতঃ ইহাকে 'বায়স্কোপ' এবং 'মুভী'ও বলা হয়। ম্যাজিক-লণ্ঠনেরই ক্রমপরিণতি এই চলচ্চিত্র বা সিনেমা। ইহা হইল কতকগুলি চলমান চিত্রের পর্দার উপর প্রতিফলন। একটির পর আর একটি চিত্র ক্রমাগত পর্দার উপর প্রতিফলিত হইতে থাকে। পর্দার বাহিরে থাকে দর্শক—বিমুগ্ধ নয়নে তাকাইয়া থাকে পর্দার দিকে, উপভোগ করে সুন্দর কাহিনী, যাহা রূপায়িত হইতেছে চলমান চিত্রগুলির মধ্য দিয়া।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'কিনেম্যাটোগ্রাফি' লইয়া বহু গবেষণা চলে। অবশেষে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এডিসন তাঁহার বিখ্যাত 'কাইনেটেস্কোপ' যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এডিসনের পরেও ইহা লইয়া বহু গবেষণা চলে এবং তাহারই ফলস্বরূপ আমরা বর্ত্তমান চলচ্চিত্র লাভ করিয়াছি। ক্যামেরার সাহায্যে আলোকচিত্র লওয়া হয়; গৃহীত চিত্রগুলিকে ঠিকমত সাজাইয়া 'প্রজেক্টারের' সাহায্যে পর্দায় প্রতিফলিত করা হয়। প্রথম প্রথম চলচ্চিত্র নির্ব্বাক্ ছিল অর্থাৎ পর্দায় ছবি দেখা যাইত, কিন্তু কথা শুনা যাইত না। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে 'ফোটো-ইলেক্ট্রিক্' যন্ত্রের সাহায্যে ছবিতে শব্দ গ্রহণ করা সম্ভব হইল—নির্ব্বাক চিত্র সবাক্ চিত্রে রূপান্তরিত হইল। সবাক্ চলচ্চিত্রকে 'টকী' বলা হইয়া থাকে—'টক' করিতে পারে বলিয়া 'টকী'। সবাক্ চলচ্চিত্র সুরু হইবার পর হইতে থিয়েটারের চাহিদা আরও কমিয়া গেল। মানুষের স্বাভাবিক জীবনের অবিকল প্রতিফলন হইল চিত্রে—জীবন্ত মানুষ স্থান পাইল পর্দায় তাহার হাসি, গান, ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব লইয়া।

চলচ্চিত্রশিল্প আজ পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প। প্রতিদেশেই এখন চলচ্চিত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এক দেশের শ্রেষ্ঠ ফিল্ম অন্য দেশে পাঠান হয়, এক ভাষার শ্রেষ্ঠ

চিত্র অন্য ভাষায় অনূদিত হইয়া থাকে। যেখানে চিত্র গ্রহণ করা হয়, তাহাকে ষ্টুডিয়ো বলে। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ষ্টুডিয়ো ক্যালিফোর্নিয়া-রাজ্যের লস্ এঞ্জেলস্ শহরের হলিউড্-নামক একটি শহরতলীতে। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ষ্টুডিয়ো হইল 'বোরহ্যামাউড্'। ভারতবর্ষে বহু ষ্টুডিয়ো আছে। ইহাদের বেশীর ভাগই কলিকাতা, বোম্বাই এবং লাহোরে। 'মেট্রোগোল্ড্ইন মেয়ার', 'টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী ফক্স' প্রভৃতি চিত্র-প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর মধ্যে খ্যাতনামা চিত্রপ্রতিষ্ঠান। ভারতে 'নিউ থিয়েটার্স কোং', 'বেম্বে টকীজ', 'প্রভাত টকীজ' প্রভৃতি চিত্রপ্রতিষ্ঠান সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন চিত্র নির্ম্মাণ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

আমাদের দেশে চিত্রশিল্পের এখনও শিশু-অবস্থা চলিতেছে। কিন্তু এই শিশু অবস্থাতেই ইহা যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। অবশ্য ইহার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। প্রকৃতি যে দেশকে যত বেশী সমৃদ্ধ করিয়াছে, সে দেশ চিত্রগ্রহণের পক্ষে তত উপযোগী। পূর্ব্বে চিত্রশিল্পকে আমাদের দেশে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হইত। ভারতবর্ষ চিরকালই প্রাচীনপন্থী—কোন কিছু নূতনকে গ্রহণ করিতে তাহার বেশ কিছু সময় লাগে। আমরা মনে করিতাম—সিনেমায় যাহারা অভিনয় করে তাহারা অসচ্চরিত্র ও মদ্যপ। হয়তো এখনও আমাদের অনেকেরই ধারণার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্রী হইতে গেলে অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন। চার্লি চ্যাপিলন, রোনাল্ড কোলম্যান, চার্লস বোয়ার, ফ্রেডারিক মার্চ্চ প্রভৃতি অভিনেতার এবং গ্রেটা গার্ব্বো, মার্লিন ডিয়েট্রিচ্, ইন্‌গ্রিড বার্গম্যান প্রভৃতি অভিনেত্রীর অনন্য-সাধারণ প্রতিভা-সম্বন্ধে বিশ্বের কাহারও আজ বোধহয় সন্দেহ নাই। ইহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ অভিনয়দক্ষতা আজ সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। ভারতবর্ষেও আমরা কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছি। শিশির ভাদুড়ী, ৺দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, কানন দেবী, মলিনা দেবী, জয়শ্রী প্রভৃতি চিত্র-জগতে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ইহার কারণই হইল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চলচ্চিত্র-সম্বন্ধে উদাসীনতা। প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষিত নরনারীর চিত্র-জগতে প্রবেশ করা উচিত।

কিন্তু সাম্প্রতিক ভারতীয় চিত্রশিল্পে একটি ব্যাধি দেখা দিয়াছে। যুদ্ধ বহু মানুষকে বহু টাকা জোগাইয়াছে। চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া, উৎকোচ লইয়া বহু মানুষ ধনী হইয়াছে। এই হঠাৎ ধনীর দল তাহাদের অর্থ এখন কোন লাভজনক ব্যবসায়ে খাটাইতে চায়। চলচ্চিত্রের ন্যায় লাভজনক ব্যবসাও আর কিছু নাই। তাই সকলেই নূতন নূতন চলচ্চিত্রের কোম্পানী খুলিতেছে। কিন্তু বিপদ্ ইহাতেও নয়। বিপদ্ হইল যেসব নিম্নশ্রেণীর চিত্র নির্ম্মিত হইতেছে তাহা হইতে। সস্তায় চিত্র

শেষ করিয়া মোটা টাকা লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, বিদেশীর কবল হইতে আমরা সদ্য মুক্ত হইয়াছি; সুতরাং স্বাধীনতাসংগ্রামের কথা দেশের লোকের মনে জাগরূক। ইহাকে আশ্রয় করিয়া আজকাল বেশীর ভাগ ছবিই তোলা হইতেছে। ভারতে স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস বিচিত্র—অনেক সুন্দর চিত্র নির্ম্মাণ করা চলে এই ইতিহাসের সাহায্যে। কিন্তু তাহা করা হয় না—সস্তা দেশপ্রেমের গালভরা বুলি দিয়া চিত্রটিকে ভরাট করিয়া দেওয়া হয় সস্তায় কিস্তিমাৎ করিবার জন্য। গত কয়েক বৎসরের অনেক চিত্রই এ মন্তব্যের পরিচয় বহন করে। তাই কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও যে শ্রেণীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইতে অনেক নিকৃষ্ট ধরণের চিত্র বর্ত্তমানে দেখা যায়।

অথচ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ প্রচুর সম্ভাবনাময়। জাতীয় সরকার যদি ইহা করেন, তাহা হইলে চলচ্চিত্রের প্রভূত উন্নতি করতে পারেন। লোভী প্রযোজকদের হাত হইতে চলচ্চিত্র-শিল্প যদি সরকার নিজের হাতে লইয়া যান, তাহা হইলে অনেক উন্নতি সম্ভব। চলচ্চিত্রের প্রসার বর্ত্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন; কারণ, চলচ্চিত্রকে জাতীয় শিক্ষার অন্যতম প্রধান বাহন করা চলিতে পারে। বিদেশে যেরূপ 'ম্যাডাম কুরী', 'এমিলি জোলা', 'প্রেসিডেণ্ট উইলসন' প্রভৃতি মনীষীদের জীবনকাহিনী লইয়া চিত্র নির্ম্মিত হইতেছে, আমাদের দেশেও সেইরূপ রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, নেতাজী প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী লইয়া চিত্র নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন। জাতীয় সরকার এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়ই ইহা সম্ভব।

বিদ্যুতের কাহিনী (ক. বি. ১৯৫১)

[প্রদত্ত সঙ্কেত:—আকাশে বিদ্যুতের উৎপত্তি—বিদ্যুতের সাধারণ ধর্ম্ম—বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায়—প্রতিভার সহিত বিদ্যুতের তুলনা—বৈজ্ঞানিক যুগে বিদ্যুতের বিবিধ ব্যবহার—উপসংহার, বিদ্যুৎশক্তি ও মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ।]

আকাশের বুকে বাজ-বিজলীর বিচিত্র লীলা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। কালো মেঘের মসীপটে সর্পিল অক্ষরে কি যেন হিজিবিজ সে জ্যোতির্লেখা। ভীম ভৈরব-রবে ঘোষিত হয় অশনিসম্পাত, মুহূর্ত্তে অবসান ঘটে বজ্রাহতের। এই বিপুল অমোঘ শক্তিকে মানুষ বহুযুগ বুঝিতে পারে নাই। তাই বুদ্ধি যেখানে মূঢ় হইয়াছে, কল্পনা সেখানে আপন খেয়ালে কত রূপকথা গড়িয়াছে। দধীচির অস্থিপঞ্জরে রচিত বজ্র; আর তাহা ইন্দ্রের অমোঘ অস্ত্র—ইহাই আমরা যুগযুগান্তর ভাবিয়া আসিয়াছি।

অকস্মাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চপলার মায়ালিখন বৈজ্ঞানিক পড়িয়া ফেলিল। সেদিন মানুষ জানিল যে বিদ্যুৎ আর বজ্র একই উপাদানে গড়া এবং উভয়ের জন্ম মেঘপুঞ্জের গতিবিধির মধ্যে। মেঘের জলবাষ্প নানাকারণে জমিয়া ভারী জলকণায় পরিণত হয়, এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তর হইতে যখন তাহা সবেগে নিম্নে ধাবিত হয়, তখন সেই জলকণায় ও তাহার উর্দ্ধস্তরে একপ্রকার শক্তির উৎপত্তি হয়। ইহাই বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ আবার দুই প্রকারের—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। বিপরীতধর্ম্মা এই দুইয়ের যখন মোক্ষণ ঘটে, তখনই আমরা বিজলীর চমক দেখি এবং মেঘের গুরুগর্জ্জন শুনি। আকাশের তাড়িতপ্রবাহই কখনও কখনও প্রচণ্ড শব্দে ধরাতলে নামিয়া আসে। উহাকেই বলি বজ্রপাত। আকাশের বাজ-বিজুলী আর মেঘের গর্জ্জন—সকলই তাহা হইলে বিদ্যুতের লীলা।

কিন্তু বিদ্যুৎ বস্তুটা কি? কি তাহার ধর্ম্ম? বৈজ্ঞানিকের ভাষায় উহা একপ্রকার শক্তি। প্রকারভেদে উহা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। কোন বস্তুতে ধনাত্মক বিদ্যুতের সঞ্চার হইলে, তাহা ঋণাত্মক বিদ্যুৎবিশিষ্ট অপর বস্তুকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। আবার একই প্রকারের বিদ্যুৎবিশিষ্ট দুইটি বস্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কিন্তু সমপরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন দুইটি বস্তু পাশাপাশি থাকিলে বিদ্যুৎপ্রভাবিত তৃতীয় বস্তুর উপর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কোন ক্রিয়াই হয় না। এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতির সর্ব্বত্র অস্তিত্বসত্ত্বেও বিদ্যুৎশক্তির লীলা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বিদ্যুতের অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রথমেই জ্ঞাতব্য এই যে, বিদ্যুৎ দুই শ্রেণীর—ঘর্ষ-বিদ্যুৎ ও চল-বিদ্যুৎ। ঘর্ষ-বিদ্যুৎ কেবল আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি সঞ্চার করে। চল-বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিতে পারে আলোক, তাপ ও অন্যান্য নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়া। ইতালীর বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ গ্যালভানি সাহেব একদা একটি লবণজলসিক্ত মরা ব্যাঙের গায়ে লোহা ও তামার স্পর্শে এই চল-বিদ্যুতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন এবং বৈজ্ঞানিক ভল্টা সাহেব ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া চল-বিদ্যুতের ধর্ম্মসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম সূত্রনির্দ্দেশ করেন। সেই হইতে অসংখ্য বৈজ্ঞানিকের যুগব্যাপী সাধনায় আজ চল-বিদ্যুতের বিচিত্র ধর্ম্ম ও প্রতিক্রিয়া পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ-শক্তির তারতম্য ঘটিলে উচ্চ হইতে নিম্নে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিতে থাকে এবং প্রবাহ বর্ত্তনীপথে (circuit) বারংবার আবর্ত্তিত হয়। সকল পদার্থের মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ চলে না। তামা প্রভৃতি ধাতু বিদ্যুৎ-পরিবাহী; কাঠ, কাচ প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যুতের অপরিবাহী। বিদ্যুতের প্রভাবে তাপ, আলোক, নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ও চুম্বকশক্তির সৃষ্টি হয়। মোটামুটিভাবে ইহাই বিদ্যুতের সাধারণ ধর্ম্ম।

এইবার বিদ্যুতের উৎপাদনসম্বন্ধে বলিব। গ্যালভানির ব্যাঙ নাচিল যে-কারণে, বিদ্যুতের উৎপাদন হয় ঠিক সেই কারণেই। অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থের

রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াতেই বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটি চীনামাটির পাত্রে ডাইলিউট সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে তামা ও দস্তার দুইটি পাতের এক এক প্রান্ত ডুবাইয়া রাখিয়া অপর প্রান্তদ্বয় তার দিয়া সংযুক্ত করিলে তাহাতে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। এইরূপ বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিবার জন্য নানাপ্রকার সেল (cell) পরিকল্পিত হইয়াছে,কিন্তু এই সকল 'সেল'-দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ পরিমাণে নিতান্ত অল্প। তাই 'ডায়নামো'-নামক যন্ত্রে বিদ্যুৎ-শক্তিকে বহুগুণ বর্দ্ধিত করিবার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান যুগে জলশক্তির সাহায্যেও বিদ্যুৎ-উৎপাদনের অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার হইয়াছে। 'ডায়নামো' চালাইবার জন্য পেট্রোল প্রভৃতি পদার্থের ব্যবহার ব্যয়সাধ্য। জলশক্তি এই পেট্রোল প্রভৃতির অপরিহার্য্যতা দূর করিয়াছে এবং বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহারে ইহা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

আজিকার পৃথিবী বিদ্যুৎ-বিলসিত। অন্তরে বাহিরে বিশ্বমণ্ডলব্যাপী এই অপূর্ব্বশক্তির প্রভাব লক্ষ্য করিলে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে একটি তুলনা জাগে। মনের রাজ্যে প্রতিভা যাহা, বস্তুজগতে বিদ্যুৎ যেন তাহাই। প্রতিভার প্রভাবে অসাধ্য সাধ্য হয়, অজ্ঞতার অন্ধকার হয় দীপ্ত, কল্পনাতীত নূতন বস্তুর ঘটে আবিষ্কার। উহার অলক্ষ্য শক্তি অযুত মানবের চিত্তে সহসা বিপ্লব সংঘটিত করে, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনে সামর্থ্য দেয়, অন্ধের চোখে উদ্ঘাটিত করে বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। এককথায় প্রতিভা এমনই জিনিস যে, উহা যাহা কিছু স্পর্শ করে তাহাকেই সজীব করে। বিদ্যুৎসম্বন্ধে ঠিক একই কথা সত্য। উভয়ই যেন লোকোত্তীর্ণ দৈবী শক্তি। অথচ বৈজ্ঞানিক মত হইল এই যে, প্রতিভা ও বিদ্যুৎ উভয়ই নৈসর্গিক। বস্তুমাত্রই নাকি বিদ্যুৎ-কণিকায় গঠিত এবং এইসকল কণিকার সংখ্যা ও প্রকারভেদে বস্তুর বিভিন্নতা। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির মাত্রা ও প্রকৃতিভেদের মধ্যেও তেমনি প্রতিভার রহস্য নিহিত। আবার যদি বিশ্বাস করি প্রতিভা দিব্যোন্মাদনাজাতীয় অলৌকিক শক্তির আকস্মিক ও দুর্জ্ঞেয় আবির্ভাব, তাহা হইলেও বিদ্যুৎশক্তির সহিত উহার সাদৃশ্য ক্ষুণ্ণ হয় না। বিদ্যুতের আকস্মিক সঞ্চারও অলৌকিক প্রভাবেরই তুল্য। জড়-পদার্থ ইহার প্রভাবে চকিতে সচলতা লাভ করে, স্থাবর জঙ্গম হয়, মূক যন্ত্রে ফুটে বাণী।

তুলনা অবশ্যই প্রমাণ নহে। প্রতিভাকে মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না কিংবা ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতেও পারে না। বিদ্যুৎ কিন্তু মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টার জাতক এবং তাহার যদৃচ্ছ প্রয়োগও মানুষের সাধ্য। আজিকার বৈজ্ঞানিক যুগে তাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাড়িতশক্তির বিপুল উৎপাদন ও বিচিত্র প্রয়োগ সম্ভব হইয়াছে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ভূগর্ভে ও সমুদ্রতলে সর্ব্বত্র চলিতেছে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতির

লীলাখেলা। মহাশূন্যে উড়িয়া যায় বিমানপোত, সাগর-দোলায় দোলে অর্ণবপোত, স্থলভাগে ছোটে মোটরাদি যন্ত্রযান, সমুদ্রগর্ভে বিহার করে ডুবো-জাহাজ। তার-বেতার, রেডিও-রাডার, রঞ্জনরশ্মি ও টেলিভিশন, ট্রাম-ট্রেন, আর বড়ছোট অগণ্য কলকারখানা ইত্যাদি ইত্যাদি—অসংখ্য ক্ষেত্রে তড়িৎ-শক্তির আজ বিচিত্র ও বহুল প্রয়োগ। ঘরে ঘরে আলো আর বিজলীপাখা, 'হীটার', রিফ্রিজারেটার, এমন কি সিগারেট ধরাইবার 'লাইটার' বা দাড়ি কামাইবার 'সেফ্‌টি রেজার'টি পর্য্যন্ত আজ বিদ্যুতের দ্বারা চালিত। ব্যাবহারিক জীবনের সাধারণক্ষেত্রেই শুধু বিদ্যুতের ব্যবহার সীমাবদ্ধ নহে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেও বিদ্যুতের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। আলট্রা-ভায়লেট্ রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা, বৈদ্যুতিক সূচ্যগ্রে অস্ত্রোপচার প্রভৃতি নানান অভিনব বিধান বিদ্যুতেরই অবদান। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের গবেষণাতেও বিদ্যুৎশক্তি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। বস্তু অপেক্ষা অবস্তু শক্তির (energy) শতগুণ উপযোগিতা এই বিদ্যুৎই প্রমাণ করিয়াছে এবং পরমাণু-বিভাগ দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি বিজ্ঞানজগতে এক অচিন্তনীয় নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম পর্য্যায়েই মানুষ আণবিক বোমার ভয়ঙ্কর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিয়াছে—মানবসভ্যতার পরিণতি কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় এখনও হয় নাই। আজিও মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মানুষের আত্মিক বিকাশের উপর। বিদ্যুৎশক্তির অপূর্ব্ব প্রয়োগ মানুষ ভবিষ্যতে কি ভাবে এবং কোন্ পথে পরিচালিত করিবে জানি না। তবে মানুষের মধ্যে পশুটাকে যদি দলন করা সম্ভব হয়, তবে বিভক্ত পরমাণুর বিপুল ভয়ঙ্কর শক্তিও মানবের সেবায় কল্যাণকর্ম্মেই দাসত্বস্বীকার করিবে। আর যদি আজিকার বর্ব্বর হিংসা, পররাজ্য-লালসা ও শোষণতৃষ্ণা অদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে বাড়িয়াই চলে, তবে মানবজাতির নিঃশেষে ধ্বংসও ঘটিবে বিদ্যুৎশক্তিরই চকিতস্পর্শে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের শক্তি লইয়া আবির্ভূত বিদ্যুৎ—মানুষ তাহাকে কোন্ রূপে আবাহন করিবে কে জানে?

যুদ্ধ—প্রাচীন ও আধুনিক

বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মারণাস্ত্রেরও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। মানুষ-হত্যায় যে দেশ যত কোশলী, সেই দেশ বর্ত্তমান মাপকাঠিতে তত সভ্য। প্রতিদিনই নূতন নূতন অস্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সাধারণ মানুষের ভীতির আর শেষ নাই; কারণ, সে জানে এইসব অস্ত্র

তাহার উপরেই প্রয়োগ করা হইবে। মৃত্যুর ভয়াবহতা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে কারণ, স্বাভাবিক মৃত্যুর দিন শেষ হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর একবার নিরস্ত্রীকরণের কথা উঠিয়াছিল—এই যুদ্ধের পরও আবার উঠিয়াছে ; কিন্তু সাধারণ মানুষ এতদিন বুঝিয়াছে যে নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা বিভিন্ন দেশের নেতার একটি বিলাস। যতদিন লোকের লোভ থাকিবে, যতদিন মানুষের শোষণপ্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হইবে না, ততদিন শান্তির আশা করা নিছক মূর্খতা। বর্ত্তমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান বিজ্ঞান; অথচ তাহাকে লইয়াই ছিনিমিনি খেলা হইতেছে —জগতের উন্নতির জন্য তাহাকে নিয়োগ না করিয়া জগতের ধ্বংসের জন্যই তাহাকে ক্রমাগত নিয়োগ করা হইতেছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষের মধ্যে লোভ বিদ্যমান। অন্যকে ধ্বংস করিয়া নিজের উন্নতি করিতে হইবে—মানুষ প্রাচীন সময় হইতে ইহাই স্থিরবিশ্বাসে জানিয়াছে। বর্ব্বরযুগে একে অন্যের মাংস খাইত ; তখন যুদ্ধ হইত একটি মানুষের সহিত আর একটি মানুষের। ক্রমে মানুষ সংঘবদ্ধ হইল ; তখন একদল মানুষ অন্যদলের সহিত যুদ্ধ করিত। ক্রমে এক জাতির সহিত অন্য জাতির, এক দেশের সহিত অন্য দেশের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বর্ত্তমানে এক মতবাদের সহিত অন্য মতবাদের যুদ্ধ ইহারই ক্রমপরিণতি।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বাধিক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে মানুষের প্রকৃতির উপর ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্য হইতে। প্রাচীনকালে যুদ্ধ অর্থে স্থলযুদ্ধই বুঝাইত। যুদ্ধের জন্য কোন স্থান নির্দ্ধারিত হইত ; দুই রাজা আসিতেন তাঁহাদের নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী লইয়া। যুদ্ধ সুরু হইত, আবার শঙ্খঘোষণাদ্বারা সন্ধ্যাবেলা যুদ্ধ বন্ধ হইত। অনেকটা যেন ফুটবল খেলার মত—নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুরু হইল এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হইল। কিন্তু মানুষ ক্রমশঃ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমুদ্র জয় করিল—আরম্ভ হইল নৌযুদ্ধ। জাহাজের উপর কামান বসান হইল —জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষ সুরু হইল সমুদ্রের উপর। বহুকাল যুদ্ধ জল এবং স্থলেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিমানপোতের আবিষ্কার হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধে আকাশ-যুদ্ধের প্রচলন হয়।

শুধু ইহাই নহে—যুদ্ধের আরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যুদ্ধ হইত রাজায় রাজায়—দুই সৈন্যবাহিনীতে। দুই পক্ষেরই অসামরিক জনসাধারণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইত না। কোন সৈন্যবাহিনী বিজিত জনসাধারণকে উৎপীড়ন করিত না। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে ইহা হইত তাহাও নহে—তৈমুরলঙ্গ এবং নাদিরশাহের ইতিহাস অন্যপ্রকার সাক্ষ্য দেয়। তবুও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণের জীবন বিপদ্গ্রস্ত

হইত না। কিন্তু বর্ত্তমানে সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা জনসাধারণই চিন্তিত হয় বেশী; কারণ, তাহারা নিরস্ত্র অথচ অত্যাচার তাহাদের উপরেই বেশী হয়। কখন বিমানপোত আসিয়া বোমা ফেলিয়া যাইবে তাহার কোনই ঠিক নাই। এক নিমিষের মধ্যে সহস্র সহস্র নিরপরাধের জীবননাশ হইবে—কোনপ্রকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করা যাইবে না। বস্তুতঃ ইহাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিরোশিমাতে সংঘটিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী এবং শিশু এক নিমিষে প্রাণ হারাইল—অথচ তাহারা জানিল না তাহাদের দোষ কি। হয়তো ইহাই বর্ত্তমান সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতার স্বরূপ।

প্রাচীন সময়ে যুদ্ধ ছিল একটা বিরাট্ সমারোহের ব্যাপার। উহাকে বিলাস বলা যাইতে পারে। রাজা যুদ্ধে যাইতেন হাতীতে চড়িয়া—সঙ্গে যাইত মহিষীগণ, রাজসভাসদ্‌গণ, নর্ত্তকী এবং সুরা। বিরাট্ একটি মিছিল করিয়া, আনন্দ-উৎসব করিতে করিতে রাজা চলিলেন যুদ্ধ করিতে। দিনের বেলা যুদ্ধ করিলেন, অবসর সময়ে বিলাসব্যসনে মত্ত রহিলেন। বর্ত্তমানকালে যুদ্ধ শুধু যুদ্ধই—যুদ্ধের প্রয়োজনে যাহা কিছু দরকার তাহাই পাওয়া যাইবে যুদ্ধক্ষেত্রে। মানুষের আজ সময় কম; তাই সে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়াছে। সে বৃথা বিলাসব্যসনে সময় নষ্ট করিতে পারে না; তাই তাহার কাছে যুদ্ধ সমারোহের বস্তু নহে।

যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কারের ব্যাপারেও মানুষের এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মানুষ হাতীতে চড়িয়া গম্ভীর চালে যুদ্ধ করিতে পারে না। তাই তাহার জন্য আজ প্রয়োজন বিমানপোত, সাঁজোয়া গাড়ী, দ্রুতগামী যান। বহু প্রাচীনকালে যুদ্ধ চলিত তীর-ধনুক লইয়া, পরে অসি ও খড়্গ হইল প্রধান অস্ত্র। আজ তীর-ধনুকের স্থান লইয়াছে বন্দুক ও কামান। এক মিনিটের মধ্যে ৪৫০ রাউণ্ড গুলী চালান চলে একটি মেশিনগান হইতে। বর্ত্তমান সময়ে মেসিন মানুষের স্থান অধিকার করিয়াছে। হাতী লইয়া যুদ্ধ, অসিযুদ্ধ ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে—ইহাদের স্থান লইয়াছে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ। ব্যক্তিগত বীরত্বের দিন আর নাই।

আজ জল, স্থল এবং আকাশ—কোথাও মানুষের শান্তি নাই। নানাপ্রকার বোমার আবিষ্কার হইয়াছে। যুদ্ধকালে আকাশ হইতে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করা হয়। শত শত গৃহ নষ্ট হয়, হাজার হাজার মানুষের প্রাণনাশ হয়, বিরাট্ কৃষিক্ষেত্রগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ইহারই ফলস্বরূপ যুদ্ধের পরেই যুদ্ধের অভিশাপ লইয়া আসে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করা হইয়াছে—মানুষের ঘরবাড়ী নির্ম্মূল করিয়া দিয়া সৈন্যবাহিনীর জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। সমুদ্রে জাহাজেও মানুষের নিস্তার নাই। সেখানে আছে টর্পেডো ও সাব্‌মেরিনের ভয়। বিরাট্ জাহাজ মাঝসমুদ্রে হয়তো হঠাৎ ডুবিয়া গেল টর্পেডোর আঘাতে। মানুষ পৃথিবীর কোনস্থানে গিয়াই বাঁচিতে পারে না।

কিন্তু ইহাই সব নয়। আধুনিক মানুষ আরও নানা মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে, যাহা আরও ভয়াবহ। মানুষের অপূর্ব্ব সৃজনীপ্রতিভা প্রতিদিনই নূতন নূতন আবিষ্কারে ব্যস্ত। সে নূতন এক যুদ্ধপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে—যাহার নাম সে দিয়াছে 'কেমিক্যাল ওয়ার'। শত্রুদেশে নানাপ্রকার কঠিন রোগের জীবাণু ছাড়িয়া দেওয়াও আজকালকার যুদ্ধরীতির মধ্যে আসিয়াছে। নানাপ্রকার বিষাক্ত গ্যাস শত্রুদেশে ছাড়া হয় এবং পানীয় জলের মধ্যে নানাপ্রকার বিষ মিশানো হয়। ইহা চরম বর্ব্বরতা। কিন্তু ইহাতেই মানুষ ক্ষান্ত নহে। সে কয়েক বৎসর হইল আবিষ্কার করিয়াছে এ্যাটম্ বোমা এবং ডেথ্ রে। এ্যাটম্ বোমার কীর্ত্তিকাহিনী হিরোশিমার ব্যাপারেই জগতে ঘোষিত হইয়াছে। অতি অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে ইহাদ্বারা ধ্বংস করা চলে। ডেথ্ রে-ও এইরূপ একটি আবিষ্কার, যাহা দিয়া এক নিমিষে বহু প্রাণীর জীবননাশ করা যায়। মানুষ এখন মৃত্যুর আরও সংক্ষিপ্ত অস্ত্র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছে। সমস্ত পৃথিবীকে এক নিমিষের মধ্যে ধ্বংস করা যায় কিনা, তাহাই সে জানিতে চাহিতেছে।

মানুষ যে সভ্যতা, শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লইয়া এতদিন গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছে, তাহা সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে যদি না সে নিজের লোভ ও শোষণ-প্রবৃত্তি ছাড়িতে পারে। বর্ত্তমানে মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার দায়িত্ববোধ ঘুচিয়া গিয়াছে। সে নির্লজ্জ পশুর ন্যায় ক্রমাগত হানাহানি করিয়া চলিয়াছে। যে বিজ্ঞানের সাহায্যে সে পৃথিবীর সমূহ উন্নতি করিতে পারে, যাহার সাহায্যে সে পৃথিবীতে শান্তি আনিতে পারে, তাহাকেই সে বিকৃত করিয়া, তাহার অপপ্রয়োগ করিয়া মানবসভ্যতার ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতেছে। যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে, ততদিন সে শুধু নূতন নূতন যুদ্ধপ্রণালী, নূতন নূতন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়া মানবজীবন-নাশের প্রয়াস করিবে। হায় রে সভ্যতা! হায় রে বিজ্ঞান!

নৈসর্গিক

মেঘ ও বৃষ্টি

সূর্য্যকরের খরতাপে বাষ্পীভূত জলকণা অহর্নিশ উর্দ্ধে উঠিতেছে। আকাশের উচ্চস্তরে এই বাষ্পপুঞ্জ শীতলতর বায়ুস্পর্শে আপনা হইতেই অথবা বায়ুচাপ-লাঘবের জন্য শীতলতর হইয়া ঘনীভূত হইয়া যায়। বায়ুস্তরবিলম্বী বায়ুকণা আশ্রয় করিয়া তখন এই ঘনীভূত বাষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং তাহাই সমবেত হইয়া মেঘরূপে আকশতল মেদুর করিয়া তোলে।

মেঘ কখনও স্থিরভাবে কখনও বা পবনচালিত হইয়া সঞ্চরমাণ অবস্থায় দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উভয়ক্ষেত্রেই অবশ্য মেঘ চিরচঞ্চল। কারণ, মেঘসঞ্চিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকণার গতির বিরাম নাই। কণাগুলি দানা বাঁধিয়াই নিম্নাভিমুখে যেমনি নামিতে থাকে, অমনি নিম্নস্থ উষ্ণতর বায়ুস্পর্শে তৎক্ষণাৎ বাষ্পীভূত হইয়া যায়। এই জলবাষ্প উহার স্বভাবসিদ্ধ প্লবতাহেতু আবার উর্দ্ধে উঠে, আবার শীতল হইয়া জলবিন্দুতে পরিণতি লাভ করে, আবার চাহে নিম্নে নামিতে। এইরূপে বারিকণার অবিরাম উচ্চনীচ গতির ফলে আকাশমার্গে মেঘস্তর স্থির বলিয়া প্রতীত হয়।

সাধারণ চক্ষে মেঘের সীমাহীন বৈচিত্র্য কল্পনার রসায়নে রঙীন হইয়া নিত্যনবীন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে কিন্তু মেঘের রূপ নির্দ্দিষ্ট। Cirrus, Cumulus, Stratus ও Nimbus—মেঘ এই চারিপ্রকার মাত্র। ইহাই বিজ্ঞানের মত। প্রায় ২৫,০০০ ফুট উর্দ্ধে আকাশের গায়ে অতিশুভ্র পালকের মত যে মেঘ দেখা যায়, তাহার নাম Cirrus, আর ভূপৃষ্ঠের উপর ৫০০ হইতে ১০,০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত পুঞ্জ পুঞ্জ তূলার মত যে মেঘ দেখা যায়, তাহারই নাম Cumulus। উহা গোলাকৃতি উত্তল-শীর্ষ সমতল-নিম্ন জলবিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত। Stratus মেঘ ভূতল হইতে প্রায় ২,০০০ ফুট উর্দ্ধে এক বিস্তীর্ণ ও ধূসর আনুভূমিক স্তর রচনা করে। Nimbus মেঘের অধিষ্ঠান আনুমানিক ৪,০০০ ফুট উচ্চে। উহা ঘনকৃষ্ণবর্ণ এবং উহারই বর্ষণ হয় অজস্র।

মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রতি মেঘেই বৃষ্টি হয় না। মেঘাশ্রিত জলবিন্দুগুলি যখন একে অন্যের সংস্পর্শে আসিয়া কোনক্রমে দুই-তিনটি বিন্দুতে একত্র হইয়া বৃহত্তর ফোঁটা সৃষ্টি করে, তখনই নামে বৃষ্টি। এ ফোঁটা দ্রুত নিম্নে ধাবিত হয় এবং পথিমধ্যে বিভিন্ন বায়ুস্তরের জলবাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া উহা উত্তরোত্তর বড় হইয়া বৃষ্টির ফোঁটারূপে ভূতলে ধারাসারে নামিয়া আসে।

বৃষ্টির ধারা যে রেখার মত দেখায়, তাহার মধ্যেও একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। আমাদের চক্ষুর উপর বাহ্যবস্তুর ছবিটি যখন ফুটিয়া উঠে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বস্তুটি সরিয়া গেলেও কিছুক্ষণ চোখের উপর তাহা ভাসিতে থাকে। এই কারণে পতনশীল বৃষ্টিফোঁটার অনেকগুলি অবস্থানবিন্দুর ছবি একত্র হইয়া আমাদের চোখে রেখার মত দেখায়।

মেঘ সকল আকাশেই চরিয়া বেড়ায় কিন্তু সকল দেশে সমান বৃষ্টি হয় না। আবার বৎসরের সকল ঋতুতেই মেঘে মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, কিন্তু বৃষ্টি হয় বিশেষ সময়ে। বৃষ্টিপাতের রহস্যটিও তাই অনুধাবনযোগ্য। আমাদের দেশের মেয়েরা বলে, মেঘ নাকি হিমালয়ের ডালপালা খাইতে যায়; ফিরিয়া আসিয়া বর্ষণ করে। আসলে কথাটা মিথ্যা নহে। এদেশে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মৌসুমীবাহিত জলবাষ্প যে মেঘমালা সৃষ্টি করে, তাহাই প্রধানতঃ বৃষ্টির কারণ। এই মেঘ বায়ুতাড়িত হইয়া উত্তরে ধাবিত হয় এবং হিমালয়গাত্রের অরণ্যে প্রতিহত হইয়া দেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। এই দৃষ্টান্ত হইতে আরও একটা সত্য স্পষ্ট হইয়া যায় যে, বৃষ্টিপাতের জন্য অরণ্যরাজির উপযোগিতা যথেষ্ট। যেখানে অরণ্য নাই, মেঘ ধরিবার জন্য যেখানে সমুচ্চ পর্ব্বতের অভাব, সে দেশে বড় একটা বৃষ্টি হয় না। রাজপুতনার মরু অঞ্চলের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার সারা দুনিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয় আসামের অন্তর্গত চেরাপুঞ্জী-নামক স্থানে। ইহার কারণও চেরাপুঞ্জীর অবস্থান-বৈশিষ্ট্য।

সম্প্রতি বৃষ্টিকে মানুষ আপনার ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে। রুশিয়াতে নাকি ইতিমধ্যেই এবিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জিত হইয়াছে। দিনে দিনে আরও কি হয় কে জানে! সুদূর অতীতে একদা মহাকবি মেঘকে বিরহী প্রেমিকের দূতরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন—বিজ্ঞান আজ তাহাকে দাসরূপে মাটিতে নামাইয়া আনিতে চাহে। মেঘের দেশে পরীর রাজ্য বুঝি ভাঙিয়া পড়ে, কল্পনার আকাশচারী অবলম্বনটুকু বুঝি এইবার বিজ্ঞানের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া যায়।

ভূমিকম্প

বিশ্ববিখ্যাত জনৈক বিজ্ঞানী পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ-সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বিশ্বসৃষ্টি জীবনের অনুকূল নহে, বরং জীবনের প্রতি ইহার একটা নিদারুণ তাচ্ছিল্য, এমন কি শত্রুতা রহিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়গুলি দেখিয়া আমাদের মনেও এই সন্দেহ জাগে। বন্যা, ঘূর্ণিবাত্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন মৃত্যুকবলে পতিত হয়, তখন স্বভাবতঃই মনে হয় জীবসৃষ্টি প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে। পৃথিবীর

সৃষ্টিধারার মাঝখানে জীবসৃষ্টি একটা আকস্মিক ঘটনা এবং এই জীবসৃষ্টির প্রতি প্রকৃতির নির্ম্মম ঔদাসীন্য জীবনের প্রতি সৃষ্টির অবাঞ্ছিত মনোভাবেরই পরিচয় প্রদান করে। জনৈক বৈজ্ঞানিক মানুষকে "Freak of Nature" বা সৃষ্টিপরম্পরায় একটা অবাঞ্ছিত প্রাকৃতিক খেয়াল বলিয়াছেন।

পৃথিবীর যে-সকল প্রাকৃতিক সংঘটন করাল রূপ লইয়া পৃথিবীতে ধ্বংসের তাণ্ডবসৃষ্টি করে, ভূমিকম্প তাহাদের অন্যতম। সভ্যতাগর্ব্বিত পৃথিবীর উপর ইহার আবির্ভাব যুগ-যুগসঞ্চিত সভ্যতা-সংস্কৃতি মুহূর্ত্তমধ্যেই ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কত সমৃদ্ধ জনপদ, কত সুন্দর নগরী, কত মানুষ, পশু, প্রাণী প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়ালে ধ্বংস হইয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। যেখানে সুন্দর নগরী বিদ্যমান ছিল, ভূমিকম্পের আঘাতে তাহা ধ্বংস হইয়া ইট-কাঠ-পাথর স্তূপে পরিণত হয়। শস্য-শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়া মরুভূমির সৃষ্টি করে। সভ্যতা-ঋদ্ধ সম্পদের কোন চিহ্নই আর কোথাও থাকে না। মানুষের সহস্র বৎসরের পরিশ্রমে সাধনায় যে সভ্যতা গড়িয়া উঠে, প্রকৃতির নির্ম্মম খেয়ালে এক মুহূর্ত্তেই তাহা মিথ্যা হইয়া যায়।

কিন্তু তবু প্রকৃতি খেয়ালী নয়। প্রত্যেক প্রাকৃতিক সংঘটনের পশ্চাতে কোন অমোঘ নিয়ম কার্য্য করিয়া থাকে। ভূমিকম্পের পশ্চাতেও তেমনি কতকগুলি কার্য্য-কারকসম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভূমিকম্পের স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার ধ্বংসকার্য্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উল্লেখযোগ্য কোন উপায় এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে অহরহঃ বিভিন্ন শিলাস্তরে যে সংকোচন, প্রসারণ ও পরিবর্ত্তন হইতেছে, ভূমিকম্প তাহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে এখনও অত্যুষ্ণ গলিত ধাতু ও নানারূপ খনিজ পদার্থের কার্য্যের ফলে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরভাগে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তাহাতেই পৃথিবীপৃষ্ঠ কাঁপিয়া উঠে। এই কম্পনকেই আমরা ভূমিকম্প বলি।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের সময় পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত গলিত ধাতুস্রোত ভীমবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতশীর্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া থাকে। ইহাকেই অগ্ন্যুৎপাত বলে। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে এই উষ্ণ প্রবাহের যে আলোড়ন, তাহার ক্রিয়ার ফলে চতুর্দ্দিকস্থ অঞ্চল সবেগে কাঁপিয়া উঠে; ইহাও ভূমিকম্পের অন্যতম কারণ বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে বহু পদার্থ রহিয়াছে, তাহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলেও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ আলোড়িত হয়। এই আলোড়নের বেগ ভূপৃষ্ঠেও অনুভূত হইয়া ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

এইজন্যই দেখা যায় পার্ব্বত্য অঞ্চলসমূহেই ভূমিকম্পের প্রকোপ বেশী। জাপান দ্বীপপুঞ্জে আগ্নেয়গিরির বাহুল্যের জন্যই সেখানে নিয়ত ভূমিকম্প হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও ভূমিকম্পপ্রবণ স্থান। আনাতোলিয়ার মালভূমির ভূমিকম্পপ্রবণতা বোধহয় জাপানের পরেই।

ভূমিকম্প দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও অত্যল্পকালের মধ্যেই ইহা ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করে। সামান্য এক মিনিট বা দুই মিনিটের মধ্যে ইহা যে পরিমাণ ধ্বংসের অনুষ্ঠান করে, অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে তত অনিষ্ট সাধিত হয় না। ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্প মাত্র দুই মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল, কিন্তু ধ্বংসের প্রচণ্ডতায় ইহা কত সমৃদ্ধ জনপদ বিনষ্ট করিয়াছে ও কত প্রাণহানি করিয়াছে তাহা হিসাব করা সহজ নহে।

ভূতাত্ত্বিকগণ গবেষণাদ্বারা পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া তাহাদিগকে একটি বলয়-বেষ্টনীর মধ্যে ধরিয়াছেন। এই বেষ্টনী জাপান দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, হিমালয় পর্ব্বত, পামীর গ্রন্থি, আনাতোলিয়ার মালভূমির মধ্য দিয়া ককেশাস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইউরোপে আল্পস্ পর্ব্বত হইয়া জিব্রাল্টার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আমেরিকায় ইহা আন্দিজ-রকি পর্ব্বতশ্রেণী, আলাস্কা হইয়া বেরিং প্রণালী পার হইয়া শাখালিন ও এ্যালিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া জাপানে ভূকম্পন-বেষ্টনীর সহিত মিলিত হইয়াছে ; পৃথিবীর কোথায় ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা জনিবার জন্য মানমন্দিরসমূহে ভূকম্প-লিখন যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই যন্ত্রদ্বারা কোথায় কোথায় ভূকম্পন হয় তাহা জানা যায়।

আধুনিক কালের মধ্যে যে দুইটি বিরাট্ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা আমরা ভূমিকম্পের বিরাট্ সংহারিকা-শক্তির পরিচয় পাই। ১৯৩৪ সালে বিহারে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে যে কত জনপদ ধ্বংস হইয়াছে, কত উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র ঊষর ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কত লোক প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১৯৩৫ সালের কোয়েটার ভূমিকম্পেও অনুরূপ ক্ষতি সাধিত হয়। লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন, আশ্রয়হীন, কেহ বা নিহত, কেহ বা আহত, কেহ বা পিতামাতাকে হারাইয়া, কেহ বা সন্তানকে হারাইয়া যে আর্ত্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল, ভূমিকম্পের বিরাট্ সংহারিকা-শক্তিই তাহার মূলে দায়ী। প্রকৃতির এই বিপর্য্যয়সমূহের বিরাট্ ধ্বংসকারিতার কথা ভাবিলে মনে হয় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী যথার্থ ই সত্য উক্তি করিয়াছেন।

নদী

যে জলরাশি পাহাড়, পর্ব্বত বা হ্রদ হইতে বাহির হইয়া নানা জনপদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তাহাকে নদী বলে। তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশিখরে তুষার গলিয়া বা পর্ব্বত-গাত্রে বৃষ্টির জল জমিয়া নদীর সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জলধারার মিশ্রণে নদী পুষ্ট হইয়া পার্ব্বত্যভূমির উপর প্রবাহিত হয়। বন্ধুর ভূমিতে নদীকে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমনিম্নাভিমুখে পার্ব্বত্যভূমিতে প্রবাহিত হইতে হইতে নদী সহসা সম্মুখবর্ত্তী নিম্নভূমিতে পতিত হইয়া জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। এই গতিতে নদীর সংহারলীলা প্রবল। পথবর্ত্তী শিলাকে শিথিল করিয়া, কোন কোন স্থান ধ্বসাইয়া দিয়া নদী অগ্রসর হইতে থাকে। গিরিখাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় নদী ভীষণ গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করে।

ক্রমনিম্ন গতি অবলম্বন করিয়া নদী পার্ব্বত্যভূমি হইতে সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হয়। সমতলভূমির শিলা অপেক্ষাকৃত কোমল বলিয়া খরস্রোত জলধারায় বিস্তৃততর ও গভীরতর খাত রচনা করিয়া নদী অগ্রসর হয়। এইজন্য সমতল-ভূমিতে নদীর আয়তন বিরাট্। সমতলভূমির উপর প্রবাহিত হইবার সময় নদীকে অপেক্ষাকৃত কম বাধার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া এই অংশে নদীর মধ্যগতি। তরঙ্গসঙ্কুলা হইলেও নদীর সংহারমূর্ত্তি তত প্রবল নয়। এই অংশে নদী বিভিন্ন দেশ হইতে শিলা ক্ষয় করিতে করিতে স্রোতের সাহায্যে ভিন্ন দেশে লইয়া সঞ্চিত করে। নদী যতই নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হয়, ততই ইহার স্রোতের তীব্রতা কমিয়া যায়; বিভিন্ন স্থান হইতে বাহিত শিলা ও পলিমাটি সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করিতে থাকে। ক্রম-সঞ্চিত এই মাটি চড়ার রূপ ধারণ করিয়া ব-দ্বীপ নামে অভিহিত হয়। স্রোতের ধীরতার জন্যই এই গতিতে নদী এইসকল মাটি ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া নদী ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সমুদ্রে প্রবেশ করে। সমুদ্রের সঙ্গে নদীর মিলনস্থলকে নদীর মোহানা বা সঙ্গম বলে।

উৎপত্তিস্থান ও সঙ্গমভেদে নদী সাধারণতঃ দুইপ্রকার। যে-সকল নদী কোন বড় নদী হইতে বাহির হইয়া ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, তাহাদিগকে শাখানদী বলে। আবার কতকগুলি নদী পর্ব্বতে বা হ্রদে উৎপন্ন হইয়া গতিপথে অন্য কোন নদীর সহিত মিলিত হয়, তাহাদের নাম উপনদী।

নদী চির-চঞ্চলা। উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত ইহার অব্যাহত জলধারা কোথাও বাধা মানে না। যেখানে যত বাধা, সেইখানেই সেই

বাধা অতিক্রম করিবার জন্য ইহার উদ্দামতা তত বেশী। উচ্চ হইতে নিম্নে, একদিক্ হইতে অন্যদিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নদী অগ্রসর হয়। জন্মের সঙ্গে যে গতিবেগ সৃষ্ট হয়, সেই গতিবেগই নানা রূপে রূপায়িত হইয়া নানা দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া চিরকাম্য সমুদ্রে আসিয়া শান্ত হয়। অভীষ্টসিদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নদীর যাত্রাপথে শান্তি নাই, ক্লান্তি নাই। অবিরাম চলার মন্ত্রে নদী উদ্বুদ্ধ। এই চলার পথে ধ্বংস হইয়াছে কত প্রাচীন ইতিহাস, সৃষ্ট হইয়াছে কত সমৃদ্ধ নগরনগরী আর জনপদ। একদিকে যেমন ভাঙা, অপরদিকে তেমনি গড়া। সৃষ্টি ও লয়ের এই দ্বৈত অনুশাসন লইয়া নদী ছুটিয়া চলিয়াছে—কোথাও উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে, কোথাও সাবলীল গতি-প্রবাহে, কোথাও বা মর্ম্মরধ্বনিতে। আপনার গতিবেগে কোথাও পর্ব্বতের ভিত্তিকে শিথিল করিয়া, কোথাও বা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া, কোথাও বা শান্ত গ্রাম্য ললনার মত নদী যাত্রাপথে অগ্রসর হয়। এই গতি-বৈচিত্র্যেই নদী সুন্দর, রমণীয়।

নদী যেমন ধ্বংসের নায়িকা, তেমনি সৃষ্টি ও সভ্যতারও ধাত্রী। প্রাচীনকাল হইতে যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেরই সভ্যতা নদীমাতৃক। সভ্যতার আদিকাল হইতে নদী মানব-জীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। নদীমাতৃক দেশসমূহ 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' হইয়া উঠিয়াছে—নদীমাতৃক সভ্যতাও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সিন্ধুনদের তীরে হিন্দুসভ্যতা, নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস্-ইউফ্রেটিসের তীরে বাবিলনীয় সভ্যতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নদীর উদার দাক্ষিণ্যে কোন দেশ শিল্প-সম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আবার কোন দেশে নদীর অভাবে মরুভূমির রিক্ততা লইয়া ঊষর হইয়া রহিয়াছে। নাব্য নদীর তীরে নানা ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, নূতন নূতন শহরের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু যে নদীগুলি নাব্য নয় তাহাদের তীরভূমি বনসঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং মানবসভ্যতা-নিয়ন্ত্রণে নদী যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে তাহা অবিসংবাদিত।

সাধারণতঃ দেখা যায়, বর্ষাকালেই বিভিন্ন নদীর জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পায় ও নদী দুই কূল প্লাবিত করিয়া অগ্রসর হয়। শীতকালে অনেক নদী জলহীন হইয়া পড়ে, আবার কোন কোন নদী জলপূর্ণই থাকে। যে-সকল নদী বরফগলা-জলে পুষ্ট, বৎসরের সকল সময় তাহাতে জল থাকে। কিন্তু অন্যান্য নদী সাধারণতঃ বর্ষার জলধারাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে এবং বর্ষাকালে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া উচ্ছল গতিবেগে তীরস্থিত ভূমি প্লাবিত করিয়া দেশে বন্যার সৃষ্টি করে। কত গৃহ, কত গ্রাম, কত নগর নদীর এই উদ্দাম কবলে পড়িয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই গেল নদীর সংহারশীলতা। অপরদিকে বর্ষার জল সরিয়া যাইবার পর জমিতে যে পলিমাটি সঞ্চিত হয়, তাহাতে আবার উর্ব্বর শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। একদিকে ভাঙা অপরদিকে গড়া—এই লইয়াই নদী চিরকাল প্রবাহিত হইতেছে।

প্রকৃতির সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের মধ্যে নদীর সৌন্দর্য্যে অভিভূত না হইয়াছে এমন লোক বিরল। খরগতিতে নদীর নিম্নপতনে যে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়, তাহা বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে অনুপম। সংহারমূর্ত্তিতে নদী যখন ভীষণা, অকূল পারাবারসদৃশ সেই নদীর ভীষণ সৌন্দর্য্যেও একটা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য মিশ্রিত থাকে। নদীর সাধারণ গতিপ্রবাহ মানুষের মনে আনন্দের সঞ্চার করে।

নদী দেশের সম্পদবৃদ্ধিতেও সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদী অন্যতম অবলম্বন। নদীর গতিবেগে উৎপন্ন জল-বৈদ্যুতের সাহায্যে বহুস্থানে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করিয়া শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে এবং হইতেছে। নদীর উদ্দাম গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নদীধারাকে ভিন্নমুখে পরিচালিত করিয়া নানাদেশ সম্পদশালী হইয়া উঠিতেছে।

নদীর অব্যাহত অপরাজিত জীবনযাত্রার সঙ্গে মানুষের কর্ম্মজীবনের মিল আছে। অভীষ্টসিদ্ধির পথে নদীর এই অব্যাহত, অপরাহত গতির দৃষ্টান্ত প্রত্যেক মানুষকে প্রভাবিত করিতে পারে।

গঙ্গানদীর আত্মকথা

আমি নদী। আপাতদৃষ্টিতে অন্য অসংখ্য নদীর সহিত আমার পার্থক্য কিছুই নাই। তবু ভারতের নদনদীগুলির মধ্যে আমিই সর্ব্বকালে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রজ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিতেছি। ইহার কারণ হয়তো অনেকে জানে না। আমি তাই আজ আমার জীবনকথা তোমাদের সংক্ষেপে শুনাইব।

আমি স্বর্গের প্রসূন, স্বয়ং বিষ্ণুরই বিগলিত ধারা। শুনিয়াছি, এককালে তোমাদের পৃথিবীবাসী এক মুনি মনে করিতেন সঙ্গীতে আর কলহ বাধাইতে তাঁহার সমান পারদর্শিতা আছে। একদা তাঁহার সঙ্গীতে রাগরাগিণীর অবস্থা হইল শোচনীয়। এই মুনি অর্থাৎ নারদের মুখে তাহাদের বিকৃতি কি ভয়াবহ হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য রাগরাগিণীসমূহ বিকলাঙ্গ নবরূপ ধারণ করিয়া পথিপার্শ্বে পড়িয়া রহিল। নারদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ইহা তাঁহারই ত্রুটির ফল; আরও জানিলেন যে স্বয়ং মহাদেব যদি বিশুদ্ধভাবে গান করেন তবেই মাত্র রাগরাগিণীর এই অঙ্গবৈকল্য ঘুচিবে। অমনি নারদ ছুটিলেন মহাদেবের কাছে। মহাদেব তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন, ধরিলেন গান। সেই গান শুনিয়া বিষ্ণুর ভাব হইল, ভাবাবেশে তিনি গলিয়া যাইতে লাগিলেন। বিষ্ণুর পদ-যুগল বাহিয়া নামিল বিগলিত ধারা। এই ধারাই আমি,—আমি গঙ্গা। এইভাবে আমার জন্ম হইলে ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলুতে আমাকে ধরিয়া রাখিলেন। সেইখানেই আমার শৈশব কাটিয়া গেল। দিনে দিনে শৈশবও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কেমন করিয়া তাহা তোমাদের মর্ত্ত্যবাসীর জানা প্রয়োজন নাই। মর্ত্ত্যে যে তোমরা আমাকে দেখিয়াছ তাহা কি করিয়া সম্ভব হইল সেই কথাই শুন।

অতি প্রাচীনকালে সূর্য্যবংশের রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। যজ্ঞের ঘোড়াটি ইন্দ্র লুকাইয়া রাখিলেন পাতালে কপিল মুনির আশ্রমের পাশে। সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে দুনিয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাতালে গিয়া সেই ঘোড়াটি খুঁজিয়া পাইল। তাহারা কপিলকেই অপরাধী ভাবিল এবং তাঁহার উপর একটু অত্যাচার করিল। মুনি তখন রাগিয়া শাপ দিলেন, মুহূর্ত্তে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে ভস্মে পরিণত হইল। তারপর বহু সাধ্যসাধনার পর মুনি বলিলেন, গঙ্গার স্পর্শেই মাত্র এই ষাট হাজার সগরপুত্র জীবন ফিরিয়া পাইতে পারে। বহুকাল কাটিয়া গেল। স্বর্গ হইতে আমাকে কে নামাইয়া আনিবে? অবশেষে সেই বংশেরই ভগীরথ নামে এক পরম তপস্বী রাজা পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারের জন্য কঠোর তপস্যা করিলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আমাকে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু আমি যখন নিম্নে অবতরণ করিব তখন আমার বেগ সহিবে কে? মত্ত দিগ্‌গজ দম্ভভরে সে বেগ-ধারণের জন্য আগাইয়া আসিল কিন্তু সামান্য তৃণখণ্ডের মত সে ভাসিয়া গেল। সকলে প্রমাদ গণিলেন। সৃষ্টি যে ধ্বংস হয়। মহাদেব তখন আমাকে জটায় ধারণ করিলেন এবং তাঁহার জটাজালের সহস্র সূক্ষ্মমুখে আমি সঙ্কীর্ণসূত্রে ভূতলে বিন্দুসরোবরে ক্ষরিত হইলাম।

এইরূপে ভূতলে নামিয়াই আমি হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থান হইতে তোমাদের দেশে প্রবেশ করি। ভগীরথ মঙ্গল-শঙ্খ নির্ঘোষে আমাকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতে থাকেন। পথে এক জায়গায় এক মুনির নাকি আশ্রম পড়িল। বুঝিতে পারি নাই, আমি সম্মুখে যাহা পাই তাহাই ধুইয়া মুছিয়া লইয়া যাই। মুনির আশ্রমেরও ফলমূল সব ভাসাইয়া লইয়া চলিলাম। কিন্তু মুনি তো মুনি নয়, একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। এক গণ্ডূষে আমাকে একেবারে গলাধঃকরণ করিলেন। ভগীরথ আর দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ মুনির অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত মুনির রাগ পড়িল, তিনি আমাকেও মুক্তি দিলেন। মুক্তি পাইয়া আমি তো অন্ধবেগে প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলাম। কিন্তু মুনির দেহ হইতে কোন্ পথে যে বাহির হইলাম খেয়াল নাই। কেহ বলে কান দিয়া, কেহ বলে জানু চিরিয়া মুনি আমাকে মুক্তি দিলেন। সেই জন্যই আমার আর এক নাম হইল জাহ্নবী, কেননা মুনির নাম ছিল জহ্নুমুনি। সে যাহাই হউক, ইহার পর বহুদেশ ও জনপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমি পাতালে প্রবেশ করিলাম এবং সগরবংশের ত্রাণ করিলাম। সেইদিন হইতে এইদিন পর্য্যন্ত আমি ত্রিভুবনময় প্রবাহিত। স্বর্গে দেবতারা আমাকে মন্দাকিনী নাম দিয়াছেন, মর্ত্ত্যে আমি গঙ্গা, পাতালে ভোগবতী।

তোমাদের বৈজ্ঞানিকগণ বড় অবিশ্বাসী। চোখে না দেখিলে, বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাঁহারা কোন কিছুই মানিয়া লন না। এই যুগে তাই আমার

গৌরব অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যুগে যুগে এদেশের মানুষ আমাকে ভক্তি করিয়াছে, আমার স্তব করিয়াছে :—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবন-তারিণি তরল-তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিলাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদ-কমলে ॥"

কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাব ও পরাধীনতার অভিশাপে মোহগ্রস্ত এদেশের একশ্রেণীর মানুষ আমাকে আজ আর তত শ্রদ্ধা করে না। ইংরাজ আসিয়া আমার উপর সেতু গড়িয়াছে, সহস্র বন্ধনে আমার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমার পূতস্পর্শে বঞ্চিত হইয়া তোমাদের কত অঞ্চল মরুপ্রায় হইয়া গেল। তবু চাও আমার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। হা বিধাতা! তোমাদের বৈজ্ঞানিকের ইন্দ্রিয় কতটুকু শক্তি রাখে! আজ যাহা তাহাদের চোখে সাদা আলোর রেখা, কাল তাহাতেই সাতরঙা বর্ণালী দেখে। কিছুদিন বাদে আবার বলে, এই সাত রঙের দুই ধারে আরও অসংখ্য রঙ আছে, যাহা ধরা পড়ে নাই। ভবিষ্যতে শুনিবে আরও কত রকমারী কথা। আসল কথা সত্যের স্বরূপ নিশ্চিত ও চূড়ান্তভাবে উদ্ধার করা তাহাদের সাধ্য নহে। আমার জল অন্য নদীর জলের মত পচিয়া যায় না কেন, বহু বিশ্লেষণেও বৈজ্ঞানিকগণ আজও তাহা ধরিতে পারে নাই। তাহারা আমার দেবমহিমা বুঝে না, বুঝিবে না। তবু তোমাদেরই, তোমাদের দেশেরই একজন বৈজ্ঞানিক আমার 'উৎস-সন্ধানে' অনেক জল্পনা করিয়াছেন। আমি জানি তিনি আমার উৎসে কখনও পৌছানও নাই, তাহার সন্ধানও পান নাই, কেবল মনগড়া কল্পনা দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কাব্য কতটুকু হইল জানি না, কিন্তু সত্য ধরা পড়ে নাই। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে যেখানে বিন্দুসরোবর সেখানে আকাশে-পৃথিবীতে কোলকুলি, সে-স্থান বৈজ্ঞানিক মানুষের অগম্য। কেবল সাধক পুরুষই দৈবী শক্তিবলে সেখানে যাইতে পারে।

যাক, এসব কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমি যে পতিতপাবনী একথা যতকাল তোমরা স্মরণে রাখ ততকালই তোমাদের মঙ্গল। আজ যে ফরাক্কা বাঁধ দিয়া তোমরা বাঙালী আমাকে আবাহন করিতেছ, তাহা তোমাদের শুভবুদ্ধির পরিচায়ক। অবিশ্বাসীর স্পর্শে কলুষিত জনহীন জনপদে আর আমার বহিতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা যে করে না তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি কীর্ত্তিনাশা, সর্ব্বনাশা হইয়া প্লাবনে, ভাঙ্গনে প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করি। তাই বলি, হে বাঙালী! আমাকে এই অবাঞ্ছিত কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া তোমরাও বাঁচ, আমাকেও স্বস্তি দাও।

চরিতকথা-প্রসঙ্গ

ভীষ্ম

মহাভারতে যে কয়টি বলিষ্ঠ চরিত্র স্বতঃই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, ভীষ্ম তাঁহাদের অন্যতম। কুরু-পাণ্ডবের পিতামহ এই বৃদ্ধ আপনার চরিত্রগৌরবে মহাভারতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। অনুকরণীয় কর্তব্যবুদ্ধি, অপরাজেয় বীরত্ব, ধীর বিচারশক্তি, অদম্য মনোবল, অটুট আত্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মজ্ঞান ইঁহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হইয়াছে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই অপরাহত ব্যক্তিত্বের গৌরব লইয়াই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে শৌর্য্য, বীর্য্য, আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—কোথাও এতটুকু মালিন্যের স্পর্শ তাহাতে লাগে নাই। মহাভারতে তাঁহার চরিত্রের যে পরিচয় আমরা পাই, তাহা বীরত্বের গৌরবে যেমন উজ্জ্বল, ক্ষমার মহিমায় তেমনি মহীয়ান্। আদর্শ বীরত্ব, আদর্শ পৌরুষ, আদর্শ মানবত্ব বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, ভীষ্মের চরিত্রে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না।

হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাদেবীর গর্ভে ভীষ্মের জন্ম। গঙ্গাদেবীর সহিত শান্তনুর বিবাহের যে সর্ত্ত ছিল, তাহাতে তিনি গঙ্গাদেবীর কোন কার্য্যে বা ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। গঙ্গাদেবী স্বীয় গর্ভজাত সাতটি সন্তানকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কিন্তু অষ্টম পুত্রকে বিসর্জ্জন দিবার সময় শান্তনু বাধা দিলেন। গঙ্গাদেবীও সর্ত্তভঙ্গের অপরাধে শান্তনুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই অষ্টম পুত্রই ভীষ্ম। মহাভারতে কথিত আছে, ইনি শাপভ্রষ্ট অষ্টবসুর অন্যতম। গঙ্গার পুত্র বলিয়া গাঙ্গেয় নামেও ইনি পরিচিত। কিন্তু তাঁহার বাল্যনাম দেবব্রত।

ভীষ্ম যখন হস্তিনাপুরের যুবরাজ, সেই সময় শান্তনু সত্যবতীনাম্নী পরমাসুন্দরী এক ধীবরকন্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু ধীবর কয়েকটি সর্ত্তে কন্যা-সম্প্রদানে সম্মত হইলেন। এই সর্ত্তানুযায়ী সত্যবতীর পুত্র এবং বংশধরগণকে হস্তিনাপুরের ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উপযুক্ত পুত্রকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করার বিনিময়ে শান্তনু বিবাহে সম্মতি দিতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতার মনঃকষ্টের হেতু জানিয়া চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে পিতার মনস্তুষ্টি করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—পিতার সিংহাসন তিনি কোনদিন দাবী করিবেন না। ইহাতে সত্যবতীর পুত্রের সিংহাসন-প্রাপ্তির পথ সুগম হইলেও, তাহার বংশধরদের রাজপদপ্রাপ্তিসম্পর্কে সন্দেহ থাকিয়া গেল। অতএব দেবব্রত

প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি জীবনে দারপরিগ্রহ করিবেন না। ধীবর আশ্বস্ত হইয়া শান্তনুর হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। চরম আত্মত্যাগের যে জলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিলেন ও যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহার জন্যই তাঁহার নাম হইল ভীষ্ম। ভীষ্ম নামেই তিনি ভারতে সমধিক পরিচিত। পুত্রের আত্মত্যাগে শান্তনু স্তম্ভিত হইলেন ; সন্তুষ্ট হইয়া তিনি ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যুর বর প্রদান করিলেন।

শান্তনুর মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদের অভিভাবকরূপে তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন ও পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহের জন্য তিনি স্বয়ংবরসভা হইতে কাশীরাজের তিন কন্যাকে হরণ কবেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ দেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা অম্বা অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করেন ও পরজন্মে শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মনিধনে সহায়তা করেন বলিয়া মহাভারতে কথিত আছে। ইহার কারণ, অম্বা ভীষ্মকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু কৌমার্য্যব্রতধারী ভীষ্ম সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণকে অন্যায় হইতে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। স্বভাবতঃই তাঁহার আকর্ষণ ছিল ধর্ম্মনিষ্ঠ ও উৎপীড়িত পাণ্ডবদিগের প্রতি। তথাপি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে আমরা ভীষ্মকে কৌরবপক্ষে প্রধান সেনাপতিপদে বৃত দেখি। অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিচার করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে ; বরং ইহাদ্বারা তাঁহার ন্যায়নীতিবোধের পরিচয়ই আমরা পাই। তিনি কুরুবংশের অন্নে পালিত ; তাহাদের চরম বিপদের দিনে কৌরবকে পরিত্যাগ করিলে তাহাতে ধর্ম্মের অপহ্নব ঘটে। ন্যায়নিষ্ঠ ভীষ্ম তাই অন্যায়কারী জানিয়াও কুরুকুলকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে ধর্ম্মনিষ্ঠ পাণ্ডবদিগের জয় অনিবার্য্য ; তথাপি জানিয়া শুনিয়াও তিনি পরাজিতের দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই বৃদ্ধের অমিত পরাক্রমে আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না ; কিন্তু ভীষ্মের পরাক্রমে তাঁহাকেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

যুদ্ধের মধ্যেও অবসরকালে পাণ্ডবগণ তাঁহার শিবিরে নীতিশিক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতেন। পিতামহ ভীষ্ম পরমস্নেহে তাঁহাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতেন। ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী ও কুরুকুলের ধ্বংস যে অনিবার্য্য, ইহা তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই একদিকে তিনি যেমন পাণ্ডবদিগকে উৎসাহিত করিতেন, অপরদিকে দুর্য্যোধনকে অন্যায় পথ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন।

ভীষ্মের পরাক্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পাণ্ডবসৈন্য যখন অস্থির, অর্জ্জুন যখন কোনক্রমে পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া

ভীষ্মকে আক্রমণ করার ব্যবস্থা করা হইল। ভীষ্ম জানিতেন, শিখণ্ডী পূর্ব্বজন্মের অম্বা, নপুংসকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে পাণ্ডবের সহিত মিলিত হইয়াছে। নারীর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ বীরের ধর্ম্ম নহে। অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে শিখণ্ডীকে তাহা আঘাত করিবে। বীরধর্ম্ম রক্ষার জন্য ভীষ্ম অস্ত্রত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ শররাজি তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার নীতি পরিবর্ত্তন করিলেন না। বাণে বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি রথ হইতে ভূমিতে শরশয্যা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পিতার বরে তিনি ইচ্ছা না করিলে মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন স্থর্য্যের দক্ষিণায়ন ; দেহত্যাগের পক্ষে সময় প্রকৃষ্ট নয়। তাই শরশয্যায় অবস্থান করিয়া স্থর্য্যের উত্তরায়ণে তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন। মহাভারতকারের সৃষ্ট এই অপূর্ব্ব চরিত্র আজও বন্দিত হইয়া থাকে।

বুদ্ধদেব

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কপিলাবস্তু জনপদের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁহার বাল্যনাম সিদ্ধার্থ। শাক্যবংশের সন্তান বলিয়া তিনি শাক্যসিংহ নামেও পরিচিত। শৈশবে মাতার মৃত্যুর পর বিমাতা গৌতমী তাঁহাকে লালনপালন করেন। গৌতমীর নামানুসারে তাঁহার অপর নাম গৌতম। কিন্তু বুদ্ধ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। গয়ার বোধিদ্রুমতলে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তিনি উক্ত নাম গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থ নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি আর দশজন বালকের মত ছিলেন না। অন্যান্য বালক যখন খেলাধুলায় মত্ত, তখন তিনি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কি ভাবিতেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের অনাসক্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া গোপানাম্নী এক সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া সংসারের প্রতি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবার আয়োজন করিলেন। কিন্তু বিবাহ-বন্ধন, রাজৈশ্বর্য্য সিদ্ধার্থের অন্তরে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিল না। পথে ভ্রমণ করিতে করিতে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, রোগী ও মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়া সংসারের অনিত্যতা-সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহাকেও একদিন জরাগ্রস্ত হইয়া রোগভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। জরাগ্রস্ত জীবনের বিড়ম্বনা, রোগভোগের অসহ যন্ত্রণা, মৃতের আত্মীয়-পরিজনের মর্ম্মান্তিক ক্রন্দন তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি স্থির করিলেন, মানুষকে জরা, রোগ ও

মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই হইল তাঁহার জীবনের সাধনা। এই সময় এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। রাজৈশ্বর্য্য, সংসারবন্ধনকে তাঁহার সাধনপথের অন্তরায় ভাবিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

২৯ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থ স্ত্রী-পুত্র, সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সংসার ছাড়িয়া চলিলেন। জ্ঞানান্বেষণের জন্য তিনি নানাস্থানে নানা পণ্ডিত, ও সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি গয়ায় বোধিদ্রুম-তলে সুকঠোর তপশ্চর্য্যায় মগ্ন হইলেন। দীর্ঘকাল সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী নামে পরিচিত হইলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য ভারতের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বারাণসীর নিকট মৃগদাব-নামক স্থানে তিনি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নাম হইল বৌদ্ধধর্ম্ম এবং যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং মগধ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে উপনীত হইয়া তত্রত্য রাজন্যবর্গকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ভারতের বহু রাজ্যে এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ রহিল না—চীন, জাপান, ব্রহ্ম, মালয়, যবদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারলাভ করিল।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অহিংসা। সর্ব্বজীবে প্রেম, পবিত্রতা, সংযম, সৎপথ ও অনাসক্তিই জীবের মুক্তির উপায়। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের সারকথা। মানুষ এই অনুশাসন পালন করিলে অনায়াসে জরা প্রভৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। উপবাস, যাগযজ্ঞ প্রভৃতিতে বুদ্ধদেবের বিশ্বাস ছিল না। জন্মান্তর-বাদও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—মানুষ যদি সত্যপথে চলে, সর্ব্বজীবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়, সংযমদ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে, তবে সে পার্থিব দুঃখকষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে; বৌদ্ধধর্ম্মের মোক্ষ-সাধনার চরম পর্য্যায় নির্ব্বাণ। জাতিভেদ-প্রথায় বুদ্ধদেব বিশ্বাসী ছিলেন না। মানুষের মধ্যে ভেদনীতি তিনি স্বীকার করিতেন না।

৪৮৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্য

ধর্ম্মপ্রচারকগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের জীবন, ধর্ম্মের মধ্যে যে গ্লানি ও মালিন্য প্রবেশ করে তাহার নিরাকরণের জন্য উৎসর্গীকৃত। প্রতিষ্ঠিত

ধর্ম্মের অনাচার দূর করিতে গিয়া তাঁহারা সময়ে সময়ে নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন, অথবা নিজের ভক্তি ও প্রেমের উৎকর্ষ দ্বারা লোকচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন শেষোক্ত দলের। তাঁহার প্রেমধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকেই উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচীদেবী। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরে ধর্ম্মভাব উপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবসময়ে বঙ্গদেশের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছিল। সাড়ম্বরে পূজা-অর্চ্চনাদ্বারা লোক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ভক্তিশ্রদ্ধার একান্ত অভাব ছিল। পণ্ডিতগণ তর্কযুদ্ধ লইয়াই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন—প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি কাহারও অনুরাগ ছিল না। তাহা ছাড়া, নূতন রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির ফলে দেশের ধর্ম্মজীবন ও সমাজজীবনে বিপ্লব দেখা দেয় এবং ধর্ম্মান্তরগ্রহণের স্রোত বহিতে থাকে। বাঙালীর জীবনের যখন এই অবস্থা, সেই সময় শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন ও তাঁহার প্রেমভক্তিময় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র বঙ্গ প্লাবিত হইয়া যায়। নূতন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়। বৈষ্ণবগণ মনে করেন, শ্রীঅদ্বৈতের আহ্বানে শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

বাল্যকালে চৈতন্যদেব নিমাই ও বিশ্বম্ভর নামে পরিচিত ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মহাপণ্ডিতরূপে গণ্য হন। অসাধারণ প্রতিভা ও মননশক্তির জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি বিবাহ করেন ও চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া নানাস্থান হইতে ছাত্রগণ তাঁহার নিকট আসিত। তখনকার প্রচলিত রীতি-অনুযায়ী পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইত। নিমাইপণ্ডিতের ক্ষুরধার পাণ্ডিত্যের নিকট বহু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সময় নবদ্বীপ বঙ্গদেশের শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্থলরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নানাদেশ হইতে বিভিন্ন পণ্ডিত আসিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনায় যোগ দিতেন।

নিমাই যখন পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় গমন করেন, তখন ঈশ্বরপুরী-নামক একজন ভক্ত সাধকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সাধকজীবনে ভক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া নিমাইএর ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তিনি গোপালমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর নিমাইপণ্ডিত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। উদ্ধত পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমাইপণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, চক্ষু অশ্রুসিক্ত, মুখে কৃষ্ণনাম, ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশ! নবদ্বীপবাসী সকলেই নিমাইএর এই ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

এই সময় নবদ্বীপের ভগবদ্ভক্ত মুরারি গুপ্ত ও শ্রীবাস প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শান্তিপুর হইতে অদ্বৈত, বীরভূম হইতে নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ—হরিদাস, গদাধর, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভক্তগণ—তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে নাম-সঙ্কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। এই সঙ্কীর্ত্তনই মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার প্রধান অঙ্গ। নবদ্বীপের ধর্ম্মধ্বজী পণ্ডিতগণ নিমাইএর এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইলেন না। জগাই ও মাধাই-নামক দুইজন অনাচারী ব্রাহ্মণতনয় নিত্যানন্দকে বিলক্ষণ প্রহার করিল, কিন্তু নিত্যানন্দ তাহাতে বিচলিত হইলেন না। অবশেষে জগাই-মাধাই শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পরম ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠিল।

মহাপ্রভু এই সময়ে কৃষ্ণ-ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন ও বৃন্দাবনের লীলাগুলি নিজের জীবনে প্রকটিত করিতেন। কৃষ্ণ-প্রেমে তিনি এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, সংসারযাত্রা তাঁহার নিকট বন্ধন বলিয়া বোধ হইল। সংসার পারত্যাগ করিয়া তিনি কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ইহার পর তিনি পুরীতে উপনীত হন ও তথা হইতে দক্ষিণ-ভারতে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত রামানন্দ রায়ের সাক্ষাৎকার হয় ও রামানন্দ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হন।

কিছুকাল পরে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। এই স্থানে রূপ ও সনাতন নামক দুই জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের সহিত তাঁহার মিলন হয়। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের তাৎপর্য্য ইঁহারা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন ও মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ব্যাখ্যান করেন। রূপ ও সনাতনের রচিত গ্রন্থাদি পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাধক ও কবিদিগের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার জীবনের শেষ আঠার বৎসর পুরীধামেই অবস্থান করেন। এখানে তিনি অধিকাংশ সময়ই ভাবে মত্ত থাকিতেন। নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার জীবনে কৃষ্ণ-ভাবের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু এখানে তাঁহার রাধা-ভাব পরিলক্ষিত হয়।

চব্বিশ বৎসর কাল সন্ন্যাসজীবন যাপন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব দেহত্যাগ করেন। তাঁহার লীলাভূমি নবদ্বীপ আজিও বৈষ্ণবদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে পরিগণিত।

মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত ভালবাসারই সুসংস্কৃত রূপ। প্রীতির ভগবন্মুখীনতাই প্রেম এবং আত্মকেন্দ্রিকতাই কাম ঃ

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥"

এ ধর্ম্মে মানুষে মানুষে ভেদ নাই। ক্ষমা, অহিংসা, ত্যাগ, সর্ব্বজীবে দয়া ও ভালবাসা এবং ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি—ইহাই মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলসূত্র। এই

সহজমধুর ধর্ম্মের প্লাবনে শুধু "শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়" নাই, সমগ্র বাঙলা তথা ভারতও ভাসিয়া গিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী

আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হইয়াছিল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের একটি বৈষ্ণব বানিয়া পরিবারে। তাঁহার পিতা রাজকোট রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। গান্ধীজী বাল্যে প্রথম শিক্ষা পান তাঁহার মায়ের নিকটে। জৈনধর্ম্ম তাঁহাদের পরিবারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। তাই মাছমাংস প্রভৃতি আহারের প্রতি একটা বিরাগ তাঁহার স্বভাবগত হইয়া যায়—জীবনযাত্রায় ও সাধারণভাবে তিনি ভক্তি এবং অহিংসার পরিবেশের মধ্যে মানুষ হন। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পাঠের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ডেও তিনি মাছমাংস পরিহার করিয়া নিরামিষ ভোজন করিতেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বোম্বাই শহরে ব্যারিষ্টারী সুরু করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন করেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় তখন ভারতীয়দের প্রতি অত্যন্ত অমানুষিক ব্যবহার করা হইত। গান্ধীজী প্রথম ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন না। তাই বুয়োরযুদ্ধে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া সাহায্য করিলেন। যুদ্ধসমাপ্তির পর তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন সুরু করেন। তাঁহার এ আন্দোলন ব্যর্থ হয় নাই। এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীদের অবস্থা দক্ষিণ-আফ্রিকায় কিছু ভাল হয়। গান্ধীজী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং যুদ্ধে ইংরেজগণকে সাহায্য করেন।

যুদ্ধশেষের পর ইংরেজ সরকার ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে 'রাওলাট্' আইন প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। গান্ধীজী জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 'আবেদন-নিবেদনের' পথে না গিয়া গান্ধীজী আন্দোলন করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করিলেন। ১৯২০ সালে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন সুরু হইল। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী ইহাতে যোগ দিল। গান্ধীজীর আহ্বানে কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সকলেই সাড়া দিল। গান্ধীজীর আদর্শ ছিল অহিংস অসহযোগ। তাই চৌরীচৌরার হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী তাঁহার আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বাধীনতা-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিল।

দুই বৎসর কারাভোগের পর গান্ধীজী কিছুদিনের জন্য রাজনীতির সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন। ১৯২৬ সালে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেশের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। ১৯২৯ সালে পৃথিবীময় আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইল ; দেশে তখন ঘোর অরাজকতা, ঘোর অশান্তি। গান্ধীজী আবার জনসাধারণকে আন্দোলনে আহ্বান করিলেন। আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হইল, সাইমন কমিশন বয়কট করা হইল। গান্ধীজীকে বন্দী করা হইল। ইহাতে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইল। সরকার তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া গান্ধীজীকে মুক্ত করিয়া আপোষ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। তাহারই ফলে গান্ধী-আরুইন্ প্যাক্ট হয় এবং আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ভারতীয় জনতা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। গান্ধীজী ইহার পর লণ্ডনে 'গোলটেবিল' বৈঠকে যান এবং সেখান হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া পুনরায় আন্দোলন সুরু করেন। শীঘ্রই তাঁহাকে আবার জেলে প্রেরণ করা হয়। ভারতের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয়। গান্ধীজী ১৯৩৩ সালের মে মাসে মুক্তি পান এবং ওয়ার্দ্ধা আশ্রমে ফিরিয়া যান। তাঁহার রাজনীতিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবসান ঘটে।

১৯৩৫ সালে ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং সাধারণ নির্ব্বাচন সুরু হয়। জাতীয় কংগ্রেস নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে এবং সিন্ধুদেশ, বাঙলা ও পঞ্জাব ব্যতীত সকল প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি হইতে পদত্যাগ করে। এই বৎসরেই মহাত্মাজী রাজকোটরাজ্যের শাসন-সংস্কারের দাবীতে আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিবাদে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে ইংলণ্ড হইতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ নূতনভাবে আলাপ-আলোচনার জন্য ভারতে আসেন। কংগ্রেস তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং বোম্বাই কংগ্রেসে 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের আগষ্ট আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বন্দী করা হয়।

১৯৪৪ সালে মুক্তি পাইয়া গান্ধীজী মুসলমান নেতা মিঃ জিন্নার সহিত আপোষ করিবার বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থকাম হন। যুদ্ধসমাপ্তির পরেই এদেশে ওয়াভেল সাহেবের আগমন ঘটে। কিন্তু তাঁহার সহিত সমস্ত আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়। আবার সাধারণ নির্ব্বাচন সুরু হয়—বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেস জয়লাভ করে। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস ও লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা দেশে দেশে মড়কের মত ছড়াইয়া পড়ে। এই দাঙ্গাতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যথিত হন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পূজারী মহাত্মা গান্ধী। সাতাত্তর বৎসরের এই বৃদ্ধ একবার কলিকাতা, একবার নোয়াখালী এবং একবার বিহার—এইভাবে শান্তির বাণী লইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকেন। অবশেষে এই নৃশংস আত্মহত্যারোধের উপায়

না দেখিয়া তিনি ভারত-বিভাগে সম্মতি দেন এবং ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। দেশ বিভক্ত হইবার পরও কিন্তু নৃশংস হানাহানি বন্ধ হইল না। পাঞ্জাব ও কলিকাতায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড সুরু হইল। গান্ধীজী তাঁহার শেষ অস্ত্র আমরণ অনশন আরম্ভ করিলেন কলিকাতায়। কলিকাতা শান্ত হইল কিন্তু পাঞ্জাব হইল না। তিনি পাঞ্জাবের পথে যখন দিল্লী আসিয়া পৌছিয়াছেন, তখন দিল্লীতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহাত্মাজী দিল্লীতে শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেশের হিন্দুরা তাঁহার প্রতি রুষ্ট হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি দিল্লীতে আর একবার অনশন করেন। তাঁহার শান্তির বাণী দেশের বহুলোকেরই ভাল লাগে নাই ; কারণ, সাম্প্রদায়িকতার বিষে মানুষ একেবারে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিল। ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ সাল, বেলা ৫ ঘটিকায় এইরূপ এক উন্মাদের হাতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষের জীবনাবসান ঘটে।

মহাত্মাজী বলিতেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। সত্যই তাই—তাঁহার এ কথা হইতে বড় সত্যকথা আর নাই। শুধু জীবন নহে, তাঁহার মরণও তাঁহার বাণী —আজ ইহা অকপট চিত্তে বলা যায়। তাঁহার জীবন-দর্শন, তাঁহার আদর্শ তাঁহার নিজের জীবনে রূপায়িত হইয়াছে ; নিজের জীবন হইতেই তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং সমস্ত জীবন ধরিয়া এই পরীক্ষা চলে। তাই গান্ধীজী তাঁহার আত্মজীবনীর নাম দিয়াছিলেন 'সত্যের পরীক্ষা'। গান্ধীজী অধ্যাত্মবিলাসী, ভক্তিবাদী সাধক ছিলেন—তিনি প্রাধানতঃ ছিলেন কর্ম্মযোগী। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। জীবনের কোন ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার আদর্শলাভের পথ হইল সত্য জীবননীতি। তাহা চিত্তশুদ্ধির নীতি—অহিংসা, অনাসক্তি প্রভৃতি আন্তরিক গুণগ্রামের অনুশীলন এবং কর্ত্তব্যপালন ও ধর্ম্মপালন। চিরকাল তিনি বিশ্বাস রাখিয়াছেন মানুষের শুভবুদ্ধির উপর ; তাই চেষ্টা করিতেন নিজের চিত্তশুদ্ধির দ্বারা অপরের শুভ চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিতে।

মহাত্মাজীর বিশেষ সাধনপদ্ধতি ইহাই—অহিংসার পথে লোকচিত্তজয় ও হৃদয়-পরিবর্ত্তন। বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টও অহিংসার নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা একান্তই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। রাষ্ট্র ও সমাজক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্বে এই নীতি ও আদর্শের প্রচার ও প্রয়োগ আর কেহ করেন নাই। গান্ধীজীর কৃতিত্ব এইখানেই।

মহাত্মাজীর জীবনাবসানে পৃথিবীর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহার আদর্শবাদের বিচার একমাত্র ইতিহাসের দরবারেই সম্ভব, কিন্তু ভারতবাসী তাঁহাকে জাতির জনকহিসাবে চিরকাল স্মরণ করিবে। ভারতের গণচেতনাকে তিনি প্রথম উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—দুইশত বৎসরের সাম্রাজ্যবাদীর চাপে যাহা নিষ্পিষ্ট হইয়াছিল। মহাত্মাজীর পূর্ব্বেও ভারতে বিদ্রোহ হইয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহা ছিল একক-বিদ্রোহ। সমস্ত ভারতবাসীকে একসূত্রে বাঁধা একমাত্র তাঁহার দ্বারাই

সম্ভব হইয়াছে। দরিদ্র, দুঃখী, অর্দ্ধভুক্ত ভারতবাসী তাঁহাকে নতচিত্তে স্মরণ করিবে তাহার একমাত্র মুখপাত্রহিসাবে। যেখানে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার হইয়াছে, সেখানেই মহাত্মাজী পীড়িত জনসাধারণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অন্যায় রোধের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধ সঙ্গিহীন অবস্থায় যেভাবে নোয়াখালীর রাস্তায় রাস্তায় শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার তুলনা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। জীবন-মহাশিল্পের এই অপূর্ব্ব শিল্পীকে ভারত কোনদিন ভুলিতে পারিবে না।

নেতাজী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার দান অসীম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে দুইটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। বৈধ উপায়ে, সংঘাত বাঁচাইয়া, পরিষদের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার একটি আন্দোলনধারা বহিয়া গিয়াছে ; অন্য ধারাটি প্রবাহিত হইয়াছে বিপ্লবের পথে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহে যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল, যে বিপ্লবের ঐতিহ্যকে আরও সুস্পষ্ট রূপ দিয়াছেন কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, সূর্য্য সেন প্রভৃতি বীর যুবকেরা, সেই বিপ্লবকে সার্থক করিয়াছেন নেতাজী তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বারা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের তরুণ হৃদয়ের সম্রাট্—তাঁহার আদর্শ, তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি, তাঁহার হিমালয়ের ন্যায় অটল চরিত্র ভারতের যুবকগণকে প্রেরণা যোগাইতেছে। নেতাজীর অমূল্য মন্ত্র—'দিল্লী চলো' এবং 'জয় হিন্দ'—ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন স্বাধীনতার হোমানলে উদ্দীপ্ত। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে কোন খাদ ছিল না। তাই দেশপ্রেমিক এই কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীকে সমগ্র ভারত অন্তর দিয়া ভালবাসে।

সুভাষচন্দ্র ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার রাজধানী কটকে জন্মগ্রহণ করেন। রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু তাঁহার পিতা এবং প্রভাবতী দেবী তাঁহার মাতা। বাল্যকালে মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভের পর তিনি কটক র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখানে ওটন-নামক একজন ইংরেজ অধ্যাপককে প্রহার করার অপরাধে তিনি কলেজ হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন এবং ১৯২০ সালে আই. সি. এস্. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই সময়

তিনি মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ-সহ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে 'অসহযোগ আন্দোলনের' প্রস্তাব গৃহীত হইবার সংবাদ পাইয়া সুভাষচন্দ্র রাজকীয় পদ হইতে ইস্তফা দেন এবং ভারতে ফিরিয়া আসিয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অবশেষে তিনি দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসেন এবং আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২২ সালে সুভাষচন্দ্র কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৯২৩ সাল হইতে তিনি 'বাংলার কথা'-নামক এক দৈনিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। পরে দেশবন্ধু-পরিচালিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রের সম্পাদনাও করিতে থাকেন। ১৯২৪ সালে 'স্বরাজ্যদল' কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। দেশবন্ধু মেয়র নির্ব্বাচিত হন এবং সুভাষচন্দ্র নিযুক্ত হন চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার।

১৯২৪ সালে ২৫শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্রকে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'-অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন আলিপুর ও বহরমপুর জেলে রাখিয়া তাঁহাকে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত করা হয়। মান্দালয়ে অবস্থানকালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে এবং শরীরে ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১৯২৭ সালের ১৫ই মে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন।

১৯২৭ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩০ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে আবার তিনি কারাবরণ করেন। কারাগারে থাকাকালেই তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ঐ বৎসরই ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৩২ সালে তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ইউরোপ গমন করেন। ইহার পর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিলে সরকার বাধা প্রদান করে। ১৯৩৬ সালের ৮ই এপ্রিল বোম্বাই শহরে পৌছিবামাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৭ সালে ১৭ই মার্চ্চ তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র জাতীয় মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহার পরবৎসর ত্রিপুরী অধিবেশনেও তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই নির্ব্বাচনে তিনি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়াকে ২০৩ ভোটে পরাজিত করেন। কিন্তু নির্ব্বাচনের ফল দেখিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বারজন সদস্য পদত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র নেতাদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে সভাপতির পদ ত্যাগ করিলেন। স্বমতপ্রতিষ্ঠার জন্য এই সময় তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ্চ তিনি তিনি রামগড়ে অনুষ্ঠিত আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ঐ বৎসরই জুন মাসে হলওয়েল্ মনুমেণ্ট অপসারণের দাবী উত্থাপন করেন। সরকার ১৯৪০ সালের ২রা জুলাই ভারতরক্ষা আইনের বলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর হলওয়েল্ মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য আন্দোলন আরও তীব্রভাবে চলিতে থাকে। অবশেষে বাঙলা সরকার হলওয়েল্ মনুমেণ্ট অপসারিত করিতে বাধ্য হন। ঐ বৎসরই ৫ই ডিসেম্বর তাঁহাকে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র স্বীয় বাসগৃহ হইতে রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দিষ্ট হন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঐ সময়ে বাহির হইতে ব্রিটিশকে চাপ দিতে পারিলে ভারতের স্বাধীনতালাভের পথ সুগম হইবে।

ভারতের স্বাধীনতা-ইতিহাসের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সুভাষচন্দ্র প্রবাসী ভারতবাসীদের লইয়া একটি সৈন্যবাহিনী গঠনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯৪২ সালে ব্যাঙ্ককে প্রবাসী ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটি আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ স্থাপন করা হয়। ইহার সভাপতি হইলেন রাসবিহারী বসু। এই সঙ্ঘের পরিচালনায় আজাদ হিন্দ ফৌজ-নামক একটি সামরিক বাহিনীও গঠন করা হইল। ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানী হইতে সিঙ্গাপুরে পৌছেন এবং ৪ঠা জুলাই তিনি আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সকল আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বগ্রহণের পর ঘটনাবলী দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সৈন্যবাহিনীতে বহু যুবক ও যুবতী যোগদান করেন। নারীগণকে লইয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীর নেতৃত্বে "রাণী অব্ ঝান্সী রেজিমেণ্ট" গঠিত হয়। অচিরে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে একটি অস্থায়ী ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। তাঁহাকে রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক করা হইল। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলি এই অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। ঐ বৎসরে ২৩শে অক্টোবর অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ১৯৪৪ সালের ৭ই জানুয়ারী এই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মস্থল বর্ম্মায় স্থানান্তরিত করা হইল। ঐ বৎসর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অস্থায়ী সরকারের সৈন্যবাহিনী আক্রমণাত্মক কার্য্য সুরু করেন এবং ১৮ই মার্চ্চ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতভূমিতে প্রবেশ করেন। কিয়দংশ অধিকার করার পর তাঁহারা তথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই অস্থায়ী সরকার সগৌরবে শাসনকার্য্য চালাইতে থাকে। মে মাসে ব্রিটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ব্রহ্ম দখল করে এবং সেই সময়েই আজাদ হিন্দ সরকারের পতন ঘটে।

ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যান্য সেনাপতি এবং কর্ম্মচারীদের বন্দী করিলেও নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করিতে পারে নাই। সহসা 'জাপানীজ নিউজ এজেন্সী' দেশগৌরব নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিয়া সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট জাপানে এক বিমানদুর্ঘনার

ফলে তিনি নাকি গুরুতররূপে আহত হন। ঐ দিনই মধ্যরাত্রিতে হাসপাতালে তাঁহার নাকি মৃত্যু ঘটে।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসন্তান। ভারতকে বৈদেশিক শক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তিনি আত্মত্যাগের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা ইতিহাসে বিরল। স্বদেশের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শেষজীবনে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাঁহার পন্থার বিচার ইতিহাসের দরবারেই সম্ভব; আমাদের নিকট সুভাষচন্দ্রের ঐকান্তিক দেশপ্রেমই মুখ্য বিষয়। সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমিক ছিলেন—এ সত্য অনস্বীকার্য্য। তাঁহার দেশপ্রেমের তুলনা নাই—দেবদুর্লভ দৃপ্ত প্রেম। সে প্রেম ত্যাগের হোমানলে পরিশুদ্ধ। সুভাষচন্দ্র বীর, তিনি বীরের ন্যায় সম্মান চিরদিনই পাইবেন। স্বাধীন ভারত তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে নম্র হৃদয়ে স্মরণ করিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যে কয়জন কৃতী বাঙালী নয়া বাঙলার গোড়া-পত্তনে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। চরিত্রের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা, কুসুমের মত কোমল হৃদয়বত্তা, ক্ষুরধার ধী-শক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য—সর্ব্বোপরি অপূর্ব্ব মানব-প্রেমের দ্বারা বাঙালীর চিত্তে তিনি স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগে দেশব্যাপী যে নৈতিক অধঃপতনের স্রোত বাঙলার সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল, দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া বাঙলার সমাজ যে পরিণতি গ্রহণ করিতেছিল, সেই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত আদর্শ চরিত্রের একান্ত প্রয়োজন ছিল। চারিদিকের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র মহিমান্বিত চরিত্র ও অসামান্য ব্যক্তিত্ব লইয়া বাঙালী-সমাজকে পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১২২৭ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে বাঙলার এই বরেণ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবীর প্রভাব ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে সুকঠোর দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় ও পরে কলিকাতায় কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। এই সময় গৃহের যাবতীয় কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া—এমন কি রন্ধনকার্য্য, উচ্ছিষ্টসংস্কার করিয়া তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইত। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহার

মনোবলকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। প্রতিবৎসরই তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। অসাধারণ প্রতিভাগুণে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন।

শিক্ষাসমাপনান্তে ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত হন। তথা হইতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। অতঃপর বাঙলা সরকার তাঁহাকে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করেন। সুকঠোর দারিদ্র্য হইতে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেও দীনদরিদ্রের প্রতি সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত এবং তিনি মুক্তহস্তে দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তাঁহার অন্তর ছিল কুসুমের মত কোমল। কাহারও দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। ছাত্রাবস্থা হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি অকাতরে দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর উপাধি তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য, কিন্তু দেশবাসী তাঁহাকে দয়ার সাগর বলিয়াই জানে। বস্তুতঃ 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। নিপীড়িত মানবতার প্রতি তাঁহার প্রাণের আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত বেশী। দানের পাত্র-নির্ব্বাচনে তাঁহার কোনরূপ সংস্কার ছিল না। উচ্চ-নীচ সর্ব্বশ্রেণীকেই তিনি প্রয়োজনমত দান করিয়া গিয়াছেন। বাঙলার বরেণ্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ফরাসীদেশে নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কবির নিকট সাহায্য প্রেরণ করেন। পরহিতব্রত ছিল তাঁহার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কত অসহায় আর্ত্ত ও পীড়িত তাঁহার সাহায্যলাভে ধন্য হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পাণ্ডিত্য অপেক্ষা হৃদয়বত্তাদ্বারাই তিনি দেশবাসীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছেন এবং গণ-মানসে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কবি মধুসূদন বলিয়াছেন ঃ

"বিদ্যার সাগর তুমি বিদিত জগতে,
দয়ার সাগর তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে—দীনের বন্ধু।"

বিদ্যাসাগরের চরিত্রবল ও ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, অনমনীয় মনোবল, নির্ভীক ব্যক্তিত্বদ্বারা তিনি তদানীন্তন বঙ্গসমাজের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। যে আবহাওয়া তখন বঙ্গদেশের নৈতিক গ্রন্থিগুলিকে ছিন্ন করিয়া সমাজে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর ছিলেন তাহার মূর্ত্ত প্রতিবাদ। তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা ও নীতিবোধদ্বারা তিনি বঙ্গ-সমাজে পথের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা এরূপ অনমনীয় ছিল যে, যাহা তিনি একবার ধরিতেন তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। তৎকালীন নীতিবোধহীন বাঙালীর সমাজে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব এক বিস্ময়ের বিষয়।

ঈশ্বরচন্দ্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা নিষ্ঠাবান্ ও রক্ষণশীল। এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্রের মন ছিল প্রগতিশীল। সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে তিনি যে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার মত নিষ্ঠাবান্ রক্ষণশীল বংশের সন্তানের নিকট কেহ তাহা আশা করে নাই। বিধবা-বিবাহপ্রবর্ত্তনে ঈশ্বরচন্দ্র তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। সমাজের নির্ম্মম প্রথাসমূহ উচ্ছেদ করিতে গিয়া তিনি বহুলোকের বিরাগভাজন হইয়াছেন, কিন্তু সমাজের স্বার্থের দিকে তাকাইয়া তিনি ব্যক্তিগত লাভক্ষতিকে তুচ্ছ করিয়াছেন।

সমাজের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধানের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের মধ্যে। সাহিত্য ও সমাজের উন্নতিকল্পে ঈশ্বরচন্দ্র যে অবদান সৃষ্টি করিয়াছেন, বঙ্গসমাজ তাহার দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার রচিত বর্ণপরিচয়, বোধোদয় প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তক, সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ, ব্যাকরণ-কৌমুদী, উপক্রমণিকা প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। বাঙলাভাষার উন্নতির ব্যাপারে তাঁহার স্থান অতীব উচ্চে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বাঙলা গদ্যের রীতি তখন বাঙলাভাষায় নূতন যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। এইজন্য তাঁহাকে বাঙলা গদ্যের জনকরূপে অভিহিত করা হয়।

মাতাপিতার প্রতি ভক্তি ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। মাতাপিতাকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতার মত ভক্তি করিতেন। মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল নদী সন্তরণ করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন তাঁহার আরাধ্য দেবতা। মাতার হৃদয়ের কোমল গুণগুলি তাঁহার চরিত্রে বিকাশলাভ করিয়াছিল।

যে-সকল সদ্‌গুণের মাত্র একটির বিকাশেই মানুষ সাধারণকে ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে আপন আসন প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, তাহার সবগুলিই ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে বিকাশ-লাভ করিয়াছিল। অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াও তিনি নিরভিমান, দরিদ্র হইলেও তিনি দাতা ও সহানুভূতিশীল। কর্ত্তব্যে হিমালয়ের মত দৃঢ় হইলেও তাঁহার অন্তর শিশুর মত কোমল। তাঁহার মনোবল, তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার কার্য্যোদ্যম, তাঁহার সমাজ-হিতৈষণা—সমস্ত কিছু মিলিয়া তাঁহার চরিত্রকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। আজ তাঁহার তিরোধানের দীর্ঘকাল পরেও বাঙালীর হৃদয়ে তাঁহার আসন পূর্ব্বের মত অবিচল রহিয়াছে।

হাজি মহম্মদ মহসীন

পরোপকার ও নিঃস্বার্থ দান করিয়া যাঁহারা দেশবাসীর স্মৃতিতে চিরজাগরূক রহিয়াছেন, হাজি মহম্মদ মহসীন তাঁহাদের অন্যতম। পরহিতব্রত ছিল তাঁহার

জীবনের ধর্ম্ম। যে বিপুল ঐশ্বর্য্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ঐহিক ভোগসুখস্পৃহা তিনি চরিতার্থ করিতে পারিতেন ; কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণ মনীষী ব্যক্তিগত সুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মানব-কল্যাণেই আপনার বিপুল সম্পদ্ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দানে উপকৃত না হইয়াছে এমন দুঃস্থ সমসাময়িক কালে ছিল না বলিলেই চলে। অযাচিতভাবে অজস্র দানের দ্বারা এই মহাপ্রাণ দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

মহসীনের পিতা ফয়জুল্লা ভাগ্যান্বেষণে সুদূর পারস্য হইতে ভারতে আসিয়া হুগলী নগরীতে বসবাস আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সে অর্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। হুগলীর অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী আগা মোতাহারের বিধবা পত্নীকে তিনি বিবাহ করেন। আগা মোতাহার মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি একমাত্র কন্যা মন্নুজানের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান।

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে মহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন। মন্নুজানকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ; মহসীনের প্রতিও মন্নুজানের স্নেহ ছিল অপরিসীম। উভয়ে একসঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ করিতে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া মহসীন কোরান শরীফ শিক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে গমন করেন। অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি অল্পকালের মধ্যেই কোরান শরীফ আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। সংস্কৃতভাষার প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং তিনি সংস্কৃতভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই মহসীনের চরিত্রে ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হয়। কোরান শরীফ পাঠ করিয়া তাঁহার সেই ধর্ম্মভাব পরিপুষ্টি লাভ করে। দেশভ্রমণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র সৃষ্টি-রহস্য জানিবার উদ্দেশ্যে তিনি ত্রিশবৎসর কাল ভারতের বিভিন্ন স্থান, কাবুল, পারস্য, আরব, মিশর, তুর্কিস্তান পরিভ্রমণ করেন ও অবশেষে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ তীর্থ মক্কায় উপনীত হন। মক্কায় ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান করিয়া তিনি পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মন্নুজান মৃত্যুসময়ে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি মহসীনকে দান করিয়া যান। ঐশ্বর্য্যের মোহ যাহাতে তাঁহাকে বিভ্রান্ত না করে সেজন্য মহসীন ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা জানাইতেন। মন্নুজানের বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার নিকট ভারস্বরূপ বোধ হইল। তিনি নিজে মুর্শিদাবাদ রাজসরকারে চাকুরী করিয়া যে অর্থ পাইতেন, তাহাই দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখমোচনের জন্য দান করিতেন। ব্যক্তিগত ভোগসুখের জন্য অর্থলিপ্সা তাঁহার আদৌ ছিল না। ভগিনী মন্নুজানের এই বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।

মানব-সেবার যে পথ তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন, সেই পথেই এই বিপুল সম্পত্তি নিয়োজিত করিয়া মহসীন তাঁহার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। দুঃস্থের দুঃখ-মোচনে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দানে, নিরন্নকে অন্নদানে তাঁহার এই অর্থ ব্যয়িত হইতে

লাগিল। মহসীন দুঃখী ও দুঃস্থগণের অনুসন্ধান করিয়া অযাচিত অজানিতভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই দানধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, দানপাত্র-নির্ব্বাচনে কোনরূপ বৈষম্য তিনি করিতেন না। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-জৈন প্রত্যেককে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। নিজে ছদ্মবেশে নগরে ও পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া দুঃস্থের অনুসন্ধান করিতেন ও সকলের অজ্ঞাতসারে দুঃখীর অভাবমোচনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করিতেন।

ভগিনী-দত্ত বিশাল ঐশ্বর্য্য শুধু যে ব্যক্তিগতভাবে জন-ক্লেশনিবারণে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নহে, বহু জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠান মহসীনের দানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজও লক্ষ লক্ষ মানবের উপকার সাধন করিতেছে। মৃত্যুর ছয় বৎসর পূর্ব্বে মহসীন যাবতীয় সম্পত্তি জনসেবায় দান করেন। হুগলী কলেজ, হুগলীর দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিখ্যাত ইমামবাড়া এই দানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলীর মাদ্রাসার ব্যয়ভারও মহসীন-ভাণ্ডার হইতেই নির্ব্বাহিত হয়।

পবিত্র দানধর্ম্মে আপনার বিষয়-সম্পত্তি নিয়োগ করিয়া মহসীন ঈশ্বরের দীনতম সেবকরূপে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে পুণ্যশ্লোক দানবীর এই মহাপ্রাণ ইহধাম ত্যাগ করেন।

বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও ভোগ-সুখে অনাসক্ত থাকিয়া ও অকাতরে দান করিয়া মহসীন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, বর্ত্তমান জগতে তাহা দুর্লভ। তাঁহার স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, জীবন-যাপনে সংযম ও মিতাচার তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মুসলমান হইলেও তিনি মৎস্য-মাংস স্পর্শ করিতেন না। সমস্ত জীবন তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সহিত চিরকৌমার্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানরাজি ও মানব-হিতৈষণা তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মৌলানা আজাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহম্মদ খইরুদ্দিন সাহেব একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন তেমনি মক্কার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত-দুহিতা। মৌলানা আজাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। কথিত আছে তাঁহাদের একজন সম্রাট্ আকবরের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া নির্ব্বাসিত হন। এই বংশেরই অপর একজন সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে অভিবাদন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কারারুদ্ধ হন। এই স্বাধীনচিত্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া মৌলানা আজাদের ধমনীতেও সঞ্চারিত হইয়াছে। আজাদের শৈশবকাল পুণ্যভূমি আরবদেশেই

অতিবাহিত হয়। শৈশবশিক্ষার অপূর্ব্ব সঞ্চয় তাই উত্তরকালে তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পথ প্রস্তুত করিয়া রাখে। দশবৎসর বয়সে তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তখন আরবী ও উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার অতুলনীয় পারদর্শিতা স্বভাবতঃই বহু গুণী ও জ্ঞানীকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। একাদশ বৎসর বয়সে তিনি একটি কবিতা-সাময়িকী প্রকাশ করিতে থাকেন এবং কবিতা-যুদ্ধে ('মুসাইরা') বহু যশস্বী কবিকেও পরাজিত করিয়া অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে থাকেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সেই আজাদ সাহেব বয়স্কদের উর্দ্দু ও আরবী শিক্ষাদানে ব্রতী হন এবং পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি 'লিয়াহুজ সিদিক'-নামক একটি সাময়িক পত্র সম্পাদন করিয়া গুণিসভায় আপনার পাণ্ডিত্যপ্রভা প্রকাশ করিতে থাকেন।

জীবনের প্রথম অঙ্ক মৌলানা সাহেব সাহিত্যসেবা এবং অধ্যাত্মচর্চ্চাতেই অতিবাহিত করেন। এসময়ের সাধনা তাঁহার নানাপ্রকার সাহিত্যসৃষ্টি, কোরানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়া অপরূপ সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। এসকলের মধ্য দিয়া মৌলানা সাহেবের যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়, তাহার মর্য্যাদাদানে মুসলমান-সমাজও বিলম্ব করেন নাই। ঐশ্লামিক ধর্ম্মাচার্য্যবৃন্দ বার বার তাঁহাকে মুসলমান-সমাজের ইমাম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরুরূপে বরণ করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু বিনয়নম্র পণ্ডিত তাহা সানুনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

মৌলানা সাহেবের রাজনীতি-জীবনের সূত্রপাত হয় বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় হইতে। বিদেশী শাসকের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তখন বিদ্রোহনির্ঘোষ ধ্বনিত হইয়া উঠে তাঁহার সম্পাদিত তৎকালীন 'অল হিলাল'-নামক পত্রিকায়। তারপর রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের বিচিত্র ধারায় মৌলানা সাহেব মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। অহিংসামন্ত্রের এই ঋষির নীতিবাদ স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রাণ মৌলানার চিত্ত জয় করিয়া লয়। তদবধি গান্ধীমন্ত্রের একাগ্র সাধক এই মৌলানা স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত। ভারতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিপদ তিনি একাধিকবার অলঙ্কৃত করেন এবং দেশের অতিশয় সঙ্কটময় কালে সুদক্ষ মন্ত্রণায় তিনি দেশকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করেন।

মৌলানা সাহেবের চরিত্র-মাধুর্য্যের তুলনা সত্যই অতিশয় বিরল। সরল অমায়িক তাঁহার ব্যবহার। বলিষ্ঠ ব্যক্তিতা ও অটুট নীতিবাদ তাঁহাকে সম্ভবতঃ একমাত্র গান্ধীজীর তুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। নিজে অতিশয় নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ও সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বহু উর্দ্ধে।

মৌলানা সাহেবের পাণ্ডিত্য মাত্র আরবী, উর্দ্দু ও কোরান-বিষয়েই সীমাবদ্ধ নহে, ইংরেজী সাহিত্যেও যে তিনি সুপণ্ডিত তাহার অকাট্য প্রমাণ তাঁহার অনেক সাহিত্য-সমালোচনায় স্পষ্ট। তবে ইংরেজী তিনি বলেন না। ইহাকে আমরা

গোঁড়ামি বলি না। স্বজাতিপ্রীতিরই অন্তর্গত এই স্বভাষার প্রতি অনুরাগ এবং বিদেশী ভাষার প্রতি বিরাগকে বলিষ্ঠতার নিদর্শন বলিয়াও বিচার করা চলে।

নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক এই কর্ম্মযোগী বর্ত্তমানে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী। স্বাধীন ভারতের জাতিগঠনের গুরু দায়িত্ব উপযুক্ত হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যৎ ভারত তাঁহারই দৃঢ় পরিকল্পনায় সুগঠিত হইবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বড়দিনের সময় জিন্নার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ী। পিতার প্রথম সন্তান বলিয়া জিন্না সাহেব শৈশব হইতেই যথেষ্ট আদরযত্নের পাত্র ছিলেন। পুত্রকে শিক্ষা-দীক্ষায় আদর্শ করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার পিতার প্রথমাবধি প্রয়াস ছিল। তাই স্বকীয় ব্যবসায়ে অর্থের সাধনায় লিপ্ত না করিয়া বিদ্যার সুমহান্ পথে পুত্রকে তিনি পরিচালিত করেন। করাচীতেই তাঁহার প্রথম শিক্ষার সূত্রপাত। এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে নিছক গ্রন্থকীটের ন্যায় তাঁহার জীবন কাটে নাই। বাহিরের নানাপ্রকার কার্য্যকলাপে তাঁহার প্রতিভা স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। সেই সূত্রে তিনি সুবিখ্যাত দাদাভাই নৌরজীর সংস্পর্শে আসেন। স্বরাজ-মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা এই মহাপুরুষের সংস্পর্শ জিন্না সাহেবের জীবনে যেমনই মহৎ প্রভাব বিস্তার করে, তেমনই মহতের নিকট প্রতিভার সুনিশ্চিত প্রমাণ ধরা পড়ে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জিন্না সাহেব আইনব্যবসা গ্রহণ করেন। কিন্তু অনতিকাল-মধ্যেই তাঁহার পরিবার ভীষণ আর্থিক দুর্য্যোগের সম্মুখীন হয়। আকস্মিক অভাবের তাড়না কিন্তু জিন্না সাহেবের জীবনে সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই আনিয়া দেয়। দৃঢ়ব্রত, একনিষ্ঠ এই নবীন ব্যারিষ্টার অচিরেই আইনজীবীদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের আহ্বান ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নবচেতনার সঞ্চার করিয়াছে। জিন্না সাহেব অনিবার্য্যভাবেই ইহার মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তখন তিনি দাদাভাই নৌরজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

কংগ্রেসের সহিত জিন্না সাহেবের সম্পর্ক প্রথমে নিবিড় আন্তরিকতার মধ্য দিয়াই আরম্ভ হয়। ১৯১০ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মুসলমান প্রতিনিধিহিসাবে তিনি যখন সুপ্রীম লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তখনও তিনি কংগ্রেসের একাগ্র সেবক। আপন সম্প্রদায় ও বৃহত্তর দেশের স্বার্থ যে পরিপন্থী নয়, ইহা তিনি তাঁহার বলিষ্ঠ সাধুতাপূর্ণ কার্য্যক্রমের মধ্যে পূর্ণভাবেই প্রমাণ করেন। মুসলমান জাতিকে প্রথমাবধি তিনি প্রাণ দিয়াই ভালবাসিতেন। মনে রাখা প্রয়োজন

যে কংগ্রেসের মধ্যেও তাঁহার প্রথম বক্তৃতার বিষয় হয় ওয়াকফ্ আলাল-ওলদ্। তারপর যখন মুস্লিম লীগের প্রথম অঙ্কুর ১৯১০ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে স্থায়িভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তখনও দেখি তাঁহার বিচক্ষণ অভিমত সম্পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সত্য না হইলেও, লীগ তখনও জিন্না সাহেবের পরামর্শ না লইয়া কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিত না।

১৯১৫ সালে দেশবরেণ্য গোপালকৃষ্ণ গোখলের মৃত্যুকাল। এই মনীষীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ক্রমে মসীময় হইয়া উঠিতে থাকে। জিন্না সাহেবকে পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের সাধকরূপেই দেখিতে পাই। একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "It is my ambition to become the Moslem Gokhale"; আর সেই গোখলে বলিয়াছিলেন, জিন্নাজীর "freedom from all sectarian prejudice...will make him the best ambassador of Hindu-Moslem unity"। এসময়ে জিন্না সাহেবের মধ্যে যেন এই ভবিষ্যদ্‌বাণীই সার্থকতার পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু এই অগ্রগতি চরম সার্থকতায় রূপায়িত হইবার অবকাশ পাইল না। কংগ্রেস-গৃহীত কতকগুলি নীতি জিন্না সাহেবের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিল। এতদিন মনেপ্রাণে যে কংগ্রেসের সেবা তিনি করিয়া আসিতেছিলেন, আদর্শবিরোধের ফলে তাহার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি শিথিল হইতে লাগিল। এইভাবে একদা সম্পর্কের সম্পূর্ণ ছেদ ঘটিয়া গেল।

তারপর ১৯৩০ হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। যে কংগ্রেস একদা মিত্র জিন্নাজীর বিখ্যাত চৌদ্দদফা দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সেই কংগ্রেসই বিপক্ষ জিন্নাজীর ভারত-বিভাগের কঠোর দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ফলে রাজনীতিকহিসাবে জিন্নাজীর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় মহিমায় মুদ্রিত হইয়া যায়।

কায়েদে আজম বলিয়া মুস্লিম জাতি একবাক্যে যাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিমহিমাই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। এবিষয়ে সরোজিনী নাইডু একটি অতিসুন্দর চরিত্র-চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। এই রচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে উহার মর্ম্মানুবাদই যথেষ্ট বিবেচনা করি। নাইডুর কথায়—জিন্নাজীর মধ্যে অন্তরে ও বাহিরে ছিল আকাশপাতাল ভেদ। দীর্ঘ দেহ তাঁহার মহত্ত্বব্যঞ্জনায় পূর্ণ। শীর্ণ শুষ্ক চেহারায় কেমন একটা অবসন্ন ভাব। অভ্যাস তাঁহার বিলাসবহুল; ক্ষীণ অবয়ব অসামান্য জীবনীশক্তি ও সহিষ্ণুতার যেন প্রচ্ছন্ন কোষ-স্বরূপ। ব্যবহারে তিনি কিছু আচারনিষ্ঠা ও খুঁটিনাটির পক্ষপাতী; গর্ব্বোদ্ধত প্রকৃতি যেন কিঞ্চিৎ আত্মসমাহিত। স্ত্রীলোকের মত কোমল ও সহজ অনুভূতিশীল তাঁহার হৃদয়। বালকের ন্যায় চিত্তাকর্ষক তাঁহার প্রভাব। অতিশয় যুক্তিপ্রবণ, বাস্তববাদী, নিরাবেগ ও পরিচ্ছন্নবুদ্ধি এই ব্যক্তিটি

স্বকীয় জীবনবাদ এবং স্থিরপ্রজ্ঞা ও সাম্যের আবরণে একটা লজ্জানম্র অত্যুচ্চ আদর্শবাদ যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই পরলোকগত কায়েদে আজম জিন্নার সত্য রূপ।

রবীন্দ্রনাথ (ম. প. ১৯৫৫)

রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর প্রতিভা। পৃথিবীতে যে মুষ্টিমেয় মানুষের আবির্ভাব ইতিহাসের চিরস্মরণীয় ঘটনা, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম ক্ষণজন্মা দিব্যপুরুষ। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এমন 'সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা ও কর্ম্মসিদ্ধিমতী সাধনা'র পরিচয় বিরল। রবীন্দ্রনাথের জাতি বলিয়া আমরা আজ পৃথিবীর নিকট মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি। বিশ্ব সংস্কৃতিতে তাঁহার দান অসীম। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ, প্রত্যেকটি জাতি আজ রবীন্দ্রনাথকে বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ভারতবাসীর তিনি কেবল মহাকবি বা দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাহার আত্মার আত্মীয়; তাহার সুখদুঃখ, আশা-আকাজ্ক্ষা সবকিছু রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গানে, নাটকে এবং উপন্যাসে।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সালে (৭ই মে, ১৮৬১) রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। ঠাকুর-পরিবার বাঙলাদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি-সম্পন্ন পরিবার। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে এই পরিবারের দান অসামান্য। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু স্বপ্নবিলাসী বালক কিছুতেই বিদ্যালয়ে যাইতে চাহিত না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিশোর রবীন্দ্রনাথকে লইয়া ভারতবর্ষের বহু স্থান পর্য্যটন করেন; পাঠ্যপুস্তক হইতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণে আনন্দ ছিল অধিক; কিশোর বয়সেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮৭৮ সালে তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠান হয় এবং তথায় তিনি ব্রাইটন স্কুলে ভর্ত্তি হন। উনিশ বৎসর বয়সে শিক্ষা সমাপন না করিয়াই তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং কাব্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৩ সালে মৃণালিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৮৮৮ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে তাঁহার কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল কাব্যেই তাঁহার প্রতিভা সীমাবদ্ধ রহিল না—ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ এবং উপন্যাসও লেখা চলিতে থাকিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কেবল সাহিত্যক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখিলেন না। জীবনকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি

করিবার জন্য এবং অভিজ্ঞতারাশির দ্বারা নিজের মনকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য তিনি দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন তিনি 'আদি ব্রাহ্মসমাজের' নেতৃত্ব করিলেন ; কিছুদিন 'ভারতী' ও 'বঙ্গদর্শন'-নামক দুইটি বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদনা করিলেন। বাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ১৮৯৬ সাল হইতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

১৯০১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় স্থাপনা করিলেন। ১৯০২ সালে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। ইহার পর একটির পর আর একটি বিপদ্ তাঁহার জীবনে আসিতে লাগিল। ১৯০৪ সালে তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যু হইল। ১৯০৫ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দেহাবসান ঘটিল এবং ১৯০৭ সালে কবি তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানকে হারাইলেন। কবির মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা গভীরভাবে কাব্য-চর্চ্চায় ব্রতী হইলেন।

১৯১২ সালে তিনি তৃতীয়বার ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার কবিতার যথেষ্ট সমাদর হয়। বিখ্যাত আইরিশ কবি ইয়েট্স কবির গীতাঞ্জলি পড়িয়া মুগ্ধ হন। পরবৎসর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। সমগ্র এশিয়ায় তিনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হন। মহাকবির প্রতিভা বিশ্বে স্বীকৃত হইল।

১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজ সম্রাট্ 'নাইট' উপাধি দান করেন ; ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই যুদ্ধের ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিচলিত হইলেন। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালা-বাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহার দেশবাসীর উপর এইরূপ বর্ব্বর অত্যাচার অসহনীয় হইল। তাঁহার দুঃসহ মর্ম্মদাহের বিবরণ পরবর্ত্তী জীবনে তিনি দিয়াছেন : "জানো, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ ব্যাপারের সময়, তখনও ভাল করে খবর পৌছায়নি। আমি বোধহয় চৌধুরীদের ওখান থেকে খবর পাই, ভাল করে মনে নেই। শুনে সে কি প্রবল কষ্ট, অসহ্য কষ্ট হয়েছিল, তা আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হতে লাগল—এর কোনো উপায় নেই ? কোনো প্রতিকার নেই ? কোনো উত্তর দিতে পারব না ? কিছুই করতে পারব না ? এও যদি নীরবে সইতে হয়, তা হ'লে জীবনধারণ যে অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।" দেশবাসীর এই ঘোর অপমানে তাঁহার যথাসাধ্য তিনি করিলেন। ১৯১৯ সালের ৩০শে মে বাঙলার কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইল ধিক্কার। তিনি বাণী দিলেন দেশবাসীর রুদ্ধ বেদনাকে—ইংরেজের দত্ত 'নাইটহুড' তিনি প্রতিবাদস্বরূপ ত্যাগ করিলেন। একখানি বিরাট্ পত্র লিখিলেন ভাইস্‌রয়কে—তাহার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিল অপূর্ব্ব দেশপ্রেম এবং বর্ব্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা। রবীন্দ্রনাথের এই পত্র আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিবৃত্তে এক অবিস্মরণীয় ব্যাপার।

১৯২০ সালে তিনি চতুর্থবার ইংলণ্ডে গমন করেন। বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে 'বিশ্ব-ভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালে তিনি চীন, জাপান এবং দক্ষিণ-আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি ইউরোপে গমন করেন এবং তথায় ফ্যাসিজ্‌মের তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৩০ সালে তিনি রাশিয়ায় যান এবং তথাকার সমাজব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা এবং শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া বিস্মিত হন। ১৯৩৮ সালে জাপানের ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া জাপানী কবি নোগুচীকে পত্র লেখেন। ১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'ডি. লিট.' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৪১ সালে ৭ই আগষ্ট বাঙলা ২২শে শ্রাবণ, রাখীপূর্ণিমার দিন তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার কোন বিচার সাধারণের দ্বারা সম্ভব নহে। মহাকবির ছিল অসামান্য সৃজনীপ্রতিভা—দিকে দিকে তাহার আলোক বিস্তৃত হইয়াছে। কাব্যে, গানে, নাটকে, উপন্যাসে—কোথাও তাঁহার তুলনা নাই। এত বড় কবি, এত বড় সংস্কৃতিকর্ম্মী বোধহয় পূর্ব্বে পৃথিবীতে কখনও দেখা যায় নাই। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন; জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিভা এতটুকু মলিন হয় নাই। তাঁহার কাব্যরীতি, পদবিন্যাস, অলঙ্কার, ধ্বনি, রস—সকলই অসামান্য। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে কোথায়ও থামেন নাই—অবিশ্রাম রচনা করিয়াছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং সমালোচনা। তাঁহার জীবন এবং কাব্যচর্চ্চা উভয়কে থামাইতে পারিয়াছে একমাত্র মৃত্যু।

তাঁহার কাব্যরাশির মধ্যে প্রত্যেকটিই অনবদ্য। কোনটিকেই অন্য আর একটি হইতে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। 'মানসী', 'চিত্রা', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'প্রান্তিক', সেঁজুতি', 'রোগশয্যা', 'শেষলেখা'—প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থই তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করিতেছে। উপন্যাসও তিনি লিখিয়াছেন প্রচুর। 'গোরা', 'চোখের বালি', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে অমর স্থান অধিকার করিয়াছে। নাটক এবং ছোট গল্পও তিনি বহু লিখিয়াছেন। ছোট গল্প তাঁহার এক মহীয়সী কীর্ত্তি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের দরবারে তাঁহার ছোটগল্পের আসন সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান সভ্যতার দুষ্টব্রণ তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল—এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। তাই তাঁহাকে বিশ্বের জনতা সর্ব্বদা নিজের সঙ্গে পাইয়াছে। সোভিয়েট রুশ ব্যতীত অন্য কোন দেশের কোন সাহিত্যিককে এত তীব্র কণ্ঠে ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে শুনা যায় নাই। যেখানে অত্যাচার হইয়াছে, যেখানে অনাচার ঘটিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন ছুটিয়াছে সেইখানে। জাপানের চীনদেশ-আক্রমণকে বারংবার তিনি ধিক্কৃত করিয়াছেন। পরাধীনতার তীব্র গ্লানি তিনি অনুভব করিয়াছেন চিরদিন—তাই বারংবার

দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন সংগ্রামে। জীবনের সায়াহ্নে তাই বিশ্ববাসীর নিকট যে বাণী তিনি প্রেরণ করিলেন, তাহা 'শান্তির ললিত বাণী' নহে—তাহা সংগ্রামে প্রস্তুতির জন্য শেষ আহ্বান।

স্বামী বিবেকানন্দ (ম. প. ১৯৫২)

উত্তর কলিকাতার সিমলা অঞ্চলস্থিত বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। কাশীর বিশ্বনাথের নিকট বহু সাধ্যসাধনার পর তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া প্রথমে তাঁহার নাম হইল বিশ্বেশ্বর। কিন্তু বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইবার সময় বিশ্বেশ্বর নামের স্থলে নরেন্দ্রনাথ লেখানো হয়। নরেন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই তাঁহার অসাধারণত্ব নানাদিক্ দিয়া প্রকাশ করিতেন। মাতার নিকট রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীগুলি এবং বাঙলা বর্ণমালা তিনি অনায়াসে শিখিয়া ফেলেন। তবু লেখাপড়ায় তথাকথিত খুব ভাল ছেলে অবশ্য তিনি ছিলেন না। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি সকলকেই মুগ্ধ করিত। নরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে প্রবেশিকা পাশ করিয়া জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজ হইতে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। কলেজে পাঠকালে একবার তিনি বিখ্যাত মনীষী হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রেরণ করেন। স্পেন্সার নরেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানানুশীলনে অশেষ উৎসাহ দিয়া পত্র লেখেন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য বিবেকানন্দের জন্ম হয় নাই। তাঁহার মধ্যে ছিল এক অলৌকিক দৈবীশক্তি নিহিত। তাহারই লীলা প্রকাশ পাইত বালক নরেন্দ্রনাথের শৈশবক্রীড়ায় আর দীনদুঃখীর প্রতি সমবেদনায়। কলেজ-জীবনে পাশ্চাত্ত্য নাস্তিকতার স্পর্শ তাঁহাকেও বিচলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাই তাঁহাকে আবার যোগ্য গুরুনির্ব্বাচনে সহায়তা করিয়াছিল, একথাও সুবিদিত।

নরেন্দ্রনাথ শুধু সুপুরুষই ছিলেন না, একজন সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। যুগপ্রভাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসঙ্গীত গান করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এসকলের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাইতেন না। এইসময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অধিষ্ঠানভূমি দক্ষিণেশ্বর পরমতীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু-সমাজের অসংখ্য ব্যক্তির সহিত দুই-একজন ব্রাহ্মনেতাও পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন। ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথও সেই মহাপুরুষের দিকে আকৃষ্ট হইলেন এবং অবশেষে পরমহংসদেবেরই অন্যতম শিষ্য এক খুল্লতাতের সহিত নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমদর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগী

হইয়া উঠিলেন। তাহার পর ঘন ঘন সাক্ষাতের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় লাভ করিলেন এবং তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিলেন। গুরুও ভক্তের অনন্যতা প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই গহন জনারণ্যের মধ্য হইতে নরেন্দ্রনাথকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যরূপে বরণ করিয়া লইলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পরমহংসদেবের তিরোভাব ঘটিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন; তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম হইল 'বিবেকানন্দ'। অতঃপর বিবেকানন্দ হিমালয়, তিব্বত, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বিস্তৃত অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। দীর্ঘ ছয়বৎসর তাঁহার এই ভ্রমণে ও ধর্ম্মের আলোচনায় অতিবাহিত হইল। দেশের মধ্যে তিনি এক নব জাগরণের সাড়া খেলাইয়া দিলেন। কত রাজা মহারাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, কত বিভ্রান্ত হিন্দু তাঁহার মন্ত্রে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ফিরিয়া পাইল। এমন সময়, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো নগরে বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলনের আয়োজন হইল। ভক্তবৃন্দের সনির্ব্বন্ধতায় বিবেকানন্দকে অনাহূত অবস্থাতেই আমেরিকা যাত্রা করিতে হইল। ঐ বৎসর ১১ই সেপ্টেম্বর যথাসময়ে সম্মেলন বসিল; বিবেকানন্দ বহু চেষ্টায় মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য সেই সম্মেলনে বক্তৃতা করিবার সুযোগ পাইলেন। কিন্তু ছোট একটি প্রণয়ঘন, ধর্ম্মানুপ্রাণিত সম্ভাষণে গৈরিকবসন ভারতীয় সন্ন্যাসী সেদিন বিশ্বহৃদয় নিমেষে জয় করিয়া লইলেন। বিপুল করতালিসহকারে অভিনন্দিত হইলেন বিবেকানন্দ। তাঁহার বক্তৃতায় সেদিন আমেরিকায় একটা বিরাট্ আলোড়নের সৃষ্টি হইল। New York Herald-নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইল: "হিন্দুজাতির ন্যায় পণ্ডিতজাতির মধ্যে খৃষ্টান প্রচারক প্রেরণ যে মূঢ়তা, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার পর তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" ইহার পর দীর্ঘ চারি বৎসরকাল তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। পৃথিবীময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল, পশ্চিমের মুখ ফিরিল পূবে—ভারতের ধর্ম্মসংস্কৃতির দিকে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী সশিষ্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক গুণী ও ধনীই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ভারতবাসীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত ও ভক্তিভাজন হইলেন ভগিনী নিবেদিতা (পূর্ব্বের নাম মার্গারেট নোব্‌ল)।

দেশে ফিরিয়া স্বামীজী সর্ব্বত্র বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিলেন। ইহার পর অসংখ্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তিনি যাহা বলিতে লাগিলেন, দেশবাসী তাহা উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নবযুগের সূত্রপাত করিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করিলেন। দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে,—সিংহল, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠা করিলেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও মঠ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় বিবেকানন্দ আর্ত্তসেবার বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আবার তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠা করিলেন

তিনি বিখ্যাত বেলুড় মঠ। এই বৎসর মার্চ্চ মাসে হিমালয়ের মায়াবতীতে বিখ্যাত 'অদ্বৈত আশ্রম'টিরও প্রতিষ্ঠা হইল। এইসকল কাজের চাপে কিন্তু স্বামীজীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। চিকিৎসকদিগের পরামর্শে তিনি তাই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের দিকে আবার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বাহির হইলেন। কিছুকাল লণ্ডনে থাকিয়া তিনি আমেরিকায় পৌছিলেন। কালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারায় তখন মার্কিন ভক্তগণ বিরাট্ 'বেদান্ত আশ্রম'টি প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে আবার বিশ্বধর্ম্ম-সভার সম্মেলন বসিল। স্বামীজীকে তাহাতেও যোগ দিতে হইল। তারপর তিনি দেশে ফিরিলেন এবং অসংখ্য সংগঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জাপানী মনস্বী ও' কাকুরার (O' Kakura) সহিত স্বামীজী সারনাথ ভ্রমণ করেন। ঐ বৎসর জাপানে একটি ধর্ম্ম-সম্মেলন বসিবার কথা। বিবেকানন্দ যথেষ্ট সনির্ব্বন্ধতাসত্ত্বেও জাপানে মনীষিবৃন্দের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না; কারণ, তখন তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ইহার পর তিনি আর অধিককাল ইহধামে থাকেন নাই। ঐ বৎসরই ৪ঠা জুলাই তিনি মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে সমাধিস্থ অবস্থায় দেহরক্ষা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর। মহাত্মা গান্ধীকে ভারতবর্ষ জাতির পিতারূপে বরণ করিয়াছে। কিন্তু এই বরণের কারণ তাঁহার প্রচারিত জীবনবাদ নহে, তাঁহার প্রদর্শিত পথে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন। স্বামীজী গান্ধীজীর পূর্ব্বেই সমগ্র ভারতের আধ্যাত্মিক জয় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আজ বুঝিতেছি একটা জাতির প্রকৃত মুক্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতাই মাত্র নহে, সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠাও বটে। এদিক দিয়া স্বামীজী আজও আমাদের স্মরণীয়। ভারতের মহত্তর মুক্তি আজও পরিপূর্ণ হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাই দেশের প্রত্যেক নেতার বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; তাঁহার প্রদর্শিত পথ প্রত্যেক ভারতবাসীর একান্ত অনুসরণীয়।

ভ্রমণপ্রসঙ্গ

দেশভ্রমণের মূল্য

একটি দীর্ঘ বৎসর অতিক্রান্ত হয় ; পৃথিবীর একবারের মত সূর্য্য-প্রদক্ষিণ শেষ হয়। তাহার থামিবার অবসর নাই, সে ক্রমাগত ছুটিয়াই চলিয়াছে। কেবল কি পৃথিবী, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র সকলেরই কেবল 'অবারণ চলা'। কারণ, থামিলেই ঘোর বিপদ্, থামিলেই অপমৃত্যু। যতক্ষণ গতি, ততক্ষণ প্রাণ ; মুহূর্ত্তের তরে থমকিয়া দাঁড়াইলেই মৃত্যুর সহস্র বিভীষিকা আক্রমণ করিবে। এই চলমান সত্তার সন্তান মানুষ, তাই চলিবার নেশা তাহার চিরন্তন। সেও কোথাও শান্তভাবে বসিতে পারে না, অনির্দ্দেশ্য আবেগ তাহাকে আগাইয়া লইয়া চলে। দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা এই অনির্দ্দেশ্য আবেগেরই সুন্দর বহিঃপ্রকাশ। তাই সৃষ্টির প্রথম হইতেই মানুষের ভ্রমণের ইচ্ছা দেখা যায়। সে ঘরে বসিয়া থাকে নাই। কোন বাধা, কোন বিঘ্নকে সে স্বীকার করে নাই। শতসহস্র বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া সে মেরুপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছে। তাহার সরল সঙ্গী-সাথীর হয়তো প্রাণনাশ হইয়াছে এই দুঃসাহসিক নেশায়, তবু সে নিরস্ত হয় নাই। সাহারা মরুভূমিতে সে গিয়াছে মরুভূমিকে আস্বাদ করিতে ; সাহারার বিরাট্ বালিরাশির মাঝে দাঁড়াইয়া, নিঃসঙ্গ অবস্থায় হয়তো তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে নিশ্চিত ঝড়ের পূর্ব্বাভাসে ; তবু সে পৃথিবীর পরিক্রমায় ক্ষান্ত হয় নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কার করিতে বার বার সে অভিযান করিয়াছে ; তাহার বহু অভিযানই ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু মানুষ হতাশ হয় নাই—সে নব উদ্যমে আবার নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে। চলিষ্ণু মানব কোথাও থামে নাই, কোনদিন থামিবে না।

এমনই মানুষের ভ্রমণের নেশা ! এই ব্যাপারে প্রাচীন মানুষের সহিত বর্ত্তমান মানুষের কোনও প্রভেদ নাই। অবশ্য ভ্রমণপ্রণালীর মধ্যে প্রভেদ হইয়াছে। তাহা হইবেই। যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারণের রীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে উট, ঘোড়া এবং হাতীই ছিল মানুষের প্রধান বাহন। মানুষ দূরদেশে যাইত উহাদের উপর চড়িয়া। ভ্রমণ তখন স্থলদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘ বনানী অতিক্রম করিয়া, বহু নগর-প্রান্তর ঘুরিয়া মানুষ এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইত ; পথে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। তাই সে সময়ে মানুষ কখনও একলা চলিত না। একশ, দুইশ মানুষ একত্র হইয়া আত্মরক্ষার জন্য নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাহির হইত দেশভ্রমণে। পদব্রজেও মানুষ এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইত। চীনদেশের মহাপরিব্রাজকগণ পদব্রজেই দেশদেশান্তরে যাইতেন, সঙ্গে থাকিত ভিক্ষার ঝুলি এবং হাতে দণ্ড। সুদূর চীন হইতে তাঁহারা নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিতেন

ভারতবর্ষে। অন্যান্য বহু দেশ হইতেও ছাত্রেরা পদব্রজে আসিতেন তক্ষশীলা এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে। কিন্তু তবু সাধারণ মানুষের পক্ষে ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য ছিল। না ছিল উৎকৃষ্ট যানবাহন, না ছিল আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা। তাই সাধারণ ভীরু মানুষ বাহিরে যাইতে পারিত না।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। মানুষ নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারদ্বারা আজ দূরত্ব জয় করিয়াছে। যানবাহনের সুবিধা হইয়াছে, আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে, মানুষও অনেকটা ভদ্র হইয়াছে। রাস্তায় মানুষ দেখিলে লুটপাটের প্রবৃত্তি তাহার কমিয়াছে। মানুষ আজ নির্ভয়ে দেশভ্রমণে বাহির হইতে পারে। আজ মানুষ বিমানপোতের সাহায্যে কয়েক সপ্তাহে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। অবশ্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহা এখনও সম্ভব নহে, কারণ অর্থাভাব। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় ভ্রমণের ব্যয় আরও কম হইবে, যাহাতে প্রতিটি মানুষ দেশভ্রমণে সমর্থ হয়।

দেশভ্রমণে যে অকৃত্রিম আনন্দ পাওয়া যায়, ইহাই বোধহয় ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল্য। ট্রেনে হুহু করিয়া আগাইয়া চলিয়াছি—নানা শহর, গ্রাম, দীর্ঘ বনানী, প্রান্তর সকলকে স্পর্শ করিয়া ট্রেন আগাইয়া চলিতেছে; থামিবার অবসর নাই, পথে অন্যান্য সকলে স্থাণুর মত রহিয়াছে, আমরা শুধু চলিয়াছি। এই গতিবোধেই আনন্দ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় ভ্রমণের দ্বারা। নদীর পোলের উপর দিয়া ট্রেন চলিয়াছে। সূর্য্যাস্তের রক্তরশ্মি খেলা করিতেছে নদীর জলে; পশ্চিম দিগন্ত লাল হইয়া আছে, আমরা ট্রেনে বসিয়া সূর্য্যরশ্মির খেলা উপভোগ করিতেছি। কখনও ট্রেন চলিয়াছে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া, কখনও বা চলিয়াছে উঁচু টিলাভূমির উপর দিয়া। প্রকৃতির অকৃপণ হস্তে বিতরিত সৌন্দর্য্যরাশির মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি, গভীর আত্মীয়তা বোধ করিতেছি উহাদের সঙ্গে। প্রকৃতির সকল দানকে উপভোগ করিতে হইলে দেশভ্রমণ করিতেই হইবে। কোন দেশে গিয়া প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি, সংহারমূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে হইবে; কোথাও বা শস্যশ্যামলা; স্নেহময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে হইবে।

মানুষকে যদি সভ্য হইতে হয়, অন্যের সহিত যদি আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে দেশভ্রমণ ব্যতীত কোন উপায় নাই। এক দেশের মানুষ অন্য দেশে গিয়া সে দেশের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহারসম্বন্ধে সঠিকভাবে জানিতে পারে। শুধু বই পড়িয়া, অন্যের মুখের কথা শুনিয়া ইহা সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠি'তে ইহাই বার বার বলিয়া গিয়াছেন। সোভিয়েট দেশসম্বন্ধে বহু কুৎসা আমরা নানা দেশের লেখক মারফত পাইয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথও সে দেশসম্বন্ধে বহু কুৎসা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে যাইয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, কুৎসা খণ্ডনের জন্য তিনি 'রাশিয়ার চিঠি' লিখিলেন। আমাদের দেশসম্বন্ধেও ইহা হইয়াছে। বহু অপপ্রচার হইয়াছে বিদেশে আমাদের বিরুদ্ধে। এককালে বলা হইত আমরা নাকি নরমাংস-

ভোজী জীব ; বিদেশের বহু লোকের ধারণা ছিল, আমাদের ন্যায় অসভ্য ও অসাধু প্রাণী পৃথিবীতে নাই। স্বার্থান্বেষী মানুষ চিরকাল তাহার স্বার্থের অনুকূলে অন্যের বিরুদ্ধে প্রচার করিবে। তাই কোন দেশকে সঠিকভাবে জানিতে হইলে সেই দেশে যাওয়া প্রয়োজন। মানসিক প্রসার ইহাতেই সম্ভব ; হৃদয়ের উদারতা ইহাতে বৃদ্ধি পায়, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ মধুর হইয়া উঠে।

দেশভ্রমণ নানাভাবে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করে। আজকাল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ভূ-বিজ্ঞান। কোন দেশের ভূগোল না জানিলে সেদেশ-সম্বন্ধে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। দেশভ্রমণের দ্বারাই এই জ্ঞান সুসম্পূর্ণ করা যায়। ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকে আমরা জলপ্রপাতসম্বন্ধে পড়ি, কিন্তু শুধু পড়িয়া আমরা কতকগুলি সংজ্ঞা মুখস্থ করিতে পারি, প্রকৃত জলপ্রপাত যে কি বস্তু তাহা জানি না। বাল্যকালেই মুখস্থ করি পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর আছে, অথচ সাগর সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের নাই। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তাই কিছুদিন পরই নূতন নূতন দেশে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন।

দেশভ্রমণের দ্বারা কোন দেশের প্রাচীন ইতিহাস সুষ্ঠুভাবে জানা যায়। প্রাচীনকালে শহর কিরূপভাবে নির্মিত হইত, জলনিষ্কাশনের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল, প্রাচীনযুগের মানুষদের জীবনধারণের পদ্ধতি কিরূপ ছিল—ইহা জানিতে পারি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি ভ্রমণের পর। তক্ষশীলা ও নালন্দায় যাইয়া প্রাচীনকালের সংস্কৃতির পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি। মহেঞ্জোদাড়োর ভগ্নাবশেষ হইতে প্রাচীনযুগের জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা জানিতে পারি। সারনাথে বুদ্ধদেবের জীবনী জানিতে পারি। প্রাচীন সভ্যতার সংস্কৃতি, কলা, শিল্প ও কারুকার্য্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান সারনাথ-ভ্রমণেই পাইতে পারি। অজন্তায় যাইয়া চিত্রকলা-সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা যায়।

আজ সমগ্র পৃথিবী ক্রমশঃ একান্নবর্তী পরিবারের রূপ ধারণ করিতেছে। ইহাতেই একমাত্র জগতে শান্তি আসিতে পারে। কিন্তু সত্য আত্মীয়তা তখনই স্থাপন করা যায়, যখন একের অন্যের উপর শ্রদ্ধা থাকে। আমরা শ্রদ্ধা করি বিদেশী সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে, সাহিত্যকে, কলাকে। অপরপক্ষে উহারা শ্রদ্ধা করিবে আমাদের মহৎ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে। কিন্তু এই শ্রদ্ধা পূর্ণজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। আমরা যদি ফ্রান্সের সাহিত্য, চারুশিল্প, সংস্কৃতি-সমাজ-ইতিহাসসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি, তাহা হইলে শ্রদ্ধা আসিবে কি করিয়া? ইহা প্রত্যেক দেশের নরনারীর পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজন দেশভ্রমণের। দেশভ্রমণের দ্বারাই একমাত্র অন্যদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি জানা যায়। অন্যথায় স্বার্থান্বেষীদের অপপ্রচারে কোন দেশসম্বন্ধেই সঠিকভাবে জানা যায় না। দেশভ্রমণই মানুষ জানিবার ও চিনিবার একমাত্র উপায়।

ভ্রমণ—প্রাচীন ও আধুনিক

মানুষের মধ্যে যে একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণি আছে তাহা মানুষকে একস্থানে স্থির হইয়া বসিতে দেয় না। সে ক্রমাগতই চলিতে চাহে। পৃথিবী বিরাট্। ইহাতে বহু দেশ, বহু জাতি, বহু সভ্যতা। এক দেশের মানুষ স্বভাবতঃই অন্যদেশের মানুষসম্বন্ধে উৎসুক। সে চায় অন্যকে জানিতে; তাহার ইতিহাস, তাহার সংস্কৃতি, তাহার জীবনধারণের প্রণালীসম্বন্ধেও তাহার ঔৎসুক্য অপরিসীম। অন্যদেশের কেন, নিজের দেশসম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট ঔৎসুক্য। যে থাকে শস্যশ্যামলা বাঙলায় সে ইতিহাস শুনে তাহারই দেশের অন্য একস্থানের যেখানে শস্যশ্যামলা ভূমির পরিবর্ত্তে রহিয়াছে বিরাট্ মরুভূমি; সে পত্রিকায় পড়ে এমন এক স্থানের কথা যেখানে পয়সা দিয়া জল কিনিতে হয়। বিস্ময়ে সে হতবাক্ হয়—ইহাও কি সম্ভব? তাহার ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য সে নিজে রাজপুতানার মরুভূমিতে যাইতে চায়—তাহার আন্তরিক ইচ্ছা তাহারই দেশের অন্য ভাষাভাষীদের সঙ্গে আত্মীয়তা অর্জ্জন করা। তাই সে ভ্রমণে বাহির হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির লীলাচঞ্চল মূর্ত্তি, প্রকৃতির সংহারমূর্ত্তি—প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সে বাহির হয় তাহার ঘর ছাড়িয়া। সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসু, জ্ঞানান্বেষী মানুষ আগাইয়া চলে নব নব পথে।

ইহা বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব নহে। আদিম কাল হইতেই মানুষের মধ্যে রহিয়াছে চলিবার প্রবৃত্তি, তাহারই তাড়নায় সে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে। মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তির এখনও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পরিবর্ত্তন হইয়াছে কেবল ভ্রমণ-প্রণালীর—তাহা নিত্যই সুন্দর, সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইতেছে। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে ভ্রমণ অর্থে প্রধানতঃ স্থলপথে ভ্রমণই বুঝাইত। পদব্রজেই মানুষ বেশী ভ্রমণ করিত; চীন হইতে ভারত, ভারত হইতে আরব। মানুষ পায়ে হাঁটিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইত। এই যাত্রায় সে একলা চলিত না, সঙ্গে চলিত অন্ততঃ পঞ্চাশ কি যাটজন সাথী; কারণ পথ ছিল ভয়সঙ্কুল। পথের ভীতির জন্য এবং যাতায়াতের কষ্টের জন্য ভ্রমণ খুব অল্পলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতিবৎসর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল যখন মানুষ দলবদ্ধ হইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইত, সঙ্গে থাকিত মাসছয়েকের আহার্য্যবস্তু এবং জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ। মানুষ ভ্রমণে বাহির হইত তাহার সমস্ত সংসার লইয়া।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রাচীন ভ্রমণ-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মানুষ আজ কয়েক সপ্তাহে সম্পূর্ণ পৃথিবী ভ্রমণ করিতে পারে। তাহার আধিপত্য আজ প্রকৃতিজগতে সর্ব্বত্র স্বীকৃত; সে সমুদ্রকে জয় করিয়াছে বেশ কিছুদিন পূর্ব্বে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে তাহার আধিপত্য অসীম আকাশেও বিস্তৃত হইয়াছে। তাহার নিকট আজ কোন স্থান অনধিগম্য নাই। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পথের ভীতিও যথেষ্ট

কমিয়াছে। সে আজ মরুপ্রদেশে, সাহারার মরুভূমিতে, প্রশান্ত মহাসাগরের ভীতি-সঙ্কুল দ্বীপপুঞ্জে অনায়াসে যাইতে পারে। আজ মানুষ এস্কিমোদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে, দুর্দ্ধর্ষ আফ্রিকাবাসীর সহিত আজ তাহার আত্মীয়তা। বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবী আজ এক বিরাট্ একান্নবর্ত্তী পরিবারে পরিণত হইতেছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঘোড়া, উট ও হাতী চড়িয়া মানুষ ভ্রমণে যাইত। পদব্রজে যাইতেন পরিব্রাজকগণ—ইতিহাসে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতের দুইটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে—তক্ষশীলা এবং নালন্দায় বহু দূরদেশ হইতে ছাত্রেরা আসিতেন অধ্যয়ন করিতে। ইঁহারা পদব্রজেই আসিতেন। সাধারণ মানুষের ভ্রমণে উট এবং ঘোড়াই বেশী ব্যবহৃত হইত। ধনী পুরুষেরা হাতী ব্যবহার করিতেন; সঙ্গে থাকিত অনুচরবৃন্দ ও বরকন্দাজগণ, মহাসমারোহে সুরু হইত যাত্রা। উট বেশী ব্যবহৃত হইত মরুভূমিতে। প্রতিবৎসর শত শত মুসলমান উটের পিঠে চড়িয়া মক্কাযাত্রা করিতেন। আজকাল এইসব বাহনের ব্যবহার একেবারে কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে একমাত্র শিকারে যাওয়া ব্যতীত কেহই হাতীতে ভ্রমণ করে না। মরুভূমিতে উটের প্রচলনও আজ সীমাবদ্ধ। পার্ব্বত্য স্থানে ঘোড়ার ব্যবহার এখনও আছে।

মোটর গাড়ী এবং রেল আবিষ্কারের পূর্ব্বে নানাপ্রকারের শকটের প্রচলন ছিল। এই শকটগুলি উট, ঘোড়া বা বলদে টানিত। শকটে ভ্রমণ অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। বর্ত্তমানেও এইসব শকটের ব্যবহার একেবারে লুপ্ত হয় নাই। যে সব স্থানে মোটর নাই, রেলপথ নাই, সেইসব স্থানে এইরূপ শকটের ব্যবহার হইয়া থাকে। শহরের মধ্যে ভ্রমণের জন্য এক্কা এবং টাঙ্গার ব্যবহার অনেক স্থানে দেখা যায়। বস্তুতঃ উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে এক্কা এবং টাঙ্গা ব্যতীত অন্য কোন যান বিশেষ পাওয়া যায় না। টাঙ্গা হইল এক্কারই পরিমার্জ্জিত সংস্করণ। ইহাতে তিনজন বেশ আরাম করিয়া বসিতে পারে।

মধ্যযুগের আর একটি বাহন ছিল পাল্কী। স্ত্রীলোকেরা এবং অবস্থাপন্ন পুরুষেরা পাল্কীতে ভ্রমণ করিত। চারজন বেহারা কাঁধে করিয়া পাল্কী লইয়া চলে। আজকাল বিবাহমিছিলে মাঝে মাঝে ইহা দেখা যায়, তাহা ছাড়া ইহা নজরে পড়ে না; পাল্কীর আর একটি সংস্করণ ডাণ্ডী পার্ব্বত্যপথে ব্যবহৃত হয়। জাপানে মানুষে-টানা রিক্‌শ প্রচুর ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও অনেক শহরে রিক্‌শর প্রচলন আছে। আজকাল আবার সাইকেল রিক্‌শ হইয়াছে; বাঙলাদেশে, উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে ইহার প্রচলন বেশী।

বাইসাইকেল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা এবং দ্রুতগামী যান। মোটর বাস এবং লরীরও ভারতে যথেষ্ট প্রচলন। বড় বড় শহরে ট্রামগাড়ী চলে। বর্ত্তমানে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে ট্রামগাড়ী বহু সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

'রেলওয়ে' আবিষ্কারের পর হইতে মানুষের পক্ষে ভ্রমণ করা অত্যন্ত সহজ ও সুখকর হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দ্রুতগামী—২৪ ঘণ্টায় দিল্লী হইতে কলিকাতা পৌঁছান যায়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই রেলপথের প্রসার হইয়াছে, তবু এখনও কিছু কিছু অংশে ইহার প্রসার সম্ভব হয় নাই। সেইসব স্থানে যাইতে হইলে মোটর বাস, গোরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্য লইতে হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ভূগর্ভেও রেলপথ আছে। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে স্বাধীন হইয়াছে; আশা করা যায় অচিরেই ভারতেও ইহা সম্ভব হইবে।

পূর্ব্বে জলপথে ভ্রমণের জন্য নৌকার ব্যবহার ছিল। বেশীর ভাগই ছিল পালতোলা নৌকা। নদীপথে মানুষ যথেষ্ট ভ্রমণ করিত; গাজীপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকায় যাতায়াত চলিত। কিন্তু সাধারণ মানুষ সমুদ্রে ভ্রমণ করিত না। বড় বড় বণিক্‌গণ ও রাজা মহারাজাগণ একদেশ হইতে অন্যদেশে পালতোলা জাহাজে চড়িয়া যাইতেন। ইতিহাসে ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে জল-দস্যুদের অত্যাচার অত্যন্ত বেশী হইত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীম-ইঞ্জিনের আবিষ্কার হইল; বড় বড় জাহাজ ইহার সাহায্যে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর এবং অতলান্তিক মহাসাগরে পাড়ি দিতে লাগিল। জাহাজে জাহাজে কামান বসান হইল; জলদস্যুদের উৎপাত কমিয়া গেল। নূতন নূতন জাহাজ কোম্পানীর উদ্ভব হইল। মানুষ আজ নির্ব্বিঘ্নে জলপথে ভ্রমণ করে। পৃথিবীর সে আজ সর্ব্বত্র যাইতে পারে জাহাজে চড়িয়া।

কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বিমানপোত। মানুষ জল ও স্থল পূর্ব্বেই জয় করিয়াছিল; এবার সে জয় করিল আকাশ। প্রকৃতি-বিজয় তাহার প্রায় সুসম্পন্ন। বিমানপোত সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যান। এক ঘণ্টায় সাধারণ বিমানপোত ৩০০ হইতে ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে অর্থাৎ তিন ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে দিল্লী পৌঁছান যায়; সম্পূর্ণ পৃথিবী ভ্রমণ করা যায় কয়েক সপ্তাহে। অবশ্য বিমানপোতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়, কারণ ভ্রমণের জন্য যথেষ্ট বিমানপোতের অভাব এবং ইহার দুর্ম্মূল্যতা। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এই সকল অসুবিধা দূর হইবে এবং মানুষ আকাশপথেই বেশী ভ্রমণ করিবে।

বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। সে পৃথিবীর দূরত্ব কমাইয়াছে, পৃথিবীকে ক্রমশঃ একসূত্রে বাঁধিবার প্রচেষ্টা করিতেছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে নানাভাবে; সে নূতন নূতন যানবাহন আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক অসুবিধাই সে দূর করিয়াছে। তথাপি এখনও পৃথিবীর এমন বহু অঞ্চল আছে যাহা মানুষের অনধিগম্য। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এইসকল স্থানও জনগণের সহজগম্য করিয়া তুলিবে ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান

বারাণসী

মানুষের শেষ বিচার ইতিহাসের দরবারেই সম্ভব। সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে মানুষ নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছে অমর হইতে, কিন্তু মহাকাল কাহাকেও বাঁচিতে দেয় নাই—কালের অতল গর্ভে সকলকেই আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং হইবেও। তবু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, সে তাহার চেষ্টা হইতে বিরত হয় নাই; সু-উচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া স্মৃতিস্তম্ভ গড়িয়া কতদূর প্রয়াস করিয়াছে চিরকাল বাঁচিবার। তাহার সেই প্রচেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে ইতিহাস তাহার বিচার করে; সেই বিচারের ফলে হয় সে জয়তিলক পরিয়া জনগণের হৃদয়ে বিরাজ করে, অন্যথায় ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই শুধু সে বাঁচিয়া থাকে। বারাণসী ইতিহাসের এই বিচিত্র শিক্ষার স্বাক্ষর বহন করে। একই সারনাথে গৌতম বুদ্ধ বাঁচিয়া আছেন মানবসংস্কৃতিতে তাঁহার অসীম দানের জোরে; কিন্তু তদানীন্তন কাশীরাজ বাঁচিয়া নাই, কারণ ইতিহাসের বিচারে তাঁহার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার নাই।

বলা হয়, বারাণসী ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগরী। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির পীঠস্থান, হিন্দুসভ্যতার লীলাভূমি এবং বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ এই বারাণসী। বহু প্রাচীন নগরী এখন কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে বাঁচিয়া আছে, তাহাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, শুধু অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক তাহাদের সন্ধান রাখেন। কিন্তু ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগরী বারাণসী আজও টিকিয়া আছে তাহার নিজস্ব মহিমায়—মহাকালের রোষবহ্নিতে সে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নাই। বহু অত্যাচার সে সহ্য করিয়াছে, বহু কালাপাহাড়ী আক্রমণ তাহার উপর হইয়াছে, কিন্তু তবুও সে মাথা উন্নত করিয়াই রহিয়াছে। মহাগৌরবে সে বহন করিতেছে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর।

উত্তরপ্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী এই বারাণসী। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৪২৯ মাইল। ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমানে ইহার লোকসংখ্যা চার লক্ষ। বাঙলাদেশের বাহিরে কোন শহরে এত বাঙালীর বাস নাই। গঙ্গানদীর সৌন্দর্য্য বোধহয় বারণসীতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। গঙ্গা এখানে অত্যধিক শান্ত—কোন তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই, ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে নিঃশব্দে। গঙ্গার অনেকগুলি ঘাট আছে, প্রত্যেকটি ঘাটই পাথরে বাঁধান। ঘাটে নামিবার জন্য সিঁড়ি আছে। ঘাটে নামিতে হইলে অনেকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করিতে হয়। বারাণসীতে

সূর্য্যোদয় বড়ই সুন্দর। প্রভাতসূর্য্যের প্রথমরশ্মি স্নান করাইয়া দেয় স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীদের, শ্রদ্ধাভরে তাহারা প্রণাম করে পৃথিবীর দেবতাকে। সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাবেশ হয় গঙ্গার ঘাটে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা সম্পূর্ণ শহরকে ঘেরিয়া আছে। গঙ্গার অপর তট হইতে দেখিলে রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে—'আধো চাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে'।

বারাণসীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থান এবং বস্তু বহু রহিয়াছে। শহর হইতে সাত মাইল দূরে সারনাথ। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভের পর সর্ব্বপ্রথম সারনাথে আসেন এবং তাঁহার পলাতক পাঁচ শিষ্যকে এখানে সর্ব্বপ্রথম দীক্ষা দেন। সেই বৌদ্ধযুগের ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভ হইতে বাহির করা হইয়াছে এবং প্রতিদিনই আরও অনেক কিছু নূতন বস্তু বাহির হইতেছে। মাটির নীচ হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যরাশি একটি মিউজিয়ামে রাখা হইয়াছে। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত নানাপ্রকার পাথর এবং মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধযুগ এবং তৎপরবর্ত্তী যুগের শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানার্জ্জন করা যায় এই সারনাথ হইতে। সম্রাট্ অশোক-নির্ম্মিত অশোকস্তম্ভ এখনও পর্য্যন্ত সগৌরবে বিরাজ করিতেছে। বৌদ্ধদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান হইল সারনাথ। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য ধর্ম্মশালা এবং গ্রন্থাগার আছে; জাপানী বৌদ্ধরা একটি বিরাট্ বুদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে—ইহার নাম 'মূলগন্ধকুটিবিহার'। ইহার পাশেই চীনা ভক্তদের দ্বারা নির্ম্মিত অপর একটি বুদ্ধমন্দির আছে। সারনাথে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে বিরাট্ মেলা হইয়া থাকে। বহু দূরদেশ হইতে বহু পরিব্রাজক, ভক্ত ও মনীষীরা মেলা দেখিতে আসেন।

প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার মূল কেন্দ্র ছিল বারাণসী। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল বারাণসী; এই স্থান হইতেই হিন্দু-সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল দিক্-দিগন্তরে। তাই বারাণসী হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। হিন্দুদের বিশ্বাস, বিশ্বের অধিস্বামী দেবাদিদেব মহাদেব বিশ্বনাথ এইস্থানে বাস করেন। তাই মুসলমানদের নিকট যেরূপ মক্কা, খ্রীষ্টানের নিকট যেরূপ জেরুজালেম, হিন্দুর নিকটও সেইরূপ বারাণসী। বিশ্বনাথের মন্দির হইল বারাণসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। ইহার স্থাপনা বহু প্রাচীনকালে হইয়াছিল। এই মন্দিরের চূড়া স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত। মুসলমান শাসকদের কালে বিধর্ম্মীরা বহু হিন্দুমন্দির নষ্ট করে। মোগলসম্রাট্ ঔরঙ্গজেব বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। যখন মন্দির আক্রান্ত হইল, তখন পূজারীরা বিশ্বনাথকে নিকটে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানের বিশ্বনাথ-মন্দির ইহার পরে নির্ম্মিত হয়।

বিশ্বনাথ-মন্দির এবং অন্নপূর্ণা-মন্দিরই বারাণসীর শ্রেষ্ঠ মন্দির। ইহা ছাড়াও বহু খ্যাত, অখ্যাত মন্দির আছে; যথা—কেদার-মন্দির, কালভৈরব-মন্দির, বটুকেশ্বর ইত্যাদি। বারণসীতে এখনও প্রাচীন সংস্কৃতির প্রচুর ছাপ রহিয়াছে। বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা-মন্দিরে সকালবেলা তরুণ ব্রাহ্মণেরা নামগান করে—সৃষ্টি করিয়া লয় প্রাচীন

কালের আবহাওয়া, তাহা শুনিয়া মানুষ ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হইয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যায়, উত্তীর্ণ হয় বেদগানমুখরিত প্রাচীন এক জগতে। এখনও পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের ব্যাপারে বারাণসীর পণ্ডিতদের অভিমতই সর্ব্বজনগ্রাহ্য। বহু টোল আছে, যেখানে এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়।

বর্ত্তমানে বারাণসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার ন্যায় আয়তন ভারতে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। ইহাতে একাধারে প্রাচীন ও আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার 'কলেজ অব্ ওরিয়েণ্টাল লারনিং', 'সায়েন্স কলেজ', 'কলেজ অব টেকনোলজী', 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ', 'এগ্রিকালচার কলেজ' ও 'আয়ুর্ব্বেদ কলেজ' সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কাচশিল্পের কলেজ ভারতে অন্য কোথাও নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌গণ কোন-না-কোনও সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন। বারণসী শহর হইতে তিন মাইল দূরে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে কাশীমহারাজার রামনগরস্থ প্রাসাদ, মতিঝিল এবং বেণীমাধবের ধ্বজা উল্লেখযোগ্য। বেণীমাধবের ধ্বজা হইতে সমস্ত শহর বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। ইহা ছাড়া চেতসিং ঘাটে চেতসিংহের দুর্গ রহিয়াছে, যাহার ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। মতিঝিল হইল কাশীরাজের প্রমোদভবন। 'ভারতমাতার মন্দির'ও একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এই মন্দিরে ভারতবর্ষের বিরাট্ একটি পাথরের মানচিত্র রহিয়াছে। ভারতমাতার মন্দিরের পাশেই রহিয়াছে কাশী বিদ্যাপীঠ—ভারতের জাতীয়তাবাদীদের তীর্থস্থান। এই বিদ্যাপীঠে ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতারা হয় শিক্ষা পাইয়াছেন, না হয় শিক্ষকতা করিয়াছেন। বারাণসীর হরিশ্চন্দ্রঘাট সুদূর অতীতের মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি আজও অটুট রাখিয়াছে।

বারাণসী বেনারসী শাড়ীর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে বহু কারিগর আছে যাহারা অতি সুন্দর বেনারসী সিল্কের শাড়ী তৈয়ারী করে। ইহাই এখানকার সর্ব্বপ্রধান শিল্প। দেশ-দেশান্তরে এই শাড়ী পাঠান হয়— এক-একটি শাড়ীর দাম ছয়শত-সাতশত টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পিতলের বাসন ও চীনামাটির খেলনা এখানকার অন্য দুইটি প্রধান শিল্প। বারাণসীর জরদা এবং পানের মসলাও ভারত-বিখ্যাত।

প্রাচীন শহর বলিয়া বারাণসী অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। ভারতের অন্য কোন শহরে এত ছোট রাস্তা ও গলি নাই। গলির বাড়ীগুলিতে কখনও আলো প্রবেশ করিতে পারে না। রাস্তার এখানে সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মন্দির হওয়াতে রাস্তাঘাট অত্যন্ত অপরিষ্কার। সব স্থানেই ফুল, বেলপাতা এবং গঙ্গাজলের সমারোহ। শহরের অপরিষ্কার অবস্থার জন্য সর্ব্বদা শহরে রোগ লাগিয়াই আছে। প্লেগ, বেরী-বেরী, কলেরা, যক্ষ্মা—ইহাদের প্রাদুর্ভাব বারাণসীতে প্রায়ই দেখা যায়।

তীর্থস্থান বলিয়া ভণ্ডামী ও গুণ্ডামী বারাণসীতে প্রচুর প্রশ্রয় পায়। বারাণসীর পাণ্ডারা গুণ্ডামীর জন্য বিখ্যাত। আর ভণ্ডামীর তো কথাই নাই। বারাণসীতে মানুষের ভীড় কম; সাধুসন্ন্যাসীর ভীড় বেশী। আনাচে-কানাচে কেবল মঠ ও আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ভণ্ড সাধুসন্ন্যাসীদের উৎপাতে মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া কিছু অসৎ প্রকৃতির মানুষ সাধারণ লোককে শোষণ করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্বনাথের মন্দিরের পূজারীরা হঠাৎ ঘোষণা করিল—মন্দির অশুদ্ধ হইয়াছে, কারণ বিহারের একজন হরিজন মন্ত্রী মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং অর্থসাহায্য প্রয়োজন। ধর্ম্মান্ধ মানুষও ভণ্ড পূজারীদের যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিল। এক-একটি মোহান্ত মন্দিরের অর্থে প্রচুর বিলাস-ব্যসনে কালাতিপাত করিয়াছে। জাতীয় সরকারের কর্ত্তব্য এইসব অর্থ বাজেয়াপ্ত করা এবং এইসব ভণ্ড পূজারীদের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করা।

অজন্তা

বোম্বাই নগরী হইতে প্রায় দুইশত মাইল পূর্ব্বে, বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া আছে অজন্তার বিখ্যাত পাহাড়। কালের কুটিল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া, আর ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতির সুদীর্ঘ অত্যাচার সহিয়া, আজিও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লইয়া প্রাচীন ভারতের এই অক্ষয়কীর্ত্তি বিদ্যমান। সম্ভবতঃ আজি হইতে প্রায় দুইহাজার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই গুহাগুলির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী সাতশত বৎসর ধরিয়া চলে শিল্প-সংযোজন। তারপর কতকাল চলিয়া গিয়াছে—কত নগর বন্দর, কত রাজ্য ও জনপদের হইয়াছে উত্থান-পতন; অমোঘ পরিবর্ত্তন তাহার চঞ্চল পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে দিকে দিকে। কিন্তু অজন্তার বিপুল বিস্ময় আজিও অম্লান হাস্যে পর্ব্বতগাত্রে ফুটিয়া আছে।

লোকালয় হইতে বহুদূরে বিজন শান্তির মধ্যে অবস্থিত অশ্বক্ষুরাকৃতি পর্ব্বত। তাহারই অভ্যন্তরে রচিত হইয়াছে এই গুহাবলী। সম্মুখে খরবেগে বহিয়া যায় এক পার্ব্বত্য নদী; পাহাড়ের পাদদেশ ধুইয়া দেয় সযত্নে। অজন্তার গুহা—বিচিত্র তাহার শিল্পরচনা। কঠিন প্রস্তর কাটিয়া নিপুণ ভাস্কর কত মূর্ত্তি আর কত চিত্র ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছে প্রতিটি গুহার প্রবেশপথে। আজিও যেন তাহারা অতীত দিনের বহু বার্ত্তা মূকভাষায় বহন করে। সজীব সুকুমার সে কলানৈপুণ্যের সত্যই তুলনা নাই। এই গুহাগুলি কিন্তু সাধারণ পর্ব্বতকন্দর নহে—উহারা এক-একটি প্রশস্ত

মন্দির। সর্ব্বসাকল্যে এরূপ চব্বিশটি মঠ (আশ্রম) ও পাঁচটি মন্দির রহিয়াছে; উহাদের অভ্যন্তরভাগও আবার অপরূপ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকার প্রকোষ্ঠ, প্রশস্ত অঙ্গন—সকলই রহিয়াছে। আর রহিয়াছে প্রাচীরে প্রাচীরে, স্তম্ভে স্তম্ভে বিচিত্র কারুকার্য্য। সেই প্রাচীনকালে মানুষ কি করিয়া সে পাষাণের জঠরে এই মায়াপুরী রচনা করিয়াছিল তাহা ভাবিলে সত্যই পুলকবিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া যাইতে হয়।

অজন্তার এই গুহামন্দিরগুলির ভাস্কর্য্যই কিন্তু একমাত্র গৌরব নহে। উহাদের প্রাচীরে ও ছাদে যে অনুপম চিত্রকলার নিদর্শন রহিয়াছে, তাহার তুলনাও সারা বিশ্বে বড় বেশী নাই। বৌদ্ধ জাতকের নানা কাহিনী এইসকল প্রাচীরচিত্রের মধ্যে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া আছে। বিরাগী সিদ্ধার্থ, তপস্যারত বুদ্ধ, আরও শতেক অবস্থায় বুদ্ধদেবের জীবনকথা তাহাতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু বুদ্ধদেবের কথাই নহে, তৎকালীন বিচিত্র সমাজও রূপায়িত আছে অজন্তার চিত্রাবলীতে। বিজয়সিংহের সিংহল-অভিযান ও রাজ্যজয়ের পর তাঁহার অভিষেকপর্ব্ব সেখানে চিত্রিত রহিয়াছে। চিত্রিত রহিয়াছে আরও অনেক স্বদেশী ও বিদেশী জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি। এসকলের মধ্য দিয়া ভারতের অতীত ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আমাদের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রাচীন ভারতের রীতিনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাড়ীঘর ও জীবনযাত্রার অবিকল আলেখ্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠে। স্তূপীকৃত গ্রন্থ পড়িয়াও যাহার কল্পনা দুঃসাধ্য, অজন্তার চিত্রাবলী এভাবে তাহারই সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় করাইয়া দেয়। শিল্পসৌন্দর্য্যের সহিত এই ঐতিহাসিক মূল্য তাই উহাকে প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট পরম দর্শনীয় বস্তু করিয়া রাখিয়াছে।

ঠিক কবে কোন্ প্রয়োজনে যে অজন্তার গুহাবলীর নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় তাহা অবশ্যই অনুমানের বিষয়। তবে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমরূপেই এইগুলি ব্যবহৃত হইত। জনপদের কোলাহল ছাড়িয়া সুনিবিড় শান্ত পরিবেশে ধ্যানধারণা করিবার পক্ষে এগুলি সত্যই আদর্শ স্থান। তৎকালের সাধুসন্ন্যাসীরা, অথবা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই ঐসকল প্রাচীরচিত্র, মূর্ত্তিনিচয় ও ভাস্কর্য্যের অন্যতম কারুকর্ম্মগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন কিনা বলা দুষ্কর। সন্ন্যাসীরা স্বয়ং, তাঁহাদের বা অন্যের দ্বারা নিয়োজিত শিল্পী যাঁহারাই এগুলির স্রষ্টা হউন না কেন, অজন্তার শিল্প-রচনার মূলে রহিয়াছে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও সুকুমার সৌন্দর্য্যবোধ। সমগ্র এশিয়ার চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে ইহারা অতুল মহিমার অধিকারী। ভারতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত নিদর্শনহিসাবেও ইহারা অমূল্য সম্পদ্।

পূজা ও উৎসব

দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজার প্রচলনসম্বন্ধে সাধারণতঃ রাজা সুরথ ও শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনীই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সুরথরাজা বা রামচন্দ্রের পূজার কথা আহিমাচল কুমারিকা সমগ্র ভারতেরই সুপরিজ্ঞাত। তবে কেন বাঙলাদেশই বিশেষ করিবা দুর্গাপূজা গ্রহণ করিল, অন্য কোন প্রদেশ গ্রহণ করিল না—এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর নাই। তাই বাঙলায় দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তনের ইতিহাস অন্যত্র নিহিত—এরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য মনে করি।

কথিত আছে মধ্যযুগে উত্তরবঙ্গে কংসনারায়ণ নামে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা রাজত্ব করিতেন। ধর্ম্মকর্ম্মে ছিল তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। একদা তাঁহার মনে যজ্ঞ করিবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পাত্রমিত্র সকলকে এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানাইলে, অনেক বিবেচনার পর পণ্ডিতগণ কলিযুগে যজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজার সাধু মনোবাঞ্ছাও তো উপেক্ষণীয় নয়; তাই যজ্ঞ না হউক, উহারই অনুকল্প একটা কিছু করা যায় কি না, পণ্ডিতগণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সেকালে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁহারই অপরিসীম প্রযত্নে দুর্গাপূজার বিধিব্যবস্থা রচিত হয়। বেদ-পুরাণ-চণ্ডী প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ সঙ্কলন করিয়া প্রস্তুত হয় এই ব্যবস্থা এবং সেই-অনুসারে সাড়ম্বরে প্রায় নয় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বাঙলায় প্রথম শারদোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন হইতে বাঙলায় শারদীয় দুর্গাপূজার প্রতিষ্ঠা। আধ্যাত্মিক কারণেই হউক বা প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য কারণসমূহের সমন্বয়েই হউক, শারদীয় পূজা বাঙালীর হৃদয়ে প্রথম হইতেই স্থায়ী আসন পাতিয়া লয়। কংসনারায়ণের দেখাদেখি তাঁহারই সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা (কুসুম্ভি ও প্রতাপবাজু পরগণার অধিপতি) জগৎনারায়ণ বাসন্তীপূজা করিলেন। আড়ম্বর তাহাতে তুলনায় আরও বেশী হইল, কিন্তু বাঙালী তাহাতে তেমন সাড়া দিল না। ইহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে জগৎনারায়ণের মন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন যে, আন্তরিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিজাত পূজা ঈর্ষ্যা-অনুপ্রাণিত পূজা হইতে যে অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সে যাহাই হউক, কালক্রমে শারদীয়া পূজা বাঙলার ঘরে ঘরে এমনই সমাদরে প্রতিষ্ঠা পাইল যে আজ দুর্গাপূজা বলিতে কেবলমাত্র শরৎকালের পূজাকেই বুঝায়। ইহাই বাঙালীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় উৎসব। দেশে বিদেশে যেখানে যেমন অবস্থায় বাঙালী রহিয়াছে, সেইখানেই দুর্গোৎসব হয়; কারণ বোধ হয় এই যে, অনুষ্ঠানটি একান্তভাবে বাঙালীর পরিকল্পিত, বাঙালীর বিশিষ্ট সংস্কৃতিরই ইহা বিশেষ অঙ্গ।

শরতের শুচিশুভ্র আকাশপটে চন্দ্রসূর্য্যের ভাস্বর জ্যোতি আর নক্ষত্রপুঞ্জের স্মিতহাস্য যখন বর্ষাধৌত সুশ্যাম ধরণীতল আলোকমণ্ডিত করিয়া তোলে, তখন বাঙালীর পুলকোজ্জ্বল চিত্তে লাগে দোল। ফলফুলে শস্যভারে ভরিয়া উঠে বাঙলা। শেফালীর শাখায় শাখায় জাগে শুভ্র মাধুরী আর মদির গন্ধ, পবনচঞ্চল কাশের বনে উঠে ফেনশুভ্র তরঙ্গ। পদ্ম ফোটে, কুমুদ হাসে, তৃণশীর্ষে দুলিতে থাকে শিশিরের ফুল। জ্যোৎস্নাফুল্ল নৈশ আকাশে উঠে আগমনী গান। জলহারা মেঘের কোলে শোভা পায় বলাকামালিকা। বাঙলার ঘরে ঘরে শস্যসম্পদ, বাজারে বাজারে কেনাবেচার বড় ধুম। পূজা আসিয়া পড়ে। বঙ্গ-প্রকৃতির এই সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত ক্ষণটিতে সঙ্ঘটিত হয় বলিয়াই দুর্গাপূজা বাঙালীর এত প্রাণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে—ইহাও সংশয়াতীত সত্য।

পূজা আসে, স্কুল কলেজ ও অফিসের কারাদ্বার হয় উন্মুক্ত। বাঙালীর সেদিন বড় আনন্দ। সুদূর প্রবাস হইতে দলে দলে লোক বাড়ী ফিরিতে থাকে, নগরের বদ্ধ-পরিবেশ হইতে এবার সাময়িক মুক্তি। নদনদীর বুকে নৌকাশ্রেণীর পবনপূরিত পালগুলি যেন আনন্দে ফুলিয়া উঠে—বহন করিয়া আনে বাঙালীর প্রবাসী স্বজন।

এদিকে দিনে দিনে ষষ্ঠীর সুমধুর দিনটি ঘনাইয়া আসে। আকাশবাতাস মুখরিত করিয়া ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টার উঠে আনন্দরোল। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিন দিন অহর্নিশ 'উৎসব'। বিশেষ করিয়া অষ্টমী ও সন্ধিপূজার সময় ভারী ঘটা। দলে দলে লোক পূজাঙ্গন ভরিয়া তোলে। নূতন বসনে ও শ্রেষ্ঠ ভূষণে সাজিয়া স্ত্রীপুরুষ বালকবৃদ্ধ—বাঙালীমাত্রই বড় সাধের এই দিন তিনটি প্রাণ ভরিয়া আনন্দ করে। শুদ্ধশুচি মনে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য সারা সকাল উপবাসে কাটে। তারপর বলির পালা। মহিষ, ছাগ, অন্ততঃ কলা কুষ্মাণ্ড ও আখ বলি পড়ে। মত্ত তালে বাদ্য বাজে, নাচিয়া উঠে রক্ত। দিবাশেষে সন্ধ্যারতির লাগে ধুম। শেষরাত্রে ফুল তুলিবার বিনিদ্র অভিযান। দিনগুলির প্রতিটি ক্ষণ ভরিয়া উঠে আনন্দচঞ্চল কর্ম্ম-ব্যস্ততায়, তারপর সহসা বিজয়া আসিয়া পড়ে। মন ভাঙিয়া যায়। মায়ের চোখেও যেন অশ্রুসজল বিমর্ষতা দেখা দেয়। ঢাকের কঠোর নিনাদ এবার প্রলম্বিত হইয়া নিদারুণ বিষাদে যেন হাহাকার করিয়া উঠে। বিসর্জ্জনযাত্রা হয় সুরু; ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মায়ের পাদস্পর্শ করিয়া বিদায় দিতেই হয়! শূন্য মণ্ডপের হতশ্রী রিক্ততা আর পূজাপ্রাঙ্গণের জনহীন নিস্তব্ধতা অতিশয় করুণ হইয়া উঠে।

বিসর্জ্জনের পর ফিরিয়া আসিলে রমণীগণ ধান্যদূর্ব্বা দিয়া বরণ করেন সকলকে। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদে প্রণাম জানায়। কোলাকুলির নিবিড় আশ্লেষে শত্রুমিত্র সেদিন প্রীতি বিনিময় করে। এরূপে এক বৎসরের জন্য দুর্গাপূজার অবসান হইয়া যায়।

আজকাল শহরের দুর্গাপূজায় অবশ্য অতিরিক্ত আলোকসজ্জা ও বাহ্য আড়ম্বরটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। রেডিও, লাউড্স্পীকার ও সাজসজ্জারই সেখানে অনর্থক

বাহুল্য। বস্তুতঃ পূজা সেখানে হয় না, হয় শারদোৎসব, এবং তাহারও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঘটা বিসর্জ্জনের দিনটায়। বাঙালীর জীবনে যে শক্তির আবাহন অপেক্ষা বিসর্জ্জনটাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, এই কঠোর সত্যটুকুই যেন শহরের পূজায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

সরস্বতীপূজা

শ্বেতপদ্মাসীনা সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অকলঙ্ক শুভ্র তাঁহার রূপ। হস্তে তাঁহার বীণা, বাহন হংস।

শুচিসুন্দর এই মূর্ত্তিমতী বিদ্যার নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। দেবী সাত্ত্বিক জ্ঞানালোক ও পবিত্রতার প্রতীক বলিয়াই এরূপ বিশুদ্ধ শুক্লতা-মণ্ডিত।

কিন্তু সাধারণের নিকট সরস্বতীমূর্ত্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য মুখ্য নহে। বাঙলায় অন্ততঃ সরস্বতীদেবীর ধ্যান অপেক্ষা তাঁহার পূজার আনন্দোচ্ছল বাহ্য অনুষ্ঠানটাই প্রধান। বস্তুতঃ সরস্বতীপূজা বর্ত্তমানে উৎসবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আড়ম্বর ও ঘটার দিক্ দিয়া দুর্গাপূজার পরই ইহার স্থান। কিন্তু দুর্গাপূজারও অধিক ইহার ব্যাপকতা। বাঙলার ঘরে ঘরে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু দুর্গাপূজা হয় অল্পসংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ ও বিত্তবানের গৃহে। তাহা ছাড়া, সরস্বতীপূজা বিশেষভাবে ছাত্রগণেরই পূজা। তাই ইহার মধ্যে দুর্গাপূজার সেই মহতী রাজকীয়তা না থাকিলেও, আছে সহজ ও প্রচুর প্রাণস্ফূর্ত্তি। সত্যই কিশোরকিশোরী ছাত্রছাত্রীর অনিরুদ্ধ প্রাণশক্তির মধুর উচ্ছ্বাসে সরস্বতীপূজা বাঙলায় অনন্য মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে।

পূজা ও প্রকৃতির আনন্দে যখন সহজেই মিলন ঘটে, বৎসরে ঠিক সেই শুভক্ষণেই হয় সরস্বতীপূজা। মাঘ-ফাল্গুনের কোন একটা মধুর সময়ে মধুমাসের আসন্নতা ফুলেফলে আর আম্রমুকুলে জাগাইয়া তোলে নূতন প্রাণের সাড়া ; বিলীয়মান কুয়াসার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া প্রকৃতি আবার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি তুলিয়া ধরে। খরসূর্য্যের উত্তরায়ণে দক্ষিণের মুক্তদ্বারে মন্দ-মলয় বহে ; কুঞ্জে কুঞ্জে বসন্তের মন্ত্রগুঞ্জরণ অনুরণিত হয়,—শীতের শেষ—বাসন্তী পঞ্চমী সমাগত।

দিকে দিকে অমনি সাড়া পড়িয়া যায়। পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালায় পাঠশালায় শিশুগণের মধ্যে সহসা আনন্দচঞ্চল কর্ম্মব্যস্ততা দেখা দেয়। বৎসরের লেখাপড়া সাফল্য-অসাফল্যের হিসাবনিকাশ পূর্ব্বেই সমাধা হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষার হাসিকান্নার পালার বহুপূর্ব্বে হইয়াছে যবনিকাপাত। এবার নির্ভার নিঃশঙ্ক ও নিঃসঙ্কোচ শুধু আনন্দের উৎসার। চতুর্থীর রাতে সেই ফুল তুলিবার বিনিদ্র অভিযান, দেবদারুপত্রে তোরণ-রচনা আর পুষ্পমাল্যে মণ্ডপসজ্জা—কত কাজ! অতন্দ্র অনলস প্রয়াসে কাটে চতুর্থী,

আসে সুখের শ্রীপঞ্চমী। শিশুগণ তাহাদের পাততাড়ি আনিয়া রাখে দেবীপদতলে—যত্নধৌত মস্যাধার নবীন মসীতে পূর্ণ করিয়া বা মসীহীন মস্যাধারে আতপ দুগ্ধ রাখিয়া তাহাতে খাকের কলম স্থাপন করিতে হয়। কিশোরকিশোরী যুবকযুবতী আপন আপন বাছা বাছা শক্ত বইগুলি আনিয়া রাখে দেবীর কৃপাস্পর্শ পাইবার আশায়। তারপর আসে অঞ্জলি দিবার পালা। সারা সকাল নিরম্বু উপবাসে কাটাইয়া ভক্তি-অবনত চিত্তে তাহারা অঞ্জলি দেয় দেবীর পদে।

এদিকে শহরের বিদ্যালয়ে ও পল্লীতে পল্লীতে জমিয়া ওঠে মহাসমারোহ। যন্ত্র-সঙ্গীতের তুমুল কোলাহল পূজাঙ্গন মাতাইয়া সমগ্র শহরকেই মুখরিত করিয়া তোলে। সেখানে সাজসজ্জার আড়ম্বর রীতিমত রাজসিক, সেখানে জয়ধ্বনি উঠে মুহুর্মুহুঃ। 'সরস্বতী মায়ীকী জয়'-এর সহিত নেতাজী, গান্ধীজী প্রভৃতির জয়জয়কার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

এইভাবে পঞ্চমী কাটিয়া যায়। বৎসরের একটিমাত্র ক্ষুদ্র হ্রস্ব দিন উহার পলে পলে এত মধু বহন করিয়া আনিয়া সহসা যেন স্তিমিত হইয়া আসে। পল্লীগ্রামে বালকদল বিমর্ষ হইয়া পড়ে। শহরে কিন্তু বিসর্জ্জনের ধুমটাই পূজার অপেক্ষাও শতগুণে জাঁকাইয়া উঠে। মোটর-লরীতে করিয়া অসংখ্য প্রতিমার মিছিল স্রোতের ধারায় বহিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যভাণ্ডের আর সামরিক ব্যাণ্ডের বিশৃঙ্খল ঘোর কলরোল। বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীসহকারে মুখোস ও মুখবিকৃতিসহযোগে ছাত্রদলের মত্ততা শহরের প্রতিমা-নিরঞ্জন অনুষ্ঠানকে একপ্রকার নেশায় মাতাইয়া তোলে।

অথচ শহরই আধুনিক বিদ্যার পীঠস্থান। বিদ্যাদেবীকে মানুষ সেখানে সরসী-বক্ষে শতদলসমাসীনা না করিয়া কৃত্রিম পাহাড়ে প্রতিষ্ঠা করে এবং তারপর পর্ব্বতচূড়া হইতে একেবারে নদীগর্ভে সোল্লাসে বিসর্জ্জন! বি. এ., এম্. এ.-র সোপান বাহিয়া সমুচ্চ শিখরে উঠিয়া 'পাশ' (pass)-এর বৈতরণী পার হইবার জন্য আমরা ঝম্প প্রদান করি এবং তারপরই বিদ্যাকে জীবনে সার্থক না করিয়া অবিদ্যার ঘনঘোরে হাবুডুবু খাই। বাঙালীজীবনের এই ক্রূর সত্যটিই যেন শহরের পূজায় অভিব্যক্তি লাভ করে।

ঈদ্

প্রতিবৎসর দুইবার ঈদ্‌পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। রমজান মাসের শেষে শওয়াল মাসের পয়লা তারিখে উদ্‌যাপিত হয় ঈদুল্-ফিতর্ মিলনোৎসব, আর জিল্‌হিজ্ মাসের দশম দিনে অনুষ্ঠিত হয় ঈদুজ্-জোহা মহোৎসব। ঈদুল্-ফিতর্ হইতে ঈদুজ্-জোহায় যেন আধ্যাত্মিকতা গভীরতর; তবে শুচিতায় ও কলাণময়তায় উভয় পর্ব্বই অপূর্ব্ব মহিমমণ্ডিত।

ঈতুল্-ফিতরের পূর্ব্বে দীর্ঘ রমজান মাস ধরিয়া চলে রোজা। এই মাসে প্রত্যেক মুসলমান সারাদিন নিরম্বু রোজা যাপন করিয়া প্রতিদিন রাত্রিতে আহার্য্য গ্রহণ করেন। পূত রমজান মাস যেন আত্মার শুদ্ধিবিধানেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট। সংযম ও ধর্ম্মধ্যানে অতিবাহিত হয় রমজান। পার্থিব প্রয়োজনে মানুষকে দিবাভাগে কর্ম্মচঞ্চলই থাকিতে হয়। কিন্তু রাত্রির প্রশান্ত গভীরতায় মনকে একনিষ্ঠ করিবার সুযোগ আসে। তাই শুচিশুদ্ধ মনে কোরানপাঠ বা শ্রবণ এবং নামাজাদি ধর্ম্মাচরণের মধ্য দিয়া খোদাতাল্লার স্মরণে পরম নিষ্ঠায় রমজানের দিনগুলি কাটিয়া যায়। তারপর বহুপ্রত্যাশিত সেই শওয়াল মাসের পরমপবিত্র দিনটি আসিয়া পড়ে। ঈতুল্-ফিতর্ উৎসবের দিব্যপ্রীতির স্নিগ্ধ হাস্য লইয়া যেন শশিকলার অকলঙ্ক শুক্লতা শতগুণে বাড়িয়া যায়। নরনারী সেদিন ভক্তি-অবনত চিত্তে মহোল্লাসে চন্দ্র দর্শন করে। কিন্তু সকাল হইতেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া যায়। প্রত্যেকে শুচিবাস পরিয়া মস্‌জিদে গিয়া নামাজে যোগদান করে—দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে নিয়মনির্দ্দিষ্ট প্রার্থনায় একাগ্র চিত্তের সুগভীর ভক্তি নিবেদিত হয় আল্লার উদ্দেশে। ঈতুল্-ফিতর্ মিলনের পরমোৎসব, ভ্রাতৃত্বের ইহা পরম ব্রত। উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র সকলে সেদিন আনন্দের নিবিড় আশ্লেষে এক হইয়া যায়। কৃত্রিম সমাজের কৃত্রিমতর ব্যবধান ঘুচাইয়া স্বর্গনির্দ্দিষ্ট ঐক্যমন্ত্র যেন প্রতি মুসলমান-চিত্তকে সাম্যভাবে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। মিলনের আলিঙ্গনে ছোটবড় সকলে সেদিন গভীর প্রীতির বন্ধনে স্বর্গসুখ ভোগ করে। মানুষ যাহার যেমন সাধ্য তেমনিভাবে দীনহীন ক্ষুধিতের প্রতি উন্মুক্ত করিয়া দেয় আপনার খাদ্যভাণ্ডার। কবির ভাষাকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা চলে—'সকলের তরে সকলে সেদিন, প্রত্যেকে সেদিন পরের তরে'। প্রেমপ্রীতির পুণ্যমহিমায় সমুজ্জ্বল ঈদের দিনটি কাটিয়া যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী দুইটি দিনেও সমারোহ শেষ হয় না। সাড়ম্বরে মিলনান্দ আর প্রাণঢালা হাসিগানে কাটে তিনটি পবিত্র দিন।

ঈতুজ্-জোহা পর্ব্বটিও বড় পবিত্র। সংসারের মায়াবন্ধন হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া খোদার প্রতি একনিষ্ঠ করিবারই ইহা সাধনা। সুদূর অতীতের নবীশ্রেষ্ঠ ইব্রাহিমের পবিত্র কথা স্বভাবতঃই ইহা মর্ম্মমূলে মুদ্রিত করিয়া দেয়। কথিত আছে যে, ঈশ্বর ইব্রাহিমের ভক্তিপরীক্ষার জন্য একদা তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইলকে কোরবানী করিবার আদেশ করেন। একান্ত ঈশ্বরনিষ্ঠ মহাপ্রাণ ইব্রাহিম যেই পুত্রের কণ্ঠে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হন অমনি দৈবাদেশ হয় প্রতিনিবৃত্তির। ঈশ্বর এই অপূর্ব্ব ভক্তিতে প্রীতিলাভ করিয়া কোরবানীর জন্য একটি দুম্বা বা মেষ ইব্রাহিমের সম্মুখে রক্ষা করেন। ভক্ত নবী দুম্বা কোরবানী করিয়া ভগবানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞচিত্তের ভক্তি নিবেদন করেন। সেই হইতেই জগৎময় কোরবানীর প্রচলন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গো, মেষ, ছাগ, উষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন জীব এই কোরবানীতে উৎসর্গীকৃত হয়। এই পরম

পবিত্র দিবসে মস্‌জিদে মস্‌জিদে বিপুল জনসঙ্ঘ গভীর ভক্তিসহকারে নামাজ পড়ে। পরমপ্রীতিতে উজ্জীবিত হইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত প্রেমালিঙ্গনে প্রীতি বিনিময় করে। ঘরে ঘরে সাধ্যমত আনন্দোৎসব চলে দিবারাত্র। পূত কোরবানীর পশু ভাগ করিয়া পরিবেশিত হয় সকলের মধ্যে। দান ও সেবার পুণ্যকর্ম্মে ভরিয়া উঠে এই দিনটি, প্রতি চিত্তে জাগাইয়া দেয় ভক্তির মাহাত্ম্য আর দিব্যকরুণার পরম উপলব্ধি।

ঈদ্‌পর্ব্ব দুইটি এইরূপে মুসলমানজগতে পবিত্র উৎসবের মধ্য দিয়া ভ্রাতৃভাবে গভীর সংসক্তি আনিয়া দেয়।

মহরম

মহরম মুসলমানগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্ব্ব। কারবালা প্রান্তরে পুণ্যাত্মা ইমাম হোসেনের শোচনীয় মৃত্যুর স্মৃতিকল্পেই এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

হজরত মোহাম্মদের জামাতা হজরত আলী ও দামাস্কাসের শাসনকর্ত্তা মাবিয়ার মধ্যে চতুর্থ খলিফার পদ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে শেষ পর্য্যন্ত এই মীমাংসা হয় যে, প্রথমে মাবিয়া এবং তাহার পর হজরত আলী খলিফা হইবেন। কিন্তু মাবিয়ার পূর্ব্বেই আলীর মৃত্যু হয় এবং মাবিয়ার মৃত্যু হইলে আলীর পুত্র ইমাম হাসান খলিফার পদ দাবী করিলে মাবিয়া-পুত্র এজিদের সহিত ঘোর কলহের সূত্রপাত হয়। কুটিল এজিদ বিষপ্রয়োগে হাসানকে হত্যা করেন এবং তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা ইমাম হোসেনকেও কারবালার মরুপ্রান্তরে নিষ্ঠুর যুদ্ধে নিহত করেন। সসৈন্যে হোসেন সেই উষর মরুর বুকে বিন্দুমাত্র জল না পাইয়া নিদারুণ তৃষ্ণায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দেহরক্ষা করেন।

মহরম পর্ব্বটির মধ্য দিয়া প্রতিবৎসর সেই মর্ম্মান্তিক ঘটনাটি আজিও প্রতি মুসলমানচিত্ত মথিত করিয়া দিয়া যায়। মহরম কথাটির মধ্যেই ঘনীভূত হইয়া আছে সীমাহীন বিয়োগব্যথা। আরবী মহরম মাসের দশম তারিখে এই অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়।

ঐ মাসে অমাবস্যার পরে প্রথম চন্দ্রদর্শনের ক্ষণ হইতে রোজা পালিত হয়। নিষ্ঠার সহিত রোজা পালন করিয়া মুসলমানগণ তখন 'অছুরখানা'য় সমবেত হন এবং 'ফতিহা' পাঠ করিয়া তাঁহারা শীতল শরবত বিতরণ করেন। সুদূর অতীতে কারবালা প্রান্তরের সেই মরুজ্বালার শান্তি করিবার জন্যই যেন এই রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। মহরমের সময় বালক ও যুবকগণের মধ্যে অপর একটি রীতিও বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। প্রতিরাত্রে আগুন জ্বালাইয়া তাহারই পার্শ্বে নানাপ্রকার অস্ত্রক্রীড়ায় তাহারা কারবালার যুদ্ধ স্মরণ করে। এদিকে 'অছুরখানা'য় কাগজাদির সাহায্যে

সুদৃশ্য তাজিয়া স্থাপিত হয়। ইহা হোসেনের কবরেরই অনুকল্প। এরূপে মহরমপর্ব্ব একদিন একদিন করিয়া নবম দিবসে উপনীত হয়। তাজিয়াসহ লোকে গ্রামে গ্রামে আর শহরে শহরে মিছিল বাহির করে। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ বুক চাপড়াইয়া 'হায় হোসেন, হায় হোসেন' ধ্বনি করিয়া দৃশ্যটিকে বড়ই করুণ করিয়া তোলেন।

দশম দিবসে তাজিয়া-নিমজ্জনের উৎসব। দলে দলে মুসলমানগণ তাজিয়াসহ বিরাট্ জলাশয়ে উপস্থিত হন। তারপর পবিত্র কোরান শরীফ পাঠ করিয়া ভক্তিপ্লুত অন্তরে তাজিয়া বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকে সাধ্যমত দীনদরিদ্র ও বুভুক্ষুকে পানভোজনে আপ্যায়িত করেন। কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনাটির স্মরণে এরূপে মুসলমানচিত্ত একদিকে করুণা, অপরদিকে মহত্ত্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

দেহচর্চ্চা

সাঁতার

সন্তরণই সর্ব্বমুখী আদর্শ ব্যায়াম। ডন, বৈঠক, ডাম্বেল, প্যারালেল বার প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম দেহের এক-একটি অংশেরই পরিপুষ্টির সহায়ক। ইহাদের মধ্যে এমন একটিমাত্র ব্যায়াম নাই যাহা সর্ব্বদেহের যুগপৎ বিকাশ সম্ভব করে। এ বিষয়ে সাঁতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশই নহে, মনেরও আনন্দবিধানে সাঁতারের মত ব্যায়াম খুব বেশী নাই।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে আমাদের অনেক ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে। পেশীগুলির পুষ্টি স্বাস্থ্যের নিঃসন্দেহ নিদর্শন বলিয়া এখনও লোকের ধারণা। কিন্তু সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে ফুস্ফুস্ ও হৃদ্যন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর প্রয়াস। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব তো চাই-ই এবং সেজন্য পেশীচর্চ্চাও যথা-বিহিত হইয়া প্রয়োজন; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের শক্তিসঞ্চার। একমাত্র সাঁতারই এই উভয় প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য প্রদান করিতে পারে।

সাঁতারের নানা বিধি আছে। বুকের প্রশস্ততা ও স্কন্ধের পেশীগুলির পরিপুষ্টি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য হামাটানা সাঁতার আদর্শ ব্যায়াম। এইরূপ দেহের বিভিন্ন অংশের বিশেষ বিকাশের জন্য বিভিন্ন সন্তরণ-প্রক্রিয়া আছে। এসকল-দ্বারা শুধু যে বহিরঙ্গের উন্নতি হয় তাহা নহে, দেহাভ্যন্তরস্থিত ফুস্ফুস্ ও হৃদ্যন্ত্রেরও অশেষ শক্তিবৃদ্ধি হয়। সাঁতারের সময় বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণের সুযোগ ঘটে; তাহাতে নানাপ্রকার ব্যাধির আক্রমণস্থল ফুস্ফুস্টির প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়া যায়। হৃদয়ের পক্ষেও নাকি ইহা অপেক্ষা উন্নততর আর কোন ব্যায়াম নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীও সময় সময় সাঁতার কাটিয়া সুফল লাভ করিয়াছে। এমন কি সাঁতারদ্বারা কুব্জ দেহও সরল হইয়াছে, এমন উদাহরণ বিরল নহে।

ব্যায়ামমাত্রেরই অন্যতম প্রধান কাজ হইল দেহযন্ত্রকে সম্যক্ চালনা করিয়া গ্রন্থিগুলিকে অধিকতর সক্রিয় করিয়া তোলা। সংবহন ও বিপাক-প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করিয়া উহা দেহাভ্যন্তরস্থ নানাপ্রকার দূষিত বস্তু স্বেদস্রোতে নির্গত করিয়া দেয়। কিন্তু রোমকূপই নির্গমপথ—তাহারা ক্লেদমুক্ত না থাকিলে হিতের আশা নাই। সাঁতার কাটিবার সময় ত্বকের পরিচ্ছন্নতা আপনা হইতেই সাধিত হইয়া যায় এবং সেই কারণে রোমকূপগুলি সর্ব্বদা মুক্ত থাকে।

স্বাস্থ্যচর্চ্চার উপায়হিসাবে সাঁতারের উৎকর্ষ, তাহা হইলে, বিতর্কের বাহিরে। ইহা ব্যতীত উহার অপর একটি উপযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেহকে সবল ও সুস্থ করা যেমন মানুষমাত্রেরই অভীষ্ট, উহার সৌন্দর্য্যবিধানও তেমনি সকলের একান্ত কাম্য। আজিকার দিনে প্রসাধনচর্চ্চার বহুল বিস্তারের মূলে এই আকাঙ্ক্ষাই নিহিত দেখিতে পাই। কিন্তু ঘষিয়া-মাজিয়া রঙ করিয়া কি আর সত্যকার শ্রী বিকশিত হয়? সুস্থ দেহের লাবণ্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। সাঁতার পুষ্টির সহিত সৌষ্ঠব বিকাশ করে, শক্তিসঞ্চারের সহিত ফুটাইয়া তোলে সুঠাম দেহশ্রী।

সর্ব্বশেষে সাঁতারের চিত্তবিনোদন-ক্ষমতাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। সাঁতার খেলায় খেলা, দেহচর্চ্চায় দেহচর্চ্চা। বালক বৃদ্ধ আর স্ত্রী পুরুষ—সকলে সমানভাবে যেমন উপকৃত হয় ইহাদ্বারা, তেমনই উপভোগ করে ইহার আনন্দটুকু। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সাঁতারের তাই এত সমাদর। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তো কথাই নাই। শীতল জলের স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিতে করিতে ভাসিয়া ভাসিয়া বা ডুবিয়া ডুবিয়া সাঁতার কাটা এদেশে সত্যই অতি মধুর।

কখনও কখনও দেহমনের পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ এই সাঁতারের অন্যতর উপযোগিতাও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে নদনদী ও জলাশয়ের মধ্যে অনেক সময় নরনারী বিপন্ন হইয়া পড়ে। এমন বিপদের সময় সন্তরণপটু ব্যক্তিই মাত্র জীবনরক্ষায় পারদর্শী। বর্ত্তমান কালে আত্মরক্ষা এবং বিপন্নের উদ্ধারের জন্য সন্তরণ-প্রক্রিয়ায় নানাপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণের মধ্যে ইহাদের প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বাহিরের খেলা—দেশী ও বিদেশী

মানুষের সমগ্র জীবনটা বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, ইহা অনেকাংশে একটা খেলা—কিছু ইহার কর্ত্তব্য। তাই বলিয়া জীবন যে মূলতঃ মায়াপ্রপঞ্চময় একথাও ঠিক নহে। বলার উদ্দেশ্য ইহাই যে, ক্রীড়া জীবনের একটা বিশেষ অপরিহার্য্য অঙ্গ। শৈশবে শিশুমাত্রই যেমন খেলাধুলা লইয়া তাহার দায়ভারহীন শূন্য জীবন ভরিয়া তোলে, পরিণত বয়সে মানুষমাত্রই তেমনি কোন-না-কোন একটা ক্রীড়াকলাপের সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনের শতবিধ কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে মনকে ক্ষণতরে মুক্ত করিয়া দেয়। ধনী নির্ধন, পঙ্গু অলস, যুবক বৃদ্ধ—কেহই খেলা ছাড়া বাঁচিতে পারে না। ইহাই জীবনের অতিবড় সত্য।

তবে খেলা দুই প্রকারের—একটি দেহপ্রয়াসনিরপেক্ষ ঘরের খেলা, অপরটি বাহিরের। বাহিরের খেলাতেই মাত্র দেহমনের যুগপৎ সক্রিয়তা প্রয়োজন। এই

হিসাবে ঘরের খেলা অপেক্ষা বাহিরের খেলাই শ্রেয়। উহাই মাত্র দেহের পুষ্টি ও মনের তুষ্টি একই সঙ্গে সাধন করিতে পারে।

জীবনকে কর্ম্ম বলিয়া কেহ কেহ অভিহিত করেন। সত্যই তো সাধারণ মানুষ অহর্নিশ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের বিনিময়েই অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে। মানুষের সমাজ ও অন্ধ প্রকৃতি কেহই অলসতা সহ্য করে না। এই নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মধারায় মানুষের বিকাশও হয় সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে নিয়ন্ত্রিত বলিয়াই কর্ত্তব্য চিরকাল কটু। খেলার মধ্যে মানুষ স্বেচ্ছায় যে কার্য্যে অনুপ্রাণিত হয়, তাহাতে এই ক্ষুধার শাসন নাই। তাই তাহা এত প্রিয়, তাই তাহার শুভদা শক্তি এত বেশী। বাহিরের খেলায় মুক্ত মাঠে-প্রান্তরে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই মানুষ অজস্র শ্রম স্বীকার করে। তাহাতে দেহেরও যেমন পরিচালনা হয়, মনও তেমনি ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। স্বাস্থ্যদানে বাহিরের খেলা তাই আদর্শ। ব্যায়ামশালায় নিয়মিত শরীরচর্চ্চাতেও দেহ পুষ্ট হয় জানি, কিন্তু এই যান্ত্রিক নিয়মানুবর্ত্তিতায় আছে একটা বর্ণলেশহীন একঘেয়েমি আর একটা নিরাবেগ একটানা কৃচ্ছ্রসাধন। সেই কারণেই বোধ হয় এইরূপ শরীর-চর্চ্চায় মস্তিষ্কের রস শুকাইয়া কেবল দেহের মেদমাংসেরই হয় বৃদ্ধি। বাহিরের খেলায় কিন্তু মানসিক উপভোগটুকুই প্রধান এবং সেইজন্যই বোধ হয় দৈহিক স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যবান্ খেলোয়াড়মাত্রেরই মনটিও সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু প্রফুল্লতা বস্তুটি তো দায়িত্ব-বোধহীন নিরর্থক আনন্দও নহে। বিকশিত কুসুমের উজ্জ্বল হাস্য যাহা, হৃদয়শতদলের সুস্থ অভিব্যক্তিস্বরূপ এই প্রফুল্লতাও তাহাই। মানসিক স্বাস্থ্যের ইহা বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। খেলার মধ্য দিয়া মনের এই বিকাশ কিরূপে সম্ভব হয় তাহা অবশ্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। দেশী খেলার মধ্যে হাডু-ডু, গাদি প্রভৃতি খেলার আলোচনা করিলে দেখি উহাতে যেমন শক্তি চাই, তেমনি চাই ক্ষিপ্রকারিতা, উপস্থিতবুদ্ধি ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। আবার এমন অনেক খেলা আছে যাহাতে সঙ্ঘশক্তি ও সহযোগিতা ভিন্ন জয়লাভ অসম্ভব। পারদর্শী খেলোয়াড় তাই সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে মনের এইসকল গুণের নিরবচ্ছিন্ন চর্চ্চা করিয়া থাকে। দেহের ক্ষমতার সহিত এভাবে মনেরও পরিপুষ্টি ঘটে। মানসিক উন্নতিবিধানে কিন্তু দেশী অপেক্ষা প্রচলিত বিদেশী খেলাগুলিরই কার্য্যকারিতা বেশী বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ ফুটবলখেলার কথা বলা যাইতে পারে। ফুটবলখেলায় স্বার্থবুদ্ধি-বিসর্জ্জন অপরিহার্য্য। কারণ, একজন কে. ভট্টাচার্য্য যত ভালই খেলুন না, তাঁহার একক প্রয়াসে জয় সুদূরপরাহত। খেলার মাঠে সহযোগিতাই জয়ের প্রথম ও প্রধান সোপান। তারপর চাই শৃঙ্খলাবোধ। আত্ম-পক্ষের খেলোয়াড়ের সহিত বৃথা কাড়াকাড়িতে কোন ফল নাই; একে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যটুকু যথাবিহিত সাধন করিতে পারাই সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের কাজ। আমার পায়ে যখন বলটা আসিয়া

পড়িল তখন যদি অবহেলা না করিয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তবেই হইল আমার সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির প্রশংসনীয় দায়িত্বপালন। তবে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সাধন করিতে হইলে আবার অন্যতর মানসিক গুণেরও প্রয়োজন। বুঝিতে হইবে অবস্থান ও সহকারীর সুবিধা। এই বিচারশক্তির অভাবে ভাল খেলিয়াও পরাজয় বরণ করিতে হয়। হকিখেলাও ফুটবলখেলারই অনুরূপ। উভয় খেলাতেই উত্তেজনা বা আবেগের স্থান নাই। সংযত চিত্তে মাথা ঠিক রাখিয়া খেলিলেই এসকল খেলায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করা যায়। ক্রিকেটখেলায় সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থিরবুদ্ধির প্রয়োজন। ক্ষিপ্রতা, বিচার ও সহযোগিতা এই খেলাতেও নিতান্ত অপরিহার্য্য। ইহাতে আরও প্রয়োজন চক্ষুর অভ্রান্ত দৃষ্টি ও মনের একাগ্রতা।

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বাহিরের খেলাতেই এরূপ দেহমনের অশেষ অনুশীলন হয়। জয়পরাজয়-সম্বন্ধে নির্ব্বিকারচিত্ততাও খেলার অপর একটি সুন্দর শিক্ষা। এই শিক্ষার ফলেই আদর্শ খেলোয়াড় সকলপ্রকার আকস্মিকতার সম্মুখে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে; বিহ্বলতা তাহাকে কখনই কর্ত্তব্যমূঢ় করিয়া দিতে পারে না। চরিত্রের দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পের অনমনীয়তা তাহাতেই বৃদ্ধি পায়।

দেহ ও মনের পুষ্টিই কিন্তু বাহিরের খেলার একমাত্র দান নহে। আনন্দও উহার অনাবিল উপহার। বন্ধুর জীবনপথের পথিক মানুষ খেলার মধ্য দিয়া এরূপে নানাভাবে লাভবান্ হয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে, ইটনের ক্রীড়াক্ষেত্রেই ওয়াটার্লুর যুদ্ধজয় হইয়া যায়। ওয়াটার্লুর বৃটিশ সিংহ ইটনের খেলার মাঠে যে সকল গুণ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে উহারাই তাঁহাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে জয়মাল্যে ভূষিত করে। ইহাই প্রবাদটির অর্থ। খেলার সার্থকতা-সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কিছুই বলার প্রয়োজন নাই।

স্বাস্থ্যই সম্পদ্

স্বাস্থ্যই যে সম্পদ্—ইহা অনেকের নিকট একটা কথার কথা মাত্র। ইহার গভীর তাৎপর্য্য খুব অল্প লোকই বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখে। একটা বাড়ী বা একবিঘা জমিকে সম্পদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও মনে কোন প্রশ্ন জাগে না। কিন্তু স্বাস্থ্যকে সম্পদ্রূপে স্বীকার কয়জন করেন? অথচ যে অর্থে প্রত্যেক বাড়ীওয়ালার নিকট বাড়ীটা সম্পত্তি, যে অর্থে কৃষকমাত্রেরই নিকট জমিটা সম্পদ, ঠিক সেই অর্থেই স্বাস্থ্যও প্রত্যেকের নিকট পরম সম্পদ্। বাড়ী ভাড়া দিয়া আয় হয়, জমি হইতে ফসল পাওয়া যায়; সেইরূপ স্বাস্থ্যও উপার্জ্জনের সহায়। তবে জনৈক স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি নিজের বিপুল স্বাস্থ্যকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ-টাই তাঁহার মস্ত দায়। উহার

প্রয়োজন মিটাইতেই উদরপথে তাঁহার সব গেল। কথাটার মধ্যে সত্য যে নাই তাহা নহে। স্বীকার করিব যে স্বাস্থ্য-অনুযায়ী কর্ম্মের সুযোগ সকলের ঘটে না এবং জুটিলেও সর্ব্বদা আনুপাতিক উপার্জ্জন হয় না। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, বোমার দিনে বাড়ী হইতেও আয় হয় নাই, অজন্মা বা বন্যার সময়ে জমিতে ফসল হয় না। পরশ্রমজীবী সমাজের বর্ত্তমান কৃত্রিম ব্যবস্থায় তেমনি স্বাস্থ্যরূপ সম্পদেরও উপযুক্ত আয় দেখা যায় না। তাই বলিয়া সম্পদ্‌কে বিপদ্ বলিয়া বর্ণনা করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

স্বাস্থ্য সম্পদ্‌ই বটে—পার্থিব সকল সম্পদ্ হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ। জগতের অর্থসম্পত্তি সুখ দেয় বলিয়াই মর্য্যাদা লাভ করে, কিন্তু স্বাস্থ্য না থাকিলে বিপুল অর্থও নিতান্ত নিরর্থক। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে স্বর্ণপাত্রে পরিবেষিত দধিদুগ্ধক্ষীরছানা আর মৎস্যমাংসডিমমাখনের প্রাচুর্য্য যেমন নিয়তির ক্রূর পরিহাস, জাগতিক যাবতীয় সম্পদ্‌ও তেমনি স্বাস্থ্য-সম্পদ্ বিনা নিতান্ত অর্থহীন। অথচ স্বাস্থ্য থাকিলে কপর্দ্দকহীন অতিদরিদ্রও প্রাসাদবাসী রাজার অপেক্ষা সুখী। স্বাস্থ্য দেহমনের শক্তির উৎস, স্বাস্থ্য সঞ্চার করে কর্ম্মপ্রেরণা। স্বাস্থ্যেরই অভিব্যক্তি সদা-প্রফুল্লতা।

গত যুদ্ধের সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে শুনিয়াছি কোন বিরাট্ ধনী ব্যক্তি তাড়ায় তাড়ায় নোট দিয়াও একমুষ্টি অন্ন জুটাইতে পারেন নাই। আকাশপ্রমাণ বিপুল অর্থগৌরব তাঁহার সেদিন সহসা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পরম খেদে তখন মিথ্যা কাগজের বিত্ত তিনি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কাহিনী হইতে ইহাই বুঝি যে, অর্থ সম্পদের মাধ্যমবিশেষ। স্বাস্থ্যও তেমনি একহিসাবে পার্থিব বিত্তের সম্ভাবনামাত্র। খাটাইবার সুযোগ থাকিলে ইহা প্রভূত উপার্জ্জনের কারণ হইতে পারে, সুযোগের অভাবে কখনও কখনও তাহার কার্য্যকারিতা অদৃশ্য হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় স্বাস্থ্য সম্পদ্ ও সুখের আকর।

সোনার মোহরগুলি যদি কলসীতে পূরিয়া মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখা যায়, তবে তাহা যক্ষের ধন হয়; মানুষের নিকট কিন্তু তখন উহারা মাটির ঢেলার মত নিতান্ত অসার্থক হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যকেও তেমনি কর্ম্মে নিয়োগ না করিয়া কেবল ভোজন-পারদর্শিতায় ব্যবহার করিলে উহার প্রয়োজন থাকে না। আলস্যে সর্ব্বনাশ—স্বাস্থ্যনাশ তো বটেই। তবে স্বাস্থ্য বলিতে দেহমনের যুগপৎ স্বাস্থ্যই বুঝিতে হইবে। যে বস্তু মানুষকে সকল জড়তা কাটাইয়া সক্রিয় রাখিতে পারে, তাহাকেই স্বাস্থ্য বলিব।

এই স্বাস্থ্য ভগবানের সহজ দান। অধিকাংশ মানুষ ইহা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল অভ্যাস ও জীবনের মত্ত নেশার ঘোরে পড়িয়া অনেকেই তাহা হেলায় নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অবশেষে স্বখাত সলিলে অকালে ডুবিয়া মারা যায়। তাই দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা উচিত। সময় হারাইয়া কেবল ঔষধ ও বায়ুপরিবর্ত্তনের ঠেকা দিয়া দেহটিকে টিকাইয়া রাখার প্রয়াস অতিবড় বিড়ম্বনা।

এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা প্রয়োজন, উপলব্ধি প্রয়োজন যে সম্পদ্ সঞ্চয়েরই নামান্তর। দেহবিষয়ে এই সঞ্চয় হইল সংযম।

কিন্তু সঞ্চয়কেও আবার খাটাইয়া, দাদন করিয়া বাড়াইতে হয়। স্বাস্থ্যসঞ্চয়কেও তেমনি নিয়মিত অনুশীলনে বৃদ্ধি করিতে হয়। এইজন্যই ব্যায়ামের প্রয়োজন। দেহকে অটুট রাখিতে হইলে শ্রমকে বর্জ্জন করা চলিবে না, মনকে সজীব রাখিতে হইলে নিষ্ক্রিয় 'ফসিল'-এর মত অচল হইয়া পড়িয়া থাকিলে হইবে না। স্বাস্থ্যই সম্পদ্—এই সত্য প্রগাঢ়ভাবে প্রণিধান করিয়া মানুষমাত্রেরই কর্ম্মব্রত অবলম্বন করা বিধেয়।

হিতাহার ও মিতাহার

শরীর একটা যন্ত্রবিশেষ। উহাকে সচল রাখিতে হইলে কয়লা দিতে হইবে, জল দিতে হইবে। তবে তো ইঞ্জিন চলিবে। দেহরূপ ইঞ্জিনের এই ইন্ধনই হইল আহার্য্য। খাদ্য হইতে উত্তাপ জন্মায় এবং সেই উত্তাপ রূপান্তরিত হইয়া কর্ম্মশক্তি সৃষ্টি করে। আবার খাদ্যের সারাংশ হইতেই দেহের ক্ষতিপূরণ ও পরিপুষ্টির ব্যবস্থা হয়। তাহা ছাড়া কতকগুলি খাদ্য আছে যাহা কেবল রোগ-প্রতিষেধকের কাজ করে। সুতরাং বিভিন্ন খাদ্যের বিভিন্ন গুণ ও কার্য্যকারিতা। এইজন্যই আহারবিষয়ে নির্ব্বাচন প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদিগের মতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মিতশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ২,৬০০ ক্যালরি উত্তাপ প্রয়োজন। এক হাজার গ্রাম (Gramme) জলের এক ডিগ্রি তাপ বাড়াইতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন, তাহাকেই এক ক্যালরি বলা হয়। খাদ্যবস্তুর মূল্যমান আজকাল এই ক্যালরির মাপেই স্থির হয়। প্রতিগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের ক্যালরিমান হিসাব করিয়া মোট কত ক্যালরি আমরা দৈনিক গ্রহণ করিতেছি এবং তাহা দেহরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বা অপ্রতুল তাহা বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। নচেৎ নির্ব্বিচারে কতকগুলি মুখরোচক বস্তু গলাধঃকরণ করিলেই দেহের হিত সাধিত হয় না, বরং কখনও কখনও হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে।

খাদ্যনির্ব্বাচনে কোন্‌টা হিতাহার কোন্‌টা নহে, তাহা নির্ণয় করিবার সময় আরও কয়েকটি বিষয় বিচার করা আবশ্যক। বয়স, আবহাওয়া, শারীরিক শ্রম এবং অনুরূপ অন্যান্য অবস্থাগুলিও খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকার নিয়ন্ত্রিত করে। শিশুর পক্ষে যাহা ক্ষতিকর, যুবার পক্ষে তাহাই হিতকর হইতে পারে। এরূপে হিতাহার ব্যক্তি ও অবস্থার বিচারে নির্ব্বাচন করিতে হয়।

বর্ত্তমান সভ্যসমাজে ভাইটামিনের প্রতি বড়ই আগ্রহ জন্মিয়াছে। টমেটো, পালং আর কত সব ভাইটা-আহারের বেশ একটা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু

ভাইটামিন বস্তুটা কি ? যন্ত্রের পক্ষে তেল (Grease) যে বস্তু, দেহের পক্ষে ভাইটামিন তাহাই। দেহযন্ত্রের মসৃণ গতি অব্যাহত রাখিবার জন্যই উহার উপযোগিতা। এখন ইঞ্জিনের চাকায় চাকায় আর প্রতি সংযোগস্থলে যেন শুধু তৈলসেক দেওয়া হইল, জল কয়লা কিছুই দেওয়া হইল না। গাড়ী চলিবে কি ? অতিরিক্ত ভাইটা-হারীদের প্রতি এই জিজ্ঞাসা।

উপরের প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই আহারের মিতাভ্যাস-সম্বন্ধে আলোচনায় আসিয়া পড়ে। প্রয়োজনের অপেক্ষা অল্পতর আহারে যেমন কুফল, অতিরিক্ত আহারেও তেমনি অনিষ্ট হয়। পরিমিত ও নিয়মিত আহারেই সর্ব্বাপেক্ষা উপকার। আমাদের মধ্যে অনেক ঔদরিক আছেন যাঁহারা রীতিমত চর্চ্চায় খাদ্যনালীর পরিসর ও ধারণ-ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধিসাধন করিয়া লইয়াছেন। দিস্তায় দিস্তায় লুচি আর গণ্ডায় গণ্ডায় সন্দেশ-রসগোল্লা অবলীলায় তাঁহারা গলাধঃকরণ করিতে পারেন। কিন্তু দেহটি তাঁহাদের সেই অনুপাতে কর্ম্মক্ষম ও পরিপুষ্ট নহে। কারণ, তাহা হইতে পারে না। সেইজন্য মিতাহার অভ্যাসই সঙ্গত। নির্ব্বাচন-দ্বারা সুসমঞ্জস খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া সেই-অনুসারে নিয়মিতভাবে পরিমিত আহার গ্রহণ করিলে দেহের রক্ষা ও পুষ্টি সহজ হইয়া পড়ে। তাই আহার-বিষয়ে হিতাহার ও মিতাহার সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা (ম. প. ১৯৫৩)

নদীয়া জিলার অন্তর্গত চাপরার মাঠে খেলা। কলিকাতার সেণ্টপল্‌স বনাম চাপরার জর্জ্জ হাইস্কুলের মধ্যে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি—মোট ২২ জন। খেলোয়াড় এবং সংরক্ষিত কয়েকজন ব্যতীতও ৬।৭ জন আছি। আমরা ক্রীড়াবীর না হইলেও ক্রীড়ামোদী এবং আমাদের চীৎকারাদি উৎসাহদান খেলার বিশেষ অঙ্গ বলিয়াই গণ্য হয়। সুতরাং খেলোয়াড় সঙ্গীদের চেয়ে আদর আপ্যায়ন আমাদের কিছুমাত্র কম হয় নাই। বস্তুতঃ আমাদের ন্যাপা ওরফে ভীম আমিষ ও নিরামিষ আতিথ্যের যে পরিমাণ সদ্গতি করিয়াছে তাহা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরও রীতিমত ঈর্ষ্যার ব্যাপার।

সে কথা অবান্তর। যথাসময়ে খেলা আরম্ভ হইল। মাঠ লোকে লোকারণ্য। কলিকাতার খেলোয়াড় আসিয়াছে, আধা সাহেবী স্কুলের ছাত্র তাহারা। না জানি কি তাহাদের বিক্রম। এইরূপ নানা জল্পনায় এই অঞ্চল দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই বেশ তাতিয়া আছে। সুতরাং যথাসময়ের বহু পূর্ব্বেই মাঠের চারিপাশে তিল ধারণের স্থানটিও পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা এই জনসমুদ্রেরই একপাশে সদলে সশঙ্কভাবে দাঁড়াইয়া আছি;

খেলোয়াড়দল বাঁশীর ধ্বনির অপেক্ষায় প্রস্তুত। অনেকেরই পায়ে বুট, সকলেরই গায়ে বর্ণবিচিত্র জার্সি ; গোলকিপারের হাতে আবার দস্তানা। আমাদের দলের এই সাজ-সজ্জার জমক কিন্তু স্থানীয় দর্শকদের সভয় শ্রদ্ধার উদ্রেক করে নাই। বরং ইহা দেখিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইল যে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে পোষাক আঁটিবার জন্য আমরা নিশ্চয় ভাল খেলিতে পারিব না।

বাঁশী বাজিল। আমাদের ক্যাপ্টেন বলটা মারিয়া মাঠে প্রবেশ করিল, পিছনে শ্রেণীবদ্ধভাবে সমগ্র দলটি নৃত্যচালে মাঠে নামিল। মিনিটখানেকের মধ্যে 'টসে' জিতিয়া আমাদের দল উত্তরদিকে স্থান লইল। খেলা আরম্ভ হইয়া গেল। প্রথম কয়েক মিনিট বলখানা বিদেশীর গোলের দিকে বার বার রুখিয়া আসিতে থাকে। বিপক্ষদলে ঐ অঞ্চলের সব জোয়ান জোয়ান ডাকসাইটে খেলোয়াড় স্কুলের ছাত্র বলিয়া খেলিতে নামিয়াছে। তাহাদের যেমন পায়ের তেমনি গায়ের জোর, আর সেই জোর জাহির করে তাহারা আতিথ্যের প্রচলিত সকল নিয়ম ভঙ্গ করিয়া। ইতিমধ্যে তুই তুইবার আমাদের তুইজনের চোট লাগিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া আমাদের ক্যাপ্টেন ঘুরিয়া সকলেরই কানে কি জানি কি বলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে খেলার ধরণ বদলাইয়া গেল। আমাদের তরফের খেলা চলিল 'শর্ট পাসে'। ফলে বিশালবপু বিপক্ষ খেলোয়াড়দের চরকির মত মত্ত ব্যর্থ ছুটাছুটি আমাদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য হইয়া উঠিল। তাহারা যাই রুখিয়া পাশের ব্যক্তিকে আক্রমণ করে অমনি মুহূর্ত্তে সেই ব্যক্তি বলখানি একটু ঠেলিয়া দেয় স্বদলের আর একজনকে। এইভাবে গোল হয় না বটে, কিন্তু বড় মজার খেলা চলে ; যেন বানর নাচ। কিন্তু রহস্য যে মাঝে মাঝে মারাত্মক হইয়া উঠে তাহার প্রমাণও অচিরেই পাওয়া গেল। ব্যর্থ আক্রোশে এবং সমর্থকদের অবিশ্রান্ত সমুচ্চ অভিযোগে চাপরার দল এইবার চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিল। খেলার অর্দ্ধেক সময়ের বাকী মাত্র তিন মিনিট। এরই মধ্যে আমাদের পাঁচ জনকে তাহারা অল্পবিস্তর আহত করিল। কিন্তু খেলার মাঠে বল ফেলিয়া সতর্ক খেলোয়াড়কে আক্রমণ করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। আক্রমণকারীরাই তাহাতে বেশী আহত হয়—মিছামিছি আছাড় খাইয়া আর নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করিয়া। আমাদের দলটি বিপক্ষের তুলনায় সত্যই বালখিল্যের দল। তথাপি তাহাদের আত্মসংযম, সতর্কতা, তড়িৎ-বেগ চাপরার গালিভারদের তিনটিকে রীতিমত ঘায়েল করিল। বাঁশী বাজিল। অর্দ্ধেক সময় উত্তীর্ণ, একটু অবসর। সেই অবসরে ভীড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমরা আমাদের দলকে ঘিরিয়া জাম্বাক, আইওডেক্স প্রভৃতি ঔষধ ও লজেন্স, লেবু প্রভৃতি চুষ্য দ্বারা সেবা করিতে লাগিলাম। দোষত্রুটি, উপদেশ-পরামর্শ, বিপক্ষের নির্ম্মম সমালোচনা—এসব ত চলিলই। কিন্তু শেষ হইল না,—আবার বাঁশী।

খেলা আরম্ভ হইবে। আমাদের এগারোজনই ডলাই-মলাইয়ের পর খাড়া হইয়াছে, কিন্তু বিপক্ষে দেখি তিনজন কম। তাহাদের ও আমাদের ক্যাপ্টেন এবং

রেফারী মহোদয়ের কি কথা হইল, অমনি বিরুদ্ধ দলে তিনজন নূতন খেলোয়াড় আসিয়া নামিল। আমাদের পক্ষে কেবল বিমল একটু বেশী আহত বলিয়া তাহার জায়গায় ভীম বা হ্যাপাকে নামানো হইল। কিন্তু ভীম তো অর্জ্জুন ছাড়া কিছুই জানে না। বল মারিতে মানুষ মারে বলিয়া সে কখনও নিজেই লজ্জায় খেলায় নামে না। অথচ তাহাকেই হিড় হিড় করিয়া টানিয়া কিনা একেবারে মাঠে আনা হইয়াছে! বেচারা তো ভয়ে-ভাবনায় একেবারে কম্পমান। ক্যাপ্টেন চেঁচাইয়া বলিলেন, "হ্যাপা, ক্ষেপিস্‌নে! ওরা ফাউল করুক, তুই মারিস্‌নে।" মারিতে সত্যই হ্যাপা জানে না। অতবড় দেহখানা নেহাৎ ঢাকের বাঁয়া, কখনও কাজে লাগে না। অন্তরে অন্তরে হ্যাপা চিরদিনই ভীরু। তবে তাহার বুদ্ধি আছে। ক্যাপ্টেনের কথায় জবাব দিল সে, "তা বাপু, ওদের সাম্‌লে খেলতে বল।" ব্যস্‌, কম্বুকণ্ঠের সেই ঘোষণা যাদুপ্রভাব বিস্তার করিল। বিরুদ্ধ দল আর হ্যাপার কাছে ঘেঁষে না। বল আসিয়া গড়াইয়া আপনি হ্যাপার সামনে থামে। আমরা চেঁচাই, "ভীম, তেড়ে মার।" আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্য বল; বিরুদ্ধ দল হয়তো ভাবে এই মারের লক্ষ্য তাহারাই। হ্যাপা বল মারিতে ব্যর্থ প্রয়াসও করে না, শুধু একটু আগলাইবার ভাব দেখায়। সেই সুযোগে আমাদের ব্যাক আসিয়া বলটিকে যথাস্থানে প্রেরণ করে। পাঁচ মিনিটেই বোঝা গেল, 'ভীম'-বলে বলী আমাদের রক্ষণভাগ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, ক্যাপ্টেন তখন নিশ্চিন্তে বিপক্ষ গোলে নিপুণ আক্রমণ চালাইল। শেষ দশ মিনিট সত্যই খেলা হইল। একটা ফাউল নাই, হ্যাণ্ডবল নাই—একবারও কেহ অফসাইড হইল না। বিপক্ষ দলের রক্ষণ-ভাগেরও অপূর্ব্ব প্রতিরোধ এবং অটুট ধৈর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। তাহাদের দক্ষতার সহিত তাহাদের আক্রমণভাগের সমন্বয় ঘটিলে খেলাটি যে কি হইত তাহা বলা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আক্রমণভাগে তাহাদের জঙ্গী সঙ্গীরা নাই, যাহারা আছে তাহারা যেন ভীমভয়-ভীত। ফলে শেষ তিন মিনিটে তাহাদের সকল প্রতিরোধ ভাঙিয়া পড়িল। আমাদের ক্যাপ্টেন প্রথম গোলটি দিয়া সুরু করিল, তাহার সুযোগ্য সহকারীরা পর পর আরও দুইটি গোল দিয়া ফেলিল। আমাদের পক্ষই জয়ী হইল। বাঁশী বাজিয়াছে। আমরা উন্মত্তভাবে ভীমকে জড়াইয়া তুলিলাম। নেহাৎ এতবড় একটা পাহাড়কে ঘাড়ে তোলা অসম্ভব বলিয়া আনন্দাতিশয্যে কেহ কেহ তাহারই কাঁধে চাপিয়া বসিল। আর 'জয় ভীম' রবে গগন ফাটিল। ক্যাপ্টেন বিমল বলিল, 'ভাল খেলিয়া পরাজয়' যেমন খেলার অভিধানের একটি ইডিয়ম, 'না খেলিয়া ভীমের জয়' এও তেমনি ইডিয়মরূপে অক্ষয় হোক।

ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার বিবরণ এইখানেই শেষ। তারপর শুধু জয়ের আনন্দ, আহারে পারদর্শিতা, প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার।

সমালোচনা ও বিতর্কিকা

লক্ষ্মণ ও ভরত

লক্ষ্মণ ও ভরত ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব্ব আদর্শ। ভালবাসায় বা ভক্তিতে, সেবায় বা আনুগত্যে এরূপ নির্ম্মল নিষ্ঠা পৃথিবীর সাহিত্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্রজের জন্য অনুজের এমন অতুল আত্মত্যাগ, সম্পদে বিপদে এরূপ একাগ্র সেবা, জাগতিক ভোগলালসার প্রতি ঋষিসুলভ এ প্রকার নির্ব্বিকারচিত্ততা, দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনায় এভাবের অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা আর কোথায় কাহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়? বস্তুতঃ এই অলোকসামান্য ভ্রাতৃদ্বয় একমাত্র নিজেরাই নিজেদের তুলনা।

কিন্তু লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃত্বের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। নিছক আদর্শের বিচারে ভরতের চরিত্রই শ্রেয় সন্দেহ নাই। দশরথ একদা ভরতকে ধর্ম্মপ্রাণতায় রামচন্দ্রেরও ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছিলেন। আমাদের মতে অন্য বহুতর গুণেও তিনি এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের শীর্ষমণিস্বরূপ। কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামের বনগমন এবং দশরথের দেহরক্ষার পর হইতে ভরত যে অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন, তাহা অকলঙ্ক শুচিতায় রামায়ণের সকল চরিত্রকে তুলনায় ম্লান করিয়া দেয়। কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশুদ্ধ চরিত্র আর একটিও নাই। রামলক্ষ্মণ-সীতাপ্রমুখ সকল চরিত্রই স্বর্গমহিমায় সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু প্রত্যেক চন্দ্রে কলঙ্ক আছে—কেবল ভরতই নিষ্কলঙ্ক। আদ্যোপান্ত তাঁহার চরিত্রে কোথাও একটু দোষ লক্ষ্য করা যায় না।

কিন্তু এই দেবদুর্লভ নিষ্কলঙ্কতা, এই অপার্থিব ত্রুটিহীনতাই আমাদের কাছে ভরতকে কতকটা বিস্ময়ের বস্তু করিয়া রাখে। মনে হয় ভরতচরিত্র যেন কতকটা অবাস্তব। একটা মহান্ আদর্শ চরিতার্থ করিবার জন্য ঋষিকবি ভরতকে যে দুর্লক্ষ্য ঊর্দ্ধস্তরে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা যেন একটা আকস্মিক ব্যাপার। শৈশব হইতে বনগমন পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালমধ্যে ভরতকে চিনিবার অবকাশ কবি আমাদের দেন নাই; তাই রামের জন্য কতখানি ত্যাগস্বীকার তাঁহার পক্ষে সম্ভব তাহার কোনও ধারণাই আমাদের নাই। সহসা যখন তিনি ত্যাগের উচ্চতম দিব্যশিখরে আরোহণ করিলেন, আমরা পরম বিস্ময়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলাম—মুগ্ধ হইতে পারিলাম না, যেন কতকটা বিমূঢ় হইয়া গেলাম।

কিন্তু লক্ষ্মণ আমাদের অতীব সুপরিচিত। রামহীন লক্ষ্মণ বা লক্ষ্মণহীন রাম আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। লক্ষ্মণ মানুষ—ভরতের মত অমানবোচিত শুদ্ধসত্ত্ব-গুণের বিগ্রহ তিনি নহেন, রজোগুণ এবং তমোগুণও তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান। এই

মানুষ লক্ষ্মণের রামভক্তির প্রতিমুহূর্ত্তের পরিচয় হইতে তাঁহার আত্মত্যাগ কতদূর অগ্রসর হইতে পারে তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা আমাদের মনে মুদ্রিত।

লক্ষ্মণ-প্রকৃতির মূল উপাদান বীরত্ব। ভরত যাহা আধ্যাত্মিক স্তরে ধর্ম্মোপলব্ধির বিষয় করিয়া লইয়াছেন, লক্ষ্মণ তাহাকে অনেকটা অন্ধ অনুরাগে ও পার্থিব, বরং ক্ষাত্র যুক্তিবলে একান্ত আচরণীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের জন্য সমগ্র বিশ্বসংসার এমন কি পিতাকেও তিনি হত্যা করিবার প্রস্তাব উচ্চারণ করিতে পারেন। নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে তিনি প্রয়োজনাধিক মূল্য দিতে চাহিতেন না। ন্যায়-অন্যায় সাধু-অসাধুবোধটা তাঁহার একান্তভাবে পুরুষকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত। দৈব-বিদ্রোহী পুরুষকার-পন্থী মহাবল ও মহাতেজ এই লক্ষ্মণ রামের একান্ত বাধ্য। রামের মধ্যে তাঁহার সমগ্র সত্তাই যেন পরিপূর্ণভাবে অবলুপ্ত।

লক্ষ্মণ ও ভরতের চরিত্রে পার্থক্যটুকু এইদিক্ দিয়াই পরিস্ফুট। ভ্রাতার অবর্ত্তমানে একজন সিংহাসনে ভ্রাতার স্বর্ণপাদুকা স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়া যান, অপরজন একমুহূর্ত্ত ভ্রাতৃসঙ্গ ত্যাগ করিতে রাজী নহেন। একজন সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ, আদর্শপূজারী কোমল ও সুকুমার, অন্যজন তেজবীর্য্যে প্রতিশোধকামনায় কিঞ্চিৎ তামসিক, বজ্রকঠিন ঘোর বাস্তববাদী অথচ কঠোর হইয়াও কোমলতার আধার। ভরত ও লক্ষ্মণের পার্থক্যটুকু যেন ভাবুকের ও কর্ম্মব্রতীর প্রভেদ।

ভরত স্তিমিত নয়নে উপলব্ধির বস্তু, লক্ষ্মণ বাস্তবে অনুকরণযোগ্য। ভরত হৃদয়লোক স্বর্গজ্যোতিতে আলোকিত করিয়া তোলেন, কিন্তু লক্ষ্মণই জীবনের ঘাতসজ্ঘাতে একান্ত আশ্রয়। একজন "ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন,—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ, অন্যজন ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান।"

আমার প্রিয় গ্রন্থ

আমার আবাল্য প্রিয় গ্রন্থটি হয়তো সাহিত্যের আসরে কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে না। কিন্তু অন্তরের সত্য যদি খুলিয়া বলিতে হয়, তবে বলিতেই হইবে যে সর্ব্বজনপরিচিত ক্ষুদ্র পুস্তকটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। 'ঠাকুরমার ঝুলি' তাহার নাম—নেহাৎ ছেলেভুলান রূপকথার সঙ্কলন।

ছেলেবেলায় ঠাকুরমাই প্রথম যাদুময় ঝুলিটির সন্দেশ বিতরণ করিতেন। এই মাটির পৃথিবীর অন্তরে-বাহিরে স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যাপ্ত করিয়া যে আর একটা মায়াজগৎ আছে, তাহার আভাস চোখে ভাসিয়া উঠিত। শত শশীর স্নিগ্ধ সুধায় রচিত, শত রঙে রঙীন অপূর্ব্ব সে গল্পের যাদুরাজ্য—শিশুকল্পনা আমার পক্ষিরাজের মত আকাশে উড়িয়া

যাইত। তারপর বর্ণপরিচয়ের প্রথম পর্ব্ব হইতেই স্বরু হয় প্রবল প্রয়াস সেই 'ঠাকুরমার ঝুলি'র মধ্যে উঁকি মারিতে। অনবচ্ছিন্ন ঔৎসুক্য আমাকে সর্ব্বদাই মাতাইয়া রাখিত। ক্রমে বর্ণশিক্ষা আয়ত্ত হইয়া গেলে সহসা কখন আলিবাবার সেই 'চিচিঙ ফাঁক'-মন্ত্র জানিয়া লইলাম মনে নাই, মনে আছে শুধু এইটুকু যে সেই মায়াপুরীর অক্ষর-অর্গল লীলায় মুক্ত করিয়া প্রবেশ করিতাম অভ্যন্তরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইত বলিতে পারি না।

আজ কৈশোরের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া যৌবনের নানা সম্ভারে সজ্জিত অর্ঘ্যথালি হাতের কাছেই পাইতেছি। পরীক্ষার শাসনে, স্বসমাজের তাগিদে আর কাঁচা কাঁটালকে রাতারাতি পাকাইবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থায় পড়িয়া অনেক বড় সাহিত্য ও বড় তত্ত্বই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অহর্নিশ গলাধঃকরণ করিতেছি। কিন্তু সত্য বলিতে লজ্জা নাই, তাহা জীর্ণ করিতে পারিতেছি না। অবসর সময়ে এখনও তাই 'ঠাকুরমার ঝুলি' খুলিয়া বসি। এ যুগের রঙচঙ-করা 'আফ্রিকার জঙ্গল' বা 'লামার দেশ' আমার তেমন ভাল লাগে না। এ সবই যেন কাতুকুতু দিয়া হাসাইবার মত কৃত্রিম উত্তেজনায় মনকে রোমাঞ্চিত করিতে চাহে। তাহাদের অস্বাভাবিক আর কল্পনাহীন লোমহর্ষণ কাঠামোগুলি কেমন জোড়াতালি দিয়া কোনরকমে একত্র করা। কিন্তু রূপকথার রাজ্যে সেই কৃত্রিমতা নাই। কল্পনার সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া যুক্তিবুদ্ধিকে বশ মানাইয়া লয় ইহা। তখন আর বাস্তব-জীবনের মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলে না সে দেশের কথার। মন ছাড়া পায় উদার আনন্দে। বুদ্ধু আর ভুতুমের মত রাজকুমার —সুপারির ডোঙায় করিয়া তাহাদের সাতসমুদ্র বিহার, তার পর একেবারে কলাবতী রাজকন্যার দেশে গিয়া পৌঁছান। আমার মনও চলিয়া যায় সেই দূরে—কোন বাধা মানে না। ঢোল-ডগরে মায়াজালে অসম্ভবও সেখানে সম্ভব হয়। তারপর বুদ্ধু আর ভুতুম যখন তাহাদের প্রকৃত দেবদেহে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে, তখন কি আনন্দ! দুষ্ট রাণীগুলির শাস্তি আর ন'রাণী ও ছোটরাণীর সৌভাগ্য ফিরিতে দেখিয়া মনটি স্বস্তিলাভ করে। ন্যায়ের জয়ে আর দুষ্কৃতকারীর পরাজয়ে সত্যই হৃদয় আশ্বস্ত হয়, প্রাণ শান্তিলাভ করে। দুয়োরাণী আর সুয়োরাণীর গল্পেও নীতির সহিত অমৃতের পরিবেষণ হইয়াছে। শীত-বসন্ত, সাত-ভাই-চম্পা আর ঘুমন্ত-পুরী প্রভৃতি কত সব গল্প আমাদের ক্ষীরসমুদ্রে মগ্ন করিয়া দেয়—সুকুমার মানসিক বৃত্তিগুলির করে লালন।

'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থহিসাবে তাই একেবারেই যে অকিঞ্চিৎকর ইহাও মানিতে রাজী নহি। নিছক সাহিত্যের বিচারে তুলনা নাকি অবৈধ। গোলাপের সহিত চাঁপার তারতম্য কাহারও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রমাণ করে না। মহাভারতের সহিত গীতাঞ্জলি বা গীতাঞ্জলির সহিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পার্থক্যটাও তেমনি তুলনামূলক বিচারের উর্দ্ধে। সাহিত্যসৃষ্টি আপনাতে আপনি পূর্ণ। আদি-মধ্য-অন্তের মধ্যে

সম্ভাবনীয়তার যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকিলেই উহার রসোৎকর্ষ। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র মধ্যে এই গুণটি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাই বাস্তবে যাহা অসম্ভব, ঘটনাপারম্পর্য্যে তাহাই সেখানে সম্ভব ও স্বাভাবিক। এইজন্যই সে-সকল কাহিনীতে কোথাও খটকা লাগে না—মনকে বিশ্বাস করিতে বেগ পাইতে হয় না।

তাহা ছাড়া, এদেশের জলমাটির সহিত এ-সকল রূপকথা এমন একটা নিবিড় সম্পর্কে জড়িত যে প্রত্যেকের মনে রূপকথার একটা সংস্কারও গড়িয়া গিয়াছে। স্নেহপ্রীতি ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি-সংবলিত আবহমান-প্রচলিত নীতির আদর্শটি এ গ্রন্থে সজীব হইয়াই আছে। তাই উহার উপযোগিতাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু ব্যক্তিগত রুচির কথাই বলিতেছি। রামায়ণ-মহাভারতও আমার ভাল লাগে। কিন্তু এই মহাগ্রন্থদ্বয়ের গভীরতা আর আকাশপ্রমাণ মহত্ত্ব স্বভাবতঃই আনন্দে বিস্ময়ে আমাকে বিমূঢ় করিয়া দেয়। তাহাদের অপেক্ষা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেকে আমি অধিকতর সহজভাবে পাই। 'কুঁচবরণ কন্যা যে তার মেঘবরণ-কেশ'—তাহার সঙ্গলাভের জন্য মেঘের দেশে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া কল্পনা উড়িয়া যায়। সোনার কাঠি আর রূপার কাঠির ইন্দ্রজালে পুষ্পরথ অপেক্ষা আকাশচারী ঘোড়াটাই কেমন যেন ভাল লাগে। ভাল লাগে সে জগতের মিহি সূতায় বোনা অলীক মায়া। সূক্ষ্ম সূতাজালের মত কারুশোভা তাহার, অথচ সকলই অবস্তু। সে জগতে এ জগতের দ্বন্দ্ব-কোলাহল নাই, ঘাতপ্রতিঘাত নাই। অন্যায় ও অনাচারের রাবণবধে তাই সেখানে লঙ্কাকাণ্ড বাধে না। একশ্বাসে দীর্ঘ তালগাছ হইতে পাতা পাড়িয়া একডুবে জলের তলার ভোমরাটাকে তুলিয়া কাটিয়া ফেলিলেই হইল—সব রাক্ষস নিপাত হইয়া যায়। দুষ্টের দমন রূপকথায় কত সহজ কাজ! ইহার কারণ এই যে, সাধু রাজপুত্রের সপক্ষে মনে মনে পাঠকমাত্রই অস্ত্রধারণ করিয়া আছে। এখন যে-কোন ভাবেই হউক, লৌকিক বা অলৌকিক যে-কোন শক্তিবলে রাজপুত্র একটু সামান্য প্রয়াস করিলেই যথেষ্ট; রাক্ষসটাকে মনে মনে আমরাও আক্রমণ করিয়াছি। মুহূর্ত্তে তাহার বিনাশই একমাত্র কাম্য, তাহা হইলেই বাঁচিয়া যাই। ঘটেও তাহাই; আমরা বিনা প্রশ্নে স্বস্তির শ্বাস ফেলি। তারপর আমাদের একান্ত আপনার রাজপুত্র যদি যুক্তিবুদ্ধির অতীত কোন যাদুবলে রাজকন্যাকে অসম্ভব স্থান হইতে চক্ষুর নিমেষে লইয়া বাড়ী ফিরে, তাহাতে আনন্দ ছাড়া আর কিই বা জাগিতে পারে? আনন্দের আতিশয্যেই যাহা কিছু অত্যাশ্চর্য্য তাহাও ভাল-লাগায় পরিণত হয়, মনকে প্রশ্নময় করিয়া দেয় না।

———

আমার প্রিয় কথাসাহিত্যিক

শরৎচন্দ্র আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় কথাসাহিত্যিক, কারণ তিনি একান্তভাবে সাধারণ মানুষের জীবনশিল্পী। সাধারণ মানুষ, বাঙলার পল্লীর নরনারী, বাঙলার কিশোর-কিশোরী স্থান পাইয়াছে তাঁহার গল্প ও উপন্যাসে। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে যেন আমরা স্পষ্ট চিনিতে পারি—তাহাদের যেন দেখিয়াছি এবং প্রতিনিয়ত দেখিতেছি আমাদের সমাজ, পল্লী ও শহরে। উপন্যাসের চরিত্রগুলির সহিত এইরূপ আত্মীয়তাবোধ ইহার পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। শরৎচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এইখানে; মিথ্যা কল্পনার চিত্র তিনি আঁকেন নাই; যাহা দেখিয়াছেন, বাস্তবজীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার অপূর্ব্ব লেখনীমুখে। তাই তাঁহার প্রত্যেকটি চরিত্রই রক্তে-মাংসে-গড়া মানুষ—আমাদেরই প্রতিবেশী।

শরৎচন্দ্রের বাঙলাসাহিত্যে আবির্ভাব চমকপ্রদ কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত শরৎচন্দ্রের ন্যায় আর কোন সাহিত্যিককে লইয়া এত বিতর্কের সৃষ্টি হয় নাই। প্রথম হইতেই তিনি সমাজ-সচেতন। তিনি শুধু সমাজের যথার্থ চিত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, সহানুভূতি দেখাইতেন নিপীড়িত সাধারণ মানুষের প্রতি, মুখোস খুলিয়া দিতেন প্রকৃত সমাজশত্রু ধর্ম্মধ্বজীদের। প্রাচীন সমাজের ভিত নড়িয়া উঠিল। স্বার্থান্ধ মানুষ নিজের বর্ব্বর রূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল এবং শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা, ইতিহাসই কেবল তাঁহার বিচারক হইতে পারে; কুৎসা এবং বিদ্রূপে তাঁহার প্রতিভার মৃত্যু ঘটে না। শরৎচন্দ্রেরও প্রতিভার মৃত্যু ঘটে নাই; তিনি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন অপূর্ব্ব মননশক্তির বলে।

শরৎচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস 'কাশীনাথে' রহিয়াছে ভবিষ্যতের মহৎ প্রতিশ্রুতি। অথচ ইহা মাত্র আঠার বৎসর বয়সের রচনা। বাইশ হইতে চব্বিশ বৎসরের মধ্যে রচিত হয় 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' এবং 'দেবদাস'। 'বড়দিদি' প্রথম উপন্যাস-হিসাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাঙলার সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি করুণ কাহিনী যে এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়, ইহা বাঙলার পাঠকগণের পূর্ব্বে জানা ছিল না। কোন বাগাড়ম্বর নাই, কল্পনাবিলাস নাই, বুদ্ধির চমকে পাঠককে চমকিত করিবার প্রয়াস নাই; নদীর স্রোতের ন্যায় কাহিনী বহিয়া চলিয়াছে নিজস্ব যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়া সুষ্ঠু পরিণতির দিকে। এই প্রথম উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রের দরদী মনের পরিচয় পাওয়া গেল। এক মুহূর্ত্তে সাধারণ মানুষ তাঁহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারিল।

ইহার পর শরৎচন্দ্র বহু উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করিয়াছিলেন। বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লিপিকুশলতা আরও সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইল; দৃষ্টিও

আরও স্বচ্ছ হইল। সমাজের সমস্ত দোষত্রুটি তাঁহার চোখে ধরা পড়িল—তাঁহার সংবেদনশীল মনে আঘাত করিল ধর্ম্ম ও সমাজের অত্যাচার। ধর্ম্মের নামে বিধবা নারীর উপর যুগ যুগ হইতে সমাজে যে অত্যাচার চলিতেছে—নারীকে পণ্যহিসাবে ব্যবহার করিবার যে প্রথা বাঙলার সমাজে চলিতেছে—সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই তাহার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাঙলার নিপীড়িত মধ্যবিত্ত নরনারীর একমাত্র মুখপাত্র ছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে বাঙলার সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হইল বাঙলার পল্লীগ্রাম। কিন্তু এই পল্লীসভ্যতার ভিত খারাপ হইয়া গিয়াছে—আভ্যন্তরীণ কলহ এবং ভুয়া জাত্যভিমানে। এই ঘুণধরা পল্লী-সভ্যতার সম্পূর্ণ ও সার্থক চিত্র পাই 'পল্লীসমাজ' ও 'পণ্ডিত মশাই'-এ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের দুইটি প্রধান মূল্য আছে—সামাজিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক। মানুষের মনের অলিগলিতে বিচরণের ক্ষমতা শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত। প্রীতি, প্রেম ও স্নেহ-ভালবাসার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অন্তর্ভেদী সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সমবেদনা বিশেষ অনুভূতিসাপেক্ষ। যে-জাতীয় উপন্যাসকে ইংরেজীতে বলে 'সাইকোলজিক্যাল', তাহাকে বাঙলাসাহিত্যে রূপায়িত করেন শরৎচন্দ্র। মনোবিজ্ঞান মানুষকে বুঝিতে, তাহার কার্য্যাবলীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। প্রতিটি সুসাহিত্যিককে ইহার সাহায্য লইতে হয়। শরৎচন্দ্রের সমাজ-বোধের সহিত মিলিত হইয়াছিল তাঁহার মনোবিশ্লেষণের অপূর্ব্ব ক্ষমতা—এই দুইটির সমন্বয়ে সৃষ্ট হইয়াছে অপূর্ব্ব উপন্যাসরাজি। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গৃহদাহ' এবং 'শ্রীকান্তে'-ও এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গৃহদাহে'র কাহিনী এবং মনোবিশ্লেষণ সত্যই অতুলনীয়। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে 'গৃহদাহে'র আসন সুনিশ্চিত। এই উপন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ এই যে, এই উপন্যাস নিজস্ব যুক্তিধারায় চলিয়াছে—লেখক বাহির হইতে কিছু চাপাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাই ঘটনার বিন্যাসের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নাই—সবল দৃপ্ত পদক্ষেপে কাহিনী চলিয়াছে পরিণতির দিকে।

'শ্রীকান্ত'কে উপন্যাস বলিলে অন্যায় করা হইবে—উহা একটি মহাকাব্য। চারিটি দীর্ঘ খণ্ডে এই মহাকাব্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার জীবনদর্শন, ইহার লিপিকুশলতা, ইহার আঙ্গিক এবং ইহার আয়তন ইহাকে উপন্যাসের ক্ষেত্র হইতে লইয়া গিয়া মহাকাব্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করাইয়াছে। পাঠক বিস্ময় অনুভব করে লেখকের সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাইয়া। সমাজ যাহাদের স্বীকার করে নাই, সমাজ যাহাদের পদতলে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, লেখক তাহাদের স্থান দিয়াছেন আপন অন্তরে এবং পাঠকের হৃদয়ে তাহাদের আসন চিরদিনের জন্য স্থাপনা করিয়া দিয়াছেন অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলে। বাঙালী পাঠক কখনও 'অন্নদা দিদি' এবং 'অভয়া'কে ভুলিবে না।

চরিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্রের অসামান্য দক্ষতা। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন যে

কর্ম্মে ও কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া চরিত্রে আপনা-আপনি বিকাশ লাভ করিবে ; লেখকের বাহির হইতে বলিবার প্রয়োজন নাই। বহু ঔপন্যাসিককে দেখা যায় তাঁহারা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বাক্যের জাল বুনিয়া চলিয়াছেন একটি চরিত্রকে প্রকাশ করিবার জন্য। শরৎচন্দ্র ইহার ব্যতিক্রম। মানুষের মনের অলিগলি তাঁহার নখদর্পণে। তাই তিনি কেবল পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথনের সাহায্যে তাহাদের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাই তাঁহার আঙ্গিক। তাঁহার উপন্যাসে লেখক কম কথা বলিয়াছেন—চরিত্রগুলি কথা বলিয়াছে বেশী। 'রাসবিহারী'র চরিত্র-চিত্রণ এই মন্তব্যের সাক্ষ্য দেয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নারী-প্রধান—শরৎচন্দ্র নারীর চরিত্র-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। নারীদের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক মমত্ববোধ ছিল ; কারণ, সমাজে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত। 'শ্রীকান্ত'-র অন্নদা ও অভয়া, 'পল্লীসমাজ'-এর রমা ও বিশ্বেশ্বরী, 'দেনাপাওনা'-র ষোড়শী, 'মেজদিদি'-র হেমাঙ্গিনী, 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ী ও সাবিত্রী বাঙালী পাঠকের চিত্তে অক্ষয় স্বর্গ অধিকার করিয়া আছে। এত সুন্দরভাবে, এত দরদ দিয়া, এত হৃদয়গ্রাহী করিয়া কেহ নারীচরিত্র অঙ্কন করিতে পারেন নাই।

সামাজিক উপন্যাস ব্যতীত তিনি একখানি বৈপ্লবিক উপন্যাসও বাঙলাসাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। বৈপ্লবিক উপন্যাসহিসাবে ১৩২৯ সালে বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত 'পথের দাবী' ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব দান। রাজনৈতিক কারণে গভর্ণমেণ্ট ইহা বাজেয়াপ্ত করেন এবং পরবর্ত্তী কালে সে আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। এই উপন্যাসে যথেষ্ট আবেগ আছে, ইতিহাসগত মূল্যও হয়তো আছে—কিন্তু উপন্যাস-হিসাবে ইহার সার্থকতা কতটুকু তাহা বিচার্য্য বিষয়।

পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব ধারা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধির আশ্রয় নিয়াছিলেন —অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'ইণ্টেলেক্চুয়াল' উপন্যাস—তাহা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফল 'বিপ্রদাস' এবং 'শেষপ্রশ্ন'। কিন্তু ইহাতে তিনি কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলা শক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরন্ত আনন্দে, যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসী হয়েছ এমন অন্য কারো লেখায় হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে—কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি।" মহাকবির এই বাণীর মধ্যেই কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সমগ্র স্বরূপটুকু প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙালী পাঠকের শরৎচন্দ্রকে ভুলিয়া যাওয়া আত্মহত্যার তুল্য।

———

আমার প্রিয় কবি

রবীন্দ্রনাথ আমার প্রিয় কবি, কারণ তিনি একই সঙ্গে বর্ত্তমানের এবং চিরকালের। বর্ত্তমান কালের গতিময়, সৃষ্টিময়, ঐশ্বর্য্যময় প্রাণসত্তা রূপায়িত হইয়াছে কবির কাব্যে, কথায় ও গানে। কবির অনন্যসাধারণ সৃজনীপ্রতিভা নিত্যই নব নব উন্মেষ লাভ করিয়াছে, দিকে দিকে বিস্তার করিয়াছে তাহার অপূর্ব্ব সৌরভরাশি, অতুল কাব্যসম্পদে বাণীমূর্ত্তি দিয়াছে বর্ত্তমান মানুষের বিবর্ত্তনের ইতিহাসকে। কবির কৃতিত্ব এইখানেই, তিনি জীবন-শিল্পের সাধক, তাঁহার জীবন-দর্শনে রূপায়িত হইয়াছে বিপুলা ধরণীর আবেগময় সত্তা। তাঁহার কাব্যে কখনও তিনি জীবনকে অস্বীকার করেন নাই, আর অস্বীকার করেন নাই জীবনে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতারাশিকে ; তাই জীবনের সায়াহ্নে ঘোষণা করিয়া গেলেন—

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধুলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা…"

তাঁহার এই জীবন-দর্শন তাঁহাকে নূতন নূতন পথে লইয়া গিয়াছে। অতীতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, মমত্ববোধ ছিল, কিন্তু অতীতের প্রতি অকারণ মোহবিলাস ছিল না। তাই তিনি অনিশ্চিতের পথে, নূতনের পথে পা বাড়াইয়াছেন বারংবার। জীবন-মহাশিল্পের এই শিল্পী শেষ দিন পর্য্যন্ত উন্মুক্ত ছিলেন নূতন ভাবধারা আহরণের জন্য। জীবনে ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছে।

এই জীবনের স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গানে, উপন্যাসে—তাঁহার সুবিপুল রচনারাশির সর্ব্বত্র। মহাকবির কবিমানস হয়তো কখনও কখনও এই পৃথিবী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে বিচরণ করিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই কবি আবার ভূতলে নামিয়া আসিয়াছেন, কারণ তিনি একান্তই সাধারণ মানুষের, পৃথিবীর কবি। ভারতের তথা বিশ্বের সাধারণ মানুষ খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহার একান্ত আপনার কবিকে, যিনি সাংস্কৃতিক জগতে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন জনসাধারণের, যিনি স্বার্থান্বেষী মানুষের মুখোস বারংবার খুলিয়া দিয়াছেন জগতের নিকট। তাঁহার সমস্ত জীবনের কাব্যাদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে এই দুইটি ছত্রে—

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—"

তাঁহার এই অপূর্ব্ব কাব্যাদর্শ প্রতিনিয়তই উৎসাহ দিয়াছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে। তাই তাঁহাকে সকল সময়েই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জনতার মুখপাত্রহিসাবে দেখিতে পাই। জীবনের প্রথম হইতেই কবি এদিকে জাগ্রত। তাই তিনি যৌবনে লিখিয়াছেন—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

কিন্তু যৌবনে যাহা ছিল আদর্শগত প্রতিবাদ, পরিণত বয়সে তাহা নিশ্চিত সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিল। কবি আর নিছক আদর্শের পূজারী নহেন, তিনি সংগ্রামী। রণক্ষেত্রে তিনি নামিয়াছেন; মন্দিরে বসিয়া নিভৃতে পূজার দিন সমাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত সংগ্রামের দিন আসিয়াছে; জনতাকে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়া বিনাশ করিতে হইবে জগতের স্বার্থান্বেষী পশুদিগকে। তাই অন্তপ্রায় কবি আহ্বান জানাইয়া গেলেন সাধারণ মানুষকে—যাহারা 'প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে' 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে'। আর মৃত্যুর প্রাঙ্গণে বসিয়া শেষবারের মত অভিশাপবাণী উচ্চারণ করিয়া গেলেন মানবজাতির শত্রুর প্রতি—

"তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের;
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।"

কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা জাগ্রত হয়। তাঁহার কবিজীবনের প্রথম যুগের কাব্য 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'। মহাকবি অবশ্য বিনয় করিয়া বলিয়াছেন যে এই যুগের লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নাই। কিন্তু এই সময়ের কাব্যে মহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই যুগের কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' মহাকবির কাব্যের ইতিহাসে অক্ষয় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ইহার পরই আরম্ভ হইল 'মানসী-সোনার তরী-চিত্রা'র যুগ। কবি শৈশব অবস্থা কাটাইয়াছেন, প্রবেশ করিয়াছেন দৃপ্ত যৌবনের রাজ্যে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে'। 'মানসী' ও 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য লিপিকুশলতার পরিচয় বহন করে। নরনারীর মনের নানা অলিগলি তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এই যুগে, তাই কাব্য রচনা করিয়াছেন মানুষের মনকে লইয়া। 'চিত্রা' অপর দুইটি কাব্য হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। 'চিত্রা' কবির আত্মসমালোচনা, কবি সমালোচনা করিয়াছেন নিজেকে, বিদ্রূপ করিয়াছেন নিজের কল্পনাবিলাসকে। 'চিত্রা'র কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' রবীন্দ্রনাথের আত্মসমালোচনার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ অশ্রান্তভাবে, অবিরত ধারায় বাঙলাসাহিত্যকে কাব্যরাশি উপহার দিতে লাগিলেন। 'চৈতালি', 'কণিকা', 'কল্পনা', 'কথা', 'ক্ষণিকা'—রবীন্দ্রনাথ একের পর এক সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই সময় কবি প্রাচীন ইতিহাসের বহু আখ্যায়িকা লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'দুঃসময়'।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মোড় এইবার ঘুরিল। ১৯০১ সালে কবির 'নৈবেদ্য' বাহির হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের পরিবর্ত্তন স্পষ্ট হইয়া পড়ে। উপনিষদের ভাবধারা তাঁহার কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করিতে চাহিতেছিল। 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি' এবং 'গীতিমাল্য' এই ভাবধারা বহন করে। কবি এখানে একান্তভাবে আত্মজিজ্ঞাসায় ব্যস্ত, তিনি 'বড়ো আমি'র সন্ধান করিতেছেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান এবং তাঁহার যশরাশি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিদেশী মনীষীদের 'গীতাঞ্জলি' অত্যন্ত মূল্যবান্ কাব্য বলিয়া মনে হইয়াছে, কারণ তাঁহাদের দেশে ঐ শ্রেণীর কাব্য বিরল। এই যুগে তাঁহার আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি 'শিশু'। 'শিশু' মহাকবির কাব্য-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

'গীতাঞ্জলি'র অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যমানসের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা অভাবনীয় এবং অপূর্ব্ব। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীময় ঘোর অনাচার ও অত্যাচারে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু এইবার তিনি আর আত্মচিন্তার কোটরে ফিরিয়া গেলেন না, জগদীশ্বরকেও কাতর মিনতি জানাইলেন না পৃথিবীকে রক্ষা করিতে। এইবার তিনি দৃপ্ত পদক্ষেপে সকলের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পূজা করিলেন মানুষের দেবতা 'গতি'কে, আহ্বান জানাইলেন মানুষকে উত্তুঙ্গ বিপদ্ অতিক্রম করিতে। জীবনের এই নূতন স্বীকৃতির স্বাক্ষর রহিয়াছে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'বলাকা'য়। কবি এইবার পুরাতনের সকল বন্ধন ছিন্ন করিলেন, ঘোষণা করিলেন নবীনের জয়যাত্রা। শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর নহে, কাব্যের আঙ্গিকেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। কাব্যের ভাষা ও ছন্দ পূর্ব্বাপেক্ষা ঋজু হইল। 'বলাকা'র পর 'পূরবী', পলাতকা', 'বনবাণী' এবং 'মহুয়া'য় রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভার নূতন পরিচয় মিলিল।

১৯২৯ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবনের বাণী স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কাব্যে গদ্যকবিতার সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে কবিতা সহজবোধ্য ও সরল হইল। এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পরিশেষ' এবং 'শেষ সপ্তক'। আঙ্গিকের বিচারে 'পুনশ্চ' শ্রেষ্ঠ। 'পরিশেষ' কাব্যের 'ভগবান্ তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে' কবিতাটি ভারতবাসী চিরকাল সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিবে।

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ইটালী এবং জার্ম্মানী ভ্রমণ করিয়াছেন এবং রোমাঁ রোঁলার সহিত ফ্যাসিজম্ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ দৃপ্তকণ্ঠে নিজেকে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী

বলিয়া ঘোষণা করেন। জাপানের চীন-আক্রমণ, ইটালীর আবিসিনিয়া-আক্রমণ এবং জার্ম্মানীর পরোক্ষে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্যদান তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি সর্ব্বাধিক ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন ইংলণ্ড ও আমেরিকার নিষ্ক্রিয়তায়। তাই তিনি ১৯৩৭ সালে 'প্রান্তিক'-এ লিখিয়া গেলেন—

"রাষ্ট্রপতি যত আছে—
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি ওষ্ঠ অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথিবীর বর্ব্বর পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন—

"মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী, নরঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠে ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।"

পৃথিবী চিরকাল এই সংগ্রামী মহাকবিকে স্মরণ করিবে।

ছায়াচিত্র ও সমাজ-জীবন

মহাত্মাজীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে উত্তরপ্রদেশের কোন বিখ্যাত সংবাদপত্রে একটি হাসির ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘটনাস্থল এলাহাবাদ। কোনও একটি পানের দোকানে বসিয়া দুইটি মানুষ সিনেমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। কথায় কথায় একটি লোক বলিয়া উঠিল—'হ্যাঁ, আজকাল সিনেমায় প্রচণ্ড ভীড় হচ্ছে। সেদিন প্রয়াগে মহাত্মাজীর অস্থিবিসর্জ্জন দেখতে গিয়ে সাতটি লোক ভীড়ের চাপে মারা গেছে, আর কালকে 'জুগনু'র টিকিট কাটতে গিয়ে দুটি লোক মারা গেল। ঘটনাটি হয়তো পত্রিকার সংবাদদাতার মস্তিষ্কপ্রসূত; কিন্তু আমাদের মানসিক ও সামাজিক জীবনে ছায়াচিত্রের প্রভাব যে কতখানি তাহা ঐ লোকটির উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। বর্ত্তমান সমাজে ছায়াচিত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। এইরূপ কাহিনী শুনা যায় যে, কোন বৃদ্ধ সাধুকে স্বর্গ কোথায় প্রশ্ন করা হইলে তিনি পথিপার্শ্বে প্রেক্ষাগৃহ

নির্দেশ করিয়া দেন। আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র প্রেক্ষাগৃহ। বিংশ শতাব্দীর কিশোর হইতে সুরু করিয়া বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ছায়াচিত্রের অনুরাগী। আধুনিক যুগে প্রেক্ষাগৃহ কৈশোরের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের লীলাক্ষেত্র এবং বার্দ্ধক্যের বারাণসী।

সাধারণতঃ মানুষ ছায়াচিত্র দেখিতে যায় আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে। সারাদিন পরিশ্রম করার পর মানুষ স্বভাবতঃই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত এবং মনকে প্রফুল্ল করার জন্য মানুষ প্রয়োজন বোধ করে এমন কিছুর, যাহা হইতে সে আনন্দ পাইতে পারে। বর্ত্তমান মানুষ এই 'এমন কিছুর' সন্ধান পাইয়াছে ছায়াচিত্রে। তাই প্রতি সন্ধ্যায় অগণিত মানুষের মিছিল দেখা যায় প্রেক্ষাগৃহের দ্বারে দ্বারে। বাক্‌চিত্র দুঃখী মানুষকে সান্ত্বনা দেয়, উৎসাহ যোগায় কর্ম্মক্লান্ত মানুষকে এবং আলো দেখায় পথভ্রষ্ট মানুষকে।

মানুষ ছায়াচিত্রকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে বলিয়া ছায়াচিত্রের প্রভাব আজ সমাজজীবনে এত বেশী। বাক্‌চিত্রে সে যাহা দেখে এবং যাহা শোনে, তাহা তাহার অন্তরে গিয়া প্রবেশ করে এবং সহজে তাহা সে ভুলিয়া যায় না। ছায়াচিত্রে যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহাই সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় জনসাধারণের মুখে। সাধারণ মানুষ ছায়াচিত্রের বাক্‌ভঙ্গী, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চলনভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ সবকিছু অনুকরণ করে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অনুকরণে তাই 'বড়ুয়া সার্ট', 'মানে-না-মানা শাড়ী', 'কাননবালা ব্লাউজ' ইত্যাদির প্রচুর প্রচলন দেখা যায়।

ছায়াচিত্র জনমতকে গড়িয়া তোলে। আধুনিক কালে কোন বিষয়সম্বন্ধে জনমত নির্ভর করে সেই বিষয়ের বহুল প্রচারের উপর। তাই জনমতগঠনে প্রধান সহায়ক ছায়াচিত্র ও সংবাদপত্র। কিন্তু সংবাদপত্র হইতেও ছায়াচিত্র এ-বিষয়ে অধিক সফল, কারণ ছায়াচিত্র কোন কাহিনীর মধ্য দিয়া কোন বিশিষ্ট মতবাদ সাধারণের নিকট পরিবেষণ করে। কাহিনী মানুষের মনে উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈয়ারী করে; ক্ষেত্র তৈয়ারী হইলে মতবাদের বীজ বপন করা হয়। একই সঙ্গে বহুলোক একটি বিষয় জানিতে পারে; আনন্দের মধ্য দিয়া তাহারা সমগ্র বিষয়টিকে পায়, তাই তাহারা ভাল করিয়া বিষয়টিকে বুঝিতে পারে। জনমতগঠনে ছায়াচিত্রের দায়িত্ব যে কতখানি, তাহা সোভিয়েট দেশের বর্ত্তমান ইতিহাস পড়িলেই জানা যায়।

অবশ্য বিপদ্‌ও এইখানেই। সংবাদপত্রের ন্যায় ছায়াচিত্রকেও মানুষের সর্ব্বজনীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া স্বার্থান্বেষী বর্ব্বরেরা নিজেদের স্বার্থের উদ্দেশ্যে ইহার অপব্যবহার করে অর্থাৎ ছায়াচিত্রের দ্বারা মানুষের অপকার করিবার চেষ্টা করে, মানুষকে নানারকম জঘন্য চিত্র দেখাইয়া তাহার পশুপ্রবৃত্তিগুলিকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আদিম প্রবৃত্তি সুপ্ত হইয়া আছে; সামান্য নাড়া পাইলেই ঐ প্রবৃত্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠে। তাই লালসাপূর্ণ চিত্র

দেখিলে সাধারণ মানুষের সহজেই উন্মত্ত হইয়া উঠিবার কথা। মানুষকে যদি এইভাবে নীচ প্রবৃত্তির পথে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে সে অন্য কোন দিকে মন দিবে না। তখন স্বার্থান্ধ মানুষ যথেচ্ছভাবে সাধারণের উপর অন্যায়, অত্যাচার করিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া আজকাল পৃথিবীতে বহু চিত্র নির্ম্মিত হইতেছে।

এই কারণেই ভাল, সুরুচিসম্পন্ন এবং আদর্শবাদী চিত্র ক্বচিৎ কখনও দেখা যায়। প্রত্যেক দেশেই একটি করিয়া সরকারী 'সেন্সর বোর্ড' আছে। ইহাদের কর্ত্তব্য হইল দেশে কুরুচিসম্পন্ন ছায়াচিত্রের প্রকাশ না হইতে দেওয়া। কিন্তু এই 'সেন্সর বোর্ডের' মানদণ্ড যে কি তাহা সাধারণের বুদ্ধির বাহিরে। কারণ, প্রতিদেশেই এত কুরুচিপূর্ণ ছায়াচিত্র দেখা যায় যে 'সেন্সর বোর্ডের' অস্তিত্বসম্বন্ধেই মনে প্রশ্ন জাগে। অথচ এই বোর্ড যে আছে ইহাও কাগজে-কলমে সত্য। বহু তরুণকেই প্রত্যহ ছায়াচিত্র দেখিতে যাইতে দেখা যায়, শহরের কোন প্রেক্ষাগৃহই বাদ যায় না। যাহা বাস্তবজীবনে সচরাচর দেখিতে পায় না, সেইরূপ কুরুচিপূর্ণ বহু দৃশ্য পরদায় প্রতিফলিত দেখিতে পায়; তাই প্রত্যহই তাহার যাওয়া চাই।

অথচ ছায়াচিত্রকে কত সুন্দর, কত হৃদয়গ্রাহী, কত মনোরম করা যায়। মানুষ বহু গ্রন্থরাজি পড়িয়া যাহা শিখিতে পারে না, বহু জ্ঞানী পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া যাহা জানিতে পারে না—একটি ছায়াচিত্র হইতে তাহার চেয়ে অনেক বেশী জানিতে ও শিখিতে পারে। কলিকাতায় সন্ধ্যাবেলায়, আরাম করিয়া হেলান দিয়া সে আফ্রিকার জঙ্গলের রহস্য জানিতে পারে। সমস্ত জীবন ভ্রমণ করিলেও মানুষের পক্ষে পৃথিবীর সকল দেশের সবকিছু জানা সম্ভব হয় না। অথচ ছায়াচিত্রের সাহায্যে সাহারার মরুভূমি হইতে সুরু করিয়া পৃথিবীর আশ্চর্য্যজনক যাহা-কিছু সবই জানিতে পারে। শিক্ষার প্রধান বাহক এই ছায়াচিত্রই হইতে পারে। যাহারা অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত, যাহাদের অক্ষরপরিচয় নাই, তাহাদের শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র ছায়াচিত্র। কারণ, ছায়াচিত্র তাহারা চোখ দিয়া দেখিবে এবং কান দিয়া শুনিবে। ভারতবর্ষের পক্ষে ছায়াচিত্রের উপকারিতা তাই অপরিসীম।

বর্ত্তমানে মানুষের জীবন ক্রমাগত জটিল হইতেছে এবং পৃথিবীময় সঙ্কট বাড়িতেছে। মানুষ সামাজিক জীব, সামাজিক প্রয়োজনেই ভাষা এবং চিত্রকলার সৃষ্টি। অন্যদিকে দৈনন্দিন সংগ্রামে সে এত ব্যস্ত যে, কল্পনাবিলাস করিবার সময় আর তাহার নাই। ছায়াচিত্রকেও আজ তাই বাস্তববাদী হইতে হইবে। জীবনবহির্ভূত কোন কাহিনী লইয়া চিত্র নির্ম্মাণ করিলে তাহা সফল চিত্র হইবে না। সাহিত্যের ন্যায় ছায়াচিত্রেও থাকা চাই জীবনের স্বীকৃতি। যে ছায়াচিত্রে জীবনের স্বাক্ষর নাই তাহা অবাস্তব, বর্ত্তমান মানুষের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। তাই চিত্র-পরিচালককে জীবনকে জানিতে হইবে—কল্পনার রঙীন আবেশে তাহাকে জানিলে চলিবে না,

খণ্ড খণ্ড করিয়া জীবনের প্রত্যেকটি অংশকে জানিতে হইবে। তাহা হইলেই তিনি সুন্দর অথচ বাস্তব চিত্রনির্ম্মাণে সাফল্য লাভ করিবেন।

ছায়াচিত্র-কোম্পানীর মালিকগণ সুচিত্রনির্ম্মাণে প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা কেবল সন্ধানে থাকেন কিসে বেশী অর্থ উপার্জ্জন করা যাইবে—ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই তাঁহারা লালসাপূর্ণ এবং কুরুচিপূর্ণ নানাপ্রকার চিত্র নির্ম্মাণ করেন, যাহা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে। তাঁহারা নীতিবোধ, ধর্ম্মবোধ, সমাজবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ —সবকিছুকে বিসর্জ্জন দেন অর্থ-উপার্জ্জনের বেদীমূলে। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তাঁহারা প্রচার-দপ্তর খোলেন, সাহিত্যিকদের নিযুক্ত করেন এইসব কুশ্রী চিত্রের ভাল সমালোচনা লিখিবার জন্য, সংবাদপত্রকে প্রচুর উৎকোচ দেন এইসব চিত্রের প্রশংসা করিবার জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। চোরা-ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের অর্থ খাটাইবার জন্য প্রতিদিনই নূতন নূতন কোম্পানী খুলিতেছেন এবং নানাপ্রকার কুৎসিত চিত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন। বর্ত্তমানে একদল পরিচালক তাঁহাদের চিত্রের ভিতর দিয়া সস্তা দেশপ্রেমের বুলি আওড়াইয়া আসর মাত করিবার চেষ্টায় আছেন। গত দুই বৎসরের বাঙলা চিত্র আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

ভারত আজ স্বাধীন। আজ তাই ভারতীয় ছায়াচিত্রের দায়িত্ব অনেক। মানুষকে শিক্ষিত করিবার, সমাজ-জীবনকে উন্নত করিবার দায়িত্ব আজ ছায়াচিত্রের অনেকখানি। এ-সম্বন্ধে জাতীয় সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। চিত্রশিল্পকে আজ জাতীয় শিল্পে পরিণত করা উচিত। তাহা হইলে চিত্রশিল্প লোভী ধনিকদিগের কবল হইতে মুক্ত হইয়া দেশের প্রকৃত উন্নতিবিধানে সমর্থ হইবে। নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। চিত্রশিল্পের প্রচুর উপকরণ রহিয়াছে আমাদের দেশে। এদেশেও 'মঁসিয়ে ভের্দু', 'গুড্ আর্থ', 'মিশন টু মস্কো' ইত্যাদির ন্যায় অপূর্ব্ব চিত্র নির্ম্মাণ করা যায়। আমাদের দেশে জীবনী-চিত্রের একান্ত অভাব। মনীষীদের জীবন লইয়া যে কি অপূর্ব্ব চিত্র নির্ম্মাণ করা যায় তাহা দেখাইয়াছে 'এমিলি জোলা', 'ম্যাডাম কুরী' প্রভৃতি যুগান্তকারী চিত্র। রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষ, গান্ধী প্রভৃতি জীবনী লইয়াও সেইরূপ চিত্র নির্ম্মাণ করা যায়। অবশ্য মাইকেল মধুসূদন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে লইয়া সবাক্ চলচ্চিত্র নির্ম্মিত ও প্রদর্শিত হইতেছে। লোকশিক্ষার দিক্ দিয়া এইজাতীয় জীবনচিত্র প্রচুর সম্ভাবনাময় বলিয়া মনে হয়।

জনকল্যাণের বাহনরূপ চলচ্চিত্রশিল্পকে সার্থক করিয়া তুলিবার শক্তি সরকারের আছে। তাঁহারা এদিকে অবহিত হউন, দেশবাসী ইহাই কামনা করে।

বাঙলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে কি না

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে একটি রাষ্ট্রভাষা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ আমলে এ সমস্যাটি ছিল না। আহিমাচল কুমারিকা ইংরেজীরই প্রবল প্রাদুর্ভাব। ইহারই মাধ্যমে বিচিত্র ভারতের সকল পার্থক্য তখন এক নূতন কৃষ্টিগত ঐক্যে সমন্বিত হইয়াছিল। কিন্তু সে কৃষ্টির মধ্যে ইউরোপীয় উপাদানই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। স্বাধীন ভারতে তাই এই কৃষ্টিগত পরাধীনতা হইতে আশু মুক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রশ্ন হইল—ইংরেজীর স্থলে কোন্ ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইতে পারে? কেন্দ্রে যাঁহারা শক্তির আসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্ররোচনায় মগজের বিচার না করিয়া কেবল মগজের আধারটির সংখ্যা গণনা করিয়াই হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। আপাততঃ সেকথা বাদ দিয়া বাঙলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারিত কিনা তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

রাষ্ট্রভাষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় ঐক্যবিধান। অতএব যে ভাষায় সর্ব্বাধিক জনসংখ্যা মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহাই রাষ্ট্রভাষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট। কিন্তু ভারতবর্ষের এমন একটি ভাষাও নাই যাহা স্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। এদেশের সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর ভাঙাহিন্দী প্রচলিত আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকেরই মাতৃভাষা। বাঙলাই সর্বাধিক লোকসংখ্যার মাতৃভাষা। এদিক দিয়া বাঙলার দাবী উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। তবে মোটামুটিভাবে কাজ চালাইবার জন্য হিন্দীর ন্যায় বাঙলার ব্যবহার তেমন ব্যাপক নহে। এই কারণে বাঙলাভাষাকে উপেক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় ভাবিবার আছে। রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রের ভাষামাত্র হইলেই হইবে না, উহাকে ভাষাহিসাবেও উৎকৃষ্ট হইতে হইবে। ভারতের সীমাহীন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য মানসিকতারও বৈচিত্র্য সূচিত করে। এই বৈচিত্র্যকে ঐক্যে সমন্বিত করিয়া ধারণ করা, তাহার স্ফুরণকে সহজ ও সাবলীল করা—এ বড় সহজ কথা নহে। অতিশয় উৎকৃষ্ট ভাষা ব্যতীত এ কার্য্য অসম্ভব বলিয়াই মনে করি। হিন্দী যত অধিক লোকেই বুঝুক না কেন, দৈনন্দিন বাজারের কাজে যতই তাহার প্রয়োগ থাকুক না কেন, বৃহত্তর প্রয়োজনে ইহার সামর্থ্য-সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় ও শঙ্কা আছে। এবিষয়ে বাঙলার পাশে যে ইহা দাঁড়াইতে পারে না, অন্ততঃ সে সত্যসম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রভাষা কেবল অফিসের কেরানীদের ভাষা নহে, যাবতীয় সূক্ষ্মসুন্দর জটিল ও সুকুমার ভাবসমূহ পরিস্ফুট করিবার শক্তিও উহার থাকা চাই। এ আদর্শ স্বীকার করিলে বাঙলার দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া পড়ে। বাঙলা আজ শুধু

ভারতেরই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বহন করে না, ইহা সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বাহক।

ভোটযুদ্ধে বাঙলাভাষা হারিত এবং হারিয়াছেও। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে brute majority শক্তিহীন। সেখানে একমাত্র উৎকর্ষই পরিণামে জয়লাভ করে। সেইজন্যই রোমক সাম্রাজ্য গ্রীক জাতিকে পদানত করিয়াও গ্রীসের নিকট কৃষ্টিগত দাসত্ব বরণ করিয়া লইয়াছিল। ভবিষ্যৎ ভারতে এই কারণে বাঙলাসাহিত্যের নিকট রাষ্ট্রভাষা হিন্দী যে দাসত্ব স্বীকার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই সর্ব্বদিক্ দিয়া যাহা গুরুস্থানীয়, সেই বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত করার প্রয়াস অন্যায় এবং দুরভিসন্ধি-প্রসূত বলিয়াই মনে করি।

বৃটিশ আমলে ভারতবাসী ইংরেজীভাষা ও সাহিত্যের প্রগাঢ় চর্চ্চা করিয়াছিল, তাহার মধ্যেও একটি শিক্ষা আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। রাজকার্য্যের জন্য যতটুকু ইংরেজীজ্ঞান প্রয়োজন তাহার শতগুণ জ্ঞানলাভের জন্য কেন সেদিন ভারতবাসী এত অনুপ্রাণিত হইয়াছিল? ইহার একমাত্র উত্তর ইংরেজী সাহিত্যের উৎকর্ষ। অতএব রাষ্ট্রভাষা যদি এমন একটি ভাষা হয় যাহা ব্যাবহারিক প্রয়োজন মিটাইয়া আত্মার ক্ষুধারও নিবৃত্তি ঘটাইতে পারে, তবে তাহা সকল দিক্ দিয়াই সার্থক হইয়া উঠে। বাঙলার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী এদিক দিয়াই সর্ব্বাধিক এবং অতিশয় ন্যায্য। মদ্রদেশীয় তামিল বা তেলেগুভাষী ব্যক্তি—যিনি হিন্দীর বিন্দুবিসর্গও জানেন না—তিনি হিন্দী পড়িবেন কেন? নিছক কলমপেষার তাগিদ ভিন্ন আর কি আকর্ষণ তাহাতে আছে? অথচ বাঙলা যদি রাষ্ট্রভাষা হয়, তবে চাকুরীর প্রয়োজন অপেক্ষা আরও অনেক বেশী উপযোগিতা লইয়া উহা তাঁহার নিকট মধুময় হইয়া উঠিতে পারে।

এরূপে সকল দিক্ বিচার করিয়া বাঙলার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবীই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত মনে হয়। ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ অমার্জ্জিত সংস্কার ত্যাগ করিয়া বাঙলাকে রাষ্ট্রসম্মানে অভিষিক্ত করিলে দেশের অবর্ণনীয় কল্যাণ সাধন করিতেন—ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

পল্লী ও নগরী

বিখ্যাত ইংরেজ কবি কাউপার লিখিয়াছেন—'God made the country and man made the town'। পল্লীগ্রাম লইয়া ভাববিলাসিতার আর অন্ত নাই। নাগরিক জীবনের বিরুদ্ধে বলা আধুনিক মানুষের একটি সংক্রামক ব্যাধি। পল্লীর সৌন্দর্য্য, শান্ত মধুর আবহাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে তাই নগরে বসিয়া কাব্য-বিলাস চলে। অপরপক্ষে পল্লীবাসীরাও নাগরিক জীবনের প্রতি মোহগ্রস্ত। মানুষের মধ্যে

একটি প্রচণ্ড ঘূর্ণি আছে, যাহা মানুষকে একজায়গায় স্থির হইয়া বসিতে দেয় না; মানুষ নিজের অবস্থায় তাই চিরদিনই অতৃপ্ত। সে যাহা পায় না তাহাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। তাই গ্রামবাসী শহরবাসীদের ঈর্ষ্যা করে এবং শহরবাসী গ্রামবাসীদের ঈর্ষ্যা করে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই মনস্তত্বকে 'কণিকা'য় সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস—
ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।"

পল্লীজীবন এবং নাগরিক জীবন—উভয়ের মধ্যেই যথেষ্ট ভাল ও মন্দ আছে। কোনটিকেই একেবারে মন্দ বলিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া যায় না এবং কোনটিকেই একেবারে দোষরহিত বলা যায় না। কবি এবং কল্পনাবিলাসিগণ নগরকে অনেক সময় নরকসদৃশ বলিয়া চিত্রিত করেন, এবং সেই সঙ্গে পল্লীজীবনকে 'স্বরগসমান' বলিয়া তাহার জয়গান করেন। ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। বড় বড় শহরে ধোঁয়া এবং ধূলা আছে; মানুষ বহু কষ্টে নগরে কালাতিপাত করে। খোলা হাওয়ার সেখানে একান্ত অভাব এবং মানুষে মানুষে আত্মীয়তাবোধের অভাব। ইহা সমস্ত সত্য। আবার ধনী-দরিদ্রে প্রভেদও শহরে বেশী। নাগরিক জীবন অত্যন্ত জটিল। কবিরা সবিস্তারে এইসব বর্ণনা করেন।

কিন্তু নাগরিক জীবনে সুখসুবিধা কি কিছুই নাই? দুঃখ, অভাব, অভিযোগ, অনটন—ইহারাই কি নগরে রাজত্ব করে? কাউপার অতি সত্য কথা বলিয়াছেন—নগর মানুষের সৃষ্টি; কিন্তু মানুষ নগরকে তৈয়ার করিয়াছে তাহার সুখ, সুবিধা, আনন্দের জন্য। তাই নগরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, কর্পোরেশন রহিয়াছে; যানবাহনের সুবিধা রহিয়াছে, আর আছে পানীয় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে সহজ ও সুন্দর করিতে চেষ্টা করিতেছে। নগরেই কেবল বিজ্ঞানের দানকে উপভোগ করা যায়। নাগরিক জীবন কিছু জটিল হইলেও আরামদায়ক—মানুষ গৃহ হইতে বাহির হইয়াই পায় ট্রাম বা বাস, অল্প সময়ের মধ্যেই সে অনেক দূর যাইতে পারে; কল খুলিলেই পরিষ্কার পানীয় জল সে পায়; সুইচ টিপিলেই ঘরে আলো ঝলমল করিয়া উঠে। ছোট ছোট শিশুদের খেলাধুলা করিবার জন্য রহিয়াছে বড় বড় পার্ক এবং উদ্যান। শিক্ষার জন্য রহিয়াছে স্কুল এবং কলেজ। সর্ব্ববিষয়ে উচ্চ শিক্ষা-লাভের জন্য রহিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়। নানারকম কল, কারখানা, দোকান রহিয়াছে শহরে। ভোর হইতেই দলে দলে শ্রমিক যায় কারখানায় কাজ করিতে; দশটায় অফিসের বাবুরা যান নিজ নিজ অফিসে; বিকালে নানাপ্রকার খেলা হয় মাঠে, দর্শকের কলকণ্ঠে এবং করতালিতে মুখরিত হইয়া উঠে বৈকালী আকাশ। সন্ধ্যাবেলায় মানুষ যায় থিয়েটার, সিনেমা বা ক্লাবে—তাহার সারাদিনের ক্লান্তি হয় দূর, প্রফুল্ল

হৃদয়ে শয়ন করিতে যায় রাত্রিতে। শহরে রহিয়াছে অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য, অবিরাম কর্ম্মব্যস্ততা।

কিন্তু এইসব সুখ-সুবিধা থাকা-সত্ত্বেও নাগরিক জীবন সর্ব্বদা ভাল লাগে না। নাগরিক জীবনে অদ্ভুত কৃত্রিমতা আসিয়া পড়ে; মানুষের স্বাভাবিক ও সরল জীবন ব্যাহত হয়। মানুষের জীবন বৈচিত্র্যহীন, মেশিনের মত হইয়া যায়। সে যেন একটি মেশিন, সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া চলিয়াছে—তাহাকে ছুটি দিতে পারে একমাত্র মৃত্যু; না হইলে এই মেশিন-জীবন হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। শহরে একঘেয়ে জীবন যাপন করিতে করিতে মানুষের উৎসাহ কমিয়া আসে, জীবনীশক্তির হয় হ্রাস। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন সংযোগ থাকে না; আত্মীয়তার বন্ধন নষ্ট হইয়া যায়; হৃদয় হয় কঠিন। মানুষের কোমল অনুভূতি, সুন্দর প্রবৃত্তি সকলেরই মৃত্যু ঘটে, বাঁচিয়া থাকে কেবল পাথরের ন্যায় কঠিন ব্যবসায়সম্পর্ক। শহরের মানুষ বৃথাই শান্তি এবং একাকিত্ব খুঁজিয়া মরে।

প্রত্যেক মানুষই জীবনে একাকিত্বের প্রয়োজন অনুভব করে। মানুষ সর্ব্বদা স্বার্থের কথা, ব্যবসায়ের কথা লইয়া বাঁচিতে পারে না—তাহার চাই একটু সামান্য নিভৃত স্থান, সেখানে সে নিজের সঙ্গে আপোষ করিতে পারে। এই নির্জ্জনতা শহরে পাওয়া দুষ্কর। তাই মানুষকে ছুটিতে হয় পল্লীগ্রামে, যেখানে প্রশান্ত আকাশের নীচে সে কিছুক্ষণ আত্মচিন্তায় বিভোর থাকিতে পারে। বুদ্ধিমান্ মানুষের তাই কিছুদিন পর পর শহরের কর্ম্মচঞ্চল জীবন হইতে সাময়িক বিদায় নিয়া পল্লীগ্রামে যাওয়া প্রয়োজন। মানসিক সুস্থতা লাভের জন্য যে শান্তিময় মুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন, তাহা একমাত্র পল্লীগ্রামেই পাওয়া সম্ভব। শহরে নানাবিধ প্রলোভনে মন হয় বিক্ষিপ্ত, কিন্তু পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধতা মানুষের মনে আনে একাগ্রতা।

পল্লীগ্রামের জীবনে কৃত্রিমতা নাই। প্রকৃতির সঙ্গে যেখানে মানুষের সংযোগ নিবিড়, কৃত্রিমতা সেখানে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই পল্লীবাসীর জীবন সরল ও অকৃত্রিম, তাহার জীবনযাত্রা সহজ ও সুন্দর। ভোরে কৃষক বলদ লইয়া চলে মাঠে, যেখানে তরুণ সবিতার স্নিগ্ধ হাসি প্রতিটি ধানের শিষকে স্পর্শ করে; কৃষক গান করে আর কাজ করে মাঠে। বালকবালিকারা পথের ধারে খেলা করে; নদীর ঘাট হইতে বধূরা জল লইয়া যায়। যুবকেরা নদীতে সাঁতার কাটে প্রচণ্ড উল্লাসে। অপরাহ্ণে রৌদ্র পড়িয়া আসে; ক্লান্ত সবিতা ধীরে ধীরে আশ্রয় নেয় পশ্চিম দিগন্তে। কৃষক ফিরিয়া আসে গাড়ীবোঝাই ধান লইয়া। পল্লীগ্রামের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি ব্যাপারে পাওয়া যায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ।

নগরে বাস করে বহু দেশের বহু জাতি এবং বহু লোক। কিন্তু তবু নগরবাসী সকলের সঙ্গে পরিচিত নহেন। কারণ, ব্যবসায় যেখানে মূলমন্ত্র সেখানে কেবল

কৃত্রিমতাই থাকে, হৃদয়ের কারবার সেখানে নাই। পল্লীগ্রামে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। পল্লীগ্রামে লোকসংখ্যা অল্প, তদুপরি সেখানে সকলেরই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা —তাই প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব থাকে। পল্লীগ্রামের একজনের বিপদে তাই সকল গ্রামবাসী ছুটিয়া যায়, যাহার যেরূপ সাধ্য সাহায্য করে বিপদ্‌গ্রস্ত লোকটিকে। অকৃত্রিম আত্মীয়তাবোধ একমাত্র পল্লীবাসীদের মধ্যেই দেখা যায়।

বাঙলার পল্লীতে আজ আর কোন সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পল্লীবাসীরা জমিদারের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত। তাহার পর অধিকাংশ পল্লী অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান। জল-নিকাশের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, বর্ষাকালে ম্যালেরিয়া, এবং পরিষ্কৃত জলের অভাবে বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ আজ বাঙলার প্রতিটি পল্লীতে। নগরের আকর্ষণ বেশী হওয়াতে মধ্যবিত্তেরা প্রায় সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বাস করিতেছেন। ইহাতে গ্রামের ভদ্র ও শিক্ষিত জনসংখ্যা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে যতদিন সভ্যতা থাকিবে, ততদিন নগর এবং গ্রাম উভয়েরই প্রয়োজন থাকিবে। মানুষকে বাঁচিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম চাই খাদ্য। এই খাদ্য উৎপন্ন হয় গ্রামে। তাই মানুষ চিরকাল গ্রামের নিকট ঋণী থাকিবে। গ্রাম তাহাকে চিরকাল ফসল দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে। অন্যদিকে নগর যোগাইবে তাহার বস্ত্র, ঔষধ এবং জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় উপকরণ। তাই গ্রামবাসী এবং নগরবাসীদের মধ্যে সহযোগিতা আবশ্যক। উভয়ের পূর্ণ সহযোগিতাই পৃথিবীতে কল্যাণ আনিতে পারে।

ছাত্র ও রাজনীতি

বর্ত্তমানে মানুষের জীবন ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। মানুষ আজ পরিপূর্ণ সামাজিক জীব—সমাজের উত্থানেই তাহার উত্থান, সমাজের পতনেই তাহার পতন। মানুষ সমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সুতরাং তাহার দায়িত্বও অনেক। এই দায়িত্ব সকল মানুষের। প্রত্যেকটি সামাজিক জীবের উপর নির্ভর করে সমাজ ও দেশের উন্নতি—প্রতিটি মানুষের দানে সমৃদ্ধ হয় দেশের সংস্কৃতি। তাই আজ মানুষের আত্মচিন্তার দিন চলিয়া গিয়াছে—দিন আসিয়াছে কাজের। আবার সমাজের ও দেশের উন্নতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর; রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সাহিত্য, শিল্প ও চারুকলা। কারণ সাহিত্য ও শিল্প সমাজ-মানসেরই প্রতিফলন। সুস্থ সাহিত্য, ও শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সুস্থ

রাজনৈতিক আবহাওয়ার। আধুনিক মানুষের তাই রাজনীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ছাত্রদের পক্ষেও এই একই কথা। রাজনীতি ব্যতিরেকে আজ কোন মানুষই পৃথিবীতে বাস করিতে পারে না।

বর্ত্তমানের পরিস্থিতিই রাজনীতির মূল্য এতখানি বাড়াইয়াছে। প্রাচীন যুগে ছিল 'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ'—অর্থাৎ অধ্যয়নই ছাত্রের তপস্যা। প্রাচীন যুগে সভ্যতা ছিল অরণ্যাশ্রয়ী। তখন ছাত্রেরা অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে যাইত; গুরু বাস করিতেন লোকালয় হইতে বহু দূরে অরণ্যে। ছাত্রেরা আশ্রমে থাকিত এবং পাঠাভ্যাস করিত। লোকালয়ের সহিত কোন সংস্পর্শই ছিল না। প্রাচীন যুগের জীবনাদর্শ ছিল সরল, জীবনধারণের প্রণালী ছিল সহজ—মানুষ কালাতিপাত করিত শান্তিতে। ধীরে ধীরে মানুষের জীবন জটিল হইয়া উঠিল, দিনের পর দিন নূতন নূতন সমস্যা আসিতে লাগিল মানুষের জীবনে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানার আবিষ্কার হইল। জগতে কৃষি-সভ্যতার অবসান ঘটিল—আরম্ভ হইল বণিক্-সভ্যতা। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বণিক্-সভ্যতার দান অসীম, কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই সভ্যতা মানুষের স্বাধীনতাকে আনকাংশে খর্ব্ব করিয়াছে। এই বণিক্-সভ্যতা মানুষকে সাম্রাজ্যলোভী করিয়াছে এবং ইহার ফল আমরা বর্ত্তমানে পৃথিবীর ইতিহাসে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। মানুষের জীবনে এখন তাই রাজনীতিই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। কারণ তাহার জীবনযাত্রার প্রয়াস আজ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজ বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই রাজনীতি আলোচনা করিতে দেখা যায়, কারণ যুগ বদলাইয়াছে। প্রাচীনকালে সমাজব্যবস্থা ছিল একপ্রকার—মাত্র কয়েকটি মানুষ রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইত, অন্যান্য সকলে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিত। ছাত্রেরা তাই পাঠ্যাবস্থায় রাজধানীতে বা শহরে না থাকিয়া দূরে কোন আশ্রমে পাঠাভ্যাস করিত, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শেষ হইলে গ্রামে বা নগরে ফিরিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিত এবং প্রয়োজন বোধ করিলে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিত। আধুনিক যুগে দেখা যায় ছাত্রেরা রাজনীতি আলোচনা করিতেছে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করিতেছে।

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাস আজ ইহারই সাক্ষ্য দেয়। দেশে দেশে আজ ছাত্র-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; স্বাধীনতা-আন্দোলনে আজ ছাত্রসমাজ পুরোভাগে আসিয়াছে। মিশরের ছাত্রদের অসমসাহসিক আন্দোলন আজ পৃথিবী-বিখ্যাত। চীনদেশের ছাত্রসমাজ শত্রুর হাত হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহা অতুলনীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ছাত্রসমাজ প্রতি দেশেই আপন আপন কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠে। ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের

ছাত্রসমাজ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আত্মাহুতি দিয়াছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রচেষ্টায়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় ছাত্রসমাজের মহৎ দান কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় ছাত্র-আন্দোলনের স্রষ্টা নেতাজী সুভাষচন্দ্র। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার নেতৃত্বে সর্ব্বপ্রথম সক্রিয় ছাত্র-আন্দোলন হয় একজন বিদেশী অধ্যাপকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে। কংগ্রেস যতবার সংগ্রামের আহ্বান পাঠাইয়াছে, প্রতিবারই ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠচিত্তে সাড়া দিয়াছে। ১৯৪২-এর আগষ্ট বিপ্লবে ছাত্রসমাজের কৃতিত্ব অনেকখানি। যুদ্ধাবসানে স্বাধীনতার কোন আশা না দেখিয়া ছাত্রসমাজ আবার আন্দোলন আরম্ভ করেন, এবং ১৯৪৫ সালের শেষভাগে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি দাবী করিয়া তাঁহারা যে অপূর্ব্ব আন্দোলন গড়িয়া তোলেন, তাহা স্বাধীনতার ইতিহাসে অক্ষয় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ছাত্রসমাজের রাজনীতিতে অংশ লওয়া উচিত কিনা, এই লইয়া প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। হইবেই, কারণ প্রত্যেক বিষয়েরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকে। একসময় ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করা উচিত কিনা, ইহাও বিতর্কের বিষয় ছিল। আজ ইতিহাস সেই বিতর্কের অবসান করিয়াছে, ভবিষ্যতে ইতিহাস 'ছাত্র ও রাজনীতি' বিতর্কেরও সমাধান করিবে। 'ছাত্র ও রাজনীতি' বিষয়ে সচরাচর প্রচলিত তিনটি মত আছে। একদল বলেন—ছাত্রদের রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন। ছাত্রদের তপস্যা হইল চরিত্রগঠন ও অধ্যয়ন। তাই তাহারা জগতের অন্য কোন বিষয়ে মন না দিয়া একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করিবে পাঠচর্চ্চায়। ভাল করিয়া পাঠাভ্যাস করা এবং পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হওয়া তাহাদের ছাত্রজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনীতিতে মনোযোগ দিলে পাঠচর্চ্চায় বিঘ্ন জন্মিবে। এইসব প্রাচীনপন্থী জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করেন। জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে শিক্ষা, তাহার মূল্য কতটুকু?

দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকেরা প্রাচীনপন্থী হইতে অনেক উদার। তাঁহারা জীবনে রাজনীতির প্রয়োজন স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে ছাত্রদের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান আহরণ করা উচিত। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অধিকভাবে জানা উচিত ছাত্রদের। তাহারা এই বিষয়গুলি পড়িবে—কারণ তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনযুদ্ধে এই জ্ঞান সাহায্য করিবে। কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহাতে তাহাদের জ্ঞানার্জ্জনের পথে বাধা সৃষ্টি হইবে—তাহারা পাঠচর্চ্চায় আর মনোনিবেশ করিতে পারিবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচকগণ জীবনে রাজনীতির স্থান সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করেন। তাঁহারা পাঠচর্চ্চা এবং রাজনীতি কোনটিকেই অস্বীকার করেন না। ইহাদের মতে ছাত্রজীবনে পাঠচর্চ্চা এবং রাজনীতি একই সঙ্গে চলিতে পারে। ইতিহাস হইতে ইহার প্রমাণ তাঁহারা সংগ্রহ করেন এবং ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অনুকূলে মত পোষণ করেন। ছাত্রগণই জাতির ভবিষ্যৎ।

ছাত্রজীবনের মূল উদ্দেশ্য হইল জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা। ইহার জন্য প্রয়োজন পাঠাভ্যাস, জগৎ ও সমাজের সহিত সংযোগ। পৃথিবীর বর্ত্তমান ঘটনাবলীকে না বুঝিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই ঘটনাবলী বুঝিবার জন্য ছাত্রকে ইতিহাস এবং রাজনীতি বুঝিতে হইবে; পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত তাহাকে পরিচিত হইতে হইবে। কিন্তু কেবল রাজনীতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি-সম্বন্ধে গ্রন্থ পড়িলেই চলিবে না—প্রয়োজন হইলে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু রাজনীতির ও দেশ-সেবার মিথ্যা অজুহাত দিয়া পাঠচর্চ্চায় অবহেলা করা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়—প্রয়োজন ইহাদের সমন্বয়ের।

দেশ যদি শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয়, দেশের স্বাধীনতা যদি বিপন্ন হয়, কিংবা প্রতিষ্ঠিত সরকারের অনাচার-অত্যাচার যদি কোনক্রমেই রোধ না করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশের ছাত্রসমাজকেই সমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সঙ্কটকালে পাঠচর্চ্চার দোহাই দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা দেশের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। আজ যাহারা ছাত্র, উত্তরকালে তাহারাই হইবে দেশের কর্ণধার। আজ তাই ছাত্রদের দায়িত্ব অনেক। দেশকে সুখী করিবার, সমৃদ্ধ করিবার, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার, অসাম্য দূর করিবার গুরু দায়িত্ব আজ ছাত্রদের। ভারতীয় ছাত্রদের আজ দেশসেবা ও জ্ঞান-আহরণ এই দুইটিই মূল লক্ষ্য।

———

লেখাচিত্র

হিমাচল

স্বর্গমর্ত্ত্য যোগ করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে প্রকৃতির এই পরম বিস্ময়। ভারতের সমগ্র বিস্তীর্ণ উত্তর সীমা পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রসারিত, ভূতল হইতে আকাশের অত্যুচ্চ প্রদেশ পর্য্যন্ত সমুন্নত, অতিশয় বিশাল ও কল্পনাতীত বৈচিত্র্যমণ্ডিত এই যে মহান্ অচলায়তন, উহাই বিশ্ববিখ্যাত হিমালয়।

প্রকৃতির রাজ্যে এতবড় বস্তু বোধহয় আর একটিও নাই। সহস্রযোজনবিস্তারী তরঙ্গভঙ্গক্ষুব্ধ অসীম সিন্ধুও ইহার মত এত সশ্রদ্ধ বিস্ময় উদ্রেক করে না—ইহার বিপুল মহত্ত্ব মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে সহজেই বিমূঢ় করিয়া দেয়। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে মহাসমুদ্রও চক্রবালরেখায় আবদ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ররূপেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই বিরাট্ পর্ব্বত দৃষ্টির সীমাতেই আরও বড়, আরও রহস্যময় হইয়া বহু ঊর্দ্ধে—কোথায় যেন স্বর্গের স্বর্ণদ্বারে গিয়া পৌছিয়াছে। মহাসমুদ্রের বজ্রনির্ঘোষ অপেক্ষাও বহুতর শক্তিব্যঞ্জক এই হিমালয়ের অটল মৌন! বিশ্বের বিস্ময়, মহত্ত্বের বিপুলতম অভিব্যক্তি অবিকম্প স্থৈর্য্য লইয়া ভারতপ্রান্তে এক অনাদ্যন্ত তপস্যায় যেন অচল হইয়া আছে। সত্যই ধ্যানরত এই গিরিরাজ এতই বিপুল যে, আমাদের ধ্যানধারণার ক্ষুদ্র পরিসরে কিছুতেই তাহার পূর্ণরূপটির স্থানসঙ্কুলান হয় না। তাহার এক-একটি খণ্ড ক্ষুদ্র দিক্ই আমাদের সমগ্র দৃষ্টি আবৃত করিয়া দিয়া কল্পনা ও বুদ্ধিকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া দেয়। অন্ধের হস্তিসম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞানলাভ সম্ভব, হিমালয়সম্বন্ধে তাহার শতসহস্রাংশ জ্ঞানলাভও বোধহয় মানুষের সাধ্যাতীত।

কি বিচিত্র তাহার শোভা! ঊর্দ্ধে চিরতুষারমণ্ডিত শিখরশ্রেণী অভ্রংলেহী উন্নতি লইয়া ভাস্বর প্রভায় আকাশমণ্ডল আলোকিত রাখিয়াছে; কোথাও বা বিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্র তরঙ্গলীলায় নিশ্চল হইয়া সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের দৃশ্য রচনা করিয়াছে। মধ্যে স্ফটিক-স্তরের সমুজ্জ্বল জ্যোতি ও সুচিক্কণ মসৃণতা অবর্ণনীয় শোভায় বিকশিত। নিম্নে শাল, দেবদারু, অগুরু চন্দন, আরও কত শত বৃক্ষরাজি নিবিড় অরণ্য রচনা করিয়াছে। সে অরণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ, চমরী ও কস্তুরীমৃগসমূহ পরম আনন্দে স্বচ্ছন্দে বিহার করে। কোথাও উত্তুঙ্গ শৃঙ্গপ্রাচীরবেষ্টিত উপত্যকা ও অপরূপ অধিত্যকা প্রদেশ। কোথাও বা গর্জ্জনমুখর ফেনিলোচ্ছল জলপ্রপাত রজতধারায় নামিয়া আসে। মনে হয় এক-একটি সমগ্র চন্দ্র যেন ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া তরল প্রবাহে গলিয়া পড়িতেছে,—তাহা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে অসংখ্য জ্যোতির্বিন্দু, যেন অসংখ্য তারা ছোটে

চারিভিতে। সূর্য্যের কিরণে তাহাতে বিচিত্রবর্ণ রামধনুর বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। চক্ষু-তারকা বিহ্বল পুলকে নিশ্চল হইয়া যায়—দেখিয়া দেখিয়া আর আশ মিটে না। কোথাও আবার বিসর্পিত রেখায় নদীধারা সবেগে ফেনোচ্ছ্বাসহকারে ধাবমান, কোথাও 'ললিত হরিত বেশে নধর নিকুঞ্জরাশি সাজে থরে থর!' কোথাও নিবিড় বনানীর শ্যামশাখায় উঠে অযুত বিহগের মধুর কাকলী। কোথাও বায়ুভরে সঞ্চরমাণ তূলার মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ পাহাড়ের গায়ে ঠেকিয়া ফিরিয়া যায়, কোথাও সহসা এক পসলা বর্ষণ হইয়া যায়। অহর্নিশ চলে এই মেঘের আনাগোনা আর লুকোচুরি খেলা। আকাশের গায়ে মেঘের দেশে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পটপরিবর্ত্তন ঘটে—হিমাচলদেহে তাহার নীল ছায়া ও আলো-আঁধারে নবনবীন লীলা ফুটিয়া উঠে। এই বৃষ্টি এই রৌদ্র, এই হাসি এই কান্না। মত্তবিক্রমে মেঘের হাতী আসিয়া যেই পাহাড়ের গায়ে দাঁত ফুটায়, প্রচণ্ড প্রভঞ্জন আসিয়া অমনি তাহাকে ঘূর্ণিপাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। হিমাচলের অনড় অচল স্তব্ধতা এই চঞ্চল লীলার পরিপ্রেক্ষিতে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। স্তব্ধ অচল এই মহাচলে প্রকৃতি নিপুণ হস্তে যে বনশোভা রচনা করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও তুলনা নাই। ঊর্দ্ধে মর্ম্মরশৈল স্বপ্নাবিষ্টের মত শুভ্র জ্যোৎস্নায় মোহময়, নিম্নে শ্যাম বনানীতে বৃক্ষলতাগুল্মের বিচিত্র বিন্যাস। কোথাও সহস্রবর্ষ প্রাচীন বনস্পতির বিপুল বিস্তার—নীচের অংশ তাহার পাষাণে পরিণত হইতেছে, কোথাও ফলফুলের অফুরন্ত সম্ভার, কোথাও বা মেষপৃষ্ঠের কুঞ্চিত রোমরাজির ন্যায় গুল্মাচ্ছাদিত পাহাড়ের ঢাল। কোথাও পাহাড় খাড়া হইয়া সোজা নামিয়া গিয়াছে, ধূসর কৃষ্ণ শুভ্র পাংশু বিচিত্র বর্ণের পাষাণস্তর তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কোথাও দেখি মন্দিরশীর্ষের ন্যায় শৈলশিখর, কোথাও বা তুষারক্ষেত্র শুভ্র আকাশের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। প্রভাতের অরুণালোক রক্তচ্ছটায় শুক্ল মর্ম্মর আর শুভ্র তুষারকে রাঙাইয়া তোলে। মধ্যাহ্নের খরজ্যোতি প্রোজ্জ্বল শৈলশীর্ষে প্রতিফলিত হইয়া মেঘের কোলে পরীর দেশে রহস্যময় সৌন্দর্য্য বিকশিত করে।

সীমাহীন সৌন্দর্য্যের আধার এই হিমালয়। কিন্তু সৌন্দর্য্যেরও অপেক্ষা মহত্তর একটা দিব্যরূপ ইহাকে আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছে। নিম্নে ঊর্দ্ধে বামে দক্ষিণে—যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি গগনতল প্লাবিত করিয়া কি প্রকাণ্ড কাণ্ড, মহান্ ব্যাপার, যেন 'পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম' লইয়া দণ্ডায়মান। এই সকল কারণেই বোধহয় মহাকবি কালিদাস হিমাচলকে 'দেবতাত্মা' বলিয়াছেন : "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।"

পল্লীর বর্ষা

ঋতুচক্রে গ্রীষ্মের পরই বর্ষার স্থান। কিন্তু নিদাঘের দাবদাহ জুড়াইয়া দিয়া কখন যে বর্ষা আসিয়া পড়ে, ঋতুবিভাগ তাহার সঠিক সন্ধান দিতে পারে না। গ্রীষ্মের আতপ্ত দীর্ঘশ্বাস জলাশয় নদনদীর শুষ্কশীর্ণ বক্ষ হইতে অহর্নিশ উর্দ্ধে উঠে। মেঘের দেশে চাতকের করুণ আকূতি আর রৌদ্রজ্বালায় দীর্ণভিন্ন ধরণীবক্ষ, ঝিঁঝি-পোকার একঘেয়ে টানা স্থর আর পত্রহীন বৃক্ষপঞ্জরে বায়ুবাহিত নিষ্করুণ হাহাকার সমগ্র ম্রিয়মাণ প্রকৃতিকে একান্ত মরুময় করিয়া তোলে। তখন সহসা কোথা হইতে 'অতি ভৈরব হরষে' 'ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা' আসিয়া পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব্বের সজল সমীর আকাশসঞ্চিত পুঞ্জীভূত তপ্ত বাষ্পকে গলাইয়া জমাইয়া রচনা করে মেঘকজ্জল নীল মায়া। বিশীর্ণ প্রকৃতির তৃষ্ণাতুর দেহে সবলে ব্যজন করে মত্ত প্রভঞ্জন। কিন্তু তাহাতে দেহের তাপ জুড়াইলেও দগ্ধকণ্ঠের জ্বালা জুড়ায় না। মরীয়া প্রকৃতি কালবৈশাখীর নটলীলায় উদ্দাম বিদ্রোহ জানায় আকাশের নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে। তারপরই সহসা বিশ্বের সকল মেদুর করুণা প্রচুর বর্ষণে নামিয়া আসে ধরাতলে। শোষণক্লিষ্ট বসুন্ধরার পিপাসার নিবৃত্তি হয়—বর্ষা আসিয়া পড়ে।

উতলা কলাপী অমনি কেকা-কলরবে নাচিয়া উঠে। ডাকিয়া উঠে ডাহুক-ডাহুকী। মত্ত দাদুরীর সঘন একতান উঠে দিকে দিকে। কদম্বশিখরে জাগে বিকচ-শিহরণ, বনে বনে হাসে কেতকী-করবী মালতী-যূথী। গগনে গগনে ঘনকৃষ্ণ মেঘমায়া, তরুলতায় শ্যামচ্ছায়া, পর্ব্বে পর্ব্বে জাগে সবুজ অঙ্কুর, নব কিশলয়ে জাগে সুচিক্কণ অরুণাভ শ্যামলতা। নূতন প্রাণের নবনবীন সমারোহ দেখা দেয় বর্ণে, গন্ধে ও সতেজ স্ফুরণে।

এমন দিনে মানুষের হৃদয়েও "শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মত করিয়া বিকাশ" নাচিয়া উঠে। মিথ্যা অছিলায় শিশুগণ নামিয়া আসে বাহিরে, বৃষ্টির তীক্ষ্ণ সজল সিক্ত ধারা মাখে সর্ব্বদেহে। কাগজের নৌকা গড়িয়া অথবা কেয়াপাতায় ময়ূরপঙ্খী রচনা করিয়া হয়তো বা কলাবতীর উদ্দেশেই জলে ভাসাইয়া দেয়। বিবশ চেতনায় বিরহী যুবক তখন অলস আবেশে রচে মেঘদূত। প্রৌঢ় বৃদ্ধ, কবি বা অকবি—সকলেরই চিত্ত দুলিয়া উঠে। 'নিখিলচিত্তহরষা' এই বরষা। তাই যুগে যুগে কবিকুল বর্ষামঙ্গল গাহিয়াছেন। মেঘমেদুর সে মধুর আকাশে কি যে মদির নেশা! বাল্মীকি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সর্ব্বকালের সকল কবি উদাত্ত কণ্ঠে বর্ষার গান গাহিয়াছেন; তবে তাহার বুকের মধুসঞ্চয়টুকু নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। না পারিবারই কথা। রূপ দেখি, রস পান করি, শ্রবণে শুনি মেঘডম্বরুর গম্ভীর রব। একদিকে পবনপূরিত পর্ব্বতকন্দরের গম্ভীর নির্ঘোষ, বজ্রের দীপ্তলেখ আর কর্কশ

নিনাদ, অপরদিকে মন্দ সমীরণের মৃদু নিঃস্বনন এবং ধারাপতনের মোহময় ঐকতান। ভৈরবে হরষে বিচিত্র এই বর্ষা।

বাঙলার পল্লীতে যখন এহেন বর্ষা আসিয়া পড়ে, তখন বাস্তবিক আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। ইহার কারণ যে শুধু কেবল সেই অপরূপ শ্যামশোভা, তাহা নহে। সৌন্দর্য্যের সহিত সমৃদ্ধি, লক্ষ্মীর সহিত শ্রী একত্র হইয়া তবেই তো বর্ষা বাঙালীর এত প্রাণের বস্তু। শস্যসম্ভারে সুফলা হইয়া উঠিবে সুজলা বঙ্গভূমি—বর্ষা যে তাহারই বাণী। মাঠে মাঠে শুধু জল, জলে ভাসে বলাকামালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ পাল-তোলা নৌকার দল। বাণিজ্যের মরশুম লাগিয়া যায়, আসন্ন পূজার বাজার জমিয়া উঠিতে থাকে অজস্র পণ্যসম্ভারে। এরূপে শস্যে পণ্যে সম্পদে সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে বাঙলাদেশ। বর্ষা তাই সর্ব্বজনবরেণ্য।

কিন্তু কুসুমে যেমন কীট আছে চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক থাকে, প্রদীপের তলায় যেমন থাকে তিমিরচ্ছায়া—বর্ষারও তেমনি একটা মসীময় দিক্ আছে। উহার সূচনায় মত্ত প্রভঞ্জনের তাণ্ডবলীলা শুধু যে বর্ষণেরই বার্ত্তা বহন করে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে অজস্র অশ্রুজলও ইহা লইয়া আসে। দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরের একান্ত আশ্রয়টুকু দেয় ইহা নষ্ট করিয়া, পক্ষিকুলের অণ্ড-শাবক নাশ করিয়া সৃষ্টি করে কত বেদনা। নীড়হারা পাখী আর ঘরহীন মানুষের ক্রন্দন শ্রাবণের ধারায় একত্র হয় বর্ষায়। কর্দ্দমপিচ্ছিল জলময় পথে তখন সাপ ব্যাঙ আর কুৎসিত দীর্ঘ সরীসৃপের ভীষণ উপদ্রব দেখা দেয়। তাহা ছাড়া বাদলায় চিত্ত যতই কল্পনাময় হইয়া উঠুক না, পাকস্থলী কিন্তু পরিপাকে অশক্ত হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মের অগ্নিনির্ব্বাণের সহিত অগ্নিমান্দ্যেরও ঘটে প্রাদুর্ভাব। গলিত পত্রের পচা স্তূপে এবং বদ্ধজলার দূষিত সঞ্চয়ে ম্যালেরিয়া আর শতপ্রকার জ্বরজ্বালায় ঘরে ঘরে দেখা দেয় ব্যাধির কম্পন।

কিন্তু তথাপি বর্ষাই আশার দূত। শুধু সৌন্দর্য্যের জন্যই নহে, ধনধান্যে ফুলেফলে সৌভাগ্যের সূচনা বলিয়াও বর্ষা বাঙালীমাত্রেরই বড় প্রিয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন বারংবার মনে জাগে—কি করিয়া তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি আস্থা রাখিয়াছেন—শ্রদ্ধা করিয়াছেন মানুষের কল্যাণবুদ্ধিকে। জীবনের শেষ ক্ষণে তিনি লিখিয়া গেলেন—

"মানুষের মহিমারে কভু
উপহাস করি নাই তবু।"

কিন্তু কি অপূর্ব্ব শক্তির বলে তিনি ইহা বলিতে সমর্থ হইলেন তাহা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্যই রহিয়া গেল। কারণ, যাহারা বাঙলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখিয়াছে তাহাদের পক্ষে মানুষের কল্যাণবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসম্ভব। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা মানুষের পক্ষে চরম অভিজ্ঞতা। অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য মানুষের সততা, নীতিবোধ, সৌজন্যবোধ,—যাহা কিছু সত্য ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—সব কিছুরই অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল—বাঁচিয়াছিল কেবল মিথ্যাচার, দুর্নীতি ও কৃতঘ্নতা। মানুষের পাশব-প্রবৃত্তির এইরূপ ঘৃণ্য আত্মপ্রকাশ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। ইহার পূর্ব্বেও বহুবার বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে—বাঙলাদেশের মানুষ বহুবার বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছে কিন্তু মৃত্যুর উদগ্র মূর্ত্তি এমন কালাপাহাড়ী রূপে কোনও দিন দেখা দেয় নাই। বস্তুতঃ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবন, সংস্কৃতি, সভ্যতা, নীতি—সব কিছু মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেল—সত্য হইয়া বাঁচিয়া রহিল শুধু মৃত্যু।

দুঃখের কারণ তো ইহাই। পঞ্চাশের মন্বন্তর যদি প্রকৃতির প্রতিহিংসা হইত তাহা হইলে ক্ষোভের কোন কারণ থাকিত না। কারণ, প্রকৃতির নিকট মানুষ এখনও নত হইয়া আছে—তাহার বিধান তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু যে দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি, তাহার সম্বন্ধে সান্ত্বনা কোথায়? আমরা ধর্ম্মভীরু জাতি—চিরকাল ভাগ্যকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছি; যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যে-কোন বিপদ্ আসিয়াছে—সবই ভাগ্যের দান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এবারও হয়তো স্বীকার করিতাম—যদি না মানুষের কুৎসিত রূপ এত কদর্য্যভাবে স্বরূপ প্রকাশ করিত। পঞ্চাশের মন্বন্তর একান্তভাবেই মানুষের বিরুদ্ধে মানুষেরই অভিযান। অভিযান সার্থক হইয়াছে, কারণ পঁয়ত্রিশ লক্ষ নরনারী আত্মাহুতি দিয়াছে এই মন্বন্তরে।

মন্বন্তর কেন হইল, কিভাবে আসিল—তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বহু সরকারী বেসরকারী তদন্তকমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল; তাঁহারা বহুদিন গবেষণা ও অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে 'হিং টিং ছটের' অর্থের ন্যায় কিছু কারণ আবিষ্কার করিলেন। অর্থাৎ মানুষের দুর্নীতি পড়িল চাপা; প্রচুর ফসল হয় নাই—সুতরাং দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী—পৃথিবীর মানুষ শুধু ইহাই জানিল। অবশ্য বাঙলার মন্বন্তর লইয়া বিলাস কিছু কম হয় নাই। নেতারা বিমানপোতে চড়িয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন, দুই-চারিটি শ্রুতিমধুর মিথ্যা কথা কহিয়াছেন, ক্ষমা ও ধৈর্য্যের বাণী শুনাইয়াছেন পীড়িত মানুষকে—ইতস্ততঃ সাহায্যও পাঠাইয়াছেন এবং ঘটা করিয়া সে সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশও করিয়াছেন—তাহার সঙ্গে দিয়াছেন একটি হৃদয়বিদারক বিবৃতি। অন্যদিকে লইয়াছেন যুদ্ধের বড় বড় কণ্ট্রাক্ট—জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া অতি-প্রয়োজনীয় আহার্য্যবস্তু পাঠাইয়াছেন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট—যথাযোগ্যভাবে

দেশসেবা করিয়া আপন দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বাঙলায় তদানীন্তন অভিশপ্ত নেতৃত্বের ইহাই ইতিহাস।

মন্বন্তরের কারণ বিশ্লেষণের পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে সেই সময়ের বিশ্ব-পরিস্থিতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন পুরাদমে চলিতেছে। আমেরিকা ও বৃটেন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে ১৯৪১ সালে। বাঙলা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ—গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুলি বাঙলাদেশে রহিয়াছে। বাঙলার প্রত্যেকটি শহরে নানাদেশের নানাসাজে নানাসৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের রসদ যোগান এবং তাহাদের আনন্দ যোগান বাঙলার মানুষদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এইসব সৈন্যদের অকথ্য অত্যাচারে বাঙলার জীবন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সাধারণের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া, নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা ইহাদের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; অত্যাচার নিরীহ গ্রামবাসীদের উপরই বেশী হইতেছিল—প্রাণের ভয়ে গ্রামবাসীরা শহরে পলাইতে আরম্ভ করিল।

অপর দিকে জাপানের অগ্রগতি কোন প্রকারেই বাধা পাইতেছিল না। ১৯৪২ সালে রেঙ্গুন শহর বোমা-বর্ষণে বিধ্বস্ত হইল এবং কিছুদিন পরেই ব্রহ্মদেশের পতন ঘটিল। জাপান একেবারে বাঙলার সীমাপ্রান্তে আসিয়া পৌছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে যে প্রচুর পরিমাণে চাউল আসিত তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ব্রহ্ম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বহু ভারতবাসী ব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া বাঙলায় আসিতে লাগিল—বাঙলার, বিশেষতঃ কলিকাতার লোকসংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তেরশ পঞ্চাশের প্রথম ভাগে বাঙলায় আশ্রয়প্রার্থী-সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করিল—বাসস্থান নাই, এতটুকু মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, আহার্য্যবস্তু নাই, চারিদিকে হাহাকার আরম্ভ হইল।

বিশ্বের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার আভ্যন্তরীণ অবস্থারও অবনতি ঘটিল। মেদিনীপুর প্রবল ঝড়ে বিধ্বস্ত হইল। ইহাতে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়। সরকারী অভিমতে বলা হয় যে, তেরশ পঞ্চাশে বাঙলায় ফসল মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। ইহার মধ্যে কিছু সত্য হয়তো আছে, কিন্তু ইহাকেই মন্বন্তরের কারণ নির্দ্দেশ করা হইলে ঘোর অন্যায় করা হইবে। যুদ্ধারম্ভের পর হইতেই বাঙলা-দেশে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছিল। মানুষের শত্রু এতদিনে তাহার পথ খুঁজিয়া পাইল। যখন আহার্য্যবস্তুর দাম বাড়িতেছিল, সে আহার্য্যবস্তু সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, সময় বুঝিয়া চড়া দামে বেচিবে। অজ্ঞ কৃষকের নিকট হইতে সস্তা দামে সে ধান কিনিয়া লইল নানা ছল ছুতায়—পরে সুযোগ বুঝিয়া চারগুণ, পাঁচগুণ দামে তাহা বিক্রয় করিল সাধারণ মানুষের নিকট। চাউল, কয়লা, চিনি, সরিষার তৈল, কেরোসিন—নিত্যব্যবহার্য্য সব জিনিসই একে একে বাজার হইতে

অন্তর্হিত হইতে লাগিল। সামান্য লবণ বাজারে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সাধারণ দামের তিনগুণ দাম দিয়াও মানুষ বাজারে কিছুই পায় না। অতিরিক্ত লাভের নেশা তখন ব্যবসায়ীদের অধিকার করিয়াছে, সব কিছু তাই যাইতেছিল চোরাবাজারে। পঞ্চাশে চোরাবাজারের অবশ্য প্রধান আশ্রয় ছিল চাউল। পঞ্চাশের প্রধানতম সত্য এই—বাঙলাদেশে অন্য কোন বাজার নাই—চোরাকারবারী তার কবলে লইয়াছে সমস্ত বাজার; এমন একটি জিনিসও বাঙলায় ছিল না যাহা সহজপথে ন্যায্যমূল্যে কিনিতে পারিত কোন লোক।

অথচ ইহাই ছিল পঞ্চাশের মর্ম্মান্তিক সত্য। দিনের পর দিন বাঙলার অবস্থার অবনতি ঘটিতে লাগিল—খাদ্য-অবস্থার চরম পরিণতি ঘটিল ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে। বাঙলার বহু স্থানেই চাউল ১১০৲ টাকা মণ দরে বিক্রী হইতে লাগিল। গ্রামে খাদ্য পাইবার কোন আশা নাই—জমিদার সমস্ত চাউল আটক করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও এতটুকু স্নেহ নাই, মমতা নাই, সহানুভূতি নাই। গ্রামের পথেঘাটে লোক মরিয়া পড়িয়া থাকে—ঘাটে পথে ষ্টেশনে শুধু নরকঙ্কালের ভীড়—মাঠে প্রান্তরে মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে—শকুনির ভোজ লাগিয়াছে মহাসমারোহে। দাহ করিবার লোক পাওয়া যায় না, কবর দেওয়া হয় না—ঘর হইতে মৃতকল্প মানুষকে টানিয়া বাহির করিয়া লয় বন্য শৃগাল। মৃত্যু সবিস্তারে পাখা মেলিল—মানুষের পরিত্রাণের কোন পথই রহিল না। তবু শেষ চেষ্টা তো মানুষ করিবেই। তাই দলবদ্ধ হইয়া মানুষ চলিল শহর-অভিমুখে—বুভুক্ষু নরকঙ্কালের মৃত্যুর মিছিল চলিল শেষ আশ্রয়ের সন্ধানে। পথেই অনেকে মৃত্যুকে আশ্রয় করিল—তাহারা অন্ততঃ অসম্মানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিদিন কলিকাতার পথে পথে এককণা খাদ্যের জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু খাদ্য দিবে কে? স্বার্থান্বেষী মানুষ চাউলের দাম আরও বাড়াইতে লাগিল। পথে পথে শুধু ক্রন্দন—'ফ্যান দাও, মা, একটু ফ্যান দাও।' মা কোনরকমে বুকে একটু কাপড় জড়াইয়া কোলের শিশুকে লইয়া দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিতে লাগিল। মহানগরী কলিকাতার রাজপথে মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল। ডাষ্টবিন হইতে মানুষে কুকুরে খাদ্য কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিল। মানুষের মনুষ্যত্ব ধিকৃত হইয়া ফিরিল দ্বার হইতে দ্বারে।

এই দুর্দশা ও দুরবস্থার সুযোগ লইয়া মানুষের কদর্য্য পাশবপ্রবৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করিল। একদিকে মৃত্যু তাহার বীভৎস আধিপত্য বিস্তার করিল দিকে দিকে, অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী মানুষ বকধার্ম্মিক সাজিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর চরম দুরবস্থার সুযোগ লইতে লাগিল। গ্রামের নারীদের এতটুকু খাদ্যের লোভ দেখাইয়া দেহবিক্রয়ে প্ররোচিত করিতে লাগিল। পঞ্চাশে চাউলব্যবসার পরেই সর্ব্ববৃহৎ ব্যবসা ছিল নারী-বিক্রয়। মানুষ তখন উন্মাদ, একমুষ্টি চাউলের পরিবর্ত্তে সে সব কিছুই

করিতে পারে—তাই সহজেই সে কামোন্মত্ত, স্বার্থান্বেষী পুরুষের কবলে পড়িল। ক্ষুধার তাড়নায় মা শিশুর গলা টিপিয়া মারিয়াছে—সেখানে দেহবিক্রয় তো কিছুই নয়। পঞ্চাশের পূর্ব্বে কখনও মানুষের কুৎসিত মূর্ত্তি এমন নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

দুর্ভিক্ষকে রোধ করিবার জন্য এবং দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্য করিবার জন্য বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য সেইগুলির মধ্যে কতগুলি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, বাঙলা-সরকার এবং ভারত-সরকারের চরম উদাসীনতা পঞ্চাশের মৃত্যুর তাণ্ডবলীলার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বাঙলা-সরকার তো প্রথমে দুর্ভিক্ষের সংবাদ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন—কিন্তু যখন কলিকাতায় দলে দলে নগ্ন নরনারীর শোভাযাত্রা চলিতে লাগিল, তখন আর কাহারও অগোচর রহিল না। বাঙলা-সরকার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ১১$\frac{১}{২}$ কোটি টাকা খরচ করেন। ইহার মধ্যে কত টাকা খরচ হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত। সরকার চিরকাল চোরাকারবারীদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, কারণ তাহাতে লাভ উভয়েরই। বিদেশী শাসন কখনও জনসাধারণের মুখ চাহিয়া কাজ করে না। তাহাদের দ্রষ্টব্য হয় প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ, দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদের দেশী তাঁবেদারদের তুষ্টি। কায়েমী দেশী স্বার্থকে তাই এই শাসনতন্ত্র একটু পথ ছাড়িয়া দেয়—রাজা, উজীর, জমিদার, চাউলের রাজা, বস্ত্রমালিক প্রভৃতির লাভের মাত্রা বাড়াইয়া তাহাদের তুষ্ট করে; শ্রমিক, কৃষক, গরীব, কারিগর—মাষ্টার, কেরানী, নিম্নমধ্যবিত্তগণ উৎসন্ন হইলেও ফিরিয়া তাকায় না। তাই সরকারের প্রচেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা কতখানি ছিল তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বেসরকারী কিছু প্রতিষ্ঠান সত্যই সাহায্য করিয়াছিল—যথা 'বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটি', 'পিপল্‌স্ রিলিফ সোসাইটি', 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রভৃতি। কলিকাতায় বহু সরকারী ও বেসরকারী লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছিল। সাধারণ মানুষ আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করিয়াছিল সাহায্য করিতে—কিন্তু তাহার প্রচেষ্টা বারংবার বাধা পাইয়াছে স্বার্থান্বেষী মানুষের কুচক্রে।

মন্বন্তরের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল। মন্বন্তরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা প্রাণ হারাইল মহামারীর শিকার হইয়া। এই মহামারীতেও দেখা গেল সরকার এবং নেতৃবৃন্দের উদাসীনতা।

দেড়শত বৎসরের চেষ্টায় বাঙালী যে জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল পঞ্চাশের মন্বন্তরে। ভদ্রতাবোধ, ভদ্রলোকের আদর্শ, স্বজাতি-প্রীতি, দেশপ্রেম, সেবাধর্ম্ম, নর-নারায়ণের সেবা—সব কিছুরই নির্ম্মম অবসান ঘটিয়াছে পঞ্চাশের মন্বন্তরে। বাঙলার নীতিবোধের সমাপ্তি ঘটিয়াছে; আজ তাই মন্ত্র হইল—'যা পারি ক'রে নিই এই বেলা; নিজে তো বাঁচি আগে।' এই নীতি

চোরাকারবারীর দান। পঞ্চাশের মন্বন্তর আমাদের সভ্যতার বুনিয়াদ ভাঙিয়া দিয়াছে—মন্বন্তরে বাঙলাদেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরাজয় সংঘটিত হইল—চোরাকারবারীর ও চোরাব্যবসায়ীর আদর্শ জয়ী হইয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর ইহাই চরম সত্য কথা।

আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালী

আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালীজীবনের সঙ্কট আজ অনস্বীকার্য্য। গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া যে ধারায় মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংস্কৃতি প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে ভাঙন ধরিয়াছে। দেড়শত বৎসরের চেষ্টায় বাঙালী ভদ্রলোক একটি স্বতন্ত্র জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল; তাহার সৃষ্টি, আদর্শ ও ঐতিহ্য গৌরব করিবার বিষয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিতে বাঙালী মধ্যবিত্তের উজ্জল স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু আজ সেই জীবনাদর্শ অবলুপ্তির পথে। সেই ভদ্রতাবোধ, ভদ্রলোকের আদর্শ, স্বজাতিপ্রীতি, দেশপ্রেম, সেবাধর্ম্ম, নর-নারায়ণের সেবা, মানবহিতৈষণা—সব কিছুরই দ্রুত অবসান ঘটিতেছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙন রবীন্দ্রনাথের চোখেই ধরা পড়িয়াছিল সর্ব্বাগ্রে—শেষ বয়সের কাব্যে তাহার ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু জনসাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে পঞ্চাশের সর্ব্বগ্রাসী মন্বন্তরের পর। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাঙালী মধ্যবিত্তের ঐতিহ্য তলাইয়া গেল—রহিল শুধু পুঞ্জীভূত ক্লেদ। মন্বন্তরে বাঙালী মধ্যবিত্তের একাংশ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বহুকষ্টে পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে—অন্য একাংশ উঠিয়া গিয়াছে উচ্চ স্তরে, চোরাকারবারের ফলে। যাহা পূর্ব্বে ঘৃণ্যবস্তু ছিল, যাহার নামে আমাদের শরীর শিহরিয়া উঠিত, সেই আত্মসর্ব্বস্বতা আমাদের সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছে। এই আত্মসর্ব্বস্বতা চোরাকারবারীর দান। সমাজের মূলে ভাঙন ধরিয়াছে। এক জাতির মধ্যেও আর স্বজনপ্রীতি নাই। বাঙলার পল্লীগ্রামের শান্ত আবহাওয়া, সুন্দর অর্থনৈতিক বিন্যাস ভাঙিয়া গিয়াছে—খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে জীবনাদর্শ ও সমাজবোধ। মোট কথা, বাঙলাদেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরাজয় সংঘটিত হইয়াছে, ডুবিয়াছে বাঙলার ভদ্রলোক—ডুবিয়াছে তাহার ভদ্রতা, শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংস্কৃতি। জয়ী হইয়াছে মিথ্যাচার, অন্যায় এবং চোরাব্যবসায়ীর আদর্শ।

বাঙালী মধ্যবিত্তের ইতিহাস গত দেড়শত বৎসরের বাঙলার ইতিহাস। বাঙালী মধ্যবিত্ত একান্তভাবে ইংরেজ সরকারের সৃষ্টি। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' ফলে সৃষ্ট হইল জমিদার এবং জোতদারশ্রেণী। ইঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন—অত্যধিক আরামপ্রিয়তা এবং লোভ ইঁহাদের সর্ব্বনাশ করিল।

তাই আজ বাঙলার ব্যবসার-বাণিজ্য ভিন্নপ্রদেশীয়দের দ্বারা কবলিত। এইরূপে ভূমির নূতন ব্যবস্থায় ও শিল্প-বিপ্লবে পুরাতন কৃষিসমাজ বিনষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু বাঙলার বণিকৃসমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিল না। ইহাতে গড়িয়া উঠিল বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ—যাহাদের পরবর্ত্তী কালে শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কৃতি সমস্ত জগতকে বিস্মিত করিয়াছে।

এই মধ্যবিত্ত সমাজের জীবিকার পাদপীঠ ছিল দুইটি। প্রথমতঃ জমিদারী-তন্ত্রের মধ্যে আশ্রয়। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজী শিক্ষার সুযোগে সহজেই ইংরেজ কোম্পানীর দপ্তরখানায় চাকরি মিলিত—তাহাতে আয় ছিল প্রচুর এবং একপ্রকার সম্মানও ছিল যথেষ্ট। এই চাকরি হইতে ক্রমশঃ মাষ্টারি, ডাক্তারি এবং ওকালতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশ্রয়স্থল হইল। ইংরেজী শিক্ষার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট পৃথিবীর তদনীন্তন শ্রেষ্ঠ জাতির জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হইল। বাঙালীজীবনে একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা, জাতীয়তা, গণতন্ত্র—সব মিলাইয়া এক নূতন জীবনাদর্শের বাহক হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণী—আধুনিক বাঙলা সংস্কৃতির জনকও তাই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

বস্তুতঃ আধুনিক বাঙলার সংস্কৃতি একান্তভাবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নায়ক ছিলেন রামমোহন। তাঁহার মধ্যে পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চা, সমাজসংস্কার এবং রাজনৈতিক চেতনার প্রথম স্ফুরণ হয়। এই যুগের আর একটি প্রধান সৃষ্টি বাঙলা গদ্য। বৈপ্লবিক চেতনাও এই সময়েই জন্মলাভ করে—যাহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় মধুসূদন এবং দীনবন্ধু মিত্রের রচনাবলীতে। বিদ্যাসাগর সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী। শাস্ত্রশাসিত অবস্থাকে তিনি শাস্ত্রের শাণিত অস্ত্র দিয়াই পরাজিত করিয়াছেন, হিন্দু জাতীয়তা-বোধে উদ্দীপ্ত হইয়া বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দ হিন্দু-সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল আন্দোলনের চরম পরিণতি দেখা গেল ১৯০৫ সালের আন্দোলনে। ইতিমধ্যে বাঙলা সংস্কৃতির প্রবাহ নানা দিকে বহিয়া চলিল। এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব রবীন্দ্রনাথ—অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শুধু একটি যুগেরই প্রতীক নহেন—পর পর তিনটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। নূতন সঙ্গীতকলা, নূতন চিত্রকলা, নূতন সাহিত্য এবং নূতন কাব্যের সৃষ্টি হইল।

যাহা হউক এই মধ্যবিত্ত সমাজে সর্ব্বপ্রথম সঙ্কট দেখা দিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে। বাঙলার কৃষি-বুনিয়াদ পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গিয়াছিল—প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাহা একেবারে ধ্বসিয়া গেল। জমির উপস্বত্বভোগীদের বোঝা বহন করা বাঙলার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। অন্যদিকে চাকরির ক্ষেত্রেও শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইল। মুসলমান সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের

উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর আসিল জগদ্‌ব্যাপী মহা আর্থিক সঙ্কট। বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী আরও অসহায় হইয়া পড়িল। কিন্তু এত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও মধ্যবিত্তের সৃষ্টিশক্তি বন্ধ্যা হইয়া পড়ে নাই—তাহা তখনও বাঙলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এ যুগেরও শ্রেষ্ঠ প্রতীক ছিলেন। মধ্যবিত্তের সৃষ্টিশক্তি যে অক্ষম ছিল না তাহার আরও প্রমাণ প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্র।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী একেবারে ধ্বসিয়া পড়িল। মহাযুদ্ধ সুরু হইতেই আসিল ফাঁপান টাকার জোয়ার—বাঙলার জীবনযাত্রা-পদ্ধতি ভাসিয়া গেল। যাহা বাঁচিয়া ছিল তাহার মৃত্যু ঘটিল মন্বন্তর এবং মহামারীতে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাই আজ দ্বিখণ্ডিত। মাত্র কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন চোরাকারবার এবং চোরাব্যবসায়ের সাহায্যে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী ভদ্রলোকের জীবনধারাই আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। জমির উপস্বত্ব হইতে আর কোন আয়ই নাই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অর্থ-উপার্জ্জনে রত—তথাপি সংসার অচল। জিনিষপত্রের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা চারপাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অথচ আয় তদনুপাতে মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী তো লাগিয়াই আছে। দেশে অনেক বস্তুই প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে অথচ চোরাকারবারীরা সমস্তই কবলিত করিয়া বসিয়া আছে—কোন কিছুই ন্যায্য দামে পাইবার উপায় নাই।

বাঙলার মধ্যবিত্ত জীবনে সঙ্কট আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে স্বাধীনতালাভের পর হইতে। স্বাধীনতা একপ্রকারের লাভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার জন্য মানুষকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছে—নিজের দেহ-বিভাজন করিয়া সে স্বাধীনতার রসদ যোগাইয়াছে। বাঙলার বিভাজন মধ্যবিত্ত সমাজকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে—তাহাদের আশ্রয় নাই, বাসস্থান নাই, আহার্য্যবস্তু নাই—পথের মাঝে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীবের ন্যায় দিন কাটাইতেছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের উপর কুগ্রহের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে চোরাকারবারীর নৈতিক মানসিক আদর্শ—তাহাদের আদর্শহীন, হৃদয়হীন, আত্মসর্ব্বস্ব বর্ব্বরতা। এই আত্মসর্ব্বস্বতার নিকট দয়া নাই, মমতা নাই, পারিবারিক পবিত্রতা নাই, কোন মানবধর্ম্মই নাই। তাই পঞ্চাশে ইহারা মানুষকে নির্ব্বিচারে মারিয়াছে, সুস্থ পরিবার উৎসন্ন করিয়াছে, নারী-বিক্রয়ের লাভজনক ব্যবসা চালাইয়াছে। মধ্যবিত্ত একদিন এই দুর্নীতিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়াছে—আজ ক্রমশঃ ইহা তাহার সহ্য হইয়া গিয়াছে, ইহাকে বর্ত্তমান সভ্যতা বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে তাহার আজ আর বাধা নাই। তাই আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীতিবোধ ও জীবনাদর্শের অবসান ঘটিয়াছে—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধুর বিপ্লবী ঐতিহ্যকে ভুলিয়া তাই সে ধ্বংসের পথে পা বাড়াইয়াছে।

আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধ্বংসের পথে। বাঙলার আধুনিক মধ্যবিত্ত আজ সর্ব্বস্থখে বঞ্চিত। ছাঁটাইয়ের দৌরাত্ম্যে সে আবার বেকার। এই মৃতপ্রায় মধ্যবিত্ত সমাজ পুরাতন ধ্বংসপ্রায় সমাজকে কিংবা নূতন চোরাকারবারী সমাজকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কিছুতেই বাঁচিতে পারিবে না। আজ মধ্যবিত্ত মানুষকে বাঁচিতে হইলে জনগণের সঙ্গে বাঁচিতে হইবে। নকল আভিজাত্যের খোলস পরিয়া সে বেশীদিন টিকিতে পারিবে না। তাহাকে হয় নিঃশেষ হইতে হইবে, না হইলে জনগণের সঙ্গে আগাইয়া চলিতে হইবে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পথে নামিয়া তাহাকে দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম করিতে হইবে।

বাঙলাদেশে গ্রীষ্মকাল (ম. প. ১৯৫৩)

বাঙলার ছয়ঋতু বারমাসের মধ্যে গ্রীষ্মের বড় একটা সম্মান নাই। কাব্য সাহিত্যে বর্ণনা-তুলনায় গ্রীষ্মকে দুঃখের নামান্তর বা রূপক হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। বসন্ত ছিল এতকাল ঋতুরাজ—ছিল তার প্রতি অজস্র কাব্যস্তুতি। তারপর শরৎ, বর্ষা, হেমন্তের গুণগান ;—এমন কি শীত পর্য্যন্ত আজ আর কাব্যে উপেক্ষিত নহে। কেবল গ্রীষ্মই এতকাল প্রায় অবহেলিত ছিল। একজন কবির মুখে শুনিয়াছি 'নবনিদাঘে'র রসমধুর অপূর্ব্ব বর্ণনা। কবি যতীন্দ্রনাথ সেন গ্রীষ্মকে কাব্যের আসরে প্রবেশপত্র দিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ'ও অনুপম।

অথচ ঋতুরাজ বসন্তের অনুজ হিসাবে গ্রীষ্মের গরিমা এমন কিছু কমও নয়। চৈত্রের শেষে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, এই দুই মাসকেই গ্রীষ্মকাল বলিয়া ধরা হয়। গ্রীষ্মের অপর নাম নিদাঘ—নিতান্ত দগ্ধ করে বলিয়াই তাহার এই নাম নয়, দুর্নাম। কিন্তু এইদিক দিয়া চৈত্র তো বটেই, শারদীয় ভাদ্রটিও কম যায় না। গ্রীষ্মে বরং কালবৈশাখীর বায়ু-বিক্ষোভ আর দুই-এক পসলা বৃষ্টির মধ্যে ক্ষণিক স্নিগ্ধতা আছে। চৈত্রের কাঠফাটা রৌদ্রে আর ভাদ্রের তাল-পাকানো গুমটে সেটুকুও নাই। আসলে নিদাঘ সত্যই তত কষ্টদায়ক নহে। বসন্তের শীতের আমেজটুকু ফুরাইতে না ফুরাইতেই বাঙলার প্রকৃতিতে যে সজল গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয় তাহার মধ্যে সত্যই অনেক কিছু উপভোগ্য আছে। প্রকৃতি তখনও ফুলসাজ ছাড়ে না। সত্য বটে,

"তপ্ত বোশেখে আকাশে ব'সে কে আগুন-ফোয়ারা হানে।"

কিন্তু তাহাতেই তো—

অদূর অশথে নবপল্লব মাতে সে অগ্নিস্নানে।
নারিকেল-শিরে ঝরে ধীরে ধীরে সেই আগুনের ঝারা,
বাগানের কোণে সূর্য্যমুখীরা পান করে সেই ধারা।

তখন দেখিতে পাই—

দুপ'র বেলার রূপালী রৌদ্রে
ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি'
উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ;

আর 'দূরে বালুচরে' রৌদ্র কাঁপে সর্পিল শিখায়। অজানা বনে কাঠঠোক্‌রা তাল ঠোকে ঝিঁঝিঁর একটানা তানের সঙ্গে। স্তব্ধ গ্রীষ্মপ্রকৃতি মদির নেশায় যেন বিবশ দেহখানি স্বপ্নের ঘোরে এলাইয়া দেয়। মাঠে প্রান্তরে গাছের ছায়ায় কালো দীঘিজল স্নিগ্ধ শীতল বুকে আলিঙ্গন দেয় শ্রান্ত আর তাপিত দেহকে। দেখিতে দেখিতে আমের মুকুলে মদির সৌরভ পরিণতি লাভ করে কচি কচি গুটিতে। কাঁঠালের পাবে পাবে, শিকড়ে ডালে দেখা দেয় 'মুচি'। জ্যৈষ্ঠের মধ্যে জাম-জামরুল, আম-আনারস, কাঁঠাল-কদলী—হরেক ফলের অজস্র সম্ভারে ভরিয়া উঠে বাঙলার প্রকৃতি। গ্রীষ্মের ছুটিকে বাঙলার ছেলে তাই 'আমকাঁঠালের ছুটি' বলিয়াও জানে।

গ্রীষ্মের মধ্যে এইরূপে রসাল-ভয়াল দ্বৈতরূপ সমন্বয় লাভ করিয়াছে। আকাশে আগুনের ফোয়ারা, বাতাসে কালবৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডব। মাঠগুলি ফুটিফাটা। প্রতিটি বালুকণা আগুনের হল্কা। ঘূর্ণিহাওয়ার মত্ত ভৈরবনৃত্য। জলাশয়ের শুষ্কপ্রায় খাতে গো-মহিষের আশ্রয়, বটের ছায়ায় আতপক্লিষ্ট কৃষক ও পথিকের দু'দণ্ড বিশ্রাম। প্রকৃতি যেন অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ। কিন্তু এই অগ্নিময় সংহারলীলার মধ্য হইতেই অঙ্কুরিত হয় নবজীবনের কচি কিশলয়। আগুনে পুড়িয়া ভস্মস্তূপ হইতে প্রকৃতি আবার নবজন্ম লাভ করে। তাহারই বরণের জন্য, লালনের জন্য কৃষকের আর অবসর নাই। মাঠে মাঠে চাষবাসের অবিশ্রাম কাজ। কর্ষণ ও বপন, রোপণ ও নিড়ান—সায়ংসন্ধ্যা নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মব্যস্ততা। তাহারই ফলে গ্রীষ্মের শেষে মাঠে মাঠে সবুজের ছোপ লাগে। নূতন শস্যের ভাবী সম্ভাবনা ঝলমল করে প্রতি সকালে সোনালী রৌদ্রের আনন্দে আশায়। তারপর একদিন মেঘের ডমরুধ্বনিতে নববর্ষার আগমনী বাজিয়া উঠে। আকাশের কোলে চাতকের 'ফটিক জল' প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে চলে।

বাঙলার গ্রীষ্মের ইহাই মোটামুটি রূপ। এই সময় বাঙালীজীবন সুখের বা দুঃখের তাহা বলা কঠিন। শহরের মানুষ তখন গুমটে ও ঘামে, ছারপোকা আর অপ্রচুর ঘুমে ক্লান্ত হয়। গ্রামের মানুষ শ্রমে আর ঘামে মশামাছির মধ্যেও তবু অবসন্নভাবে রাত্রিযাপন করে। কিন্তু বাজারে যে তখন আগুন লাগে সেইটাই হয় বাঙালীর পক্ষে দুর্ব্বিসহ। নচেৎ পশ্চিমের গ্রীষ্মের মত বাঙলার গ্রীষ্ম নির্জ্জলা বা মরুময় নয়। প্রকৃতির ফলসম্ভার আর সদয় মৌসুমীবায়ুর সজল সঞ্চার বাঙলার গ্রীষ্মকে অনেক পরিমাণে উপভোগ্য করিয়াছে। তাই তো বিদেশী পাখী তখন এদেশে আসে, রঙ্গ করিয়া ডাক দেয় 'বৌ কথা কও'। তবু যে বাঙলার সুখের পায়রাগুলি দার্জ্জিলিং বা সিমলায় ছুটে, তাহা শুধু সাহেবী ফ্যাশান।

নক্সা

রিক্সাভ্রমণ

মোটরে ভ্রমণের তো কথাই নাই—রেলগাড়ী, নৌকা, এমন কি পদব্রজে ভ্রমণের পর্য্যন্ত অজস্র মহিমা কীর্ত্তিত হয়। কিন্তু ভুলক্রমেও কেহ কখনও রিক্সার নামোল্লেখ করে না। আধুনিক যুগের উন্নততর যানবাহনের তুলনায় রিক্সা নিতান্ত সেকেলে এবং সেইজন্য হেয় বলিয়াই বিবেচিত হয়। অথচ এই হতভাগ্যের নিকট বাছিয়া বাছিয়া রিক্সাভ্রমণই সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব বস্তু।

মনে করুন আটটা-সাতটা অফিসের পর শহরের দূরপ্রান্তে এই শ্রান্ত দেহভারটা রাতারাতিই পৌঁছাইয়া দিবার ঐকান্তিক প্রয়োজন। এদিকে বাহিরে কোঁচার পত্তন হইলেও ভিতরে হয়তো ছুঁচোর কীর্ত্তন। শূন্য উদরে হয়তো জলবায়ুর সশব্দ আলোড়ন চলে। তখন উপায় কি? রিক্সা। ট্রামবাসের বিপুল মল্লযুদ্ধে আত্ম-নিয়োগ করিবার শক্তি নাই; মিনার্ভা, অষ্টিন, ফোর্ড, পন্টিয়াক, ষ্টুডিবেকার দেখিয়াই সুখ। রোল্‌সরয়েস, বুইক-এর কথা ছাড়িয়াই দিলাম; কারণ, ওদুটিকে দেখিতেও তপস্যা চাই। এমন কি ঐ যে অর্দ্ধমৃত শীর্ণ পক্ষিরাজবাহিত টম্‌টম্‌টি, উহারও প্রতি লোভ করা চলে না। রিক্সা—কেবল রিক্সাই অগতির গতি, অধমের শরণ। শুধু অল্প ভাড়ার সুবিধাটাই বড় কথা নয়। ভি. পি. প্রথায় নিজেকে বাড়ী চালান দেওয়ার অপূর্ব্ব সুযোগও কেবল ইহাতেই আছে। ট্যাক্সির ন্যায় মিটারের শাসন তো আর নাই যে নামিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিতে হইবে। বরং সঙ্গে এক-আধটা পোঁটলাপুঁটলি থাকিলে তাহাও রিক্সাওয়ালার মারফতেই উঠাইয়া লইয়া বেশ ধীরে সুস্থে ঘরে গিয়া দাম চুকান চলে। তাহা ছাড়া অলিগলির যে-সকল সঙ্কীর্ণ বিবরে যানবাহনের যাতায়াত অসাধ্য, সেখানেও রিক্সা অবলীলায় ঢুকিয়া পড়ে। দেহকে আদ্যন্ত আরাম দিতে হইলে তাই রিক্সাভ্রমণের উপযোগিতা অস্বীকার করা চলে না। তাহা ছাড়া নিঃসঙ্গতার আরাম-বিলাস—"I am monarch of all I survey"-এর ভাব। অতএব যাহারা 'র‍্যাক্সি' অথবা 'জাপানী ট্যাক্সি' বলিয়া রিক্সাকে বিদ্রূপ করে, তাহাদের উপেক্ষা বরদাস্ত করা যায় না। বস্তুতঃ রিক্সারও একটা অনন্যসাধারণ মহিমা রহিয়াছে। কেবল রসিকেরাই তাহার মর্ম্মোপভোগে সমর্থ। এই যে তড়িৎতাড়িত, বা বাষ্পবাহিত বা পেট্রোলপায়ী যানবাহনের দল, তাহাদের গতি ছাড়া আর কিই বা আছে? পথের সহিত সেই অন্তরঙ্গতা কই? রিক্সা চলে টুংটুং নৃত্যচ্ছন্দে তাল রাখিয়া, চলে লহরে লহরে। রিক্সাভ্রমণে তাই আছে একটা সুগভীর আমেজ। পথের সহিত পথিকের এমন নিবিড়তা আর কিছুতেই বোধ হয় আনিতে পারে না। টুং, টুং, টুং,—মৃদুমধুর কোমল টুঙ্কার, মন্থর মদির গতি। হেলিয়া দুলিয়া গা ঢালিয়া দিয়া উদার আকাশতলে চাহিয়া দেখি—সব মুক্ত, সব স্পষ্ট। রাস্তার ধারে কোথায় কি আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি জিনিষের সহিত

পরিচয় ঘটাইতে ঘটাইতে রিক্সা চলে। ঐ যে পথের পাশে দেওয়ালের গায়ে 'হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর' বিজ্ঞাপনটি—'হাওড়া' হাওয়া হইয়া গিয়াছে, 'কুটীর' ফুটির মত ফাটিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, দেওয়াল আলো করিয়া জ্বলিতেছে শুধু 'কুষ্ঠ'; ইহার মাধুর্য্য যে এমন করিয়া উপভোগ করিলাম, সে শুধু মন্থরচারিণী রিক্সার কোলে আমি আরামে বসিয়া আছি বলিয়া। যুগপৎ ভ্রমণ ও বিশ্রামের এই স্বর্ণসুযোগে মনটাই হয় সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয়।

যদি হাওয়া খাইতে চান, আশ্রয় নিন রিক্সার। হাওয়ার গাড়ীতে চড়িয়া যাহারা বায়ুসেবনে অভ্যস্ত, তাহারা হয়তো জানেই না মুক্ত বাতাস বস্তুটা কি। গতিবেগে আবর্ত্তিত হইয়া যেটুকু স্বাভাবিক বায়ু মোটরবিহারীদের নাকে-মুখে ঝাপটা মারে, তাহা কৃত্রিম। বদ্ধ ঘরের মধ্যে বিজলীপাখার সাহায্যে বায়ু-তাড়ন এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে সন্ধ্যা-সমীরণের মধুরমন্দ প্রবাহ—এই দুইয়ের যেটুকু তফাৎ, দ্রুতগামী যানে বসিয়া বায়ুসেবন এবং রিক্সায় চড়িয়া হাওয়া খাওয়ায় ঠিক ততটাই প্রভেদ।

এসকল যখন ভাবি তখন স্বভাবতঃই মোটরবিহারীদের প্রতি আর ঈর্ষ্যা থাকে না, বরং কেমন একটা কৃপার ভাব মনে উদিত হয়। শহরের পিচ-আস্তীর্ণ মসৃণ পথের কথা বাদ দেওয়া যাক। কাঁচা রাস্তার উচ্চ-নীচ খাদ-গর্ত্ত-সঙ্কুল কর্দ্দম-কঙ্করময় পথে যখন ঐ যন্ত্ররথগুলি উন্মত্ত বেগে ধাবিত হয়, তখন আরোহীর অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখুন—এ যেন ঔষধ খাওয়ার পূর্ব্বে "শেক দি বটল" (Shake the bottle) প্রক্রিয়াটা সবলে সাধা হইতেছে। অথচ রিক্সা চলে কেমন বাহিয়া বাহিয়া—আর সেই অনুভূতিটাই কত মধুর। ঢেউয়ের মত একবার উপরে উঠিয়া আরবার নীচে নামিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া চলা—দোলাচল কত মধুর সে ভ্রমণের আনন্দ।

কিন্তু হরিষে কেন বিষাদ মিশিয়া থাকে? কেন অনাবিল আনন্দ জগতে নাই? যখন দেখি রিক্সার চালক আমারই মত মানুষ, তখন মনটা সহসা বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। বিধাতার অভিশাপে একজন বাহক, আর একজন বাহিত। বাস্তবিক রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া এই যাহারা মানুষ হইয়াও মানুষের বোঝা টানিয়া মরে, তাহাদের দুঃখে এক-একবার রিক্সাভ্রমণের সমগ্র আনন্দটাই মাটি হইয়া যায়। তবে ইহাও জানি যে এ কৃপা নির্ম্মমতারই নামান্তর। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থায় যাহাদের মুখে একমুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিতে পারি না, তাহাদের কঠোর শ্রমার্জ্জিত সামান্য খুদকুঁড়ার ব্যবস্থাটাও কৃপাভরে উপেক্ষা করা যায় না। এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে হয়,—রিক্সাওয়ালার প্রতি নিষ্ঠুর দয়া পরিহার করিয়া আবার ভ্রমণের মধুর আমেজটুকু নিবিড়ভাবে অনুভব করা চলে। এই চলন্ত দ্বিচক্র সিংহাসনের মন্থর প্রবাহে ভাসিয়া যাই আনন্দে। পুলকবিস্ময়ে ভাবি এ অপূর্ব্ব সৃষ্টির কথা—কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাপানী প্রতিভাকে।

একটি ঝাঁকামুটের রোজনামচা

এই যে ঝাঁকামুটে, তার নাম মণিয়া। রোজ সকালে সূর্য্যেরও আগে সে উঠে। দাঁতন-দাঁতে, লোটা-হাতে প্রাতঃকালীন বিশিষ্ট ক্রিয়া সুবিধামত কোথাও সারিয়া লইয়া সে রাস্তার কলে লোটাটিকে মাজিয়া মাজিয়া রূপা করিয়া তোলে। তারপর মলিন কটিবাসদ্বারা লজ্জানিবারণ গৌণভাবে সাধন করিয়া দৃঢ়গ্রন্থি রচনা করে কোমরে। মাটির ভাঁড়ে একটু চা তাহার প্রাতরাশ। তারপরই ছুটিয়া চলে কার্য্যস্থলে। একখণ্ড চটের আবরণে আচ্ছাদিত ঝাঁকাটা তাহার একমাত্র বিজ্ঞাপন। ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়। লোকে তাহার নামটিও জানে না। ঝাঁকামুটে 'ঝাঁকা' হইয়া গিয়াছে।

বিশাল শহরের নিদ্রাজড়িত অলস-আবেশ যখন কাটে নাই, তখনই দেখা যায় মণিয়া রেলষ্টেশনে ছুটিয়া চলিয়াছে। সতেজ শাকসব্জী আর দূরাগত মৎস্যসম্ভারে ততক্ষণ ষ্টেশন-প্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিয়াছে। মণিয়ার মনে প্রভাতের আলোকরেখা যেন প্রবেশ করে। চিরাচরিত দরকষাকষির পর মণিয়া মোট মাথায় লয়। এক ক্ষেপ রাখিয়া আর ক্ষেপ যদি বহা যায়, সেই আশায় দ্রুতবেগে সে ছুটিয়া চলে। প্রত্যূষের স্নিগ্ধ আলোকের আতপ্ত আমেজটুকু কাটিয়া যায়। তরুণ তপন খর হইয়া উঠিতে থাকে। মণিয়া বাজারে গিয়া ঝাঁকা মাথায় ঘুরিতে থাকে। দৈবাৎ কোন বাবু হয়তো হাঁক ছাড়েন: 'এই ঝাঁকা'!' অমনি মণিয়া চমকিয়া সাড়া দেয়। স্খলিত হস্তে সযত্নমিশ্রিত খৈনিটুকু রক্ষা করিতে গিয়া এবং সহসা-কম্পিত ঝাঁকাটা সামলাইতে গিয়া মুক্তকচ্ছ মণিয়া কেমন বিহ্বল চঞ্চলতায় আগাইয়া যায়। তারপর সারা বাজার ঘুরিয়া ঝাঁকার মধ্যে মৎস্য মাংস তরিতরকারী আর ডাল নুন তেল বহিয়া ক্ষণিকের প্রভুটিকে মণিয়া ছায়ার মত অনুসরণ করে। বাজার শেষে বাবুর গৃহের পথে কত ঝামেলা। আকাশে কাকচিলের লোলুপ দৃষ্টি আর আশপাশে ছিঁচকে চোরের নিপুণ অঙ্গুলির ভয়। চারিদিক্ সামলাইয়া যথাস্থানে মাল পৌছাইয়া দিয়া সে চারিটি, বড় জোর দুটি গণ্ডা পয়সা পায় এবং পয়সারও অতিরিক্ত পায় সে বাবুর ধোপদুরস্ত সুমিষ্ট বচন।

এভাবে মণিয়ার সকাল কাটিয়া যায়। দুপুরের রৌদ্রে অবসন্ন দেহটি তাহার বিশ্রামকাতর হইয়া উঠে। মণিয়া নর্দ্দমার কলে শুচিস্নান সারিয়া সিক্ত কটিবাসের এক অংশে লজ্জাকে রীতিমত লজ্জা দিয়া অপর অংশ শুকাইয়া লয় এবং শুকনা অংশটি উল্টাইয়া পরিয়া বাকী অংশটুকু আবার যথাসম্ভব শুষ্ক করিয়া লয়। তারপর ছাতুওয়ালার দোকানের পাশে ফুটপাতে বসিয়া দুইটা কাঁচালঙ্কা ও কিঞ্চিৎ চাটনি-সহযোগে তেলচিটে গামছাখানিতে জলের ছিটায় ভিজা ছাতুপিণ্ডটি গলাধঃকরণ করে।

তারপর উদর-গহ্বরের শূন্য অংশটা একঘটি জলে পূর্ণ করিয়া মণিয়া পরম তৃপ্তিতে ঢেকুর তুলে। পরে ফুটপাতে কোন গাড়ীবারান্দার তলায় ঝাঁকাটাকেই বালিশ করিয়া মণিয়া তন্দ্রালস দেহটি এলাইয়া দেয়। ভাগ্যক্রমে কেহ যদি 'ঝাঁকা' বলিয়া ডাকে, অমনি তন্দ্রা টুটিয়া যায়। মণিয়া কলের পুতুলের মত তিড়িঙ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, হাত দুটি উর্দ্ধে বিস্তারিত করিয়া পায়ের আঙুলে ভর করিয়া আড়িমুড়ি ভাঙিয়া লয়। টিকিটি শিহরিয়া উঠে! মুহূর্ত্তে কোন এক শব্দভেদী বিদ্যায় সে সেই আহ্বানের উৎসমূল বুঝিয়া লয়। আবার ঝাঁকা ভরিয়া মাথায় উঠে। বিরলকেশ মস্তকে গামছার বিড়াটি ভারে নিষ্পেষিত হয়। মণিয়া ছুটিয়া চলে।

দিনের শেষে কাজ ফুরাইয়া আসে। ফুটপাতেই আবার রাত্রির আহার শেষ হয় এবং আহারশেষে চটশয্যায় ফুটপাতে মণিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়ে। শীতের শেষরাত্রির মৃদু আলোকে কোনদিন দৈবাৎ যদি বাহির হন, তবে পথের পাশে বস্তা নড়িতে দেখিলে যেন ভয় পাইবেন না। হোঁচট খাইলেও খাইতে পারেন —কিন্তু মনে রাখিবেন, ইহাদের মধ্যে একটি বস্তা আমাদের গৃহহীন নিঃস্ব বেচারা মণিয়া।

পত্র-প্রবন্ধ

বন্ধুর নিকট গ্রীষ্মাবকাশযাপনের প্রস্তাবসংবলিত একটি পত্র

প্রিয় 'বাউল',

ছোটবেলার নেহাৎ একটা ছোট কথা আজও তোমার মনে আছে নিশ্চয়। তোমাদের সেই পূবের ঘরে দুজনে বসিয়া পড়া—বার মাস, ছয় ঋতু······শীত বসন্ত। আমার হিসাবে কিন্তু বসন্ত যাইত হারাইয়া, শীতের পরই বলিতাম গ্রীষ্ম।

আজ কলিকাতার দারুণ গুমটে যখনই হাঁপাইয়া উঠি তখনই ভাবি, সত্যই তো শীতের পরেই গ্রীষ্ম। শীতগ্রীষ্মের উপদ্রব ছাড়া আমাদের জীবনে আর কিই-ই বা আছে ? চারিদিকে দুঃখদৈন্য আর জীবনের অসংখ্য মরুজ্বালা—বিষাইয়া উঠে মনপ্রাণ, অক্ষম কল্পনা আমার আঁকুপাঁকু করে একটা ক্ষণিকের বসন্তের পিপাসায়।

গ্রীষ্মের ছুটি আসিল। কলিকাতার আকাশে ইতিমধ্যেই তামাটে রঙ লাগিয়াছে, তাপদ্রব পিচের রাস্তায় ভারক্লান্ত গো-মহিষের নাকে-মুখে ফেনা। এমন দিনে, কেন জানি না, প্রাণের ভিতর আবার সেই পুরাতন ঘূর্ণিটা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, নামিয়া যাইতে চাই পথের ধূলায়, নিরুদ্দেশ পরিক্রমায়।

কিন্তু, বন্ধু, তোমার সঙ্গ ছাড়া এ যাত্রা নিষ্ফল। মরুপথের পান্থপাদপের মত আছে তোমার অজস্র হৃদয়-রস। কণ্ঠের অমৃতধারায় আছে সঞ্জীবনী। চল যাই তোমার চিরবাঞ্ছিত পল্লীমায়ের শ্যামল স্নেহে ফিরিয়া। বাউলের মত অকারণ অবারণ চলায় দিই গা ঢালিয়া। বাঙলার একপ্রান্ত হইতে আরপ্রান্ত—কতটুকুই বা বিস্তার ? গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অনবচ্ছিন্ন গতিতে বলিয়া যাইব এই কয়টা দিন।

নগরের বাহিরে পল্লীবঙ্গে যে স্বর্গ বিরাজ করে, এ ভ্রান্তিবিলাস আমার নাই। কঠোর জীবনের নির্মম সত্য এড়াইয়া পলায়নের প্রস্তাবও ইহা নহে। আমি চাই আমার পুঁথিপড়া, কল্পনায় গড়া বাঙলার সত্যকার রূপ নয়ন ভরিয়া দেখিতে। হয়তো বলিবে তাহাতে আশার চেয়ে নৈরাশ্যই বেশী। জানি। জানি আমি বাঙলার আকাশে চিতাধূম, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘরে ঘরে। কিন্তু দুঃখে, দৈন্যে, মৃত্যুশোকে সোনার বাঙলা যে ছারখার হইয়া গেল, বদ্ধ ঘরে বসিয়া তাহার বিলাপেই বা কি সার্থকতা ? তাহার চেয়ে চল দেখিয়া আসি আমার সাধের এই পোড়া বাঙলা। ভিক্ষার ঝুলি, আমার বাঁশীটি আর তোমারই সুকণ্ঠ হইবে আমাদের সম্বল। গ্রীষ্মের খরতাপ মাথায় বলিয়া, পায়ের তলায় মরুদাহ সহিয়া কাঙাল বাঙালীর সান্ধ্য অবসরে দৈবাৎ আমরা একটা ক্ষণিকের সুরমূর্চ্ছনা জাগাইয়াও দিতে পারি। বাঙলার ম্রিয়মাণ আত্মার

বোধনকল্পে তুটি তুর্ব্বল ক্ষীণস্বর, কে জানে, অপরূপ সার্থকতায় ধন্যও হইয়া উঠিতে পারে।

আমাদের হইবে শুধু চলা আর গান গাওয়া। বাউল, ভাটিয়ালি, আর কীর্ত্তনের সুরে ঢালিয়া দিব প্রাণ। ডাক দিয়া যাইব মানবপ্রেমিক বাঙলার মুমূর্ষু আত্মাকে। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, নদী-উপনদী, জলাজঙ্গল আর দিক্‌চক্ররেখার নীলমায়া আমাদের আকর্ষণ করিবে দূরে, আরও দূরে। এইভাবে কাটানো গ্রীষ্মাবকাশের দিন-কয়টায় আমার জীবনের হারানো বসন্তটা আবার ক্ষণিকের জন্য হয়তো ফিরিয়া আসিতে পারে। তোমার সদয় সঙ্গদানে ভরিয়া উঠিতে পারে এই রিক্ত অস্তিত্ব।

আশা করি নিরাশ হইব না। পড়াশুনার দীর্ঘ অজুহাত বা 'নানা কারণ'-জাতীয় গতানুগতিক মিথ্যা ছলনায় আমার আহ্বান অবহেলা করিও না—এই আমার আন্তরিক অনুরোধ। পূজ্যপাদদের প্রতি আমার প্রণাম আর তোমাদের সকলের প্রতি ভালবাসা রহিল। উত্তরের আকাঙ্ক্ষা নাই, সশরীরে উপস্থিত হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি।

তোমার
'ক্ষ্যাপা'

মহানগরী
৭ই বৈশাখ, ১৩৫৭

গ্রামের জলকষ্টনিবারণের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন

ভারত স্বাধীন হইয়াছে। শুনিতে পাই পুনর্গঠনের বড় বড় পরিকল্পনা সরকারী দপ্তরে জমিয়া উঠিতেছে। কবে কখন এসকল কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা আমাদের অনুমানের বাহিরে। ইতিমধ্যে দেশের ও দশের তুঃখের পসরা ভরিয়া উঠিয়াছে। বিত্তবান্ দেশবাসী ইহার প্রতি কিছুতেই উদাসীন থাকিতে পারেন না, থাকা উচিতও নয়।

এই পত্রে আমি একটি স্থানীয় সমস্যার প্রতি সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। বাঁকুড়া জিলার নয়নপুর গ্রামে আমার বাস। একদা এই গ্রামটি ধনেজনে পরিপূর্ণ ছিল এবং গ্রামবাসীর বদান্যতা ও সুকৃতির কল্যাণে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহও নানাভাবে উপকৃত ছিল। কিন্তু কালক্রমে গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ নগরে গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে গ্রামের সামাজিক নানা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়া যে-সকল জনহিতকর কাজ হইত, বহুদিন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের পুষ্করিণীগুলি সংস্কারের অভাবে একে একে প্রায় সব কয়টা মজিয়া গিয়াছে। যে তুই-একটা পানাসঙ্কুল উদ্ভিজ্জপূর্ণ পুষ্করিণী আজিও গ্রামে জলসরবরাহ করিয়া আসিতেছে,

তাহাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়। বর্ষার পর দুই-এক মাস তাহাদের দূষিত, প্রায় অপেয় জল কোনপ্রকারে গ্রামবাসীর অভাব মোচন করে। কিন্তু শীতের প্রারম্ভেই সুরু হয় নিদারুণ জলকষ্ট। চতুঃপার্শ্বে দুই ক্রোশের মধ্যে কোথাও তেমন একটা সুপেয় জলের পুষ্করিণী নাই। মাঘের শেষ হইতে বৈশাখের আরম্ভ পর্য্যন্ত লোকে প্রচণ্ড রৌদ্রে দূরদূরান্তরের ডোবা ও গর্ত্ত হইতে এক-আধ-ঘটি কর্দ্দমরস কি কষ্টে যে সংগ্রহ করে তাহা চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। এই অঞ্চলে বড়-একটা নলকূপ নাই। যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহাও দুই-একটা স্থাপিত হইয়াছিল, অসংখ্য লোকের অহর্নিশ পেষণে তাহারাও বহুপূর্ব্বেই বিকল হইয়া গিয়াছে।

শুষ্ককণ্ঠেই লোকে একবিন্দু জল দিতে পারে না, তাহার উপর আবার জরজালার প্রকোপ। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিতে তালু ফাটিয়া গেলেও মানুষ নিরুপায়। জল পাইবে কোথায়? বস্তুতঃ এ সভ্যযুগে কোন সভ্যদেশে এরূপ অবর্ণনীয় জলকষ্ট বোধ হয় নাই। আরবদেশের মরুভূমিতেও মরূদ্যান আছে, আছে পান্থপাদপের শান্তিরস। কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলে তৃষ্ণা-নিবারণের কোনও উপায় নাই। দেশবাসী যদি অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে অবহিত না হন, তবে দেশের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল অচিরেই উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

পুষ্করিণীখনন ও নলকূপস্থাপন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কয়েকজন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। কিন্তু আমাদের সম্বল নগণ্য, আমাদের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে দেশবাসী মুক্তহস্তে আমাদের এই মহৎ কার্য্যে অর্থসাহায্য করিবেন—ইহাই আমাদের একান্ত ভরসা। এবিষয়ে সাধ্যমত সকলেই আমাদের অল্পবিস্তর দান করিতে পারেন। বিন্দু বিন্দু বারিকণার সমবায়েই আমরা এই মরুতৃষা নিবারণ করিব। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাহায্যও তাই আমাদের পরম উপকারে লাগিবে। ধনিনির্ধন আপামর জনসাধারণের নিকট আমাদের এই করুণ ভিক্ষা নিশ্চয় ব্যর্থ হইবে না এই আশায় বুক বাঁধিয়া রহিলাম। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলপ্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি—

বিনীত
শ্রীধীরেন্দ্ররঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
সম্পাদক,
নয়নপুর গ্রামোন্নয়ন সমিতি।
পোঃ গাঙ্গনাপুর,
জিলা বাঁকুড়া।

একটি স্মরণীয় দিবসের বর্ণনা করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে লিখিত পত্র (ম. প. ১৯৫৫)

'সূর্য্যপুরী'
মহাত্মা গান্ধী রোড,
কানপুর।

শ্রীচরণকমলেষু,

দাদা, আমাদের নগরের বিশেষ কোন উৎসবের কাহিনী জানিতে চাহিয়াছ। আজ তাই আমাদের জাতীয়-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতিথিটি কিরূপভাবে পালন করা হইয়াছে তাহাই লিখিলাম। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের ঘটনা ; তবুও ঐ দিনটির স্মৃতি আমার মনে হোমশিখার ন্যায় জলিতেছে এবং এ জীবনে কখনও হয়তো উহা নির্ব্বাপিত হইবে না।

স্পষ্ট মনে পড়িতেছে—১৪ই আগষ্ট অত্যধিক গরমের জন্য আমরা রাত্রে ছাদে শুইয়াছিলাম। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াছি ; তাই দৈহিক ক্লান্তি শুইবামাত্র ঘুম পাড়াইয়া দিল। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি, সূর্য্যের আলো আমার বিছানায় খেলা করিতেছে। উঠিয়াই বোধ হইল যেন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেছি। সূর্য্যের আলো, পাখীর কাকলী, গাছের সবুজ-পত্র—সকলকেই মনে হইল আমার পরমাত্মীয়। আজ আমরা সকলেই স্বাধীন, পরাধীনতার অমানিশা কাটিয়া গিয়াছে, শিশু সূর্য্যের অনাবিল হাসিতে ধরণী আজ প্লাবিত। উঠিয়া প্রথমে সূর্য্যপ্রণাম করিলাম : 'হে সূর্য্য, হে আলোর সারথি, সমস্ত অন্ধকার দূর কর, আলোয় উদ্ভাসিত কর সমস্ত পৃথিবী, শক্তি দাও যেন স্বাধীন ভারতের সুযোগ্য সন্তান হইতে পারি। তোমার নির্ম্মল হাসিতে আমাদের সব দুঃখ, মালিন্য, কুশ্রীতা মুছিয়া ফেল। যে জীবন পাইলাম তাহাকে রক্ষা করিবার মত সামর্থ্য দাও।'

নীচে গিয়া একটি জাতীয় পতাকা লইয়া আসিলাম। সশ্রদ্ধচিত্তে স্বাধীন ভারতের পতাকাকে অভিবাদন করিলাম। নতচিত্তে, নম্রহৃদয়ে প্রণাম জানাইলাম মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে, যিনি আমাদের কণ্ঠে ভাষা দিয়াছেন, যিনি বার বার আলো দেখাইয়াছেন অন্ধকার বন্ধুর পথে। প্রণাম করিলাম জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে, যিনি বার বার আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন সংগ্রামের পথে। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিলাম দেশগৌরব নেতাজীকে, ক্ষুদিরামকে, প্রফুল্লকে, সূর্য্য সেনকে, ভগৎ সিংকে, বাঘা যতীনকে, গোপীনাথকে এবং আরও সহস্র সহস্র বিপ্লবী বীরদের, যাঁহাদের নীরব আত্মোৎসর্গেই আজ স্বাধীনতা সম্ভব হইয়াছে। স্মরণ করিলাম ১৮৫৭কে, ১৯০৫কে, ১৯২১কে, ১৯৩২কে ; বার বার নত হইয়া প্রণতি জানাইলাম ১৯৪২ এবং ১৯৪৫কে।

সকাল ৯টায় স্কুলে অনুষ্ঠান। রাস্তায় বাহির হইয়াই দেখি দলে দলে লোক চলিয়াছে ; প্রত্যেকেরই হাসিমুখ—আজ যেন দুঃখদারিদ্র্যের কোন চিহ্নই নাই। হিন্দু, মুসলমান, শিখ—সব একসঙ্গে চলিয়াছে—একটি ভারতীয় জনতার স্রোত। স্কুলে পতাকা-অভিবাদনের পর মিষ্টি বিতরণ করা হইল।

শহরে বৈকাল হইতেই উৎসব চলিয়াছিল। পূর্ব্বরাত্রে ঠিক বারটার সময় বারটি কামান ঘোষণা করিয়া দিল আমরা স্বাধীন হইয়াছি। তোমাদের দিল্লীতে না জানি কি সমারোহই হইয়াছে। আমাদের এখানে সকালে হিন্দু-মুসলমানের ছোট ছোট দল পতাকা-হাতে গলিতে গলিতে 'ঝাণ্ডা উঁচু রহে হামারা' সঙ্গীত গাহিয়া বেড়ায় ; সকালবেলা ক্যাণ্টনমেণ্ট পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী পতাকা অভিবাদন করে। উৎসবে উত্তর-প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী শ্রীসম্পূর্ণানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। পতাকা-অভিবাদনের পর তিনি নবলব্ধ স্বাধীনতার সুচারু ব্যাখ্যা করেন।

বেলা দশটায় জনতার স্রোত টাউনহল অভিমুখে যাত্রা করে। টাউনহলে শহর কংগ্রেস কমিটি একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীদামোদর স্বরূপজী। প্রদর্শনীতে শিল্পকার্য্য এবং মর্ম্মরমূর্ত্তি রাখা হইয়াছিল। চিত্রের সাহায্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পূর্ণ-ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়। শান্তিনিকেতন হইতে দুইজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীকে এই কার্য্যে আহ্বান করা হইয়াছিল। ১৮৫৭-এর সিপাহী-বিদ্রোহ হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেকটি ছোটবড় সংগ্রামের ইতিহাসই চিত্রে স্থান পাইয়াছিল ; ইহা ব্যতীত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিটি স্বর্গত ও জীবিত নেতার চিত্র প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী উদ্যানে সভার ব্যবস্থা হয়। সভায় শহরের প্রায় সমস্ত লোকই জাতিধর্ম্ম-স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে উপস্থিত ছিল। সভা লোকে লোকারণ্য ; হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্বাধীন মানুষ। সভাস্থলে প্রবেশের জন্য দুইটি তোরণ করা হইয়াছিল—মহাত্মাজী তোরণ ও নেতাজী তোরণ। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির অধ্যক্ষ শ্রীশিবনারায়ণজী। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থজী। আজও আমার কানে পন্থজীর বাণী ভাসিয়া আসিতেছে—"বহু কষ্টের পর আমরা স্বাধীন হইয়াছি। নিদারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যে দেশ বিভক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিভাজনকে নতচিত্তে আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষ হিন্দুরাষ্ট্র হইবে না, মুসলমান রাষ্ট্র হইবে না—ভারতবর্ষ সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে। আসুন আমরা সকলে একত্র হইয়া রাষ্ট্রের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি।"

সভার পর আমরা নগরপরিদর্শনে বাহির হইলাম। নগর সহস্র সহস্র দীপালোকে আলোকিত। প্রত্যেকটি গৃহ, প্রতিটি বিপণি সুন্দরভাবে সাজান

হইয়াছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে নয়াগঞ্জে আসিয়া একটি স্বর্ণদ্বার দেখিতে পাইলাম। কিছুদূরে একটি রৌপ্যদ্বার এবং আরও কিছুদূরে একটি বরফের দ্বার দেখা গেল। লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা রঙের আলোতে নগরের সেই অপূর্ব্ব শোভা বর্ণনার অতীত।

১৫ই আগষ্টের উৎসব জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। সেই অপূর্ব্ব সমারোহে, হিন্দু-মুসলমানের সেই অপরূপ মিলনের দৃশ্য! তবু মনে একটু দুঃখবোধ হইতেছিল—আহা, আজ যদি ভারত দ্বিখণ্ডিত না হইত, তাহা হইলে এই উৎসব না জানি আরও কত সুন্দর হইত!

রাজধানী দিল্লীতে স্বাধীনতা উৎসব কিরূপ হইয়াছিল তাহা জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। সংবাদপত্রে তো অনেক কিছুই পড়িয়াছি, কিন্তু আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব কিছু জানিতে চাই। পত্রোত্তরে তুমি তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া আমার ঔৎসুক্য নিবারণ করিও।

প্রণাম ও প্রীতি গ্রহণ করিও। তোমার পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম। ইতি

প্রণত সুশান্ত

———

বিচিত্রা

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি"

জননী জন্মভূমির রূপ আমাদের চোখে স্পষ্ট নয়। অল্প অনুরাগ আর স্বাভাবিক আসক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেই রূপ দেখিবার জন্য চাই নিরাবরণ চক্ষু। বিঘা দুই জমি, তাহাও দেখি মায়াজালে মানুষকে জড়াইয়া রাখে। জীর্ণ কুটীরের চতুঃপার্শ্বে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে দৃষ্টি যেন বাঁধা পড়ে। কৃত্রিম অধিকারবোধে আবৃত করিয়া রাখে রসনেত্র। কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের এই শেষ বন্ধনটুকু যখন টুটিয়া যায়, তখন সর্ব্বহারাও যেন নূতন দৃষ্টিলাভ করে। এই কারণেই উপেন যাহা দেখিয়াছিল আমরা তাহা দেখি নাই। দেখি নাই অপরূপরূপা বঙ্গভূমির বিচিত্র সৌন্দর্য্য। নিরর্থক উচ্ছ্বাসের কথা নহে, সহজ ভাবালুতায় আবেগ-ফেনিল বর্ণনাবিলাস ছাড়িয়া একবার মাতৃভূমির স্বরূপ ধ্যান করিয়া দেখিলে ঠিক এই কথাটাই বার বার মনে জাগে—এ এক বিচিত্র দেশ।

পণ্ডিতগণ ইহাতে দ্বিমত হইতে পারেন। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতে পারেন—এ আবার একটা দেশ! আবক্ষ তাহার আর্দ্রতা, বন্ধুরতাহীন, বৈচিত্র্যবর্জ্জিত এ ভূভাগ। লতাগুল্ম, বৃক্ষরাজি, জীবজন্তু ও মানুষ—কাহারও এখানে দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ হইবার উপায় নাই। বৃদ্ধি এদেশে শুধু সংখ্যায়, স্বাস্থ্যে নহে। সুন্দরবনে বাঘ আর বাঘের অপেক্ষা ভয়ানক নগণ্য জীবাণু ও ব্যাক্‌টিরিয়া এদেশের বায়ুমণ্ডল ছাইয়া রাখিয়াছে। এই আমাদের বাঙলাদেশ, একে তো গ্রীষ্মপ্রধান, তাহার উপর আর্দ্র আবহাওয়ার অলস আবেশ—একেবারে সোনায় সোহাগা। তৈলসেক ব্যতিরেকেও আলস্যলালিত দেহভার যেন আপনা হইতেই এলাইয়া পড়ে। রূপের কথা বলিতে গেলেই বা আজ আর বেশী কি বলা যাইবে? সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভূমিকে এখন জলা-জঙ্গলময়রূপেই বর্ণনা করিতে হইবে। স্বীকার করিতেই হইবে যে, কালের কুটিল বিবর্ত্তনে দেশের লক্ষ্মীশ্রী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছায়া-সুনিবিড় ছোট ছোট গ্রামগুলি আজ বড় বড় শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। গ্রামগুলি সব ক্রমে উৎসন্ন হইতে চলিল। তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না। উর্দ্ধ আকাশে প্রদীপ নিভিয়া গেল। তবু যে শহরবন্দরে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, তবুও যে নগরীর বিপুল আলোকসজ্জা ও অতুল সমারোহ, তাহা কিন্তু একান্তই মস্ত একটা ফাঁকি। দেহের যে ক্ষতটা দিয়া অশেষ রক্তমোক্ষণ হয়, তাহা একটু অতিমাত্রায় লোহিতই হইয়া থাকে। ইহাই বিশ্বকবির মত।

সবই সত্য। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, এসকলই অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফল। নচেৎ আজিও বঙ্গভূমির ছয়ঋতুর লীলামাধুর্য্য যেমন তেমনই আছে,

প্রকৃতির অকৃপণ বদান্যতা আজিও বাঙলাকে ধন্য করিয়া রাখিয়াছে। দেশটা সমতল কিন্তু অগণ্য নদী-উপনদীর জটিল জালে তাহাতেই এক অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ফুটিয়া রহিয়াছে। বিস্তীর্ণ শ্যামপ্রান্তর, নিবিড় বনানী আর বৃক্ষরাজিভূষিত গ্রামগুলির ঘনশ্যাম সুষমা—তাহারই মধ্যে আঁকিয়া-বাঁকিয়া সর্পিল নদীগুলি যেন সীবন-শিল্প-রচনা। চারিদিকে সীমাহীন সবুজ, মাঝে মাঝে ফেনিল-গৈরিক জলরাশির কম্প্ররেখা। উত্তরসীমায় অভ্রভেদী হিমাচল; শীর্ষে তাহার তুষারজ্যোতি। দক্ষিণে নীলসমুদ্রের কলধৌতবৎ ফেনোচ্ছ্বাস। পূর্ব্বে রহিয়াছে অচল অরণ্যের মেঘের সহিত সুনীল আশ্লেষ। পশ্চিমে কেবল মুক্তি।

বঙ্গভূমির এই মূর্ত্তির প্রধান মাধুর্য্য কিন্তু লীলাচাঞ্চল্যে। ঋতুচক্রের নিয়মিত আবর্ত্তনে এদেশের সৌন্দর্য্য নিত্য নবীন রূপে বিকশিত হইয়া উঠে। নিদাঘের প্রচণ্ড দাহ নির্মেঘ আকাশতলে যখনই অগ্নিময় হইয়া উঠে, তখনই জাগে কালবৈশাখীর তাণ্ডব। কিন্তু বেশী দিন এখানে মরুজ্বালা অব্যাহত থাকে না। অচিরেই জমে ঘনঘটা, মেঘমেদুর আকাশ গলিয়া নামে মুষলধারে বর্ষণ। ভৈরব হরষে বাজিয়া উঠে মেঘডম্বরু—কেকাকলরবে আসিয়া পড়ে বর্ষা। বিপুল জলোচ্ছ্বাস। মাঠপ্রান্তর ডুবাইয়া নদীরেখা মুছিয়া সাগরের সঙ্গে এক হইয়া যায় সারা বাঙলা। জাগিয়া থাকে শুধু গ্রামগুলি, যেন তাহারা ছোট ছোট দ্বীপ। জলে ভাসে পালতোলা নৌকা, বাতাসে স্পন্দিত হয় প্রাণঢালা ভাটিয়ালি সুর। বর্ষা যায়, আসে শরৎ। হরিতে-হিরণে মধুর কিরণে হাসিয়া উঠে দেশ। আকাশের অকলঙ্ক শুক্লতা রচনা করে শুভ্র চন্দ্রাতপ—নিম্নে শ্যামল পৃথিবী। ফলে ফুলে জ্যোৎস্নায় বাঙলা তখন স্বর্গমহিমায় মণ্ডিত হয়। আসে হেমন্ত শিশির ছিটাইয়া। কুয়াসার অবগুণ্ঠন টানিয়া ব্রীড়া-সঙ্কোচে আসে শীত। আবার আসে বসন্ত। দক্ষিণ সমীরণে গায় জাগরণী। ফুল জাগে, ফল জাগে; জাগে পাখী, হাসে বাঙলা। এই আমাদের বাঙলামায়ের লীলাচঞ্চল রূপ। ইহার তুলনা নাই। অশেষ দুঃখদৈন্যের মধ্যেও তাই জননী জন্মভূমি এত মায়াময়—তাই তাহা চিরনমস্য। সর্ব্বহারার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাই বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই গাহিয়া উঠি: 'নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি'।

দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ

লজ্জা বস্তুটা অনেকাংশে একটা সামাজিক বোধ। ইহা ধারণার দিক্ দিয়া যেমন, ঘটনার দিক্ দিয়াও তেমনি সত্য। কোন্‌টা লজ্জার কোন্‌টা নহে, তাহা স্থানকাল-পাত্র অনুযায়ী বিশেষ একটা সাময়িক ও সামাজিক আদর্শের সহিত সম্পর্কিত।

আবার ঘটনাহিসাবে অনেক লজ্জাকর ঘটনাতেও সময়ে লজ্জার বোধ হয়, সময়ে হয় না। দশজনের সমক্ষে উঠিলে সামান্য দোষক্রটির কথাও লজ্জা দেয় ; সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ঘটিলে ইহার চেয়ে অনেক বেশী লজ্জাদায়ক ব্যাপারও নীরবে হজম হইয়া যায়। অতএব মোটামুটিভাবে লজ্জা বস্তুটাকে সামাজিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

যদি ইহাই সত্যি হয়, তবে দশে মিলিয়া কাজ করিলে লজ্জার সম্ভাবনা বাস্তবিকই কম। অন্ততঃ তাহাতে যে ব্যক্তিগতভাবে সঙ্কুচিত হইতে হয় না, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। যে সমাজে লোকের বাস, তাহার বহুর সহিত একত্র কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে ইহাই লাভ। সাফল্যের গৌরব বা অসাফল্যের অবমাননা তখন আর একার নহে। একার নহে বলিয়াই তাহা আবার বিশেষ করিয়া কাহারও সঙ্কোচের বিষয় নহে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে দুই-একটি প্রশ্নের অবতারণা করিতেছি। হারিলে লজ্জার কথা আছে, জিতিলে কিসের লজ্জা ? দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বজনীন লজ্জা বলিয়াও কি কোন বস্তু নাই ? একে একে আলোচনা করা হউক।

সাধারণভাবে জয় কখনও লজ্জার নহে, গৌরবের বটে। কিন্তু কখনও কখনও জয়ের ইতিহাস হয় বড়ই গ্লানিকর। মিথ্যারও জয় আছে, কাপুরুষও ঘটনাক্রমে বীরকে জয় করিতে পারে। মোট কথা, লজ্জাকর উপায়েও জয়গর্ব্ব অর্জ্জন করা যায়। কিন্তু বিবেকবান্ ব্যক্তির নিকট সে-জয় লজ্জার বস্তুই থাকিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, এই সেদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পশ্চাদপসরণকুশলী যাহারা জয়লাভ করিল তাহাদের মধ্যে এমন বহু প্রকৃত বীর নিশ্চয় আছেন যাঁহারা এ জয়ের লজ্জা ভুলিতে পারেন না —এ্যাটম বোমার জয় সত্যকার যুদ্ধজয় নহে। লজ্জা সমবেতভাবে সকলের বলিয়াই বোধ হয় সহনীয়। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার ইহাই প্রধান উপযোগিতা। তাহা হইলে জয়-পরাজয় উভয়েই লজ্জা থাকিতে পারে। দশে মিলিয়া তাহার অংশভাগী হইলে তাহা আর বড় একটা গায়ে লাগে না, ইহাই হইল তাৎপর্য্য।

তবে একেরই হউক আর দশেরই হউক, লজ্জাকর ব্যাপারে একপ্রকার-না-একপ্রকার লজ্জা অবশ্যই আছে। আছে বলিয়াই জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ হইলে যুদ্ধ বাধে। বস্তুতঃ এমন অনেক ঘটনা ঘটে যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে কোন লজ্জার কারণ নাই, অথচ স্বসমাজের বা দলের লজ্জায় মাথা নত হয়। পলাশীর কলঙ্ক স্মরণ করিলে সমগ্র বাঙালীজাতি আজও লজ্জা বোধ করে। একদা মোহনলালও বোধহয় এই লজ্জাটা বুকের ভিতর শেলের মতই বোধ করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার মত বীর কয়টা দেখা যায় ? এমন আত্মদান, এমন দেশপ্রেম, এমন মহিমমণ্ডিত জীবনের তুলনা কৈ ? তবু কিন্তু সকলের লজ্জায় মোহনলালের লজ্জা—মীরজাফরের আচরণে সকল বাঙালীর সহিত তাঁহারও লজ্জার অবধি নাই।

কাজেই দশে মিলিয়া কাজ করিলেই হারজিতের মধ্যে যে কিছুমাত্র লজ্জা নাই একথা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। আসল কথাটা বোধ হয় ইহাই যে একতাবদ্ধভাবে কাজ করার উপযোগিতা অনেক। তাহাতে লজ্জার গুরুত্ব কমিয়া যায়। খেলাধুলায় খেলোয়াড়দের যে উদারতা প্রশংসনীয়, তাহা এই দলগত মনোভাবেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বদলের পরাজয়ে লজ্জা আছে, কিন্তু তাহা সহ্য করার মধ্যেও গৌরব আছে, ইহাই sportsmanlike spirit বা খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির গোড়ার কথা। দশে মিলিয়া কাজ করার মধ্যেও যেন এমনিই একটা সুকুমার বোধ সৃষ্ট হয়। সেইজন্যই সকলের সহিত জয়পরাজয় অম্লানবদনে বরণ করা যায়, সেই কারণেই লোকে বলে—"দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"।

"বিনা স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা ?"

পরপদানত ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা, সংস্কার ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া ময়ূরপুচ্ছধারী কাক সাজিয়াছে, তখনই পরম খেদে কবি তাঁহার এই অন্তরের পিপাসাটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন। আশৈশব যে ভাষায় মানুষের ভাবকল্পনা উছলিয়া উঠে তাহার ঐশ্বর্য্য যেরূপ হউক না, হৃদয়ের সহিত তাহারই সম্পর্ক স্বাভাবিক ও নিবিড়তম। তাই মাতৃভাষায় পরিবেষণ না হইলে কাব্যসাহিত্য দর্শনবিজ্ঞান সবকিছুই বুদ্ধিকে যতটা উত্তেজিত করে, হৃদয়কে তত তৃপ্তি দেয় না। দুইচারিজন এ সত্যের নিপাতন হইতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশেরই ইহাই মর্ম্মকথা—স্বদেশী ভাষা ভিন্ন সত্যই কাহারও অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণভাবে মিটে না।

ভাষার তর্কটা স্বভাবতঃই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়িয়া আছে। সত্যই দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন লিখিত সম্ভারের ক্ষেত্রে তো বটেই, তাহা ছাড়া জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রের ভাষার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষায় সাহিত্য ও জ্ঞান-দর্শনের বিষয় বিদেশী বস্তু অপেক্ষা সকল সময়ই যে মধুরতর, তাহা অবশ্যই বলা চলে না। স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় সাহিত্য, জার্ম্মানীর বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞান বা সংস্কৃত দর্শনের ন্যায় দর্শন তুলনাবিহীন। বিসংবাদের বিষয় ইহা নহে। কথাটা হইল এই যে, শাদা ডালভাতের মধ্যে উপাদেয়তা অপেক্ষাও রুচিগত অন্যতম এমন একটা অন্তরঙ্গ আস্বাদ পাই যাহা বিদেশী চপ্-কাট্‌লেটে দুর্লভ। তাহা ছাড়া কাঁটা-চামচের অনভ্যস্ত প্রক্রিয়াটা বহুকাল সাধিয়াও হাতের গ্রাসের মত অত সহজ ও উপভোগ্য হয় না। বিদেশী ভাষায় নিবদ্ধ বস্তুও অনুরূপভাবেই প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে এইজন্যই মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বজনস্বীকৃত। আমাদের দেশে

অবশ্য এবিষয়ে অদ্ভুত একটা হেঁয়ালী প্রকট। নীতির দিক্ দিয়া যাহা বিধেয়, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা হইয়াই রহিয়াছে। সুদূর অতীতে বিদেশী শাসকের প্রয়োজনে এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহার উপযোগিতা আজ নিঃশেষিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বার বার একথা বলিয়া ও লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তবু কয়লার ময়লা গেল না। পরাধীনতা মজ্জায় প্রবেশ করিয়া মনের যে শোচনীয় বর্ণবিকার ঘটাইয়াছে, তাহার বুঝি আর ক্ষালন হইবে না। মুষ্টিমেয় ইংরেজীবিদের একচেটিয়া কারবারে দেশের যথেষ্ট শিক্ষিতের সম্মতি রহিয়াছে। অনেকের প্রতিবাদ তাই অরণ্যে রোদন। এ তর্কের অথৈ জলে নামা আপাততঃ নিরর্থক। শুধু এইটুকু বলিয়া রাখা যায় যে, সকলের জন্যই শিক্ষা এবং সে শিক্ষা মাতৃভাষায় পরিবেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি দেশবাসীর অন্তরে তাহা পৌছাইতে পারে না। দেশ চায় আপনার বিকাশ—বিদেশ হইতে আমদানী করা উজ্জ্বল ভূষা সকলে চায় না, চাহিলেও পায় না: আর পাইলেও সকলের গায়ে তাহা মানায় না। তাই "আমাদের বিলাতী বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙ্গানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না (রবীন্দ্রনাথ)।" তাই সে শিক্ষা আমাদের হৃদয়পিপাসা মিটাইতে পারে না।

ক্ষুৎ-পিপাসা নাকি দেহের অভাব সূচিত করে। সম্যক্ পরিপুষ্টির জন্য যে উপাদানের প্রয়োজন, সময় সময় তাহাদের দাবী ক্ষুৎ-পিপাসায় আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষা ও জীবনের সর্ব্বত্র ভাষার জন্য যে আজ একটা প্রবল কামনা দেখা যাইতেছে তাহাও পুষ্টিকর আকাঙ্ক্ষা ব্যঞ্জিত করে। কারণ "উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না।" এইজন্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আধ্যাত্মিক মুক্তি বহন করিয়া আনে নাই। মনেপ্রাণে আমরা আজও পরাধীন। ইংরেজগণ কৃষ্টির দিক্ দিয়া এদেশে যে বিপুল জয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহার কঠোর নিগড় আজও বহু নেতা-উপনেতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে যাহাই হউক, একথা অন্ততঃ বিসংবাদের ঊর্দ্ধে যে জাতিকে আত্মস্থ করিতে হইলে, তাহার আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সর্ব্বাঙ্গীণ ও সহজ করিতে হইলে চাই মাতৃভাষার একান্ত আশ্রয়।

মোট কথা, বিনা স্বদেশী ভাষা আশা মিটিবে না। ধূর্ত্ত শৃগাল সারসকুলের জন্য চ্যাপ্টা থালায় যে প্রচুর খাদ্যসম্ভার সাড়ম্বরে সাজাইয়া দিয়াছিল, তাহা লালসা জাগাইলেও পিপাসার নিবৃত্তি কখনও করে নাই। দুইএকজন কর্ত্তিতচঞ্চু বিকৃত জীবের পক্ষে যেরূপই হউক, দেশের জনসাধারণের নিকট বিদেশী ভাষায় বাহিত বিদ্যা বা সাহিত্য জাতির অন্তরক্ষুধার নিবৃত্তি করে নাই, করিতে পারে না।

——

কাজ করবি শক্ত, কাজের হবি ভক্ত

কর্ম্মই জীবন। দেহ ও মন লইয়া মানুষ। এ-দুইয়ের কেহ অলসভাবে বসিয়া নাই। মন নাকি নিদ্রিত অবস্থায়ও সক্রিয়। তাহারই ফলে মানুষ স্বপ্ন দেখে। আর দেহ,—উহারও প্রতিটি খণ্ড ও ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অহর্নিশ কর্ম্মব্যস্ত। দেহের রাজ্যে হরতাল চলে না। উদরটি ভোগী বলিয়া হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি উদরের সেবা না করিয়া কখনও ধর্ম্মঘট করে না। বস্তুতঃ মানুষ দেহে ও মনে সর্ব্বদা কর্ম্মশীল। শুধু কি মানুষ? চেতন, অচেতন, জীবিত ও মৃত যাবতীয় বস্তুসহকারে এই বিপুল বিশ্বও নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মচঞ্চল। চঞ্চল বিশ্বের সজীব অংশ বলিয়াই বুঝি মানুষেরও গতির বিরাম নাই।

তবে মানুষের দেহ-মন সর্ব্বদা এক এক হিসাবে কর্ম্মব্যস্ত থাকিলেও সামাজিক অর্থে সকল মানুষই ঠিক কর্ম্মশীল নহে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত সমাজবন্ধন সেরূপ অবিচ্ছেদ্য নহে। সেই কারণেই সমাজজীবনের কর্ম্মকুণ্ঠা মাঝে মাঝে প্রশ্রয় পায়। তথাপি "কাজ করবি শক্ত, কাজের হবি ভক্ত"—এ কথাটাও মনুষ্যসমাজেরই আদর্শ প্রচলন। ইহার ব্যবহারটা অবশ্যই বিশেষভাবে দীনহীন ও নিম্নস্তরের প্রতি উদ্দিষ্ট হয়, হাড়ভাঙা খাটুনিটুকু কেবল শ্রেণীবিশেষেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। পরশ্রমজীবী মুষ্টিমেয় একদল ধনিকের মুখে তাই কাজের মহিমাটা স্তোকবাক্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কাজের যে একটি অতিশয় গৌরবময় মহিমা আছে, তাহাতেও আবার সন্দেহ নাই।

রাজনীতি ও সমাজনীতির তর্ক ছাড়িয়া দিয়া মোটামুটিভাবে স্বীকার করিতে আপত্তি থাকা উচিত নয় যে, প্রত্যেক মানুষেরই কর্ম্মানুরক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা কাজকে কেবল জীবিকা-সংস্থানের উপায়রূপে বিচার করিলেই চলিবে না; উহাতে মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশেরও সুযোগ রহিয়াছে। কাজের মধ্য দিয়াই মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টিবিধান হয়। কাজের অভাবে সেগুলি আবার ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই পেটের দায়েই হউক আর অন্য যে-কোন কারণেই হউক, মানুষকে যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় তাহার মধ্যে যথেষ্ট শুভও রহিয়াছে। কাজ যখন করিতেই হইবে, তখন তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে সাধন করিবার নিমিত্ত মানুষমাত্রেরই আগ্রহ থাকা সঙ্গত। এবিষয়ে অর্দ্ধপথে রণে ভঙ্গ দেওয়া যেমন কাপুরুষতাসূচক, তেমনই অভীষ্ট-সিদ্ধির পথেও তাহা নিতান্ত ক্ষতিকর।

আরব্ধ কার্য্যে সকলেরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। "কাজ করবি শক্ত"-দ্বারা বোধহয় ইহাই বুঝায়। নির্ব্বোধ গর্দ্দভের ন্যায় গুরুভার বহনের মধ্যে সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না; তাই মানুষের প্রতি অমানুষিক পরিশ্রমের সাধু উপদেশটিও আলোচ্য প্রচলনের মধ্যে নিহিত নাই, একথা নিশ্চিত।

বাইবেলে কথিত আছে যে, মানুষ সৃষ্টির আদিম প্রভাতে যে গুরুতর পাপ করিয়াছিল তাহারই শাস্তিস্বরূপ পরিশ্রম তাহার চিরন্তন অভিশাপ। কিন্তু বাস্তবিক কি কর্ম্ম মানুষের পক্ষে অভিশাপ, না বর? গীতায় আছে—'নিষ্কামভাবে কাজ করিয়া যাও, কাজেই কাজের সার্থকতা। ফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না।' বাইবেল ও গীতার এই পরস্পরবিরোধী মত দুইটির কোনটিই পূরাপূরিভাবে হয়তো সর্ব্বজনগ্রাহ্য নয়। কিন্তু আসলে কর্ম্ম অভিশাপও নয়, সাধারণের নিকট তাহা নিষ্কাম ধর্ম্মসাধনার সোপানস্বরূপও নয়। মানুষ কাজ করে অনেকটা দায়ে, অনেকটা প্রেরণায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, কলা প্রভৃতি অগণ্য কৃতির সৃষ্টিমূলে যে কর্ম্ম দেখিতে পাই, তাহা মূলতঃ অনুপ্রাণিত। বাস্তবিক এ পর্য্যন্ত কোন বড় কাজই হৃদয়ের অনুরাগ-অভিষিক্ত প্রেরণা ব্যতিরেকে সাধিত হয় নাই। কর্ম্মকে যতদিন প্রাণ দিয়া ভালবাসা না যায় ততদিন সেই কর্ম্মে লোকোত্তর মহিমারও অধিকারী হওয়া যায় না। প্রাণ দিয়া ভালবাসিলে আবার ফলের কথাটাও গৌণ হইয়া পড়ে এবং কাজে কাজেই "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" কথাটাও তাৎপর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবনব্রত আলোচনা করিলে আমরা ইহারই ভূরি ভূরি নিদর্শন পাই। অতএব শক্ত হাতে দৃঢ়ভাবে কাজ করিলেই যথেষ্ট হয় না, সে কাজের মধ্যে প্রাণ পড়িয়া থাকাও চাই। সেইজন্যই কথায় বলে—"কাজ করবি শক্ত, কাজের হবি ভক্ত"।

ব্যবসায়ে বাঙালী

বাঙালী ব্যবসায়ে বিমুখ। মাসমাহিনার নির্দ্দিষ্ট চাকরীর মোহে আচ্ছন্ন তাহার বুদ্ধি, অথর্ব্ব তাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা। অমর্য্যাদাকর সত্য, কিন্তু অস্বীকার করিবার তো উপায় নাই। দেখিতে হইবে ইহার কারণ কি এবং তাহার প্রতিকারকল্পে করণীয়ই বা কিছু আছে কিনা।

জাতিহিসাবে বাঙালী যে নূতন পথের অভিযানে কুণ্ঠিত, তাহা কখনই বলা যাইবে না। তাহার হৃদয় বিপদ্-ভয়ে শঙ্কিতও নহে। তবু যে সে ব্যবসায়ের উত্থান-পতনময় বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্র এতকাল সযত্নে এড়াইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ অস্পষ্ট নয়। মনে রাখিতে হইবে যে, বৃটিশশাসনের গোড়াপত্তন হয় এই বাঙলায় এবং তাহারই প্রয়োজনে বিলাতীশিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দেশেই সেই নূতন বস্তুর আলোককুহকে বাঙালী একদা মাতিয়া উঠিয়াছিল এবং তাহারই অবসরে ভারত-শাসনের কামারশালা—আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়—কেরানী গড়িয়াছিল লাখে লাখে। অন্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা বাঙালীকে তাই চাকরীর দুয়ার তখন স্বাগত সম্ভাষণ

জানাইয়াছে। দিনে দিনে নিশ্চিত আয়ে নিশ্চিন্ত জীবন বাঙালীকে দুর্নিবার মোহে একেবারে পূরাপূরি চাকরীজীবী করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার বিলাসিতার আকর্ষণ বাঙালীর মানসিক আলস্যপ্রবণতাকে লালন করিয়া অবশেষে তাহাকে বিগতপ্রয়াস অদ্ভুত জীবে পরিণত করিয়া দিয়াছে। বাঙালী তাই ব্যবসায়-কুণ্ঠ।

অতীতের ইতিহাস কিন্তু ভিন্নরূপ। বাঙালী একদা ব্যবসায়ে অগ্রণী ছিল। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর একদা দেশবিদেশের সহিত বিপুল পণ্য বিনিময় করিত। ঢাকাই মস্‌লিন আর মুর্শিদাবাদের সিল্ক, তৈজসশিল্প আর হস্তিদন্তের কারুসম্ভার সেকালে ভারতের বাহিরে সুদূর প্রাচ্যে পর্য্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী বস্তুরূপে পরিগণিত হইত। বস্তুতঃ শতপ্রকারের শিল্প এদেশে একদা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের বিনিময়ব্যপদেশে বাঙালী তখন দূরপ্রাচ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায়ী জাতিরূপেই প্রখ্যাত ছিল। কিন্তু বিদেশীর প্রত্যক্ষ চক্রান্তে সে-সকল বিনষ্ট হইয়াছে। তাহাদের পরোক্ষ দুষ্টপ্রভাব কিভাবে বাঙালীকে চাকরীজীবীতে রূপান্তরিত করিয়াছে তাহাও বলা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে দেশে বেকার-সমস্যাটা যখন বিকট আকার ধারণ করিয়াছে, তখন আবার একটা পুনর্জাগরণের প্রয়াস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, বটকৃষ্ণ পাল, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আলামোহন দাশ প্রভৃতি ব্যবসায়ধুরন্ধর ব্যক্তিগণ দেখাইয়াছেন বাঙালী ব্যবসায়-বুদ্ধিতেও ন্যূন নহে। তাহার পর গত ২০।২৫ বৎসর যাবৎ নানাদিক্ দিয়া ব্যবসায়-প্রয়াস চলিয়াছে। সার্থকতা অবশ্য আসে নাই। তবে তাহাতে নৈরাশ্যকরও কিছু ঘটে নাই। বেঙ্গল কেমিক্যাল, এমন কি টাটার বিপুল লৌহশিল্পও বাঙালী প্রতিভারই জয়-বৈজয়ন্তীস্বরূপ।

কিন্তু ব্যবসায়ে বাঙালী তথাপি পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ দর্শাইতে যাইয়া বহুকাল যাবৎ বাঙালীচরিত্রের নিন্দা ও সঙ্গে সঙ্গে মাড়োয়ারীপূজার বেশ একটা রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। এক কথায়, বাঙালী মাড়োয়ারী হইতে পারে নাই বলিয়াই নাকি ব্যবসায়ীও হইতে পারে নাই। আমাদের মতে ইহা ভ্রান্ত। বাঙালী তাহার স্বকীয় বিশেষত্ব-সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত নহে বলিয়াই ব্যবসায়ে তাহার অসাফল্য; ইহাই সত্য মনে করি। লোটাকম্বল সম্বল করিয়া অশেষ কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীর আরাধনা এদেশে হইবে না। নিছক পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রয়োজন যাহাতে, তাহাতে বাঙালী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিবে না। যে কর্ম্মে বিশদ সংগঠন-কুশলতা প্রয়োজন, যে ব্যবসায়ে চক্রান্ত অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা-দক্ষতা আবশ্যক, তেমন ব্যবসায়েই বাঙালীর সার্থকতা সুনিশ্চিত। যৌথ কারবারে বাঙালী সম্প্রতি যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে তাহাই একথার সত্যতা প্রমাণ করে।

ব্যবসায় অবশ্যই কেবল বুদ্ধির কাজ নহে। অর্থেরও চাই প্রচুর যোগান। এইখানেই আমাদের পরাজয়। এই কারণে বাঙালীর বুদ্ধি ক্রয় করিয়া মাড়োয়ারী বড় হয়, বড় বড় টাটা কোম্পানী গড়ে। বিড়লা-সিন্ধিয়া-টাটা-বাটাকবলিত ব্যবসায়ক্ষেত্র বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী বড়লোক নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবসায়ে টাকা ঢালিতে না শিখিলে বাঙালী দাঁড়াইতে পারিবে না। না পারিলে জাতিহিসাবে বাঙালীর ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। এই কথা ভাবিয়া বাঙলার সরকারের একটু তৎপর হওয়া উচিত। স্বেচ্ছায় না ঘটিলে আইনের সাহায্যে বাঙালী যক্ষদিগকে ব্যবসায়ে অর্থনিয়োগ করিতে বাধ্য করা প্রয়োজন। প্রয়োজন তেমনি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আবশ্যক রূপান্তর। ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি এবং ব্যবসায়কুশলতা—উভয় উদ্দেশ্য শিক্ষায় প্রাধান্য পাওয়া আশু প্রয়োজন। ব্যবসায়ে বাঙালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইহাতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে।।

বাঙলার একান্নবর্ত্তী পরিবার

আবহমান-প্রচলিত আদর্শানুগত যুগপ্রাচীন এই একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা। রামায়ণ-মহাভারতের, সম্ভবতঃ তাহারও পুরাতন এই সামাজিক বিশেষত্বটুকু কালের সকল কুটিল বিবর্ত্তন উপেক্ষা করিয়া এতকাল এদেশে অব্যাহত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিমের কঠিন সংঘাতে তাহাতে ভাঙন ধরিয়াছে। যে সংসক্তি একদা বহুকে এক করিয়া দৃঢ় আশ্লেষে বাঁধিয়া রাখিত আজ তাহার অবলোপ ঘটিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের জীর্ণ কঙ্কালটিই মাত্র বর্ত্তমানে অবশিষ্ট রহিয়াছে—উহার প্রাণস্বরূপ আদর্শটির অস্তিত্ব আজ আর নাই।

একান্নবর্ত্তী অর্থে এখন এমন একটি পরিবার বুঝায় যাহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণ এক হাঁড়ির অন্ন গ্রহণ করেন। এইমাত্র। কিন্তু পুরাকালে এক স্বার্থে, এক আদর্শে পরিচালিত বিচিত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানবিশিষ্ট আত্মীয়-পরিজনের যৌথ-জীবনপদ্ধতির নাম ছিল একান্নবর্ত্তিতা। তখন পরিবারের একজন কর্ত্তা থাকিত ; একজন গৃহিণী তাহার শাসন করিতেন। পুত্রকন্যা, নাতিনাতনী ও বধূবৃন্দ কর্ত্তা-গিন্নীর নিতান্ত অনুগতভাবেই চলিতেন এবং কর্ত্তা-গিন্নীও সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুসারে পরিবারচালনা কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। আদর্শ তখন নির্দ্দিষ্ট এবং জীবন্ত ছিল। বাল্যকাল হইতে সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য নিজেদের অজ্ঞাতসারেই জানিয়া লইত। কাঁটায় কাঁটায় নিয়মিতভাবে পরিবারজীবন তখন মসৃণভাবে অতিবাহিত হইত। বিরোধ বা অসঙ্গতি কখনও দেখা দিত না। কিন্তু কালক্রমে সমাজশাসন যখন শিথিল হইয়া যায়, আদর্শটুকু যখন উবিয়া যায়, তখন এই একান্নবর্ত্তী পরিবার বিকৃত হইয়া পড়ে।

বাঙলায় আমরা আদর্শ বস্তুর সেই অপভ্রংশই দেখিয়াছি। তাহার ভালমন্দ দুই-ই আমাদের নিকট বড় হইয়া এই যুগসন্ধিক্ষণে জিজ্ঞাসা জাগাইয়াছে—ইহা গ্রহণীয়, না বর্জ্জনীয়?

ভাল যেটুকু এখনও অদৃশ্য হয় নাই তাহার আলোচনা স্বভাবতঃই প্রথমে মনে জাগে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের এখনও কতকগুলি কল্যাণময় বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য। অনেকের সহিত একত্রে বাস করিতে হইলে পরস্পরের ত্রুটি-বিচ্যুতি দোষ-অপরাধ সহিয়া চলিতে হয়। ঘটিবাটি একত্রে থাকিলে ঠোকাঠুকি অপরিহার্য্য, ইহা ভাবিয়া মানুষকে তখন মানাইয়া চলিতে হয়। অব্যবহিত প্রতিবেশের সহিত সামঞ্জস্যরক্ষায় এইরূপে কিঞ্চিৎ ত্যাগ ও কিঞ্চিৎ বুঝিবার প্রয়াসদ্বারা মানুষ যে শিক্ষালাভ করে, সংসারের বৃহত্তর ক্ষেত্রের জন্য তাহা অমূল্য সঞ্চয়। সখ্য, প্রীতি, মমত্ব প্রভৃতি সুকুমার মানসিক বৃত্তিগুলিরও বিকাশ একান্নবর্ত্তী পরিবারেই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া সকলের জন্য আত্মস্বার্থ-বিসর্জ্জনও এই প্রথার অমোঘ শিক্ষা। ক্ষুদ্র তুচ্ছ অবাঞ্ছনীয় ঘটনাকে হেয়জ্ঞান না করিলে এক সংসারে থাকা যায় না। তাই বৃহৎপরিবারভুক্ত প্রত্যেকেই একপ্রকার উদারতা অর্জ্জন করেন। কর্ত্তার পক্ষে তো সঙ্কীর্ণতা একেবারেই অস্বাভাবিক। দশজনের অভাব-অনটন দেখিয়া অন্নবস্ত্রের বিলিব্যবস্থার ভার যাঁহার হস্তে ন্যস্ত, তিনি স্বভাবতঃই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও উদারচিত্ত হইয়া উঠেন। দৃষ্টিও হয় তাঁহার সর্ব্বপ্রসারী। কেননা, কখন কাহার কি প্রয়োজন, কোন্‌টা শোভন কোন্‌টা দৃষ্টিকটু প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হয় এবং এসকল কাহারও বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবার এইরূপে বিচক্ষণতার ভিত্তিভূমি। আবার দেশপ্রীতি, মানবপ্রেম, দয়াদাক্ষিণ্য ও আত্মত্যাগের প্রাথমিক বিদ্যাপীঠও আমাদের এই একান্নবর্ত্তী পরিবার। হৃদয়কে পরিবারের দশজনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া মানুষ এখানে বৃহত্তর প্রীতির অঙ্কুরটি অলক্ষ্যে লালন করিয়া তোলে। জীবনের মহত্তর ক্ষেত্রে কখনও তাহা দেশপ্রীতি, কখনও বা বিশ্বপ্রেম-রূপে বিকশিত হইয়া উঠে। পরিবারের একজনের জন্য অপরজনের যে মায়াপাশ গড়িয়া উঠে, তাহাতে আশৈশব বাড়িয়া উঠিয়া মানুষ আর নিজের কথাটাকেই বড় করিয়া দেখিতে পারে না। ভাবিতে শিখে 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। তাহারই জন্য পুষ্টিলাভ করে দয়া-দাক্ষিণ্য ও ত্যাগবৃত্তি।

এত-সত্ত্বেও কিন্তু একান্নবর্ত্তিতার জয়গান বেশীক্ষণ গাওয়া চলে না। প্রদীপের তলায় ছায়া থাকে, চাঁদও কলঙ্কহীন নহে। আর যুগপ্রাচীন এই প্রথা—এ কোন্ ছার! ইহার মধ্যে যে অশেষ ত্রুটি থাকিবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? উজ্জ্বল দিক্‌টার কথা এতক্ষণ বলা হইয়াছে, এইবার উহার মসীময় দিক্‌টারও বিবরণ সংগ্রহ করা যাক।

আলস্যের প্রশ্রয় এ প্রথার বোধহয় শোচনীয় কলঙ্ক। পরিবারের কয়েকজনের সমবেত উপার্জ্জনে দুইএকজনের বেশ নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটিয়া যায়। অভাবের কশাঘাতই মানুষকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের এই অভাবটা প্রায়ই দুই-একটি কৃতী সন্তানের প্রচুর উপার্জ্জনে মোটামুটি মিটিয়া যায়। অপরের পক্ষে তখন কর্ম্মোদ্যমের তাগিদটা তেমন তীব্র হইয়া উঠিতে পায় না। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় বৃহৎপরিবারের যৌথ বিষয় দেখাশুনা করিবার জন্যও দুইএকজনকে বাধ্য হইয়াই স্বকীয় উপার্জ্জন-প্রয়াস ত্যাগ করিতে হয়। বাড়ীঘর দেখাশুনাই হয় তখন তাঁহাদের একমাত্র কাজ। বিষয়ের আয় ভাল হইলে তো কথাই নাই, নচেৎ প্রবাসী পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মাসিক অর্থসাহায্যে তাঁহাদের দিনগুলি পরম আলস্যে শিথিল হইয়া যায়। কাজ তাঁহাদের বিশেষ কিছু থাকে না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় দলাদলি হাঁকাহাঁকি করিয়া বর্ণলেশহীন ঝিমাইয়া-পড়া জীবনটাকে মাঝে মাঝে একটু উত্তেজনায় চাঙ্গা করিয়া লইতে হয়। ইঁহারাই অবশেষে কুখ্যাত 'গ্রাম্য-দেবতা' হইয়া উঠেন। বাঙলার বহু দুর্ভাগ্যের মূলে রহিয়াছেন ইঁহারা। ইঁহাদের কূটবুদ্ধির প্রাখর্য্য ও নষ্টামির অত্যুৎসাহ দেখিয়া মনে কৃপাই জাগে। অলস কর্ম্মবিমুখতার সুযোগ না ঘটিলে হয়তো তাঁহারাও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন, কর্ম্মশক্তির এই বিপুল অপচয় না ঘটিলেও পারিত।

ইংলণ্ডে একটা প্রবাদ আছে যে, ও-দেশের কনিষ্ঠ পুত্রগণ ইংলণ্ডের ভাগ্যবিধাতা। সে-দেশের উত্তরাধিকারনিয়মে জ্যেষ্ঠপুত্রেরই পিতার সর্ব্বস্ব করতলগত হয়। কনিষ্ঠগণ তাই সংসারযুদ্ধে বীরবিক্রমে আপনাদের ভাগ্য গড়িয়া লয়, প্রসঙ্গতঃ দেশের ঋদ্ধিও তাহাদেরই হস্তে প্রচুর হইয়া উঠে। আমাদের দেশে আবার গোদের উপর বিষফোড়া। একে তো উত্তরাধিকারে সাম্য, তাহার উপর এই একান্নবর্ত্তিতা। সকলেরই আর খাটিয়া খাওয়ার দুশ্চিন্তাও করিতে হয় না। এক-আধজন দৈবাৎ যদি বা নূতন পথের বিপদকে তুচ্ছ করিয়া উন্নতির দিকে ধাবিত হয়, অমনি বাকী সকলে তাহার কাছায় ধরিয়া মারে টান। পত্রে পত্রে আশীর্ব্বাদ শুভাকাঙ্ক্ষাদির মিথ্যা ভূমিকা করিয়া কর্ত্তব্যের বড় বড় তালিকা প্রেরণ করিতে থাকেন সেই শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়গণ। অর্থে সামর্থ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনের বৃথা চেষ্টায় অনেক সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়, অনেক প্রতিভা উদয়ের পথেই রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ব্যক্তিত্ববিকাশের ও প্রতিভার উন্মেষের পথে এরূপে আজ একান্নবর্ত্তী পরিবার মহা অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এদিকে পাশ্চাত্যের যন্ত্রসভ্যতার প্রবল সংঘাত লাগিয়াছে আমাদের জীবনে। অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবী নূতন যুগের অনিবার্য্য আনুষঙ্গিকহিসাবে পরিবারে পরিবারে, মানুষে

মানুষে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তুলিয়াছে ঘোর ব্যবধান। ঠিক এমন দিনে প্রাচীন একান্নবর্ত্তিতা-প্রথাটি যেন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে, উহার জীর্ণ কাঠামো প্রগতিশীল মানুষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্বে আবার প্রথাটির যাহা কিছু সার্থকতা তাহাও যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। পরিবারে সে আদর্শ নাই, শাসন আছে কিন্তু নাই সে মান্যমানতা; শৃঙ্খলা নাই, আছে কেবল শৃঙ্খল। পিতাও পুত্রকে আজ সম্পত্তির মত বিবাহাদি ব্যাপারে ক্রয়বিক্রয় করেন, উপার্জ্জনের অংশ-আদায়ে গলায় দড়ি দিয়া নির্ম্মমতা-প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন না।

তাই বলি একান্নবর্ত্তী পরিবার আজ লুপ্ত হইয়াছে। কোথাও কোথাও তাহার স্থলে একপ্রকার যৌথ জীবনযাত্রাপদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। ইহা কিন্তু আধুনিক মেস হোষ্টেলেরই পারিবারিক সংস্করণ। তহবিল ভিন্ন রাখিয়া ভিন্ন রুচির বিভিন্ন কতকগুলি লোক একত্র বাস করে। ইহাতে হিতের চেয়ে অহিতই বেশী, সুখের চেয়ে অসুখই ঘটিতেছে অধিক। জটিলতা, সঙ্কীর্ণতা, হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি নানা অভিশাপ এরূপ যৌথ-জীবনকে বিষময় করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বলি এই ছলনারও আর প্রয়োজন নাই। বিশ্বকবির অতিবাঞ্ছিত প্রার্থনা যখন সফল হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্গমায়ের স্নেহাঞ্চল ছাড়িয়া বাঙালী যখন একান্ত লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আর মায়া বৃথা, অতীতের ছায়া ভূতের মত যেন আমাদের অনুসরণ না করে। অনাগতদিনের ভাঙা-গড়ার লীলায় যেরূপ পরিবারপ্রথা নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমরা যেন প্রস্তুত থাকি।

জীবসেবাই শিবসেবা

রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শে বিচিত্র এই বিশাল জগৎ আপনা হইতেই উদ্ভূত হয় নাই। ইহার অস্তিত্বের মূলে পরমকারুণিক, কল্যাণময়, প্রজ্ঞাবান্ এক স্রষ্টা আছেন। ইনি ভগবান্। ভগবান্ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া ইহার বাহিরে স্বর্গনামক কোন স্থানে অবস্থান করেন না। বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি অপ্রকাশরূপে বিরাজ করিতেছেন। সাধক নীলকণ্ঠ সত্যই বলিয়াছেন,—

"সকল রূপে রূপ মিশায়ে আপনি নিরাকার,
হরি তুমি বিশ্বরূপে সকল রূপের মূলাধার।"

এই শিক্ষাই আমাদের চিরদিনের শিক্ষা। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" (ঈশ্বর এই সব-কিছুকেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন)—ইহাই আমাদের উপনিষদের বাণী। উপনিষদ্ আরও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে সামান্য একটি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রহ্মময়

("আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ")। এই পরমসত্য যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই সত্যকার জ্ঞানী। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন—যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পান এবং সব-কিছুকেই আমার মধ্যে দেখিতে পান, আমি তাঁহাকে প্রনষ্ট করি না এবং তিনিও আমাকে প্রনষ্ট করেন না ("যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র, সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। অহং তং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥")।

নিখিলসৃষ্টিকে যিনি এইভাবে দেখিতে শিখিয়াছেন, নিঃসন্দেহে তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন ; তিনি তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ। এই সিদ্ধি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। দৃষ্টির এই পরিধিসীমাকে যিনি সঙ্কুচিত করিয়া শুধু মানুষে নিবদ্ধ করিতে পারেন, সাধকরূপে তাঁহারও আসন উচ্চে। মানুষমাত্রকেই ভগবানের প্রতীক জ্ঞান করিয়া তাহার সেবাতেই যদি তিনি নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করেন, ভগবানের প্রসাদ তিনি লাভ করিবেন ; কারণ, মানবসেবা তাঁহার প্রত্যক্ষ সাধনা হইলেও তাহা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরসাধনা। কবি নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—

"সাধনা নিষ্কাম ধর্ম্ম লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,
সাধনার একনীতি বিশ্বজনহিত।"

লক্ষ্য পরমব্রহ্ম—সত্য ; কিন্তু সাধনা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া নহে, নিষ্কাম-নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বজনহিতেই তাহার প্রকাশ। ইহাই সাধনার, অন্যতম নহে, একমাত্র নীতি।

জীবপ্রেমের সার্থকতার ইহা দার্শনিক বিচার। কিন্তু অন্যবিচারেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মানুষ সামাজিক জীব ; এই সমাজবদ্ধতাই তাহার প্রকৃতিসঙ্গত। পারস্পরিক কল্যাণেই সমাজের ভিত্তি। এখানে কাহারও আত্মকেন্দ্রিক হওয়া চলে না। সমাজ বলিতে আমি দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের খণ্ডবিচ্ছিন্ন সমাজ বুঝিতেছি না ; বুঝিতেছি মানবসমাজ। দেশের বা কালের প্রকৃতি-অনুসারে সমাজ-প্রকৃতির কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মানবজীবন-সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মৌলিক নীতি আছে, যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। এখানে সমাজে সমাজে জাতিভেদ নাই। এই বিরাট্ অখণ্ড মানবসমাজ-সম্বন্ধেই ভারতীয় ঋষি একদা বলিয়াছেন—

"সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ ॥"

(সকলের মঙ্গল হউক, সকলে নীরোগ হউক, সকলের দৃষ্টি শুভ হউক, কেহই যেন দুঃখ না পায়।) এমনি পরমউদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জনকল্যাণসাধন প্রত্যেক সামাজিক মানুষের ধর্ম্ম। সমাজ শুধু মানুষের সমষ্টি নহে—সিন্ধুতটে স্তূপীকৃত বালুকণা নহে।

সমাজ একটি পূর্ণবিকশিত শতদলপদ্ম—ইহার প্রতিটি দল আপন ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, কিন্তু সম্পূর্ণ পদ্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে। আবার সম্পূর্ণ পদ্মটি আপন বৃহত্তর বৈশিষ্ট্যে মহিমময়, কিন্তু ঐ দলগুলির অঙ্গিরূপে। মানুষের সহিত সমাজের এবং সমাজের সহিত মানুষের সম্পর্ক এইরূপ। সুকুমার বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস্য বিকাশেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বিকাশ সম্ভব করিয়া তোলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী মানুষটি। তাহার সুখে যদি সুখী হইতে পারি, আপন দুঃখকে সুখ বলিয়া মানিয়া তাহার দুঃখে দুঃখী হইতে পারি এবং তাহা দূর করিতে প্রয়াসী হই, সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া যদি তাহার কল্যাণসাধনকেই জীবনের মহত্তম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি—আমার মানবতার তখনই হইবে বিকাশ। এই চেতনা যদি সমাজের প্রতিটি নরনারীর মনে জাগিয়া উঠে, মানুষ ও দেবতার পার্থক্য লুপ্ত হইয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাব মানবজীবনের উপর অত্যন্ত অধিক। এই কারণেই বোধহয় প্রাচীন মনীষিগণ জীবের মধ্যে শিবের অবস্থিতির কথা জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের অমৃতরসে কঠোর কর্ত্তব্য কোমল হইয়া পড়ে এবং যাহা তপস্যার মত আয়াসসাধ্য তাহা অনায়াসসাধ্য, এমন কি শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক হইয়া যায়। মানুষকে যদি শুধু বলা হইত—

“আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী ’পরে ;
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে” (কামিনী রায়)

নিতান্ত নীতিবাক্যের মতই শুনাইত। তাই মানবতত্ত্বজ্ঞ পরমসাধক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মানুষের সহজাত ধর্ম্মবোধকে আহ্বান করিয়া শুনাইলেন—

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

———

সহযোগিতা ও সঙ্ঘশক্তি

মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একদা অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশের সমাজে লক্ষ্যহীনভাবে এই অসহযোগ বস্তুটা সঙ্ঘশক্তিকে বহুপূর্ব্বেই বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে।

অথচ এমন এক কাল ছিল যখন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবনের অসংখ্য ক্রিয়াকলাপের প্রতিষ্ঠাই ছিল সকলের সহযোগিতার উপর। এদেশের লোক ‘একঘরে’

হওয়াটাকে এই জন্যই চূড়ান্ত শাস্তি বিবেচনা করিত। আজ সে কাল আর নাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ আসিয়াছে, সমাজজীবনে যেন বহু পূর্ব্বেই আণবিক বোমার বিকেন্দ্রীকরণ সমাধা হইয়া গিয়াছে। মানুষ এখন একা, নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক।

ইহাতে আক্ষেপের কিছু না থাকিতে পারে। কিন্তু জীবন যে নিস্পন্দ হইয়া আসে; সহযোগিতা ভিন্ন প্রাণের বিচিত্র ছন্দ লয়ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এক হিসাবে আধুনিক জীবন সেই নিঃসঙ্গ নিশ্ছন্দ জড়ত্বের প্রতিই ধাবিত হইতেছে। কিন্তু বাঁচিতে হইলে সহযোগিতা চাই, কেননা ইহাই জগতের অমোঘ নীতি।

এই যে আকাশের অনন্ত নক্ষত্রসজ্জা আর বিশ্বপ্রকৃতির এই অসীম বৈচিত্র্য, কে তাহা ধারণ করিয়া রাখিয়াছে? সহযোগিতা। একে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া, প্রত্যেকে অপরের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া মহাশূন্যে গতির মধ্যেও সৃষ্টিস্থিতি সম্ভব করিয়াছেন। নিম্নে ধরাতলে সূর্য্যতাপে জলবাষ্প, জলবাষ্পে ঘনঘটা, বর্ষণে নদীধারা, আর নদীসিঞ্চিত এই বসুন্ধরা। একের সহযোগে অন্যের বিকাশ। সকলের বিকাশে ধন্য জগতের বিচিত্র-বিস্ময়।

জীবনেও প্রকট একই লীলা। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। যদি তাহাই হয়, তবে আদর্শহিসাবে সহযোগিতার উপযোগিতা বিশেষ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ক্রিয়াকর্ম্ম অনেকের সহযোগে সার্থক হইয়া উঠে; এককে তাহা সম্ভব হয় না। সাধকমাত্রেরই উত্তরসাধক আছে, আছে মন্ত্রদ্রষ্টা গুরু। বিজ্ঞান, দর্শন, তত্ত্ববিদ্যা, সাহিত্যকলা—সব-কিছুরই সকল কীর্ত্তি পরস্পরের সাহায্যে গঠিত। বস্তুতঃ সঙ্ঘশক্তির ন্যায় শক্তি নাই। সংহতি দুর্ব্বলতা-সংহারক। ক্ষুদ্র বারিকণা—ব্যষ্টিতে তাহা দুর্ব্বল; সমষ্টিতে তাহাই আবার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে কঠিন শিলাস্তর, গড়িয়া তোলে মহাসাগর। তেমনি দীনহীন মানবসঙ্ঘও জগতের বহু দুঃসাধ্য বস্তুকে যুগে যুগে অবলীলায় সাধন করে। ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া যায়, পরাধীন স্বাধীন হয়, পতিত হয় জয়োদ্ধত উন্নতশির।

আবার এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে অশেষ ব্যক্তিগত নিপুণতাও সহযোগিতার অভাবে নিতান্ত ব্যর্থ। এযুগের যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে সেইজন্যই সুশৃঙ্খল সহযোগিতার উপর এত বেশী গুরুত্ব। ব্যক্তিগত বীরত্বের সেখানে সার্থকতা ততটুকুই মাত্র, যতটুকু সে সমবেত স্বার্থের অনুকূল। এক একটা খণ্ডযুদ্ধে অমিত শৌর্য্য দেখাইয়া অনেকেই হয়তো আপন বীরত্বমহিমা প্রচার করিতে পারিত। কিন্তু যুদ্ধ আজ আর লোক-দেখানো বস্তু নয়, সমবেত সাফল্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন কোনপ্রকার বিচ্ছিন্ন বীরত্বের অবকাশ ইহাতে নাই। কারণ, সঙ্ঘবদ্ধতাই শক্তির নিদান, সহযোগিতাই সংহতির ভিত্তি। একথার সত্যটুকু খেলাধুলায় পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রমাণ হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক বিজয়ী দলের জয় দেখি সহযোগিতারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিজিত দলের মধ্যে হয়তো স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক খেলোয়াড় বিজয়ীদের প্রত্যেকের তুলনায় শ্রেয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ভাল খেলিয়াও পরাজয় হয় সহযোগিতার অভাবে। আসল কথা, তিলে তেল আছে সত্য, কিন্তু একতিল একতিল করিয়া ভিন্নভাবে তাহা নগণ্য।

সঙ্ঘশক্তির উপযোগিতা তাহা হইলে অসামান্য। কিন্তু শক্তির উপযোগিতা বিচার করিতে হইলে স্বতঃই আর একটা প্রশ্ন উঠে। উহা প্রয়োগের কথা। মহৎ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলেই মাত্র সঙ্ঘশক্তি শ্লাঘ্য; অসাধু উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে তাহার আবার অকল্যাণক্ষমতাও অশেষ। তাই নিয়তই দেখা যায় দলে পড়িয়া মানুষ অধঃপতিত হয়; আবার দশচক্রেও ভগবান্‌কে ভূত বানাইয়া দেয়। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বহুপ্রকার দুষ্টকার্য্যের মধ্যেও সহযোগিতা ও সঙ্ঘশক্তির প্রশ্রয়।

তাহা ছাড়া, সঙ্ঘের মধ্যে ব্যক্তিতা বিসর্জ্জন দিয়া যে শক্তিলাভ, তাহা যে পূরাপূরিই লাভ একথাও সর্ব্বদা সত্য নহে। দশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে একের পক্ষে নিজস্ব মতামত ও বিচারবুদ্ধির অনেকটা পরিবর্ত্তন ও বর্জ্জন অনিবার্য্য। তাই কখনও কখনও লোকোত্তীর্ণ প্রতিভার যুগান্তকারী বুদ্ধি ও সঙ্ঘের শাসনে রুদ্ধ হইয়া যায়। সঙ্ঘশক্তির ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর অপকারিতা।

পল্লী-উন্নয়ন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটবড় অনেক লেখক বঙ্গপল্লীর অপরিসীম দুর্দ্দশায় অজস্র বিলাপ করিয়াছেন। অবস্থাটা শোচনীয় সন্দেহ নাই; তবে হাহাকারও নিরর্থক। মনে রাখা প্রয়োজন যে, একাল আর সেকালের মধ্যে পার্থক্যটা নিতান্ত অনিবার্য্য। অতীত যতই মধুর হউক না কেন, কালচক্র ঘুরাইয়া কিছুতেই তাহাকে বর্ত্তমানের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। বাঙলার পল্লীজীবনের যে সুখ ও বিশেষত্ব গত হইয়াছে, হয়তো তাহা যুগধর্ম্মের অমোঘ বিবর্ত্তনে চিরতরেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু ইহাই আলোচনার যোগ্য যে, নূতন অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পল্লীগুলিকে কিরূপে আবার প্রাণৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা প্রয়োজন আমাদের পল্লীসমস্যার বিভিন্ন দিক্। নহিলে প্রতিকারের কথা দূরে থাক, অন্ধের হস্তিপরিচয়ের ন্যায় সমস্যাটির স্বরূপই আমাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে।

বৃটিশ-শাসনের গোড়াপত্তনের দিন হইতে বাঙলার গ্রামগুলিতে চারদিক্ দিয়া ভাঙন সুরু হইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে বাঙলার পল্লীসমাজ এমন একটি অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাহাতে বর্ণবিভাগ ও শ্রমবিভাগ একই প্রথায় নিয়ন্ত্রিত হইত।

কিন্তু যেদিন হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল, সেদিন হইতে যুগপ্রাচীন এই সনাতন সমাজ-ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দিল। তাহার পর আসিল পশ্চিমের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবল বন্যা। পুরাতনের রোমন্থনকারী বাঙালী জাতি এ আঘাতের আকস্মিক আবির্ভাবটা প্রতিরোধ করিতে পারিল না। অসহায় তৃণখণ্ডের ন্যায় দলে দলে মধ্যবিত্ত বাঙালী ভাসিয়া গিয়া শহরে আশ্রয় লইল। এদিকে প্রাকৃতিক নিয়মে এবং স্থানীয় অভিশাপে বাঙলার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং উহারই আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক নানাপ্রকার প্রতিক্রিয়ায় বাঙলার ক্ষীয়মাণ পল্লী-সংস্থা একেবারে ধ্বসিয়া পড়িল। সেদিন হইতে বাঙলার পল্লীগুলি ক্রমেই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। সেদিন হইতে পল্লীজীবনের প্রাণস্পন্দন ক্রমে ক্রমে থামিয়া যাইতেছে।

বঙ্গপল্লীর আধুনিক দুরবস্থা তাহা হইলে বাঙালীর সর্ব্বৈব আদর্শচ্যুতির ফলই মাত্র নহে। বিলাসের ফাঁস পরিয়া বাঙালী আত্মঘাতী হইয়াছে ইহাও নিছক কাব্যকথা। প্রকৃতপক্ষে গত্যন্তর ছিল না বলিয়াই বাঙালীকে নগরের পথে অন্নের সন্ধানে ছুটিতে হইয়াছে। দেশময় অর্থনৈতিক যে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে পল্লীগুলির এই দুর্দ্দশা—একথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা যাইতে পারে।

যদি তাহাই হয়, তবে প্রতিকারের উপায় কি? উৎসন্ন এই গ্রামগুলির নিবিড় ছায়ায় যে বিপুল অন্ধতমসা জমাট বাঁধিয়া আছে তাহা দূর করিবার উপায় কি? শ্মশানের মত নিষ্প্রাণ এই বিস্তীর্ণ দেশের নীরব সন্ধ্যায় আজ শৃগাল-কুকুরের বীভৎস আর্ত্তনাদ। তুলসীতলায় প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, কীর্ত্তন, বাউল, আরও কত প্রকারের গ্রাম্য সঙ্গীত সন্ধ্যা-আকাশে আর প্রতিধ্বনিত হয় না। এক কথায়, বঙ্গপল্লীর জীবনদীপ একেবারেই নিভিয়া গিয়াছে। ইহার প্রতিকার কি?

এ-সম্বন্ধে একটা অতি সহজ সমাধান সম্প্রতি লোকমুখে বিশেষ প্রচার পাইয়াছে। ধুয়া উঠিয়াছে 'গ্রামে ফিরিয়া যাও'। কিন্তু সাধু প্রচার অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণগুলি অধিকতর শক্তিশালী। কেবল বড় বড় আদর্শের কথা এবং অতীতের আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগ—ইহার দ্বারা কখনও বুভুক্ষু জাতিকে গ্রামমুখী করা যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইহার জন্য চাই গ্রামগুলির পুনর্গঠন। জীবিকা-অর্জ্জনের সুবিধার্থ নানাপ্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠার ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি প্রণালী প্রবর্ত্তন করা হইলে স্বভাবতঃই মানুষ আবার পল্লীগুলিতে ফিরিয়া যাইতে পারে। অবশ্য নগরগুলি আর ভাঙিয়া চূরমার করিয়া দেওয়া যাইবে না। যন্ত্রসভ্যতার কেন্দ্রাতিগ্ শক্তি স্বভাবতঃই চাহিবে মানুষকে শহরের সঙ্কীর্ণ পঞ্জরে পুরিয়া লইতে। কিন্তু জাপান যেরূপ তাহার বিচিত্র শিল্প-প্রয়াস গ্রামে গ্রামে কুটীরে কুটীরে ছড়াইয়া দিয়াছে, আমাদের দেশেও যদি সেরূপ উৎপাদনব্যবস্থা সমগ্র দেশের

মধ্যে প্রসারিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে ঘরমুখো বাঙালী অন্ততঃ পল্লীর মায়া ত্যাগ করিয়া শহরের মুখে পা বাড়াইবে না। বর্ত্তমানে কল-কারখানার আকর্ষণে যে-সকল শ্রমজীবী শহরে আসিয়া ভীড় করিতেছে, তাহাদের নিবৃত্ত করিতে হইলে কৃষিকর্ম্মের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যন্ত্র ও রাসায়নিক সারপ্রয়োগে আজকাল বিপুল শস্যসম্ভার উৎপন্ন করা হইতেছে। বাঙলায় যদি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, দেশের লক্ষ্মীশ্রী আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। এবিষয়ে অবশ্য প্রতিবন্ধক অনেক আছে। কিন্তু সরকার মনোযোগী হইলে অচিরেই সেগুলিও দূরীভূত হইতে পারে। প্রচলিত উত্তরাধিকার-আইন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; উৎসাহী দেশবাসী ও সরকারের সহযোগিতায় নানাপ্রকার যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিতে হইবে গ্রামে গ্রামে। তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিপ্রয়োগ এদেশেও সম্ভবপর হইবে এবং তাহার ফলে আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালীকে আর গড্ডলিকা-প্রবাহে একমাত্র কেরানীবৃত্তির জন্য মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইবে না।

পল্লীজীবনের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সূত্রহিসাবে একটা মোটামুটি ইঙ্গিতই মাত্র করা হইল। এদিক দিয়া আরও বিশদ চিন্তা ও বিস্তৃততর পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া আরও একটা জিনিসের প্রয়োজন আছে। ইহা বস্তুতান্ত্রিক নহে, আত্মিক। যুগপ্রভাবে বাঙালীর জীবনমান স্বভাবতঃই একটু উর্দ্ধস্তরে উন্নীত হইয়াছে। তাহার সুখ-সুবিধা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারণাও ভাঙিয়া-গড়িয়া যুগোপযোগী হইয়া নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই আদর্শকে বিলাসিতার আদর্শ বলিয়া যতই নিন্দা করা হউক না কেন, পুরাতন সরল জীবনাদর্শ আর কিছুতেই বাঙালীমনের সহিত খাপ খাইবে না। তাই পল্লীগুলিতেও আধুনিক নাগরিক সুখ-সুবিধার কিছু কিছু পরিবেষণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্র, বেতার, ছায়াচিত্র এবং অনুরূপ অনেকপ্রকার শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রামগুলির মধ্যেও বিস্তারিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। রাস্তাঘাট, চলাচলের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত নানাপ্রকার পৌর-পরিকল্পনা গ্রামেও প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

তাই বলিয়া গ্রামগুলিকে পাশ্চাত্ত্য ছাঁচে নগরীর ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তরিত করার প্রস্তাবও ইহা নহে। আমাদের দেশেরই বিশেষত্বগুলিও ইহার সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। আসল কথা, মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান চাই সবার আগে। পেট পুরিয়া খাইতে পারিলে মনের আনন্দ আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং সকল সহজ আনন্দই উহার স্বাভাবিক খাতে আপনা হইতেই স্বচ্ছন্দে বহিয়া চলে। কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, পাঁচালী, কথকথা, কবিগান, তরজা প্রভৃতি যে-সকল বস্তু বাঙালীর একান্ত প্রাণের জিনিস, তাহা সুযোগ পাইলেই আবার বঙ্গপল্লীর আকাশ মুখরিত করিয়াও তুলিতে পারে। সামাজিক কার্য্যকলাপ, বারোয়ারী পূজা,

বার মাসে তের পার্ব্বণ আর কত শত যুগপ্রাচীন প্রথা আবার ফিরিলেও ফিরিতে পারে। এভাবে বাঙালীর পল্লী আবার জীবন ফিরিয়া পাইতে পারে।

উপসংহারে একটা কথা বিবেচনাযোগ্য। পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারটাকে আমরা যেন সখের কাজ বলিয়া না ভাবি। সাময়িক ছুটির অবসরে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া দুই-একটা সৎকার্য্য-সাধন বা দুই-একটা সংস্কারমূলক আন্দোলন নাড়া দিয়া আসা নিষ্ফল। দুই-একজন বড়লোককে গ্রামে যাইয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত করাইলেও যথেষ্ট ফল হইবে না। আসল কথা, এ ছোটখাট সংস্কারের কাজ নহে, ইহা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিশাল বৈপ্লবিক সংঘটন। একমাত্র এই পথেই বাঙলার পল্লী-উন্নয়ন সম্ভব।

ছাত্রের সাধনা

অধ্যয়ন ছাত্রের তপস্যা—চরিত্রবিকাশই তাহার সাধনার নিষ্কর্ষ। উপায় যেরূপই হউক, লক্ষ্য সর্ব্বত্রই মানবচরিত্রের পরিপূর্ণতা।

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি ও শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শৈশবে সেগুলি কোমল অঙ্কুরের ন্যায় মানুষের মধ্যে বিরাজ করে। কতকগুলি আবার অব্যক্ত অবস্থায় সুষুপ্ত থাকে। সযত্ন লালনেই মাত্র এগুলি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, অন্যথায় বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই শৈশবকাল হইতেই মানবসন্তানকে উপযুক্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিতে হয়। ছাত্রজীবনের প্রয়োজন ও আরম্ভের এইরূপেই হয় সূত্রপাত।

হস্তপদাদিসংযুক্ত বিশিষ্ট আকারের জীবমাত্রই মনুষ্যপদবাচ্য নহে। মানুষ হইতে হইলে চাই যুগপৎ কায়মনোবাক্যের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ। ছাত্রের সাধনা এই মনুষ্যত্বেরই সাধনা। পুরাকালে তাই ছাত্রগণ অধ্যয়নকেই একাগ্র তপস্যারূপে গ্রহণ করিলেও, দেহে মনে শ্রদ্ধায় ও বিদ্যায় পরিপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুগৃহ ত্যাগ করিত না।

বর্ত্তমানে অবশ্য সে আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আরও ঠিক করিয়া বলিলে বলিতে হয় আজকাল আদর্শেরই সর্ব্বৈব অভাব। এ যুগের ছাত্রও অধ্যয়নকে পূর্ব্বের তুলনায় হয়তো পরমতর তপস্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সে অধ্যয়নের লক্ষ্য কেবল পরীক্ষাপাশ মাত্র। অধীত বিদ্যাকে জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। এজন্যই আমাদের ছাত্রজীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময়ের নিষ্ফল অপচয়।

সে যাহাই হউক, ছাত্রের সাধনা বিকাশই বটে। সেজন্য অধ্যয়নই আবার যথেষ্ট নহে। অধ্যয়নের প্রয়োজন বিদ্যা-আহরণ। মনটিকে সুশিক্ষিত ও সুবিন্যস্ত

করিবার জন্য ইহার উপযোগিতা অশেষ; জগতের জ্ঞানভাণ্ডার, মনীষীবৃন্দের শতশতাব্দীব্যাপী সাধনার ফলশ্রুতিটুকু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জানিয়া লওয়ার সুযোগ ইহাতেই নিহিত। নিকটে না গিয়াও জগতের চিন্তানায়কদের সঙ্গলাভ, কানে না শুনিয়াও তাঁহাদের মনস্বিতার সারাংশ-সঞ্চয়—এসকলই অধ্যয়নের দ্বারা সম্ভব। এক কথায়, জ্ঞানসিন্ধুকে ক্ষণিকের মধ্যে গণ্ডূষে আহরণ করিয়া পান করিয়া লইবার উপায়ই যেন অধ্যয়ন।

কিন্তু পান ও পরিপাক বিভিন্ন প্রক্রিয়া—উহাদের ফলও ভিন্ন। অধীত বিদ্যাকে জ্ঞানে পরিণত করিয়া জীবনে গ্রহণই হইল মহত্তর সাধনা। তাহা ছাড়া বিদ্যা অপার, জীবন হ্রস্ব, বিঘ্নও অগণ্য—তাই অধ্যয়নেও নির্ব্বাচন প্রয়োজন। নচেৎ গ্রন্থকীটের ন্যায় জগতের যাবতীয় বৃহৎ বৃহৎ মহাভারত ও বৈবর্ত্তপুরাণগুলি এফোঁড় ওফোঁড় ভেদ করিয়া গেলেও নির্ব্বোধ পাঠকের কীটত্ব বিনষ্ট হইবে না। অন্ততঃ জ্ঞান তাহাতে হয় না, পড়িয়া পড়িয়া বড় জোর উৎকেন্দ্র Don Quixote পর্য্যন্ত হওয়া যায়। অতএব বিস্তৃততর অধ্যয়নের পূর্ব্বেই মনটিকে প্রস্তুত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ছাত্রজীবনের প্রথম পর্ব্বে ইহাই সাধনার প্রথম স্তর হওয়া উচিত। মানসিক শৃঙ্খলা, বিচারশক্তি, সর্ব্বোপরি সুরুচি—প্রথম পর্য্যায়ে এইগুলিই অর্জ্জন করিবার প্রয়াস থাকা চাই।

কিন্তু দেহ ভিন্ন মনের আশ্রয় নাই। সেজন্যই গ্রীসদেশে একদা দেহচর্চ্চা সভক্তি আচারের ন্যায় মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। ভবিষ্যতে কি হইবে জানি না; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেবল মস্তিষ্ককে পরিপুষ্ট করিয়া সমগ্র দেহকে শীর্ণ রাখার ব্যবস্থাই চলিতেছে। মনের সহিত দেহেরও চাই পরিপূর্ণ বিকাশ। ছাত্রের সাধনার ইহাও অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

দেহমনের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইল, তাহাতেও কিন্তু একটি কথা সুপরিস্ফুট হইল না। একথা চরিত্রবিষয়ক। ব্যাবহারিক জীবনে দেখি অগাধ বিদ্যা এবং অটুট স্বাস্থ্যসত্বেও মানুষ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। নিছক আদর্শের বিচারে যতই সাধু হউক না, মানুষ বাস্তবের কষ্টিপাথরে যদি উপযুক্ত পরিগণিত না হয় তবে তাহার কায়মনোবাক্যের যাবতীয় উৎকর্ষই নিষ্ফল। বাস্তব জীবনের সার্থকতার জন্য চাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিতা, কঠোর কর্ত্তব্যবোধ, নিয়ম ও সময়নিষ্ঠা এবং অনুরূপ বহুতর ব্যাবহারিক গুণ। এসকল গুণের সমন্বয়েই মানুষের চরিত্র সুগঠিত হয়। ছাত্রের সাধনায় এই চরিত্রগঠন, তাহা হইলে, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলিবার ইহাই রহিল যে ছাত্রজীবন জীবনের বপনকাল। তাহার সাধনার সিদ্ধি আসে পরবর্ত্তী জীবনে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে। কর্ষণ ও বপন সুসময়ে সুচারু-ভাবে সমাধা হইলেই তো শস্যসম্ভার সুপ্রচুর হইয়া উঠে। এই সত্যটি স্মরণ রাখিয়া ছাত্রের সাধনা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। তবে কর্ম্মেই মানুষের অধিকার, ফলদান

বিধাতার কাজ। সৎকার্য্যের শুভদা শক্তির উপর বিশ্বাসই রাখা চলে, কিন্তু ফলের জন্য একান্ত আগ্রহে লালসা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া নিষ্কাম ব্রত-উদ্‌যাপনই ছাত্রের শ্রেষ্ঠ সাধনা বিবেচনা করি।

নারীশিক্ষা ও গৃহধর্ম্ম

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের সীমারেখা ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর মূলমন্ত্র হইল সাম্য ; বর্ত্তমান যুগে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। পুরুষের আধিপত্য বিস্তার করিবার দিন আজ শেষ হইয়াছে, কারণ মানুষ বুঝিয়াছে আধিপত্য হইতে সহযোগিতা শ্রেষ্ঠ। তাই স্ত্রীশিক্ষার প্রসার আজ সকল দেশেই বাড়িয়াছে, পুরুষের ন্যায় সেও শিক্ষালাভ করিতেছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সকল দেশে সমান নহে। যে দেশ যত উন্নত সেই দেশে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা তত বেশী। পরাধীন দেশগুলিই স্ত্রীশিক্ষাব্যাপারে বেশী রক্ষণশীল।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু বিগত দুইশত বৎসর সে পরাধীন ছিল। পরাধীনতা, যে-কোন দেশের পক্ষে, সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দশার মূল। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উন্নতি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভিন্ন সম্ভব নহে। দুইশত বৎসর ধরিয়া ইংরেজ আমাদের শিক্ষিত করিবার বিশেষ কোন চেষ্টাই করে নাই। যে দেশে পুরুষদেরই যথোপযুক্ত শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে স্ত্রীশিক্ষার প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। অবশ্য ইহার জন্য আমরা নিজেরাও অনেকটা দায়ী। আমাদের রক্ষণশীল মনোভাব স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকে বার বার বাধাগ্রস্ত করিয়াছে। বার বার নানাপ্রকার পৌরাণিক উদ্ধৃতি দিয়া স্ত্রীশিক্ষাকে আমরা গৃহধর্ম্মের পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। পরাধীনতা এবং রক্ষণশীলতার ফলেই আজ আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার এমন শোচনীয় অবস্থা।

ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙলাদেশের অবস্থা বিচার করিলেই আমাদের দেশের দুর্গতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। বাঙলাদেশের নারীশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার যে চিত্র আমরা পাই, তাহা জগতের যে-কোন সভদেশের গ্লানিস্বরূপ। ১৯৪১ সালের লোকগণনায় বলা হইয়াছে যে বাঙলায় শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর মোট সংখ্যা হইল শতকরা ১৬'১ এবং তাহার মধ্যে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা শতকরা ২'৬১। এই ২'৬১ জনের মধ্যে অধিকাংশই প্রাথমিক স্তরের। মাধ্যমিক স্তরের সংখ্যা ৮,০০০ এবং উচ্চশিক্ষার স্তরে মাত্র ২,৬০০। অবিভক্ত বাঙলার নারীর সংখ্যা দুই কোটি

পঁচাশি লক্ষ। কিন্তু ইহার মধ্যে এই ২,৬০০ শিক্ষিতা নারী লইয়াই সমাজপতিরা ব্যতিব্যস্ত। বাঙলাদেশের রক্ষণশীল পুরুষদের অভিমত এই যে, বাঙলাদেশের শিক্ষিতা নারীরা মোটেই গৃহকর্ম্মের উপযুক্ত নহেন। স্নো, পাউডার, লিপষ্টিক এবং ফ্যাশান করিয়া শাড়ী পরা এবং রকমারি অলঙ্কার নির্ব্বাচন করাই ইহাদের একমাত্র কাজ। সাংসারিক কর্ম্ম ইহারা সর্ব্বদাই অবহেলা করেন এবং থিয়েটার-সিনেমা লইয়াই বেশী মাতিয়া থাকেন। কিন্তু এইসকল অভিযোগ মোটেই প্রমাণসহ নহে। প্রসাধন-বিলাস এবং অলঙ্কারপ্রিয়তা অশিক্ষিতা এবং অর্দ্ধশিক্ষিতা নারীদের মধ্যেও প্রচুর। আর সাংসারিক কর্ম্মদক্ষতা বেশী নির্ভরশীল পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপরে। সাংসারিক অকর্ম্মণ্যতা ধনীর দুলালীদের মধ্যেই বেশী পরিমাণে দেখা যায়। আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কখনই শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা নহে। ইহাতে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে, যাহা একমাত্র সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনেই দূর করা সম্ভব।

আর একটি কথা প্রায়ই শুনা যায় যে, শিক্ষিতা নারী প্রাচীন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। আদর্শ কোন অবিনশ্বর, অচল বস্তু নহে—আদর্শ নির্ভর করে যুগ-পরিবেশের উপর। প্রাচীন যুগের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তি তৈয়ারী করিয়াছিল প্রাচীন আদর্শকে; আজ সেই আদর্শকে বর্ত্তমানের কষ্টিপাথরে বিচার করিতে হইবে। না হইলে কেবল পুঁথিগত প্রাচীন আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিলে জীবনসত্যকেই অস্বীকার করা হইবে। বাঙলাদেশের ২,৬০০ শিক্ষিতা নারী যদি প্রাচীন আদর্শের অন্তরায় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাকী দুই কোটি চুরাশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারিশত নারীই কি প্রাচীন আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন? ইহারা তো তথাকথিত গৃহধর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে বাঙলার উন্নতি হইয়াছে কতটুকু? শিক্ষার অভাবে বাঙলার তরুণীদের স্বাস্থ্য এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের আসল ব্যাধি হইলে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল চিন্তাধারা এবং সামাজিক প্রথা।

নারীশিক্ষার আশু প্রয়োজনের বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ আজ থাকা উচিত নহে। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের জীবনের জটিলতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থের প্রয়োজন আজ বেশী অনুভূত হইতেছে—এতদিনের পরনির্ভরশীলা নারীকে আজ তাই স্বাবলম্বী হইতে হইবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নারীরা নানা কর্ম্মক্ষেত্রে অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা দেখাইয়াছে। ভবিষ্যতেও তাহাকে বার বার পুরুষের কাজে সহায়তা করিতে হইবে। কিন্তু এইসকলের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার। যে-শিক্ষা বর্ত্তমানে প্রচলিত, তাহা উপযুক্ত শিক্ষা নহে। কারণ, তাহা নারীকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলে না। বর্ত্তমান যুগে নারীকে বাহিরেও কর্ম্ম করিতে হইবে এবং

গৃহকর্ম্মও পালন করিতে হইবে। পুরুষ ও নারী উভয়ের সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতায় সংসাররথের চাকা চলিবে মসৃণভাবে। নারীশিক্ষার পদ্ধতি তাই এমন হইবে যাহা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, স্বাধীন চিন্তা এবং সংসারবন্ধনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে শিক্ষা দিবে। বাহিরের কর্ম্মজীবন অব্যাহত রাখিয়া যে শিক্ষায় গৃহ ও সংসাররচনা সুন্দর ও সুখময় হইয়া উঠিতে পারে, সেই নূতন আদর্শেই শিক্ষার সংস্কার সাধন করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক নারীর আশা ও আদর্শোপযোগী নহে। এই শিক্ষা নারীর ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাকে তথা জীবনকে কৃত্রিম করিয়া তোলে। তাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

স্বার্থান্বেষী পুরুষ নানা প্রকার গালভরা কথা বলিয়া প্রশংসা করিয়া নারীদের ভুলাইয়া রাখিতে চায়। তাই কথায় নারীতে দেবীত্ব আরোপ করে, কিন্তু কাজের সময় পশুর ন্যায় ব্যবহার করে। প্রসঙ্গতঃ বিধবা-বিবাহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অশেষ প্রতিকূল অবস্থার সহিত লড়াই করিয়া বিধবা-বিবাহকে আইনের চক্ষে মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ বহু বৎসর গত হইয়াছে, বিধবা-বিবাহ এখনও সমাজে মোটেই প্রচলিত হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী পুরুষেরা। নারীদের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের বৈধব্য-জীবনের কর্ত্তব্য এবং আদর্শসম্বন্ধে বহু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের বিবাহ করিতে দেওয়া হয় নাই, মৃতপতির প্রতি মহৎ প্রেমের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু বিধবা ভগ্নী এবং আত্মীয়াদের সহিত মানুষ অন্যদিকে করিয়াছে পশুবৎ ব্যবহার। নারীকে বলা হয়—তোমার ধর্ম্ম গৃহধর্ম্ম, তোমার ধর্ম্ম সতীত্ব; গৃহে থাক, সন্তান প্রতিপালন কর, সুচারুরূপে গৃহকার্য্য কর—ইহাই তোমার আদর্শ। নারীর আদর্শ গৃহধর্ম্ম—ইহা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু ইহাই একমাত্র আদর্শ নয়। নারীর স্থান ঘরে এবং বাহিরে—দুইস্থানেই। তাহার গৃহধর্ম্মপালনের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। সুশিক্ষা গৃহধর্ম্মপালনের অন্তরায় নহে, সহায়ক।

নারী কল্যাণময়ী এবং শক্তিরূপিণী। সুশিক্ষা নারীকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবে তাহার অগ্রগতির পথে। তাহার নারীসুলভ সুকোমল প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে নিষ্পেষিত না হইয়া যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুশিক্ষা তাহার জীবনে আনিবে দীপ্তি, আনিবে পারিবারিক শান্তি, তাহাকে করিবে স্বাবলম্বী আর তাহার জীবনে আনিবে সরল, সবল গতি।

স্বাবলম্বন

মানুষ এ জগতে একা আসে একা যায়। যতদিন সে বাঁচিয়া থাকে, ততদিনও আত্মশক্তিই তাহার প্রধান অবলম্বন। শারীরিক দিক্ দিয়া যেমন, মনের দিক্ দিয়াও তেমনি 'বলং বলং বাহুবলম্'—স্বাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ বল।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্ধ নির্ব্বাচনে ইহজীবন যোগ্যেরই মাত্র ভোগ্য। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবীতে ঘটিতেছে বিচিত্র বিপ্লব। যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে ; যাহারা শক্তিমান্, তাহারাই সংগ্রামে জয়ী হইয়া টিকিয়া থাকিতেছে। ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন লীলা। অস্তিত্বরক্ষার জন্য এই সংগ্রামে কেহ কাহারও সহায় নহে। বরং একে অপরের সহিত কঠোর প্রতিযোগিতালিপ্ত বলিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি অনেকটা শত্রুভাবাপন্ন। এমন সংসারে তাই স্বাবলম্বন ভিন্ন বাঁচিবার উপায় নাই—আত্মশক্তি ব্যতিরেকে অন্য কিছুই অবলম্বন নাই।

শরীর যে ব্যাধিমন্দির তাহাতে আর সন্দেহ কি? অথচ এই শরীরটাকে আশ্রয় করিয়াই তো জীবন। প্রত্যেক মানুষ ইহাকেই টিকাইয়া রাখিতে যেন অনবচ্ছিন্ন সংগ্রামে রত, তাহাতেও দেখিতে পাই আত্মশক্তিরই একান্ত আশ্রয়। এই আকাশ, এই বাতাস, এই জল আর এই অনন্ত প্রকৃতি—সর্ব্বত্র অসংখ্য রোগজীবাণু ছাইয়া আছে। অনুক্ষণই তাহারা দেহে প্রবেশ করে, দেহের প্রতিরোধশক্তিই আবার তাহাদিগকে নির্ব্বিষ করিয়া শেষ করিয়া দেয়। পীড়ায় ঔষধপ্রয়োগ হয় সত্য কিন্তু এক্ষেত্রেও মানুষের স্বকীয় জীবনীশক্তিই অন্তিম যুদ্ধের জয়পরাজয়ের জন্য দায়ী। মোট কথা, প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের দেহটি সর্ব্বদাই স্বাবলম্বী।

উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, স্বাবলম্বনই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। শুধু তাহাই নহে, আত্মবিকাশেরও ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ।

বস্তুতঃ কৃষ্টি ব্যতীত বিকাশ নাই। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির পুষ্টির জন্যও তাই জীবনসংগ্রামে তাহাদের প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু অপরের উপর নির্ভর করিলে আপনার শক্তিগুলির আর পরিচালনা হইবে কি করিয়া? পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির উন্নতি অসম্ভব। পরশ্রমজীবীর বিলাসলালিত দেহটি যেমন অকর্ম্মণ্য অথর্ব্ব, পরাশ্রয়ী মানবের বৃত্তিগুলিও তেমনি ঘুণে ধরিয়া, মরিচা পড়িয়া ক্রমেই নষ্ট হইয়া যায়। একমাত্র স্বাবলম্বী ব্যক্তিই এ বিষয়ে ভাগ্যবান্। আপনার শক্তিকে আশ্রয় করিয়া, পরিচালনা করিয়া সে উত্তরোত্তর আপনারই নব নব বিকাশ সম্ভব করিয়া তোলে।

তথাপি অধিকাংশ লোকে যে বৃথা স্বাবলম্বন পরিহার করিয়া চলে, তাহার কারণ কিন্তু কেবল আলস্য নহে। অনেক সময় আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে ইহার মূলে। আত্মবিশ্বাসের অভাবে দেখা দেয় ভীরুতা, কোন কার্য্যে একাকী ব্রতী

হইবার সাহস নষ্ট হইয়া যায়। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অবিচলিত নীতিনিষ্ঠা এবং এইপ্রকার অন্য সকল গুণের অভাবে কেহ স্বাবলম্বী হইতে পারে না। বাস্তবিক মানবচরিত্রের গুণদোষগুলি এমনভাবেই সম্পর্কিত যে উহাদের ক্রমনির্ণয় অসম্ভব। স্বাবলম্বনে অন্যতর গুণের যেমন বিকাশ, অন্যতর গুণের দ্বারাই আবার স্বাবলম্বনশক্তিরও উদ্ভব। তাই বলিয়া কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে স্বাবলম্বন দেখা দিবে, কিসের অভাবে তাহার বিকাশ কিছুতে সম্ভব হইবে না, তাহাও আবার নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। তবে এইটুকু মাত্র নিঃসংশয় যে আত্মপ্রত্যয়ই কর্ম্মশক্তির উৎস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সাফল্যের নিদান এবং স্বাবলম্বন উহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মসাধনার মহত্তম পথ।

স্বাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেই যে জীবনযুদ্ধে জয়ী, তাহা অবশ্যই সত্য নহে। আসলে জয়পরাজয়ের প্রশ্নটাই জীবনে বড় কথা নহে, তৃপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট বস্তু। স্বাবলম্বনে আছে সেই বহুবাঞ্ছিত তৃপ্তির অমৃত-উৎস। স্বকীয় চেষ্টায় জয়লাভ করিলে যেমন আনন্দ, চেষ্টাসত্ত্বেও পরাজয়ে তেমনি জ্বালা নাই। পক্ষান্তরে পরের কৃপায় সাফল্যলাভের গ্লানি আছে, মহিমার কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

অতএব স্বাবলম্বন মানবচরিত্রের এক মহৎ অভ্যাস। অভ্যাস, কেননা ইহা কেবল নীতির কথা নহে, আচরণেরও কথা। নীতির দিক্ দিয়া অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহার উপযোগিতা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পালন করিতে পারেন না। বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়াও মানুষ যে চরিত্রের মধ্যে সদ্‌গুণ বিকশিত করিতে পারে না তাহার কারণ হইল আবাল্য অনভ্যাস। তাই বাল্যেই স্বাবলম্বন শিক্ষা করা প্রয়োজন। কেবল পুঁথি পড়িয়া তাহা হয় না, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রবৃহৎ যাবতীয় আচরণেই যথাসম্ভব আত্মনির্ভরতা অভ্যাস করিতে হয়। তবেই শেষ পর্য্যন্ত পরমুখাপেক্ষিতা আর প্রকৃতির মধ্যে দৃঢ়মূল হইতে পারে না। নিজের কাজ নিজের হাতে করিতে করিতেই জাগে আত্মপ্রত্যয়। দশজনে যাহা পারে প্রত্যেকেই তাহা পারে—এই সত্যই ক্রমে মনে গ্রথিত হইয়া যায়। আত্মশক্তির উদ্বোধন এইরূপেই হয়, স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়া ঘটে চরিত্রের নবনবীন বিকাশ।

সাধারণ পাঠাগার

গ্রন্থাগারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার এবং তৎসন্নিহিত পাঠাগারের প্রবর্ত্তন সেরূপ প্রাচীনকালের কথা নহে। ভারতবর্ষে বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সুবৃহৎ গ্রন্থসঙ্কলন ছিল, তাহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। শুধু দেশবাসীই নহে, বিদেশীর পক্ষেও নালন্দায় আসিয়া অধ্যয়ন করার যে কোন বাধা ছিল না তাহার প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক

হিউ-এন্থ-সাঙের বিবরণেই রহিয়াছে। নালন্দার উদাহরণ সেকালের পক্ষে অসাধারণ ঘটনাই বটে। উহার সমসাময়িক কালে পৃথিবীর অন্যত্র সাধারণের ব্যবহার্য্য খুব বেশী গ্রন্থশালার সংবাদ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালে সাধারণ পাঠাগার বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সাম্প্রতিক প্রতিষ্ঠানই বটে।

পৃথিবীর প্রতিদেশে আজ এরূপ গ্রন্থাগারের বহুল প্রচলন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ফ্রান্সের বিব্লিওথেক ন্যাশন্যাল, রোমের ভ্যাটিকান এবং এইরূপ আরও কয়েকটি গ্রন্থাগার আয়তনে ও উপযোগিতায় জগদ্বিখ্যাত। আমাদের দেশেও বিখ্যাত ইমপিরিয়্যাল লাইব্রেরী (বর্ত্তমানে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী), পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরী, কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদ্ লাইব্রেরী প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার রহিয়াছে। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রবর্ত্তন ও পরিচালনায় সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রুশিয়ার সমকক্ষ অন্য কোন দেশই নহে। গ্রন্থাগার সংরক্ষণ ও পরিচালনসম্বন্ধে আজকাল বিজ্ঞান-সম্মত অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমেরিকাই অবশ্য পথ-প্রদর্শক। প্রসিদ্ধ 'ডুওডেসিমেল' পদ্ধতি আমেরিকাতেই আবিষ্কার হয়।

সাধারণ পাঠাগার বর্ত্তমান সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। বিজ্ঞানের আজ কত শত যুগান্তকারী আবিষ্কার মানুষের অমেয় কল্যাণ তথা অকল্যাণ সাধন করিতেছে। একমাত্র সাধারণ পাঠাগারই দেখি অবিমিশ্র শুভ ধারণ করে। সত্য-শিব-সুন্দরের ইহা পীঠস্থান। এইখানে আসিলে মানুষের সকল প্রগল্ভতা স্তব্ধ হইয়া যায়। অফুরন্ত জ্ঞানের আর অপরিমেয় আনন্দের এই নীরব পারাবারে আসিয়া সকল চপলতা দূর হইয়া যায়। স্থির সাম্যে হৃদয় ভরিয়া উঠে। শুচিশুদ্ধ প্রগাঢ় একাগ্রতায় স্থানকালপাত্রের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া মানুষ বিশ্বমনের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারে।

গ্রন্থ যে গ্রন্থকার অপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কারণেই মহান্ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ আলাপ অপেক্ষা তাঁহার গ্রন্থনিবদ্ধ চিন্তাধারা অনেক বেশী উপকারী। এ-সকলই গ্রন্থের উপযোগিতার কথা। গ্রন্থাগার-সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের উদ্দেশ্য এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে, সকল সংসর্গ অপেক্ষা মহত্তম এই গ্রন্থাগারের পবিত্র পরিবেশ। নীরব শান্তিতে দেশবিদেশের এবং অতীতের ও বর্ত্তমানের সকল মনীষীর সহিত পরিচয়ের সুযোগ এইখানে। তাঁহাদের সাধনার নিষ্কর্ষটুকু সুবিন্যস্ত আকারে যে গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা হইতে জ্ঞানসুধা আকণ্ঠ পান করিতে পাই এই পাঠাগারে। উৎকৃষ্ট মানসিকতা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপরূপ সৌন্দর্য্যবোধ আর দুরূহ সমস্যার সমাধান লইয়া কত শত পুস্তক এখানে থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই যে-কেহ তাহা পাঠ করিতে পারে। সীমাবদ্ধ

ব্যক্তিগত আয়দ্বারা সাধারণ মানুষ ইচ্ছা থাকিলেও এত শত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারে না। সংগ্রহ করিলেও উহাদের সংরক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন যত্ন ও ব্যয়ের ব্যাপার। একটা মানুষের কখনই এতটা সাধ্য নহে। সাধারণ পাঠাগার মানুষের সকল শ্রম ও ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া জ্ঞানের পসরা আর আনন্দের অর্ঘ্যথালি সকলের তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কেবল ইচ্ছা ও অবসর থাকিলেই হইল—অধ্যয়নের সুযোগ সম্মুখেই মুক্ত।

অধ্যয়নবিষয়ে নির্ব্বাচনের সমস্যাও বড় গুরুতর। আজকাল সাধারণ গ্রন্থাগার সে সমস্যা সমাধানেরও দায়িত্ব লইয়াছে। শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের পরামর্শে পাঠকের আজ আর ধূলা বাছিয়া মুক্তা বাহির করিতে হয় না। অভীষ্ট ধারায় অভিজ্ঞ পরামর্শে অনায়াসেই অগ্রসর হওয়া যায়। তাহা ছাড়া আধুনিক সাধারণ পাঠাগারগুলির উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোথাও কোথাও এক একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার হইতে চতুর্দ্দিকে অভিনব পদ্ধতিতে পুস্তকাদি সরবরাহ করা হয়। মোটরবাহিত এক একটি চলমান পাঠাগার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। দূরাঞ্চলের অধিবাসিগণ তাহাতে আবশ্যকমত অধ্যয়ন ও গৃহে পাঠ করিবার জন্য পুস্তক লইতে পারে। সাধারণ পাঠাগার আবার শুধু যে পুস্তকই সরবরাহ করে তাহা নহে, দৈনিক ও সাময়িক সংবাদপত্র-সরবরাহও তাহাদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। সাধারণ মানুষ বড় জোর দুই-একটা সংবাদপত্র রাখিতে পারে। দেশবিদেশের বিভিন্ন সাময়িক ও দৈনিক পত্র রাখা একজনের পক্ষে অসম্ভব। সাধারণ পাঠাগার এই সমস্যার সমাধান। এইখানে আসিলে সকল অভাব মিটিয়া যায়।

সাধারণ পাঠাগারগুলি তাহা হইলে জাতির পরম সম্পদ্। লোকশিক্ষার পীঠস্থানরূপে তাহারা সর্ব্বজনের পূজা ও যত্ন পাইবার যোগ্য। দেশের মধ্যে এরূপ পাঠাগারের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। আমাদের জাতীয় সরকার এ-বিষয়ে অবহিত হইয়া তৎপর হইলে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতিমূলক কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

নিরক্ষরতা ও সমাজজীবন

এযুগে নিরক্ষরতা অতিবড় অভিশাপরূপেই পরিগণিত হয়। পুরাকালে মানুষের সমাজ ও জীবন যখন আজিকার ন্যায় এত জটিল ও কঠোর হইয়া উঠে নাই, তখন অক্ষরজ্ঞান অপরিহার্য্য ছিল না। এমন এক কাল ছিল যখন শিক্ষাদীক্ষা মানুষের মুখে মুখেই প্রচারিত হইত; তখন লোকশিক্ষা অন্ততঃ একান্তভাবে পুঁথিগত ছিল না। কথকতায়, গল্পে, গানে এবং নানাপ্রকার লৌকিক আমোদ-প্রমোদ ও

ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়াই তখন সাধারণের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারলাভ করিত। কিন্তু সেকাল আর একাল—অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

সুদীর্ঘ সে বিবর্ত্তনের ইতিহাস। কালে কালে এখন অবস্থাটা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে চর্ম্মচক্ষুটির অভাবও সহা যায়, কিন্তু অক্ষরপরিচয় না হইলেই নয়। এ গণতন্ত্রের যুগ। সম্ভবতঃ সাম্যবাদও খুব দূরবর্ত্তী নয়। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তাহার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে হয়, লড়িয়া আদায় করিতে হয় আপনার দাবী। আর দাবী ও দায়িত্ব যেহেতু আনুষঙ্গিক, তখন উভয় ব্যাপারেই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই জ্ঞানের প্রয়োজনেই সাধারণের পক্ষে অক্ষরজ্ঞান আজ অপরিহার্য্য।

রাজনীতি আজকাল আর রাজকীয় বিষয় নহে, ইহা সর্ব্বসাধারণের। অর্থনীতি আজ আর দুই একজন কৌটিল্যের নিশীথ চিন্তার বস্তু নহে, সাধারণের জীবনমরণের সহিত জড়িত বলিয়া সকলেরই ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা ছাড়া সমাজের আরও নানাপ্রকার ক্ষুদ্রবৃহৎ সূক্ষ্মজটিল সমস্যা রহিয়াছে যাহাদের সমাধান করিতে হইলে সাধারণের সচেতন সহায়তা আবশ্যক। এসকল কারণে এযুগে মানুষমাত্রকেই মোটামুটি লেখাপড়া জানিতে হয়। মানুষ একবার যখন সেই বাইবেল-কথিত নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়াছে, তখন অজ্ঞানতার আর নিস্তার নাই। চারিদিকে বিপুল অন্নবস্ত্রের সমস্যা, শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম; ইহার মধ্যে অন্ধ মানুষ কেবল খাবি খাইয়া মরিতেছে। কল্যাণের সন্ধানে উন্মত্ত বেশে বস্তুতন্ত্রী পৃথিবী অহর্নিশ সম্মুখে ধাবমান। এই দুর্ম্মদ গতির সহিত সমপদক্ষেপে চলিতে হইলে নিত্যনিয়মিত সমাজ ও সংসারের সংবাদ না রাখিলে নয়। নিরক্ষরতা তাই আজ শুধু শাপই নহে, অপরাধও বটে।

অপরাধ এইজন্য যে, আজিকার সমাজ একহিসাবে অতিশয় অপূর্ব্বভাবে গ্রথিত। তাহার স্বার্থ, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য বা বিপর্য্যয় এক ও অবিভাজ্য। একের সহিত দশের মঙ্গলামঙ্গল বিশেষভাবে জড়িত। কাজেই ব্যক্তিকে সঙ্ঘের প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে। আমার দুর্ভাগ্য লইয়া কপাল ঠুকিয়া আমি পড়িয়া থাকিব, এতটুকু স্বাধীনতাও বুঝি আজ আর নাই। কারণ, আমার সহিত যে অনেকের ভাগ্য জড়িত। অন্ধকার যে নিজেই শুধু কালো তাহা নহে, উহার ছায়াটাও কালো। সমাজের কোন অংশে তাই যদি আঁধার জমাট বাঁধিয়া উঠে, তবে অপর অংশের জ্যোতিটাও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। এইজন্যই নিরক্ষরতা অপরাধ।

একথা ব্যক্তির দিক্ দিয়া যেমন সত্য, সমষ্টির দিক্ দিয়াও তেমনি সত্য। রাজা, প্রজা, শাসক ও শাসিত—সকলেরই এ বিষয়ে কর্ত্তব্য রহিয়াছে। জগতের উন্নতিশীল জাতিগুলি একথা নিবিড়ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে এবং সেই কারণেই নিরক্ষরতা-মোচনে তাহাদের বিপুল প্রয়াস। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন,

জার্মানী, জাপান—বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্ত সম্মুখেই জাজ্বল্যমান। কেবল দুর্ভাগ্য আমাদের এই দেশের কথাই বেদনাদায়ক। পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যা এদেশে গভীর অন্ধতিমিরে নিমজ্জিত। স্বাধীন ভারতে নূতন সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন হইতে চলিয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষার কঠিন বুনিয়াদে বলিষ্ঠ জাতিগঠনই আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণের বিজ্ঞাপিত আদর্শ। কার্য্যতঃ তাহা সত্যে পরিণত হইলেই মঙ্গল। ইহাতে যত বিলম্ব হইবে ততই অনিষ্ট ও বিষময় সমস্যা বিস্তারলাভ করিবে। একথা বুঝিয়া সরকার ও দেশবাসী সমবেতভাবে নিরক্ষতা দূরীকরণে ব্রতী হইলেও মাত্র সমাজজীবনের পুনর্গঠনের প্রথম সোপান প্রস্তুত হইবে—ইহাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

পশ্চিম-বাঙলার ভবিষ্যৎ

র‍্যাডক্লিফ্ রোয়েদাদ অনুসারে অখণ্ড বাঙলার যে অংশটি পশ্চিম-বাঙলা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহার ভাগ্যের কথাই বলা হইতেছে। সুদূর অতীতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সজল স্নেহে, মেদুর পলিমাটি দিয়া গড়া এই বাঙলা। রাজনৈতিক বহু উত্থানপতনের নানাপ্রকার ভাঙাগড়া উপেক্ষা করিয়া এতকাল ইহা অবিচ্ছিন্ন ছিল। তাই উহার ভাবালু ভঙ্গপ্রবণতার কথা কাহারও দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে নাই। কিন্তু এই সেদিন স্বখাতসলিল প্রলয়পয়োধিপ্রমাণ হইয়া যখন পূরা বাঙলার দুই-তৃতীয়াংশকে ভাঙিয়া ভাসাইয়া নূতন নামে নূতন দেশে পরিণত করিয়া দিয়াছে, তখন স্বভাবতঃই অবশিষ্ট বাঙলার ভবিষ্যৎ বড়ই ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

ভাবনার কথাই বটে। পশ্চিম-বাঙলা বৃথাই অবান্তর একটা "পশ্চিমের" নামাবলী জড়াইয়া পূর্ব্বসম্বন্ধে বৈরাগ্যপ্রয়াস করিতেছে। গোটা বাঙলার সভ্যতা ও ঐতিহ্যরক্ষার গুরু দায়িত্ব আজ উহারই উপর ন্যস্ত। বস্তুতঃ বাঙালী বলিয়া আজও যাহারা পরিচয় দেয়, তাহাদের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিতে পশ্চিম-বাঙলাই একমাত্র আশ্রয়। পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থিগণকে তাড়াইয়া দিয়া, তাহাদের রাজনৈতিক দাবী অস্বীকার করিয়া আপাততঃ না হয় অর্থনৈতিক কাঠামোটি জোড়াতালি দিয়া টিকাইয়া রাখা গেল। কিন্তু ভবিষ্যৎ কি ?

মানুষের আত্মা অপরাজেয়, অবিনশ্বর জাতি-প্রাণ। যুগে যুগে কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সংহতি ভৌগোলিক ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া সবলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চীনের প্রাচীর ইহাকে রোধ করিতে পারে না। আত্মিক রাজ্যে সিগ্‌ফ্রিড্ ও ম্যাজিনো লাইন গড়া চলে না। নদীর জল বিপুল অধ্যবসায় সহকারে কত শত বাধা ভাঙিয়া সাগরে মিশে। জাতির মধ্যেও তেমনি একটা দুর্নিবার বিধি রহিয়াছে

যাহার অমোঘ প্রেরণায় বাঙালী-মাত্রই পরিণামে বাঙালীর সহিত একীভূত হইয়া যাইবে এবং সম্ভবতঃ এই পশ্চিম-বাঙলাই হইবে নবীন বাঙলার পীঠস্থান।

যদি ইহাই সত্য হয়, তবে এই খণ্ডিত ক্ষুদ্র প্রদেশটির সমস্যা অতিশয় জটিল হইয়া পড়ে। সর্ব্বপ্রথমেই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে এই বিপুল জনসংখ্যার অন্নসংস্থানের কথা। বাহিরে বিস্তারের পথ রুদ্ধ, ভিতরে উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি। আসামে 'বঙ্গালখেদা', বিহারে ও উড়িষ্যায় বাঙালী-বিদ্বেষ—সারা ভারতে বাঙালীর কোথাও স্থান নাই। দ্বিতীয় সমস্যা হইল সংস্কৃতিগত। বিভাগের খড়্গাঘাতে রক্তহীন বাঙালী। তাহার পাণ্ডুর দেহে আত্মিক শুচিতা আজ আর অক্ষুণ্ণ নাই। নানাপ্রকার পাপ জাতিকে পাইয়া বসিয়াছে। শ্লথ সমাজজীবন একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়া কি ভীষণ পরিণামের প্রতি ধাবিত হইতেছে তাহা কে বলিবে? দেশের বাহিরে বাঙালীর অস্তিত্বই বিপন্ন, তাহার সংস্কৃতি আর অব্যাহত থাকে কি করিয়া?

পশ্চিম-বাঙলার ভয়াবহ পরিণাম ইহাই। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে হইবে। দেশের শাসনরজ্জু যাঁহাদের করায়ত্ত, তাঁহাদিগকে অতি সন্তর্পণে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া জাতিকে পরিচালিত করিতে হইবে। উপস্থিত সুবিধা ও দলীয় স্বার্থচিন্তা পরিহার করিয়া পৃথিবীবক্ষে বাঙালীকে বাঁচাইয়া রাখিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই। এই কর্ত্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া দেশের নেতৃবর্গকে কালবিলম্ব না করিয়া ঘরে পরে তৎপর হইতে হইবে। দেশের মধ্যে কৃষিশিল্পের প্রভূত বিস্তার ও উৎকর্ষবিধান, দেশের বাহিরে বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার, এবং দেশবিভাগের জন্য দায়ী ভারত সরকার হইতে ন্যায্য প্রাপ্য আদায়—এসকল আশু কর্ত্তব্য যদি নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে করিতে পারেন তবে সাফল্য বিলম্বিত হইবে না। কিন্তু দেশের কাজ কেবল নেতৃবর্গের করণীয় নহে, দেশবাসীর সুশৃঙ্খল সমবেত প্রয়াসও ইহার জন্য অপরিহার্য্য। শৃঙ্খলাবোধ ও সঙ্ঘবদ্ধতারই আজ বড় অভাব। আত্মস্বার্থ-অন্বেষণে ভ্রষ্ট বাঙালীর উদার সংবিৎ আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে—ইহাই বোধহয় আজিকার দিনে প্রথম সাধনার বস্তু। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, ছাত্র, শিক্ষক—সকলকে সম্মিলিত হইয়া নয়া বাঙলার গোড়াপত্তনে লাগিয়া যাইতে হইবে। ইহার আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব সহে না।

পশ্চিম-বাঙলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কা হয় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর অমরত্ব-বিষয়ে একটা নিশ্চয় আশাও জাগে। কয়েকটা অবর্ণনীয় মন্বন্তর আর মারাত্মক মহামারী যে-জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে নাই, রাজনৈতিক দাসত্ব ও লাঞ্ছনা যাহার দৃপ্ত প্রাণশক্তিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই—সে জাতি কখনও মরিবে না, মরিতে পারে না। এই কল্পনাতীত দুর্ভাগ্য, ইতিহাসের এই ক্রূরতম শাস্তি ম্রিয়মাণ বাঙালীর চরিত্রকে হয়তো কষিয়া, জারিত করিয়া অম্লান স্বর্ণে পরিণত

করিবে। হয়তো এই কঠোর বর্ত্তমান বাঙালীর সুপ্ত বীরত্বের করিবে উদ্বোধন। পশ্চিম-বাঙলার ভবিষ্যৎ-সূর্য্য ভারতের পূর্ব্বাকাশ আবার ভাস্বর জ্যোতিতে ভরিয়াও দিতে পারে।

সময়ের মূল্য

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র একস্থলে রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন যে আমাদের জীবনের এক একটা বৎসর যেমনই বিগত হইয়া যায় অমনি আমরা তাহাকে বয়সের সহিত যোগ করি। আসলে যাহা বিয়োগ হইয়া গেল তাহাকে এরূপে যোগ করা, আপাতদৃষ্টিতে মস্ত ভুল বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু বয়স কেবল বৎসরসংখ্যা মাত্র নহে—ইহা কেবল পঞ্জিকার বিচার্য্য নহে। সময় যায় বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা রাখিয়া যায়। কায়মনোবাক্যে মানুষ দিনে দিনে বাড়িয়া উঠে ক্রমাগত। এইটাই জীবনের নিরবচ্ছিন্ন যোগপ্রক্রিয়া, ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে সময়ের মূল্যের কথা।

আর্থিক মূল্য ব্যতিরেকেও আরও একপ্রকার মূল্যমান রহিয়াছে। একমাত্র তাহাই সময়ের সত্যকার পরিমাপ হইতে পারে। এই মান হইল ব্যবহারের তুলাদণ্ড। সময়স্রোত পলে পলে ক্ষণে ক্ষণে তড়িদ্‌বেগে ধাবমান। আমরা তাহার প্রতিটি মুহূর্ত্তকে কিরূপে প্রয়োগ করি তাহা বিচার করিয়াই সময়ের মূল্য নিরূপণ করিতে হয়। জীবনের সার্থকতা বা অসার্থকতার দ্বারা ইহার বিচার চলে না। কারণ, ব্যবহারিক জীবনের সাফল্য বা অসাফল্য কখনই কেবল সময়ের সদ্ব্যবহারের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল নহে—উহার সহিত আরও নানা প্রশ্ন জড়িত আছে। অনেক অনলস কর্ম্মী অহর্নিশ সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াও জীবনে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নাই—এমন উদাহরণ বিরল নহে। আবার সময়নিষ্ঠাহীন ব্যক্তির জীবনও দৈববিধানে কখনও কখনও অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। কাজেই সাফল্য বা অসাফল্য দ্বারাই মাত্র সময়ের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না। সময়ের মূল্য ব্যবহারে—উহাতেই উহার সার্থকতা।

এ মূল্যও অবশ্য আপেক্ষিক। সময় যে শুধু চলিয়াই যায় তাহা নহে, লোকে বলে সময় আসেও। অবিরত নদীপ্রবাহ যেমন পলিমাটি বহিয়া আনে, সময় তেমনি উহার গতিপথে নিয়ত কতকগুলি সুযোগ লইয়া আসে। কোন্ ক্ষণটি কাহার পক্ষে কি সুবিধা লইয়া আসিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একজনের পক্ষে যাহা সুসময়, আরজনের পক্ষে তাহা দুঃসময়। তাই সময়োপযোগী ব্যবহারও এক একজনের পক্ষে এক একপ্রকার। উহার মূল্য সেইজন্য আপেক্ষিক। জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের মাত্র পাঁচ মিনিটের অবহেলায় নাকি ওয়াটার্লু যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটে।

ক্ষুদ্র এই পাঁচ মিনিটের গুরুত্ব ঐ যুদ্ধসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট অপরিমেয় ছিল সন্দেহ নাই। অথচ ঠিক সেই সময়টুকু হয়তো পৃথিবীর অগণ্য মানুষের আলস্যে কাটিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। অতএব বিশেষ অবস্থা এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়াই সময়ের বিশেষ মূল্য বুঝিতে হয় এবং তদনুসারে উহার প্রয়োগও প্রয়োজনীয়।

তবে মনে রাখা আবশ্যক ইহাই যে, প্রতিটি ক্ষণ অসীম সম্ভাবনা বহন করে। ব্যবহার করিতে জানিলে মুহূর্তমধ্যে যুগান্তকারী আবিষ্কার ঘটিয়া যায়, অন্যথায় শতাব্দীকালও নিষ্ফল, নিরর্থক হইয়া মরুপ্রায় পড়িয়া থাকিতে পারে। জীবনের ক্ষুদ্র প্রান্তরে কালের অনন্ত প্রবাহ অষ্টক্ষণ কণা কণা করিয়া কত বস্তু কত বীজ বপন করিয়া বহিয়া যায়। সযত্ন লালনে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেই মাত্র সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়—শ্যামশস্যে ভরিয়া উঠে আমাদের জীবন। অবহেলায় আবার এ সকল অব্যক্ত সম্ভাবনা মজিয়া গিয়া অস্তিত্বকে মরুময় করিয়া দেয়।

তাই কর্ম্মচঞ্চল এ পৃথিবীতে আজ আর মুহূর্তমাত্র অপচয় করিবার উপায় নাই। বেতার-বিমান, আরও কত শত বিজ্ঞানের দান স্থানকালের ব্যবধান যতই হ্রস্ব করিয়া আনিয়াছে, প্রতিটি পলের মূল্যও সেই অনুপাতে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই তো এযুগের মানুষের হাতে হাতে ঘড়ি। প্রতি মিনিট, এমন কি প্রতি সেকেণ্ডকে মর্য্যাদা দিয়া আজ তাহারা কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্রতী। উপায় নাই; 'নাই নাই, নাই যে সময়'। কর্ম্মময় জীবনের বিন্দুমাত্র সময় আর অপচয় করে চলে না।

অবশ্য জীবনসংগ্রামের কঠোরতাবৃদ্ধিই বর্ত্তমান মানুষের এই সময়নিষ্ঠার কারণ। নিদারুণ অবস্থার শাসনেই মানুষের এই নিষ্করুণ ব্যস্ততা। নচেৎ সত্যিকার সময়নিষ্ঠা সকলেরই নাই। নিয়মিতভাবে কার্য্যক্রম বিন্যস্ত করিয়া যথাসময়ে যথাকর্ত্তব্যসাধনের নামই সময়নিষ্ঠা। ভারক্লান্ত গর্দ্দভের ন্যায় অবিরত বোঝা বহিতেই মানুষ আসে নাই। তাই পেটের তাড়নায় অহর্নিশ কাজ আর কাজ করিয়া যাওয়াই সময়জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। মানুষের জীবন আত্মার বিকাশের জন্য। কাজেই উহার পুষ্টি ও তৃপ্তির জন্য অবসরেরও আয়োজন থাকা চাই এবং সেই অবসরে নির্দ্দোষ আমোদে মানুষকে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই কথা স্মরণ রাখিয়া দৈনন্দিন সময় বিভাগ করিতে হয়। কাজের সময় কাজ, অন্য সময়ে অন্য কাজ—ইহা যে বুঝে তাহারই সময়নিষ্ঠা আছে। সেই ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। তাহার পক্ষেই সময়ের মূল্য অসীম।

———

"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"

(ম. প. ১৯৫৫)

বর্ত্তমান যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। একজন আর একজন হইতে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজিকার মানুষ একান্তভাবে নিজেকে কেন্দ্র করিয়া নিজেরই ক্ষুদ্র-স্বার্থের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বড়ই একাকী হইয়া পড়িয়াছে। একজনের শ্বাস আর একজনের গায়ে লাগে, কিন্তু তবু প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপরিচিত—দুইয়ের মধ্যে সাগর-প্রমাণ ব্যবধান। বস্তুতঃ ইহাই এ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ট্রাজেডি।

কিন্তু মানুষের আসঙ্গপ্রিয়তা কেবল একটা জৈব প্রবৃত্তি মাত্র নহে—ইহার একটা বৃহত্তর উপযোগিতা ও তাৎপর্য্যও রহিয়াছে। মানুষ তো কেবল রক্তমাংসের পিণ্ড মাত্র নহে; তাহার মধ্যে মনটাই প্রধান। এই মন চায় মনের আশ্রয়, প্রাণের আকূতি প্রাণের জন্য। এই আবেগের বন্ধনেই সমাজসংশ্লেষ। ইহার উপর আবার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে মহত্তর বিকাশের সম্ভাবনা।

এই কারণেই মানুষ কখনও আপনাকে লইয়া একান্তভাবে মগ্ন হইতে পারে নাই। যুগে যুগে সে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছে বহুর মধ্যে। বস্তুতঃ প্রাণধর্ম্ম আত্মকেন্দ্রিক নহে। অনেকের মধ্যে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া নবনবীনরূপে বিকশিত হইয়া উঠাই জীবনের ধর্ম্ম। আত্মবিলয়ের ভিতর দিয়া আত্মলাভের এই যে সাধনা, মৃত্যুর মধ্যে এই যে অমরত্বের সাধনা, জীবপ্রকৃতির ইহাই স্বভাব-সিদ্ধ।

তাই সঙ্কীর্ণ আত্মপরতন্ত্রতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সকলের তরে আত্মবিসর্জ্জন অক্ষয় মহিমা অর্জ্জন করে। আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে এ জগতে কেহ আসে নাই। পরের তরে প্রত্যেকে আমরা কিছু-না-কিছু আত্মত্যাগ অবশ্যই করি। তাহা না হইলে জগৎ যে অচল হইয়া পড়ে। প্রত্যুত সংসারে সীমাহীন দুঃখসুখ ও নৈরাশ্যের অন্ধতিমিরে নিরাশ্রয় মানুষ চায় মানুষের সাহচর্য্য। এই কথা স্মরণ রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে আকাশের মত উদার করিয়া তোলা সঙ্গত। শিক্ষা করা উচিত 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'।

এ আদর্শের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে সহযোগিতা ও সঙ্ঘশক্তির অঙ্কুর। আমরা যদি প্রত্যেকে ইহাকে নিজ নিজ জীবনে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি, সকলের স্বার্থে নিজেকে যদি অম্লানবদনে দিতে পারি বলি, তবেই তো জীবন ধন্য। এই মহৎ আদর্শের মধ্য দিয়াই মানুষে মানুষে ঐক্য গড়িয়া উঠে। এই মহৎ ত্যাগমন্ত্র মানুষের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার করে, তাহা জীবনের বহু বিঘ্ন বহু দুঃখ সবলে দূর করিয়া স্বর্গের শুচিশুভ্র কিরণধারা নামাইয়া আনে এই মাটির পৃথিবীতে। ক্রূর প্রকৃতি ও দুর্নিবার নিয়তির সহিত মানুষের অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এ সংগ্রামে জয়লাভ একার কাজ নয়। সকলে মিলিয়া, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহচর্য্য করিয়া এ বিচিত্র জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হয়।

সংসার অসার; 'দারাপুত্রপরিবার তুমি কার, কে তোমার?'—এ বৈরাগ্য মানবধর্ম্ম-বিরোধী। বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া যাঁহারা মায়াপ্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ মানুষই সামাজিক জীব—আধ্যাত্মিক শূন্যমার্গে অতি অল্প লোকই উড্ডীন হইতে পারেন। মানুষকে লইয়া মানুষের জীবন, একজনের জন্য অপরজনের তাই এত প্রীতি, এত শুভাকাঙ্ক্ষা। প্রীতিই সংসার ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই নীতি সেই মানবপ্রীতিরই মন্ত্র।

"পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য"

স্বামীর ধর্ম্মাচরণকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে তাহাতে স্ত্রীর সহযোগিতা চাই; একা স্বামী নয়, স্বামী ও স্ত্রী সম্মিলিতভাবে ধর্ম্মাচরণ করিলে তবে তাহা সার্থক হইয়া উঠে; ইহাই "সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ" কথাটির তাৎপর্য্য। আজ ধর্ম্ম বলিতে আমরা বারব্রত পূজাপার্ব্বণ-জাতীয় অনুষ্ঠান বুঝিয়া থাকি; কিন্তু প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম ছিল বৃহত্তর জীবন-ধর্ম্ম। মানবশাস্ত্রের "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি, ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" অথবা গীতার "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই মহান্ ও ব্যাপক জীবন-ধর্ম্মের কথাই বলিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার আর্য্যযুগে, পৌরাণিক যুগে এইভাবেই স্ত্রী ছিলেন স্বামীর সহধর্ম্মিণী। স্ত্রী যে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী ইহারও তাৎপর্য্য গভীর। নারী বা পুরুষ কেহই একা পূর্ণ নয়; উভয়ের সার্থক মিলনের ফলরূপে জাগিয়া উঠে এক পূর্ণ মানবসত্তা। স্বামীই একমাত্র সত্য এবং তাহার মধ্যে লীন হইয়া আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াই স্ত্রীর সার্থকতা—এ আদর্শ প্রাচীন ভারতের নয়। আমাদের অর্দ্ধাঙ্গধারণা এ নয় যে স্ত্রী পুরুষের অঙ্গলগ্ন পরগাছা, তাহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। আমাদের অর্দ্ধাঙ্গকল্পনায় পুরুষ বড় নারী ছোট, পুরুষই সব নারী কিছুই নয়, এ ভাব নাই। দুই বিভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত দুইটি মানবসন্তানের পারস্পরিক সহযোগিতার এক পূর্ণ শক্তিতে অধিষ্ঠানই আমাদের আদর্শ ছিল। আমাদের দেবতার অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিকল্পনায় এই সত্যই নিহিত রহিয়াছে।

দেশের যুগযুগান্তরব্যাপী বিচিত্র ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে আমাদের সমাজচেতনা শিথিল হইতে হইতে অদ্ভুত বিকৃতি লাভ করিয়াছে। নারী যে চিরকালই সর্ব্বগ্রাসী পুরুষের মুখের গ্রাসমাত্র, এই ধারণাই আজ আমাদের শিক্ষিতা-সমাজের একটা অংশের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আজিকার শিক্ষিতা নারীর তথাকথিত প্রগতি-আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে এই ধারণা—একটা প্রচণ্ড 'ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্‌স্'। নারীর সীমন্তের সিন্দূর যে অতীত ভারতের পুরুষ মালিকবিশেষের মালিকানাজ্ঞাপক

একটা মার্কা মাত্র (যেমন হাটে ছাগল-ভেড়ার গায়ে থাকে), একথা আজ অনেক প্রগতিবাদিনীর মুখে শুনা যায়। প্রাচীন ভারতের পুরুষের 'শিকার' মেয়ে পাছে পলাইয়া যায়, তাই তাহার হাতে লোহার শিকল পরাইয়া খুঁটায় তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখা হইত, তাহারই নিদর্শন বিবাহিতা নারীর হাতের 'লোহা'—এ মহাবাণী আমাদের রেডিও মারফত অতি-আধুনিকারা বেশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে প্রচার করেন। এই অতিপ্রগতাগণের অনেকে 'বিবাহ' কথাটা শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন। ইহাদের মতে নারীপুরুষ পরস্পরের বন্ধুভাবাপন্ন সমপর্য্যায়ের সঙ্গী মাত্র, এইভাবের একটা আইনঘটিত চুক্তিই (Legal contract) যথেষ্ট। সৌভাগ্যের কথা সারা দেশটাই মহানগরী কলিকাতা নয় এবং নারীজাতির শতকরা অন্ততঃ আটানব্বই জনই বিদ্যুৎ-দীপ্তিকে সূর্য্যালোক মনে করেন না।

তবু নারী-আন্দোলন অসার্থক নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নানা বিপর্য্যয়ের ফলে আমাদের শিক্ষাসংস্কৃতির চরম অধঃপতন হইয়াছে। আমাদের সমাজজীবন এদেশে ইংরেজ-আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বেই এক নিবিড় তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজী-শিক্ষার যোগসূত্রপথে পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবনপরিচয় লাভ করায় আমাদের চেতনার উদ্বোধন হইয়াছে। নারীর প্রগতি-আন্দোলন ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহার গতিপ্রকৃতিতে বহু বিকারলক্ষণ থাকিলেও এই আন্দোলন অনাবশ্যক নয়। রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনের শুধু সমর্থক ছিলেন না, ছিলেন উদ্‌গাতা। কবির "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রচণ্ড শ্লেষ রহিয়াছে। 'নহিলে খরচ বাড়ে'-র ভিতর তাঁহার স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কধারণা নিহিত—স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ এক স্বার্থপর পুরুষরূপে স্বামিজাতি এখানে কল্পিত। স্ত্রীর কাছে স্বামীর আসল রূপটি কবি এখানে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

সীতা, দ্রৌপদী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আদর্শ পত্নী। কিন্তু স্বামীর সত্তায় ইহাদের কেহই লীন ছিলেন না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেও ইঁহারা মহীয়সী। কিন্তু কালক্রমে স্বামীই প্রভুরূপে প্রকট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; পত্নী স্বামীর স্বার্থমূঢ় অস্তিত্বের অতল তলে ডুবিয়া হারাইয়া গিয়াছিল। পতিই সর্ব্বস্ব, পত্নী তাহার সম্ভোগবাসনা চরিতার্থ করার উপকরণমাত্র—অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাই সত্য হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীর মঙ্গলে স্ত্রীর মঙ্গল, স্বামীর অমঙ্গলে স্ত্রীরও অকল্যাণ। কখনও কখনও অবশ্য মঙ্গলের অংশ স্ত্রী আর পাইতেন না, অকল্যাণের বেলাতেই কেবল তাঁহার ভাগটা হইত বড়। নারীর নাম হইয়াছিল 'অবলা' সহকার-শাখা লতিকার যেমন আশ্রয়, স্ত্রীর তেমনি স্বামীই ছিল একমাত্র অবলম্বন। তাই স্ত্রীর মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ স্বামীর ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। একা পত্নী ছিল অর্থহীনা।

সেই কারণেই সতীর পক্ষে পতিভক্তিই ছিল একমাত্র সাধনা, এবং পতির পক্ষেও পুণ্যলোভাতুরা পত্নীকে স্তোকবাক্যে ভুলাইবার ছিল অজস্র সুবিধা। পাপ-পুণ্য, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, এমন কি সুখ-দুঃখ—কোন কিছুরই দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বর্ত্তাইত না। পতির পুণ্যেই ছিল সতীর পুণ্য।

আধুনিকা নারী আপনাকে অবলা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। পতির দেহে একান্ত অবান্তর 'আবে'র মত লাগিয়া থাকিতে এখনকার শিক্ষিতা সতীরা রাজী নয়। পতিসেবার মহান্ আদর্শ আজ দিল্লীকা লাড্ডুর মত একটা অলীক বস্তু হইতে বসিয়াছে। এদেশের সীতাবৃন্দই যে ইহার জন্য একমাত্র দায়ী তাহা বলিতে চাহি না। স্বীকার করিতেই হইবে যে একালের রামেরাও সর্ব্বৈব আদর্শভ্রষ্ট। কাজেই সতীগণের পক্ষ হইতে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। স্বামীর স্বামীত্ব এখনকার সতীদের কাছে 'ফ্যাসিজম্'। বর্ত্তমান ডেমোক্র্যাসির যুগে ইহা অচল। শিক্ষিতা নারীর কণ্ঠ ছাপাইয়া তাই আজ দারুণ প্রতিবাদের 'শ্লোগান' ছুটিতেছে—'পুরুষদের স্বামিত্ব চলবে না, চলবে না'।

অতএব তীর্থযাত্রার ছলনা করিয়া কোন পতির পক্ষেই আজ আর-নিরাপদ্ বায়ু-পরিবর্ত্তনের কল্পনাও সম্ভব নহে। কেবল গোল্লায় যাত্রা করিবার অধিকারটুকুতে এখনও স্ত্রীলোক বাধা দেয় না, বরং ইহাতে তাহাদের উৎসাহটা বেশী।

পুরুষ যেমন স্বাধীন, স্ত্রীলোকও তেমনি স্বাধীন। না মানিয়া উপায় নাই। কাজেই স্বামীস্ত্রীকে সমান মর্য্যাদায় পরিবার-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাই এ-যুগের দাবী। সুকৃতির ক্ষমতা উভয়েরই আছে, তাই উহার সুযোগটুকু স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়া আর রাখা চলে না। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য', সঙ্গে সঙ্গে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য, আবার দুইয়ের পুণ্যে দুইয়েরই পুণ্য—একটা আপোষরফা।

কিন্তু প্রকৃতি যতদিন বিপক্ষে রহিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক যেন বেশী বাড়াবাড়ি না করেন, এবং বিবাহ যতদিন সামান্য একটা চুক্তিতে পর্য্যবসিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহিতাগণ স্বামীকে পুণ্যমুখী করিয়া তাঁহার পুণ্যের অর্দ্ধাংশ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইলেই বেশী লাভবতী হইবেন। স্বাধীন হইয়া স্ত্রীলোক অনেক দিক্ দিয়া পুরুষকে ইতিমধ্যেই পরাধীন অর্থাৎ স্ত্রী-অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন নাকে দড়ি দিয়া তাহাকে দিয়া যদি কিঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয় করাইয়া লইতে পারেন, ক্ষতি কি? এরূপ ক্ষেত্রে অন্ততঃ পতির পুণ্যে সতীর অংশগ্রহণে আগ্রহ থাকিতে পারে।

———

আমার জীবনের আদর্শ

ভাবী "আমি"-কে বিশিষ্ট একটি পরিবেশে স্থাপন করিবার, তাহার ধ্যানদৃষ্ট মূর্ত্তিকে বিশিষ্ট একটি বর্ণে রঞ্জিত করিবার মূলেও কতকগুলি হেতু সক্রিয় থাকে। আমাদের সমাজ ও পরিবেশই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে কালপ্রয়োজনে বিভিন্ন রূপ দান করে। রবীন্দ্রনাথ বেদুইন হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবনের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া কয়টি যুবকের তদ্রূপ কামনা জাগরিত হয়, সে-বিষয়ে বিশেষ সংশয়ের অবকাশ আছে।

দীপঙ্করের যুগে জন্মগ্রহণ করিলে আমি হয়তো দুর্লঙ্ঘ্য তুষারস্তূপ অতিক্রম করিয়া তমসাচ্ছন্ন তিব্বতকে চেতনালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য তাঁহার সহযাত্রিত্ব কামনা করিতাম; সমতট রাজকুমারের যুগে ভূমিষ্ঠ হইলে আমি হয়তো তাঁহার চরণপ্রান্তে আশ্রয় ভিক্ষা করিতাম। আচার্য্য শঙ্কর যখন তাঁহার ধীশক্তি, তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যবলে বঙ্গের নৈয়ায়িককুলকে নিস্তব্ধ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ন্যায়শাস্ত্র আয়ত্ত করিবার দুর্নিবার দৃঢ়সঙ্কল্প জাগরিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই যুগে হয়তো নবদ্বীপে অধ্যয়ননিষ্ঠ জীবন যাপন করিবার আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া পড়িতাম; রামমোহনের সমসাময়িক হইলে হয়তো খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণের অপপ্রচার ও বিষোদ্গারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতাম; দেশবন্ধুর যুগে জন্মগ্রহণ করিলে হয়তো খদ্দরের শুভ্র তেজঃপ্রভায় জীবন আলোকিত করিয়া পথে পথে ফিরিতাম; সুভাষের অনুষঙ্গী হইলে হয়তো ইম্ফলের রণক্ষেত্রে গৌরবময় মৃত্যুবরণ করিতে উৎসুক হইতাম।

কিন্তু আমি বিংশ শতকের শেষার্দ্ধে জীবনের যাত্রাপথে অগ্রসর হইতেছি। কোথায় এখন মানবজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কোথায় সহস্র বাধা-বিপদ্ দুর্য্যোগঝঞ্ঝাকে সগর্ব্বে অস্বীকার করিয়া জীবনের জয়গান গাহিবার জীবনব্যাপী নিষ্ঠা। চতুর্দ্দিকে আজ হতাশা—উচ্চাশা, মহৎ জীবনযাপনের বরণীয় সঙ্কল্প আজ আমার সহচরের উপহাসের বস্তু। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্রতা, নীচতা—মনুষ্যত্বের সহস্র অবমাননা নতশিরে স্বীকার করিয়া লইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য হৃদয়ভেদী হাহাকার। আমার দেশবাসী আজ নিজেকে ভুলিয়াছে, তাহার আদর্শ ভুলিয়াছে, জীবনদেবতার পূজা বিস্মৃত হইয়াছে, বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচ্যুত হইয়া পশুর সমস্তরে অবরূঢ় হইয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে শুধু জৈব প্রয়োজনের তাড়নায় অঙ্কুশাহত মত্তহস্তীর ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বিরাট্ ক্ষমতা আজ বিলুপ্ত, ভবিষ্যতের মহতী সম্ভাবনা বাস্তবের তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বাঙালীর জাতীয় জীবন বাস্তবের শত দুঃখদুর্দ্দশায় পতিত হইয়াও কখনও তাহাকেই চরম বলিয়া স্বীকার করে নাই। রুদ্র বাস্তবের উপর বাঙালীর রসগ্রাহী

সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন এক অমৃতময় প্রলেপ লেপন করিয়া দিয়াছিল। "বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া" বাঙালী বাঁচিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের প্রকাশ হইয়াছে আগমনী ও বিজয়ার গানে, শ্রীরাধার বিরহব্যথার অদ্ভুত কাব্যিক প্রকাশে, চৈতন্যের ভাবসাধনায়, রামপ্রসাদের অভিমানপূর্ণ স্নেহকাতর মনের ব্যঞ্জনাময় শ্যামাসঙ্গীতে। প্রতীচীর প্রতিনিধি যেদিন এই স্বর্গখণ্ডে আসিয়া প্রবেশ করিল সেইদিন এই নূতন যুগের আরম্ভ।

বাঙালীর সৌকুমার্য্য যে দুর্ব্বলতারই রূপান্তরমাত্র নহে, তাহা যে বীরত্ব ও ক্ষমতার বেদীতে স্থাপিত সুন্দরের পূজোপচার, তাহা প্রমাণিত হইল এই প্রাচী-প্রতীচী সংঘর্ষে। আজিও স্মরণ করিয়া গর্ব্ববোধ করি যে, যে সঙ্কটে অন্য কোনও জাতি স্বীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিসর্জ্জন দিয়া, জাতিগত স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইত—সেই সঙ্কটেও বাঙালী ভাববিজয় লাভ করিয়া, নবাগতের ঐশ্বর্য্য স্বকীয়তায় আচ্ছাদিত ও আত্মসাৎ করিয়া নবতর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। সাহিত্যে, দর্শনে, সমাজে ঊনবিংশ শতকের গৌরবময় 'রেনেশাঁস' তাহার গৌরবময় কীর্ত্তি।

কিন্তু হায়, প্রথম সংঘর্ষে যে বাঙালী সদর্পে আত্মরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল, শেষরক্ষা সে করিতে পারে নাই। স্বদেশী যুগের সহস্র আত্মদান, ত্যাগ ও শৌর্য্যের বিনিময়ে বাঙালী বরণ করিয়া লইয়াছে তিলে তিলে মৃত্যু ও ক্ষয়। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রাজরোষের উত্তাপে তাহার জীবন-উৎস শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিল—সেই বাঙালীর দুর্দ্দিন!

কিন্তু বাহ্য আঘাতের শক্তি ছিল না বাঙালীকে অবদমিত করিবার। প্রকৃত আঘাত আসিল মানসলোকে। বাঙালী স্বদেশের মহৎ ও তুচ্ছ সকলেরই জয় কামনা করিয়াছে। বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল—সবই তাহার প্রেমরসে রঞ্জিত দৃষ্টিতে কুবেরের মণি-মঞ্জুষা। বাঙালী তাহার ভাই, বাঙালীই তাহার ইহলোক পরলোক। সুন্দরের উপাসক তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রেমধারায় অভিষিক্ত করিয়া যে ভাবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, হিংস্র দানব তাহার সমগ্র বল নিয়োজিত করিয়া সেই মূর্ত্তি প্রচণ্ড আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল—বাঙালীর সব ফুরাইল

যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে সে কিসের আশা লইয়া জীবিত থাকিবে? কে দিবে তাহাকে প্রেরণার উৎস, যাহার জন্য সে জীবনসংগ্রামে নববলে বলীয়ান্ হইয়া দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্প লইয়া প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িবে? বাঙালীর বাঙলা নাই, সে প্রেমঘন মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে, তাহার জীবনে প্রয়োজন কি?

আমি, সেই বাঙালী। হতাশায় মুহ্যমান, শোককাতর, জীবনযুদ্ধে বিধ্বস্ত,

মোহাবিষ্ট সেই বাঙালীর শ্মশানভূমিতে রক্তবীজের বংশধর আমরা নবীন বাঙালী নবীন যুগপ্রভাতে মাতৃঋণ পরিশোধ করিতে আবির্ভূত হইয়াছি। পূর্ব্বপুরুষের চিতাভস্মে আমাদের ললাটে তিলক রচিত হইয়াছে—বাঙালীর বলবীর্য্যের জ্ঞানগরিমার আর একবার পরিচয় দিতে আসিয়াছি আমরা মহাকালের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া। পরাজয়ের গ্লানি বহন করিয়া কখনই বাঙালী ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে না; বিলুপ্তি যদি আসে, তবে তাহা আসিবে বীরের আত্মবিসর্জ্জনের রূপ লইয়া। মরিতে হইলে বাঙালী মরিবার পূর্ব্বে আর একবার "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া দিয়া যাইবে।

যুগদেবতা আমাদিগকে সেই কর্ত্তব্যে আহ্বান করিতেছেন। হৃদয়ের অন্তস্তলে একাগ্রমনে কান পাতিয়া তাঁহার গভীর গম্ভীর আহ্বান শুনিতে পাইতেছি; শুনিতে পাইতেছি তাঁহার অভীঃ মন্ত্র, তাঁহার অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। যাই, প্রভু, যাই! তোমার আহ্বান আমাকে সকল গ্লানি, সকল তুচ্ছতার হীন পরিবেশ হইতে সবলে আকর্ষণ করিতেছে, তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত অভীঃ মন্ত্র হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব দুর্দ্ধর্ষ ক্ষাত্র তেজ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে বিপুল কলরোলে মথিত হইতেছে—যাই, প্রভু, যাই!

তোমার আদেশ আজ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম প্রভু! বাঙালীর হৃদয়ে নূতন আশাবীজ অঙ্কুরিত করিব, আত্মবিস্মৃত জাতিকে তাহার পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইব, ভাবনয়নে তাহাকে আর একবার তাহার সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী ষড়ৈশ্বর্য্যবিভূষিতা প্রেমাভিষিক্তা মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করাইব। আগতপ্রায় যুগের সংগ্রামী বীরকে মাতৃ-নামের শান্তিবারিসিঞ্চনে শ্মশানের ধূলিরাশি হইতে পুনরুজ্জীবিত করিয়া পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির শ্মশানভূমিতে বিচরণ করিয়া বেড়াইব। গাহিব, "জাগো কালজয়ী বীর! জাগো দীপঙ্কর, শীলভদ্র, কপিলের বংশধর; জাগো চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের উত্তরসাধক; জাগো বঙ্কিমের মন্ত্রশিষ্য বাঙালী!" যে জাতির ভাগ্যাকাশে একদা দুর্নিরীক্ষ্য তেজঃপুঞ্জ রবীন্দ্রের উদয় হইয়াছিল, তাহার অস্তগমনক্ষণের অন্তিম রশ্মিচ্ছটাকে একবার প্রচণ্ড বলে, আত্মদানের মহিমায়, শেষকীর্ত্তির যশঃপ্রভাবে দ্বিগুণ উজ্জ্বলতর করিয়া যাও। অকৃতকর্ম্মা সন্তানধারণের অগৌরব ও গ্লানিতে আমাদের মাতৃমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষে আর কালিমা লেপন করিও না। বঙ্গভারতীর, বঙ্গলক্ষ্মীর রাতুল চরণে হৃদয়জবায় তোমার শেষ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। মা আমাদের অবিনশ্বরা; তাঁহার নাশ নাই। তোমার অর্ঘ্যে তৃপ্ত হইলে তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার ভুবনমোহিনী রূপে দর্শন দান করিবেন। তাঁহার শুভদৃষ্টি, তাঁহার সন্তোষ কামনা করিয়া বাঙালী বিরাট্ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছে—তাহার গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণধ্বনি শুনিতে পাইতেছে না? অগ্রসর হও, অন্তরে

শ্রবণ কর সেই ভগবদ্বাণী ; তিনিও তোমাদিগকে নিয়ত কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"।

কর্ত্তব্যশেষে দেশজননীর সর্ব্বদুঃখহরা মূর্ত্তি স্মরণ করিতে করিতে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে আমার নশ্বর দেহ এই পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিপূত ভূ-স্বর্গে, এই মাতৃমন্দিরের বেদীমূলে পঞ্চভূতে মিশাইব।*

রণরঙ্গে বাঙালী

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাহার অতীত ইতিহাসের বহু গৌরবময় অধ্যায় কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। অবশিষ্ট যাহা কিছু বাঙলার ইতিহাস বলিয়া প্রচারলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে অনেক মিথ্যা, অনেক সত্যের অপলাপ, অনেক ইচ্ছাকৃত বিকৃত বর্ণনা বাঙালীর সত্যকার ইতিহাসকে মসীময় করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু এই কলঙ্কলেপ ভেদ করিয়াও দুইএকজন শশাঙ্ক, দুইএকজন দনুজমর্দ্দন মহাবিক্রম পালরাজ শৌর্য্যবীর্য্যের উজ্জ্বল প্রভায় ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে প্রদীপ্ত করিয়া ফুটিয়া আছেন। বাস্তবিক একদা বাঙালীর সামরিক পরাক্রম ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। মহাকবি কালিদাসের রঘুরাজ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া বাঙলায় প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন—এ প্রাচীন কথা বাদ দিলেও বাঙলার বারভূঁইয়াদের অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী আজও অম্লান গৌরবে বিরাজমান। প্রতাপাদিত্য, ঈশা খাঁ ও কেদার রায় যেভাবে প্রবল পরাক্রান্ত মুঘলশক্তির বিরুদ্ধে উদ্ধত গর্ব্বে উন্নত শির লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে প্রত্যেক বীরহৃদয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সমক্ষে মহাবীর পুরুর সদর্প উক্তিটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙালী বীর কেদার রায়ের ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বীরোরিত একটি উক্তি কুত্রাপি স্থান পায় নাই। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ যখন বাঙলা আক্রমণ করেন, তখন তিনি নাকি তাঁহার সিংহবিক্রম জ্ঞাপন করিয়া কেদার রায়কে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য একটি পত্র লিখেন। কেদার রায় ইহার উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, "সিংহের বিক্রমে সন্দেহমাত্র নাই, কিন্তু সিংহ পশু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।" এই ক্ষুদ্র উত্তরের মধ্যে অতীত দিনের স্বাধীন বঙ্গের অপরাজেয় বীরত্বের দীপ্তি দেখিতে পাই।

ইতিহাসের খণ্ড বিচ্ছিন্ন এই কয়েকটি সাক্ষ্য বাঙালীর বীরত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। ইহাদের সম্মুখে লক্ষ্মণ সেনের মিথ্যা বৃত্তান্তটি স্বভাবতঃই

* এই প্রবন্ধটির রচয়িতা শ্রীমান্ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যের দ্বিতীয় বর্ষ, বঙ্গবাসী কলেজ।

বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনীটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাহা বর্ত্তমানে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তবু যে বাঙালীকে অসামরিক বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহার কারণ আছে। পলাশীর দিনে বৃটিশসিংহ এদেশে যখন তাহার সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে তখন একদিকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি নিঃশেষে আত্মদানের অতুলনীয় শক্তিও প্রকট হইয়া উঠে। মীরজাফরের ফসল হয়তো এদেশের মাটিতে মন্দ হয় না, কিন্তু মোহনলালের মহীরুহও এদেশে জন্মে। তাহা ছাড়া এই জগৎশেঠ ও মীরজাফর, ইহারা তো সত্যকার বাঙালীও নহে। সেই হইতে ইংরেজ বাঙালীর বুদ্ধি ও শক্তির যুগপৎ সমন্বয়টাকে সম্ভবতঃ ভয়ের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। তাই বাঙালীকে অসি ছাড়াইয়া মসীজীবী করিতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের একটা ঘৃণিত প্রয়াস প্রথম হইতেই ছিল। সেইজন্যই বাঙালীর ইতিহাসকে বিকৃত করা হইয়াছে; সেই কারণেই বাঙালীকে অসামরিক বলিয়া কলঙ্কিত করা হইয়াছে। তারপর দীর্ঘ দুইশত বৎসরের কুশিক্ষা, পরাধীনতা ও মিথ্যাপ্রচার বাঙালীকে প্রায় ভীরু বানাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের নবজাগরণে বাঙালীর সুপ্ত আত্মা আবার জাগিয়া উঠে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত অমর জাতির বীরত্বের কাহিনী ফুটিয়া উঠে বিপুল গৌরবে তিমিরান্ধতা ভেদ করিয়া। বাঙালী অগ্নিমন্ত্রের সাধক। সন্ত্রাসবাদী বাঙলার সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুপ্ত আগ্নেয়গিরিরই বারংবার উদ্গিরণ।

যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর শৌর্য্য আজিও পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় নাই—একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।. কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে বাঙালী পল্টনের অমিত বীর্য্য এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাঙালী সৈনিকদলের অসামান্য সাফল্য সত্যই অতিশয় মহিমমণ্ডিত। তবু তো সে-সকল সৈন্যদলে সেরা বাঙালীর প্রবেশাধিকারই ছিল না। কোনপ্রকার বাধানিষেধ না থাকিলে বাঙালী রণরঙ্গে কি সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ। এই সেদিনও কাশ্মীর রণাঙ্গনে দেখিয়াছি বাঙালীর ছেলে এল. পি. সেনের অপূর্ব্ব রণদক্ষতা, হায়দ্রাবাদে চৌধুরী-মুখার্জ্জী-রুদ্রপ্রদর্শিত বাঙালীজাতির রুদ্র বিক্রম। তালিকা বিস্তার করিয়া লাভ নাই। রণরঙ্গে বাঙালীর মহিমা আজ ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে।

রণক্ষেত্রে বাঙালীর পরিপূর্ণ গৌরব সম্যক্ বুঝিতে হইলে স্বভাবতঃই বাঙালী-চরিত্রের একটি বিশেষত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাঙালী বীর বটে কিন্তু প্রধানতঃ সে বুদ্ধিমান্। তাই বিপুল দেহটাকে যখন কাতুকুতু দিয়াই ধরাশায়ী করা যায়, বাঙালী তখন মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও কখনও 'য পলায়তে স জীবতি',—অন্ততঃ রণাঙ্গন কিছুতেই মোগলাই দরবার নহে যে, পৃষ্ঠ-

প্রদর্শন না করিয়া সন্তর্পণে পিছু হাঁটিয়া অপসৃত হইতে হয়। বাস্তবিক আধুনিক যুদ্ধবস্তুটা প্রধানতঃ মস্তিষ্কের কাজ এবং উহাতে নীতি-শাস্ত্রের অনুশাসন একান্ত পালনীয় নহে। "Discretion is the better part of valour"—ইহাই প্রাজ্ঞজনের অভিমত। ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালী ব্যতীত আর কাহারও বীরত্বের মধ্যে এই রণনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজপুত, শিখ, মারাঠা, জাঠ, মদ্র, গুর্খা—সকলেই বীর। কিন্তু হলদীঘাটের পুণ্যকাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশের অসংখ্য শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনীর মধ্যে দেখিতে পাই যে আত্মত্যাগই প্রধান। যে কূটনীতি অল্পলোকক্ষয়ে অধিকতর সাফল্য আনয়ন করে, তাহার প্রয়োগ বড় একটা দেখিতে পাই না। এবিষয়ে সম্ভবতঃ একমাত্র বাঙালীই আদর্শ।

অবশ্য সকলই রণবীর বাঙালীর সম্ভাবনার কথা, কীর্ত্তির কথা নহে। অনাগত দিনে রণরঙ্গে বাঙালী কবে পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহা অনুমানযোগ্য নহে। তবে একথা নিশ্চয় যে, এই তথাকথিত অসামরিক জাতিটির সামরিক মর্য্যাদা খুব বিলম্বিত হইবে না। পৃথিবীর সমক্ষে রণরঙ্গে বাঙালী যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গবিভাগ

বঙ্গব্যবচ্ছেদসূত্রে দুইটি স্মরণীয় ঘটনা সমগ্র ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের একটি পরম গৌরবের, অপরটি অতি শোচনীয়। কিন্তু উভয়েরই পরিণাম জটিল ও সুদূরপ্রসারী।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করিতে বাঙালী যে আন্দোলন সৃষ্টি করে, তাহা উহার অব্যবহিত উদ্দেশ্য তো লাভ করেই, উপরন্তু দেশের সুপ্ত আত্মাকেও প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে মহত্তর সংগ্রামের জন্য। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস—যে-বাঙালী বিদেশীর ব্যবস্থিত এই বঙ্গভঙ্গ রহিত করিবার জন্য এত রক্ত দান করিয়াছিল, চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই আবার সেই বাঙালী স্বেচ্ছায় বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া লইল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী জাতি কিরূপে বঙ্গবিভাগ সাগ্রহে চাহিয়া লইল, তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে, শুধু এইটুকু উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় কংগ্রেসের ক্রমাগত ভুল, বৃটিশ ষড়যন্ত্র ও মুস্‌লিম লীগের পাকিস্তান-দাবীরই অবশ্যম্ভাবী ফল বঙ্গবিভাগ।

যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে—র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদ-অনুসারে প্রাচীন বাঙলা আজ পশ্চিম-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানে বিভক্ত। ইহাদের একটি মুস্‌লিম রাষ্ট্র; অন্যটি না-হিন্দু না-মুসলমানের এক অদ্ভুত আকারপ্রকারহীন 'ষ্টেট'। বাঙালীজীবন

তাই বিষাইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধার্ম্মিক জীবন একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে হিন্দুগণ ক্রমাগত ঐস্লামিক রাষ্ট্রের দৃপ্ত প্রচারের মধ্যে পড়িয়া স্বভাবতঃই স্বদেশে প্রবাসীর ন্যায় উৎকণ্ঠার জীবন যাপন করিতেছেন; পশ্চিম-বঙ্গের 'Secular' State-বাসিগণও পূর্ব্বের ন্যায় স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠ নহেন এবং উভয় বঙ্গের অধিবাসিগণই ধর্ম্মার্থকাম বিসর্জ্জন দিয়া অনিশ্চয়ের অন্ধ তিমিরে কেবলই খাবি খাইতেছেন।

অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া সমগ্র বাঙলা, অন্য যে-কোন প্রদেশ হইতে নিবিড়তর বন্ধনে অবিভাজ্য স্বার্থে বদ্ধ। পূর্ব্ব-বঙ্গ ভিন্ন পশ্চিম-বঙ্গ অসার্থক; পশ্চিম-বঙ্গ ভিন্ন পূর্ব্ব-বঙ্গের বিকাশ নাই। একে অন্যের সহিত এমনি একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। পূর্ব্ব-বঙ্গের পাট আর যাবতীয় কাঁচামাল পশ্চিম-বঙ্গের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এতাবৎ যোগান দিয়াছে। বিনিময়ে পশ্চিম-বঙ্গের শিল্পায়তন শতসহস্র টাকা পূর্ব্ব-বঙ্গের ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের উর্ব্বর শস্যভূমি আর পশ্চিম-বঙ্গের খনি ও কলকারখানা—উভয়ের উপরই বাঙলার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৃত্রিম ও আকস্মিক ব্যবচ্ছেদে সেই অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নূতন ব্যবস্থা আসে বিবর্ত্তনের নিয়মিত পথে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব তাহাতে অনিবার্য্য। অন্ততঃ বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সহিত আজিকার অর্থনৈতিক অবস্থা আনুপাতিক নহে। ফলে লোকের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাহার উপর আবার অন্য বিভ্রাটও আছে। পাক-ভারতের সম্পর্ক পরস্পর সন্দেহে কলুষিত। তাই ব্যবসায়-বাণিজ্য শত চেষ্টাতেও সহজ খাতে প্রবাহিত হয় না। একদিকে তৈল, বস্ত্র, তণ্ডুলের অভাব; অন্যদিকে মৎস্য, মাংস, পাট প্রভৃতি নানান মালের অনটন। বঙ্গবিভাগ শুধু যে মানচিত্রের পরিবর্ত্তনমাত্র নয়, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বাস্তব নিরপেক্ষ একটা দায়িত্ববোধহীন আবেগমাত্র নয়—উভয় বঙ্গের অধিবাসী আজ মর্ম্ম দিয়া তাহা নিদারুণভাবে বুঝিতেছে। বঙ্গবিভাগের ক্রূর কৃপাণ এবার যেন 'ধড়' কাটিয়া প্রাণের উপর হানিয়াছে নির্ম্মম আঘাত।

সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গেল। সুখে হউক, দুঃখে হউক, অর্থনৈতিক কারণেই হউক বা রাজনৈতিক চাপেই হউক, বাস্তুহারার প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে পশ্চিমে বহিতেছে। পূর্ব্বের গ্রামগুলি উৎসন্ন হইয়া গিয়া নিরন্ন মরিয়া মানুষের দস্যুতার কবলে পড়িয়া বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে খাদ্যাভাব, পুনর্বসতি ও তাহার আনুষঙ্গিক অসংখ্য সমস্যার জটিলতায় ইহার সমাধান হয় নাই। যতই তাহা বিলম্বিত হইতেছে, ততই নানাপ্রকার বিষক্রিয়া স্থায়ী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভীষণ পরিণামের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছে। বস্তুতঃ এ অবস্থা বেশীদিন চলিলে উভয় বঙ্গেরই ভবিষ্যৎ অতিশয় শোচনীয়। যে ধর্ম্মের জন্য একটা বর্দ্ধিষ্ণু দেশকে কাটিয়া দুইখান

করা হইয়াছে, সেই ধর্ম্মই সমাজ হইতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। চুরি, জুয়াচুরি, দুর্নীতি প্রভৃতি নানাপ্রকার পাপ সমাজজীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া দিয়াছে।

বাঙলার কৃষ্টিগত ঐক্য কোন ঐতিহাসিক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সমগ্র ভারত হইতে বাঙলা স্বতন্ত্র। তাহার শিল্পকলা, ধ্যানধারণা, জীবন-ধর্ম্ম—সকলই স্বতন্ত্র, স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বাঙলাসাহিত্য, বাঙলার ঐতিহ্য ও বাঙালীর চরিত্রই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এইরূপে এক সংস্কৃতিবদ্ধ অখণ্ড বাঙলার প্রাণশক্তি ছিন্নদেহে সম্ভব হয় না। উভয় বঙ্গের বিপন্ন কৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাই প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

উপসংহারে নিখিল বঙ্গের বিপন্ন অধিবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই আহিমাচল-কুমারিকা 'বঙ্গালখেদা'র কথা। রাজনীতি বুঝি না। বিনীতভাবে বলি—বাঙালী তোমরা কেহই হয়তো বুঝ না। আত্মঘাতী মিথ্যা প্রপঞ্চে পড়িয়া আমরা আজ যে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছি, ইহা একবার যেন আমরা নিরাবেগে শান্তভাবে চিন্তা করি। বঙ্গবিভাগে বাঙালীর কোন শুভ নাই। 'বাঙালী আজ যাহা ভাবে, ভারত কাল তাহাই ভাবে'—এই মহাসত্য আবার যেন আত্মপ্রকাশ করে।

বাধ্যতামূলক সামরিক-শিক্ষা

পৃথিবীতে দীর্ঘকাল যাবৎ যুদ্ধবস্তুটা গৌরবই পাইয়া আসিয়াছে। বীরত্ব এতাবৎ শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বের সম্মান ভোগ করিয়াছে এবং বীর ভোগ করিয়াছে বসুন্ধরা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মানুষের মন যুদ্ধের মহামারী-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রমেই উহার প্রতি বিরূপ হইয়া গিয়াছে। দুই-একটা মহাযুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসলীলায় নেহাৎ দৈবক্রমে যাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে, অথবা বাঁচিয়া যাহারা মরিয়া আছে, সেই মানুষের প্রাণের আকূতি আজ সমরের জন্য নহে—শান্তির জন্য। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলে তাই সামরিক শিক্ষা কেহ সমর্থন করিবে না। আমরা ভারতবাসী; আমাদের আবার শান্তির প্রতি ঝোঁকটা একটু মাত্রাতিরিক্ত। কাজেই সমরগন্ধি বিষয়মাত্রই আমাদের নিকট সমর্থনযোগ্য নহে।

কিন্তু তথাপি সামরিক-শিক্ষা প্রয়োজন। ভারতবর্ষেই আবার সে প্রয়োজন অতিশয় প্রবল। ভারতের সুপ্ত শৌর্য্য ও লুপ্ত শক্তির বোধন করিতে হইলে গালভরা শান্তির বাণী উচ্চারণ করিলে হইবে না। দেহে-মনে, অভ্যাসে ও আচরণে দেশবাসী যাহাতে বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহারই প্রয়োজনে আমাদের দেশে সামরিক-শিক্ষার প্রবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই শিক্ষাকে

আবার বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন এই কারণে যে, দীর্ঘদিন অপরিচয়ের ফলে সত্যকার কল্যাণপ্রদ বস্তুও মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে চাহে না। তাহা ছাড়া শ্রমকুণ্ঠা আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। সস্তা নোটের সাহায্যে তিনদিনে যে শিক্ষা গুলিয়া খাওয়া যায়, সেই পরীক্ষাসর্ব্বস্ব শিক্ষার আবেষ্টনে বর্দ্ধিত ছাত্রের পক্ষে নিয়মিত ও অনবচ্ছিন্ন প্রয়াসে অনিচ্ছা স্বাভাবিক। সামরিক-শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলেও স্বভাবতঃই সে নোটের ভরসা না পাইলে ও-পথে পা বাড়াইবে না। অতএব বাধ্য করিয়াই ছাত্রকে সামরিক-শিক্ষা দিতে হইবে—শিখাইতে হইবে সবল দুইটি চরণে ভর করিয়া কত সহজে বিচরণ করা চলে। শোচনীয় এই পরমুখাপেক্ষিতার স্থলে আত্মনির্ভরতা আনিতে হইলে ইহা পরম কার্য্যকরী হইতে পারে।

সমর ও শান্তির গতানুগতিক তর্কটা এক্ষেত্রে নিরর্থকই বিবেচনা করি। কারণ, আজিকার সমর ও শান্তির গোড়ার কথা মূলতঃ অর্থনৈতিক—নিছক মানসিক বিকৃতি নহে। কাজেই যুদ্ধবিদ্যার প্রচার হইলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে, একথা মানিতে রাজী নহি। তাহা ছাড়া যুদ্ধের প্রস্তুতি নাকি শান্তির ভিত্তি, এমনও একটা যুক্তি আছে। সে যাহাই হউক, নির্বীর্য্যের ক্লীবত্ব অন্ততঃ শান্তি নহে; শক্তিমানের শক্তিসংযমই সত্যকার শান্তি। শান্তিবাদীরও শক্তিচর্চ্চায় আপত্তি থাকা সঙ্গত নহে। সুতরাং সামরিক-শিক্ষার বিরুদ্ধে আর কোন যুক্তি টিকে না। ভারতে তাহার আশু প্রচলন সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

শহরের রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, রেলে বা জনসমাবেশে একবার তাকাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় বেসামরিক-শিক্ষার বিশৃঙ্খল অভ্যাস কি ভয়াবহ অবস্থায় পৌছিয়াছে। এ শুধু বাহিরের ব্যাপারে নহে, গৃহাভ্যন্তরেও আমাদের শৃঙ্খলার বড় অভাব। সমগ্র জীবন আমাদের অবিন্যস্ত, কেমন বিশৃঙ্খল—প্রায় উচ্ছৃঙ্খল। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে সামরিক-শিক্ষা না হইলেই নয়। শৃঙ্খলাই সামরিক-শিক্ষার মূলকথা; আর কিছু না হউক, অন্ততঃ শৃঙ্খলাবোধ আনয়ন করিতে পারিলেই ইহার অশেষ উপযোগিতা মানিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু শৃঙ্খলা-শিক্ষা তো আর একটা কঠিন শব্দরূপ, বা জ্যামিতির উপপাদ্য বা ঐ ধরণের কোন বস্তু নয় যে মুখস্থ করিয়াই বাজী মাৎ করিয়া দেওয়া যায়। শৃঙ্খলাবোধ আসে আরও নানা গুণের বিকাশের মধ্য দিয়া। ইহার জন্য নিয়মানুবর্ত্তিতা চাই, চাই বাধ্যতা ও সময়জ্ঞান। সামরিক-শিক্ষায় এসকল গুণের বিকাশ তো করেই, তাহা ছাড়া শক্তি, সাহস ও অকুতোভয়ে আত্মত্যাগের মহৎ শিক্ষাও ইহা মর্ম্মমূলে গভীরভাবে মুদ্রিত করিয়া দেয়।

এরূপে মানুষের দেহমনের অনেকগুলি বৃত্তির স্ফুরণে ও চরিত্রবিন্যাসে সহায়ক বলিয়া সামরিক-শিক্ষার উপযোগিতা আমাদের বর্ত্তমান সকল শিক্ষা অপেক্ষা বহু

অধিক। মানুষ গড়াই যদি শিক্ষার মুখ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য হয়, তবে এই পুঁথিগত বিদ্যা, এই পাশের শিক্ষা যে উহার তুলনায় হেয় তাহা বলাই বাহুল্য। স্বীকার করি সামরিক-শিক্ষা মানুষের সূক্ষ্ম সুকুমার ও কোমল বৃত্তিগুলির লালন করে না, বরং কখনও কখনও উহাদের দলনই করে। তথাপি উহার প্রচলন আশু কর্ত্তব্য। যাহা উহার সাধ্য নহে তাহার জন্য তো সাধারণ শিক্ষা রহিলই। সাধারণ শিক্ষার আনুষঙ্গিকরূপেই সামরিক-শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

একহিসাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অর্থহীন শিরোনাম। কারণ, প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য দেহ ও মনের যুগপৎ বিকাশসাধন; কাজেই স্বাস্থ্যের প্রশ্ন শিক্ষারই অঙ্গীভূত—ইহাকে পৃথক্ করিয়া বিচার করার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ এখন শিক্ষা বলিতে বিদ্যাচর্চ্চাই বুঝায়। স্বাস্থ্য বলিতেও তেমনি কেবল দেহের কথাটাই বুঝায়। প্রচলিত অর্থে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুইটি পৃথক্ বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ মনকে পুষ্ট করা। জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এই মনের উৎকর্ষেরই জন্য। বুদ্ধি, কল্পনা ও অনুভূতিগুলি লইয়া যে মন, তাহার সযত্ন লালন সৃষ্টির আদিকাল হইতে অনবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। শত শতাব্দীর সেই অভিজ্ঞতা মানুষ আজ তাহার বিজ্ঞানী বুদ্ধির সাহায্যে স্বল্প পরিসরে আহরণ করিয়া লইয়াছে। একত্রিত, বিশ্লেষিত ও বিন্যস্ত হইয়া এই বিপুল জ্ঞানের নিষ্কর্ষটুকুই আজ শিক্ষার ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে। মানুষের মন বড়ই বিচিত্র। তাহার অসংখ্য সূক্ষ্মজটিল প্রকোষ্ঠে দীপশিখা জ্বালিয়া দেওয়াই আজিকার শিক্ষার মুখ্য প্রয়াস। মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রটির শতসহস্র তার। কোনটি ছিন্ন, কোনটি মরিচাপড়া, আর তাহাদের অধিকাংশ নীরব। অনুভূতি-যন্ত্রের এই সহস্র তারের সুর বাঁধিয়া তান ও লয় ফুটাইয়া তোলাও শিক্ষার আদর্শ। আদর্শ তাহার চেতনাকে সর্ব্বমুখী ও সংবেদনশীল করিয়া তোলা। তাহারই জন্য এত কাব্য, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, আরও কত কি! পাঠের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হয় মনের উপর মনের ক্রিয়া। অমনি মানুষের অন্তর্লোকে সাড়া পড়িয়া যায়। প্রভাতসূর্য্যের আলোকস্পর্শে যেমন ফুলের পাপড়িগুলি একে একে চোখ মেলে—যেমন করিয়া বিস্ময়কর বর্ণসুষমা বিকশিত হয় উহাদের পরতে পরতে, ঠিক তেমনি এক রহস্য প্রক্রিয়ায় সুপ্ত বৃত্তিগুলির ঘুম ভাঙে। শিক্ষার প্রয়াস সার্থক হয়।

কিন্তু মনের সহিত দেহের সম্পর্ক অতি নিবিড়। বিদ্রোহী মন অবাস্তব, আর মনোহীন দেহ জড় মাংসপিণ্ডবিশেষ। অতএব মনকে পুষ্ট করিতে হইলে দেহকে

উপেক্ষা করা চলে না। শিক্ষার সহিত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক এই কারণে অতিশয় ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ স্বাস্থ্য ও বিদ্যা পরস্পরসাপেক্ষ—একটি অপরটির পরিপূরক। সুস্থ দেহ উন্নত মানসিকতার প্রকৃষ্ট আধার—একথা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু উৎকৃষ্ট মন কিরূপে সুস্থ দেহের পরিপূরক তাহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মহিষের দৈহিক স্বাস্থ্য খুব ভাল, কিন্তু মানুষের তেমন ভাল স্বাস্থ্য নেহাৎ বাহুল্য। আর বুদ্ধিটাও যদি নিতান্তই মাহিষ্য হইয়া উঠে তবে বড়ই বিপদ্। তেমন মানুষ চিড়িয়াখানা বড় জোর সার্কাসে কদর পাইতে পারে, কিন্তু সমাজে তাহার অবস্থান বিপজ্জনক। তাই দেহকে পুষ্ট করার সঙ্গে মনটারও বিকাশ প্রয়োজন। আর মনের বিকাশও যে দৈহিক স্বাস্থ্যের বিনিময়ে সাধনীয় নহে, তাহাও ভাল করিয়া বুঝা দরকার। পণ্ডিতগণ বলেন, আমাদের এই ঝগড়াটে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি একদা চর্চ্চার অভাবে একেবারে আর গজাইবেই না। সুদূর ভবিষ্যতে নাকি মস্তিষ্কটি বিস্ফারিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্ষীণ ও হ্রস্ব হইয়া এক কিম্ভূতকিমাকার মনুষ্যজাতির উদ্ভব হইবে। অন্ধ বিবর্ত্তন কোন্ পরিণতির মুখে মানুষকে চালিত করিতেছে বলা দুষ্কর। কিন্তু আপাততঃ কলার প্রতীকরূপে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপযোগিতাও আছে। হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির যথাবিহিত পরিচালনা ব্যতীত এখনও জগৎ অচল। তাই শিক্ষার সহিত স্বাস্থ্যের চর্চ্চা আজও অপরিহার্য্য।

স্বাস্থ্যের প্রশ্নটা গভীরভাবে দেখিলে মানসিক ব্যাপারেও প্রযুক্ত হইতে পারে। মনেরও স্বাস্থ্য আছে। বিকৃত বুদ্ধি, উদ্ভট কল্পনা, উৎকেন্দ্র অনুভূতি—এ-সকলই অস্বাস্থ্যের অর্থাৎ উন্মাদের লক্ষণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাই যুগপৎ মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যবিধান।

আমাদের দেশে এ উদ্দেশ্য কতটুকু অনুসৃত হইতেছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ছাত্রদের প্রতি সদুপদেশ-পরিবেষণ অতিশয় সাধু। কিন্তু আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে, উপদেশকে জীবনে গ্রহণ করিবার সুযোগ দিতে হইলে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আদর্শ রূপ দান করা বিধেয়। আমাদের এই বিদ্যালয়ের ঢালাইযন্ত্রে সে-উদ্দেশ্য কখনও বিধেয় হইতে পারে না। এখানে পরীক্ষা-বৈতরণী উত্তীর্ণ হইবার জন্য স্বাস্থ্যনাশ করিয়া নোটের তরণী বাহিয়া চলিলেও হয়। অন্ততঃ শিক্ষার সহিত স্বাস্থ্যের যোগাযোগ এদেশে কার্য্যতঃ স্বীকৃত নহে—ইহাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ। এ অবস্থার প্রতিকার না হইলে দেশের কল্যাণ নাই। এ-বিষয়ে কর্ণধারগণের আশু দৃষ্টিপ্রসার হইলেই পরম সৌভাগ্য। নচেৎ 'মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ'।

নিরুদ্দেশ-যাত্রা

এত বড় একটা রাজনৈতিক বিপ্লবের বিচিত্র সমস্যার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে আমার মনের কোণে বিকাশোন্মুখ আদর্শটি কবে কখন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। রিক্ত মানসলোকে ক্ষণে ক্ষণে অগণ্য আশার বুদ্‌বুদ ফুটিয়াই ফাটিয়া যায়—দিশাহারা ক্ষুদ্র মনটি আমার কোন একটি কঠিন বন্ধনময় একান্ত অবলম্বনকে আশ্রয় করিতে পারে না। আমি যেন স্রোতের ফুল—জীবন-নদীর প্রবাহপথে ভাসিয়া চলিয়াছি। এই অবারণ চলার মধ্যেই কিন্তু জীবনের নিশানা একটা মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই; উহা স্থিরলক্ষ্য নহে—অস্থির নিরুদ্দেশ-যাত্রা। অথচ ইহাই আমার প্রকৃতি-সঙ্গত। আদর্শ ভবঘুরে হইব, আপাততঃ ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য।

লোকে ধিক্কার দিবে জানি। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল-ব্যারিষ্টার, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যবসায়ী—নিদেন-পক্ষে একজন দেশসেবী হইবার আকাঙ্ক্ষা কার না মনে জাগে? এ সকল মহৎ লক্ষ্য ছাড়িয়া শেষে কিনা একটা গৃহহীন লক্ষীছাড়া জীবনের প্রতি অনুরাগ! হঠাৎ ঘৃণায় আপনার নাসিকাটা কুঁচকাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভবঘুরে কি সত্যই উপেক্ষার পাত্র? সামাজিক সংস্কার ও পার্থিব ভোগলালসার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিলেই দেখা যাইবে যে, এ জগতে সত্যকার মহান্ প্রাণী একমাত্র ভবঘুরেই।

দুর্নীতির কলুষপ্লাবনে মনুষ্যসমাজ আজ আবিল। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাপের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। ক্ষুদ্রবৃহৎ বহু মনস্বীরই এই মত; আপামর জনসাধারণের ইহাই কঠোর অভিজ্ঞতা। এমন যে মনুষ্যসমাজ, তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া কি একপ্রকার শ্লাঘ্য প্রব্রজ্যা নহে? স্বার্থসংস্কার ছাড়িয়া, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মায়া ত্যাগ করিয়া বিদায় লইতে চাই পাপপঙ্কিল এই ঘাতসংঘাতময় সমাজ হইতে। বিশ্বের বিশাল বক্ষে চলিবে আমার অনন্ত পরিক্রমা। স্থানকাল-পাত্রের পরিসীমা অতিক্রম করিয়া আকণ্ঠ পান করিব উদার মুক্তির অমৃতধারা। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস-সম্বন্ধে যেমন সর্ব্বদা সচেতন নহি, মানুষের মধ্যে থাকিয়া মানুষের তথ্যটিও তেমনি ভুলিয়া থাকি। চোখবাঁধা কলুর বলদের মত কেবল ঘুরিয়া মরাই সার হয়—জীবনের গভীর রহস্যলোকে একবার ক্ষণেকের জন্যও উঁকি মারিয়া দেখার সুযোগ নাই। একমাত্র মায়ামুক্ত ভবঘুরেটিই এবিষয়ে ভাগ্যবান্। জীবনস্রোতের বিচিত্র তটে অবারিত তাহার গতি—দুঃখসুখ আশা-নিরাশার লীলাচঞ্চল বিক্ষোভ সে দেখে। অনাসক্তভাবে সে বিচার করিতে পারে এ-জীবনের বিপুল তাৎপর্য্য অর্থাৎ প্রকাণ্ড ফাঁকিটা।

ঋষি নাকি প্রতিবেশীহীন গৃহী; ভবঘুরে গৃহহীন ঋষি। অথচ বিশ্বমানবেব সে নিত্য প্রতিবেশী। অরণ্যের নিবিড় শান্তি তাহার কাম্য নহে—পাপ-পুণ্যে সুখে-দুঃখে মানুষেরই সে চিরসঙ্গী। তবে মোহের বন্ধন কখনও তাহাকে বাঁধিতে পারে না। জীবন-কুঞ্জে ভ্রমরের মত প্রতি হৃদয়-শতদল হইতে পান করে সে মধু। সকলেই তাহার আপনার; অথচ কাহারও সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সুখস্পর্শটুকু জটিল মনুষ্যের জটিলতর হৃদয়ের অনুভূতিলোকে তাহার রসঘনরূপে জমিয়া উঠে। মানুষকে তাই সে নিঃস্বার্থভাবে এবং মোহলেশহীন চিত্তে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে।

মানবপ্রেমিক, মুক্ত-উদার, বন্ধনহীন এই ভবঘুরে-জীবনই আমার কাম্য। আনন্দের আবেগে বাউলের মত ঘুরিয়া ফিরিব সারা বিশ্বে। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় অমৃতের বাণী শুনাইয়া যাইব মানুষের কানে কানে।

বলিতে পারেন সামাজিক দায়িত্ব এড়াইয়া জীবনের কঠোরতার ভয়ে পলায়নের ইহা পন্থা। বলিতে পারেন মানুষের সমাজে দায়িত্ববোধ কর্ত্তব্যকুণ্ঠ এ জীবনাদর্শ এযুগে নেহাৎ অচল। কিন্তু অশ্বত্থের ক্রোড়ে ঐ যে ক্ষুদ্র পরগাছাটি, উহা যে সস্নেহ লালনে পরিপুষ্ট নয়, একথা কি জোর দিয়া বলা যায়? মানুষের রাজ্যেই বা কেন তবে দু-একটা নির্ব্বিষ সুচারু পরগাছা সকল স্নেহের দাবী হইতে বঞ্চিত রহিবে?

প্রকৃতপক্ষে সমাজের নিকট নানাভাবে বঞ্চিত বলিয়াই মনটা আমার উদাস হইয়া পড়িয়াছে। মানুষকে আমি প্রাণ দিয়াই ভালবাসি। কিন্তু মানুষের রাজ্যে পুঞ্জীভূত সংস্কার ও যুগসঞ্চিত অন্যায় আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু রক্তপাগল বিপ্লবীর অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। কেবল একটা অশান্ত বিক্ষোভ পাগল করিয়া উহা আমাকে পথে টানিয়া আনে। ইহা ভাবালুতার আতিশয্য হইতে পারে, হইতে পারে ইহা দুর্ব্বলচিত্তের পলায়ন-কামনা; কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনার সার্থকতা নাই —আমি আমাকে চিনি। এই উদাস ভবঘুরে-জীবনই আমার জন্য শান্তিসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। তাই আমি চাই আদর্শ ভবঘুরে হইতে।

উদ্বাস্তু-সমস্যা ও পুনর্বাসন

ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ যে-সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এই উদ্বাস্তু-সমস্যা। ইহার অব্যবহিত প্রভাব এবং দূরবর্ত্তী পরিণাম দুইই সমপরিমাণে ভয়াবহ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সমস্যাটিকে সর্ব্বভারতীয় সমস্যারূপে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের প্রাদেশিক মুখ্য অমাত্যও কাজে বা কাগজে এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট তৎপরতা-প্রদর্শনে প্রয়াসী রহিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি বলিব—মূলেই ভুল রহিয়া গিয়াছে। সমস্যাটির সম্যক্ স্বরূপ ও উহার গুরুত্ব-সম্বন্ধে যেন কেহই তেমনভাবে বিক্ষুব্ধ বোধ করেন নাই।

একটু বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাপারটি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে পড়ে, জাতীয়তার পীঠস্থান, স্বাধীনতাসংগ্রামের সর্ব্বপ্রথম শিবির এই বাঙলাই একদা 'বঙ্গভঙ্গ' রহিত করিবার জন্য সারা ভারতে মুক্তিকামনার বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল। নিয়তির ক্রূর পরিহাস—সেই বাঙলাই কিনা স্বেচ্ছায় বঙ্গবিভাগ চাহিয়া লইয়াছে! কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইল সে কাহিনী অতিশয় রূঢ়, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য। সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিবেশে বাঙলার কথা চিরকালই উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন' নীতির ফলে বাঙলার মসনদে লীগের অধিষ্ঠানকে বিদেশী ভেদনীতির শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিতে পারি। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই নবজাগ্রত মুসলমান সাধারণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি বিষাইয়া উঠিতে থাকে এবং কালক্রমে বাঙলাই লীগের শক্তির প্রধান উৎস হইয়া উঠে। তারপর দিনের পর দিন জাতিবিদ্বেষের নিরবচ্ছিন্ন বিষোদ্গারের মধ্য দিয়া ঘনাইয়া আসে ১৯৪৬ সাল। মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাক্রমে ভারতের অন্তর্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ঠিক অব্যবহিত পরেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অবর্ণনীয় হত্যালীলায় রক্তস্নান করে কলিকাতা। নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাব—একের পর এক পৈশাচিক বর্ব্বরতায় মত্ত হয় নৃশংস হত্যালীলায়। এই শোচনীয় অবস্থায় কংগ্রেসী অধিনায়কবৃন্দের দুর্ব্বল স্নায়ু সহসা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহারা স্বীকার করিয়া লয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ। অতএব "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—এই নীতিতে অমুসলমান বাঙালীকে বঙ্গবিভাগ মানিয়া লইতে হয়।

এইভাবে বাঙলা দুই ভাগ হইয়া গেল ; এক ভাগ হইল 'ধর্ম্মহীন' রাষ্ট্রের অন্তর্গত, অপর ভাগ কবলিত হইল ধর্ম্মান্ধতার গভীর তিমিরে। পূর্ব্ব-পাকিস্তান ঐস্লামিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হইল। 'জিম্মি'-পর্য্যায়ভুক্ত হিন্দু অধিবাসিগণ স্বভাবতঃ নিজেদের বিপন্ন বোধ করিয়া যাত্রা করিল ভারতে। সেই হইতে সুরু হইয়াছে উদ্বাস্তুর ক্রমাগত প্রবাহ। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দো-পাক চুক্তি সে প্রবাহে সাময়িক একটা বালির বাঁধ মাত্র রচনা করিল, কিন্তু ১৯৫০-এর শোচনীয় ঘটনাবলী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিল যে পাকিস্তান হিন্দুর বাসোপযোগী নহে। বর্ত্তমান উদ্বাস্তু-সমস্যার গোড়ায় ইহাই শাদা সত্যকথা।

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় অসহায় ভারত সরকারকে এই সত্য চাপিয়াই চলিতে হইতেছে। কিন্তু বাঙালীর মত একটা বুদ্ধিমান্ জাতিকে বড় জোর অন্যায়-অত্যাচারই করা চলে, ধাপ্পা দেওয়া যায় না। তাই দিল্লীচুক্তির পরও উদ্বাস্তু-প্রবাহ প্রশমিত হয় নাই ; কারণ, পূর্ব্ববঙ্গের

নিছক শান্তি-শৃঙ্খলার সহিতই মাত্র ইহা জড়িত নহে, ইহার মূলে রহিয়াছে একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক কারণ। একটা কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল যে, একজন হিন্দুও পাকিস্তান চাহে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের সহস্র শহীদ স্বাধীনতার জন্য যে এত রক্ত দান করিয়া গেল, তাহার প্রতিদানে আপনাদের 'জিম্মিদশা' কেমন করিয়া একজন হিন্দু অন্তর দিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে? ধর্ম্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি ও সত্যকার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ঘৃণ্য অস্তিত্বরক্ষার জন্য কোন চেতনাবান্ মানুষের পক্ষে নিজদেশে প্রবাসী হইয়া থাকা সম্ভব নয়; তাই পাকিস্তানী হিন্দু যে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত হইতে পারে নাই, একথা সম্ভবতঃ সর্ব্বৈব সত্য। আজকাল শুনিতে পাই, অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলেই হিন্দু উদ্বাস্তুর পূর্ব্ববঙ্গত্যাগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সত্য কথাটা আরও একটু ঘুরাইয়া বলিলে হয় এই যে, কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থই পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর একমাত্র বন্ধন ছিল। সেটুকুও ধ্বসিয়া যাওয়ায় আজ আর তাহাদিগকে দেশত্যাগ হইতে কোন চুক্তিই বিরত করিতে সমর্থ নহে। অতএব উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিব, তাহার মূলে এই কথাটি যেন স্বীকৃত থাকে যে ইহা প্রায় এক কোটি লোকের পুনর্বাসন-সমস্যা।

দ্বিতীয়তঃ এই বিপুল সমস্যার সমাধানের মূল দায়িত্ব ভারত সরকারের—এই কথাটি ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস-সভাপতি ট্যাণ্ডনজী সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন। ভারত সরকারও যে এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবহিত নহেন, এমন নহে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তাঁহারা যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা অনেকটা সূক্ষ্ম প্রতারণায় অসহায় উদ্বাস্তুদের পাকিস্তানী অগ্নিকুণ্ডে পুনরায় নিক্ষেপ করারই দিকে নির্দ্দিষ্ট। পাঞ্জাব ও বাঙলার উদ্বাস্তু-নীতি তাই সম্পূর্ণ-বিভিন্ন। সমস্যাও কিঞ্চিৎ পৃথক্ সন্দেহ নাই। কারণ, বাঙলার বেলায় বাধ্যতামূলক লোকবিনিময়ে সরকার সম্মত নহেন। অতএব পুনর্বাসনসমস্যা এখানে অত্যন্ত গুরুতর। নেহরুনীতির অবাধ্যতা সম্ভব নহে, অথচ ক্ষুদ্র খণ্ডিত পশ্চিম-বাঙলার পক্ষেও এক কোটি লোকের স্থান-সঙ্কুলান অসম্ভব। এই অবস্থায় বাঙালীকে উড়িষ্যা, বিহার, হায়দ্রাবাদ, আসাম ও আন্দামানে নির্ব্বাসনের সুবর্ণসুযোগ অবহেলিত হয় নাই। স্বীয় কৃষ্টি, স্বীয় স্বাতন্ত্র্য জলাঞ্জলি দিয়া নূতন দেশে নূতন অবস্থায় বাঙালীকে এই যে আত্মোৎসর্গ করিতে চাপ দেওয়া হইতেছে, ইহাকেও ঐস্লামিক জবরদস্তি অপেক্ষা কম নৃশংস বলিতে পারি না।

পুনর্বাসনের বিপুল কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন একটা বিশদ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা অবশ্যই অসম্ভব। কেবল উহার মূলনীতিটি-সম্বন্ধে বাঙালীর অন্তরের কথাটিই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে চাই। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তাদিগকে স্মরণ রাখিতে

হইবে যে, দেশ-বিভাগ গণভোটের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা পুরাতন পরিষদে আইনপ্রণয়নাদির জন্যই মাত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই দেশবিভাগের মত এত বড় একটা সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন—তাহার জন্য দেশবাসীর যাবতীয় দুঃখকষ্ট ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহাদেরই। কাজেই বাঙালী হিন্দু যদি আজ দাবী করে যে, আর তাহাদের বিভক্ত করা চলিবে না, তবে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাহা সকল ভারতীয় পরিষদবর্গের মানিতেই হইবে। লোকবিনিময় করিতে না চাও, না করিলে; পাকিস্তানের বর্ব্বর অত্যাচার নির্বীর্য্য নপুংসক নীতিবলে সহিতে চাও, সহিয়া যাও। কিন্তু বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া নব্য বঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই। বিহার-উড়িষ্যার বাঙালী অঞ্চলগুলিতেই বাঙালী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। বড় জোর ত্রিপুরা-করিমগঞ্জ সীমায় ও গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাঙালী অঞ্চলগুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। যেভাবেই হউক, বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাঙালীকে একত্র প্রতিষ্ঠিত করার নীতিই আমরা চাই। আজ ভারতে এই দাবীকে প্রাদেশিকতা বলিয়া দাবাইয়া রাখার চেষ্টা করা হইতেছে। স্বার্থপর কংগ্রেসী দলাদলিতে বাঙালীর এই দাবী সমবেত কণ্ঠে সমুচ্চারিত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিদের পক্ষে সমীচীন হইবে না, একথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। সহস্র সহস্র অসহায় উদ্বাস্তুর অজস্র রক্ত পূর্ব্ব-বাঙলার মাঠ-প্রান্তর হইতে হয়তো একদিন বর্ষার প্লাবনে ধুইয়া-মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু উদ্বাস্তুর ক্ষতস্রাব আজিও ভারতের মাটি রক্তরঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, রক্ত তরল কিন্তু উহার বর্ণ তেমন নহে। কে বলিতে পারে পূবের আকাশে যে রক্তাভা দেখিতেছি তাহাতে আর ইহাতে মিলন ঘটিয়া দাবানল জলিয়া উঠিবে না? কেহ বলিতে পারে শত সীতার পাশবিক অপহরণ, সহস্র দ্রৌপদীর দুর্ব্বিষহ অপমান রক্তলোলুপ মানুষ হইয়া জন্ম লইবে না? নারীগণ মাতৃজাতি, ভবিষ্যৎ বিদ্রোহীর জননী—এই সত্য স্মরণ রাখিয়া ভারতের ঐতিহ্যরক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহারা যেন আর বাঙালীকে বিভক্ত না করেন।

"বিত্ত হ'তে চিত্ত বড়, এই ভারতের সত্য বাণী" (ক. বি. ১৯৫১)

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আকস্মিক আক্রমণে শতাব্দীকাল ধরিয়া ভারতবাসী দিশাহারা প্রমত্তদশায় পতিত হইয়াছে। মোহঘোরে ভুলিয়া গিয়াছে সে তাহার সনাতন সত্যসাধনা। ইউরোপের জড়বাদ তাহার বাহ্য চমক ও আপাতচমৎকারিত্বের মরীচিকায় মানুষের স্থূল ভোগতৃষ্ণাকে অতিশয় তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। ফলে

ভারতের সরল সন্তোষ-সমাহিত শান্তজীবন সহসা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত চঞ্চল ও অনুকরণপ্রিয় একটা অংশ অমৃতের সাধনা ছাড়িয়া অনৃত ভোগবিলাসে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল তোতাপাখীরই মুখে পাশ্চাত্ত্য অপপ্রচার আমরা শতাব্দীকাল শুনিয়া আসিয়াছি এবং ভারত সভ্য কিনা—এমন একটা অবান্তর প্রশ্নের সম্মুখে অনেকে সন্দিহানও বোধ করিয়াছি ; কারণ, বিত্ত হইতেও যে চিত্ত বড়, দেহ হইতেও যে আত্মা শ্রেয়—এই সত্য ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে বহুকাল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীন ভারতের বিশদ ইতিহাসও আজ আর সর্ব্বাবয়বে জানিবার উপায় নাই। এদেশের রাজপুত্র কেন পিতৃসত্যরক্ষার জন্য নির্ব্বাসন বরণ করিত, কেন সে সুখবিলাস বর্জ্জন করিয়া জীবের মোক্ষচিন্তায় অশ্বত্থমূলে দীর্ঘ সাধনায় মগ্ন হইত? এদেশের অশোক কোন্ সাধনায় ধর্ম্মাশোক হইল, মহামতি কৌটিল্য একটা বিরাট্ সুসংহত সাম্রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের হাতে তুলিয়া দিয়া কেন নিজে চিরকাল দরিদ্র ব্রাহ্মণই রহিলেন, কেনই বা এই সেদিনও বুনো রামনাথ পণ্ডিত তিন্তিড়ীপত্র ও স্থূল তণ্ডুলেই তৃপ্ত থাকিতেন? এই সকলেরই মূলে রহিয়াছে ভারতীয় সাধনার একটি নিগূঢ় সত্যোপলব্ধি। ভারতবর্ষ কখনই ইহকালকে সর্ব্বস্ব মনে করে নাই। জীবনকে জীবের সাধনার সোপানরূপে সে দেখিয়াছে। ফলে তাহার দৃষ্টি ছিল সর্ব্বদা অন্তর্মুখী। আত্মিক বিকাশ ও নৈতিক পরাকাষ্ঠাই ছিল তাহার লক্ষ্য। জাগতিক ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা আন্তর বিভূতিই ছিল তাহার অধিকতর কাম্য।

এদেশের পূজাপার্ব্বণ, ধর্ম্মকর্ম্ম আর আমোদ-উৎসবের সর্ব্বত্র আমরা এই কামনাটি সর্ব্বদা অভিব্যক্ত দেখিতে পাই। ঐশ্বর্য্যকে এখানে আত্মকেন্দ্রিক ভোগে নিয়োগ করা হইত না। দান-ধ্যানে আতিথ্যে-সেবায় সকলের মধ্যে সম্পদের পরিবেষণেই যেন সম্পদের চরিতার্থতা নিহিত ছিল। হৃদয়কে যে ভারতবাসী সম্পদের উর্দ্ধে স্থান দিত, ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য বিদ্বান্, সকলেই সেকালে ছিলেন নির্লোভ, নিরাসক্ত। তাঁহাদের জ্ঞানের সাহায্যে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা পাইত, বৈশ্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইত, কিন্তু জ্ঞানী আর গুণিগণ চিরকাল অল্পে তুষ্ট, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত শুচিসুন্দর জীবনই বাছিয়া লইতেন। কেন? উত্তর—"বিত্ত হ'তে চিত্ত বড়, এই ভারতের সত্য বাণী।"

কিন্তু অতীতে ও বর্ত্তমানে বহুবার এই বাণীর সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহও প্রকাশ পাইয়াছে। এদেশেরই চার্ব্বাক বলিয়াছেন—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। আর বিদেশের বস্তুবাদিরা তো বরাবর ভোগকেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে, ফলে বিত্তের সাধনায় তাহারা চিত্তের দাবীকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। অতএব প্রশ্ন হইল সত্য কোন্‌টি?

স্বনামখ্যাত ইংরেজ মনীষী একবার বলিয়াছিলেন যে, "Happiness lies in the multiplicity of agreeable consciousness". অর্থাৎ সুখ বস্তুটি চেতনার আনন্দপ্রদ অনুভূতিসমূহের বাহুল্যের মধ্যেই নিহিত। বস্তুতঃ বস্তুর মধ্যে তো সুখ নাই; বিত্ত তাই সুখের আধার হইতে পারে না। সুখ অনুভূতির ব্যাপার এবং সেই সুখদ অনুভূতির প্রাচুর্য্য ঘটিতে পারে একমাত্র হৃদয়েরই অকৃপণ পরিবেষণে। টাকা জমাইয়া কেহ কেহ সুখ পান, কেহ কেহ কেবল আপনার ভোগসুখে অর্থ ব্যয় করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। আবার এমন লোকও আছে যাহারা বিত্তের অহঙ্কারেই আনন্দলাভ করে। আসলে এসকল বিকৃত মনোভাব। ভোগে কেবল ইন্দ্রিয়ের স্থূল সুখ। তাহা চেতনায় কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। এইপ্রকার জৈব প্রবৃত্তির সুখকেই কিন্তু প্রতীচ্য সভ্যতা এতাবৎ কামনা করিয়াছে। চার্ব্বাকপন্থী ভোগবাদীদের এই সুখকে মানুষের যোগ্য, অন্ততঃ মানুষের একমাত্র কাম্য বলিতে বিবেকে বাধে। মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ এবং তাহার শ্রেষ্ঠতা কায়িক নহে—মানসিক। যদি তাহাই হয়, তবে তাহার আত্মিক আকৃতিকেই দৈহিক লালসা হইতে উচ্চে স্থান দিতে হয় এবং আত্মার যাহাতে অধিকতর সুখ সেই বস্তুকেই আমরা সত্য বলিব। ভারত এই বাণীই আবহমানকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে। বিত্তকে তাই গৌণ জ্ঞান করিয়া চিত্তকে দিয়াছে সে মুখ্য গৌরব এবং চিত্তপ্রসাদের জন্য সেবাধর্ম্ম হইয়াছে এদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

আজিকার ভারতবাসী পাশ্চাত্য মোহ হইতে মুক্ত হইয়া এই সনাতন সত্য বাণী মর্ম্মে ধারণ করিলে সুখী হইবে। স্বার্থপুষ্ট আত্মকেন্দ্রিকতা আজ চারিদিকে মায়াজাল বিস্তার করিয়া মানুষকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। রেশম-কীটের ন্যায় আপনার জালে আপনি রুদ্ধ হইয়া এও একপ্রকার আত্মহত্যা। জাতির লুপ্ত সংবিৎ আবার কবে ফিরিয়া আসিবে? কবে আবার ভারতবাসী ভাবিবে যে, 'আপনারে ল'য়ে আপনি' থাকিতে আমরা এ জগতে আসি নাই? 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এমনতর মহৎ ঔদার্য্য আবার আমরা কবে ফিরিয়া পাইব? চিত্তকে বিত্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জনকল্যাণে হৃদয় ঢালিয়া দেওয়াই সত্যের নির্দ্দেশ, ভারতীয় সাধনার নিষ্কর্ষ।

বাঙলার কৃষিজীবী (ক. বি. ১৯৪৫, ১৯৫০ ও ম. প. ১৯৫২)

বাঙলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। প্রকৃতপক্ষে কৃষিই এদেশের প্রাণস্বরূপ, কেননা দেশবাসীর অধিকাংশ জনসংখ্যাই কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছে। সুতরাং, সমগ্রভাবে বলিতে গেলে কৃষকের ভাগ্যই বাঙালীর ভাগ্য ; কৃষির ভালমন্দই বাঙালীর ভালমন্দ।

দুর্ভাগ্যের কথা, এ সত্যটি সকলে বুঝে না। বৃটিশ আমল হইতে এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের কত দিকে কত উন্নতি হইয়াছে। আধুনিক কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, তার-বেতার আর বিজলীর বাতি—সকলে মিলিয়া শহরগুলিকে স্বপ্নপুরী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এগুলিই হইয়াছে আমাদের কাল। শহরের এই অস্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের মায়া আমাদিগকে মোহে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাঙলার গ্রাম আর প্রান্তর-গুলির দিক্ হইতে আমাদের দৃষ্টি দূরে সরিয়া গিয়াছে। বহুবৎসর আগেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দেশের এই ভুল চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথও অন্যভাবে একই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাসের ফাঁসে গলা পাতিয়া দিয়া বাঙালী আত্মহত্যারই পথে চলিয়াছে। বাঙলার গ্রাম, বাঙলার কৃষককুল তাই অবহেলিত। তাই তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নাই। অবশ্য ইহার কারণ শুধু শহরের মোহই নহে। কৃষিপদ্ধতির রক্ষণশীলতা, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, জমিবিভাগ প্রভৃতি অসংখ্য কারণও কৃষকের দুর্দ্দশার মূলে নিহিত আছে। এদেশের চাষবাস সেই আদিকাল হইতে একই ধারায় একই রীতিতে চলিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংবাদ এখানে কৃষকেরা কিছুই জানে না। ফলে অধিকতর ফলনের ব্যবস্থাও হয় না। এদিকে কালে কালে দেশের লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। মাথাপিছু জমির পরিমাণও সেই অনুপাতে কমিয়া যাইতেছে। প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনবলে জমিগুলি উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হইয়া ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতেছে। অল্প ও খণ্ডিত জমিগুলি এইভাবে চারিদিকে ছড়ানো। কাহারও সকল জমি এক জায়গায় একত্রে একটি বড় আকারের খামার হয় না। ফলে চাষবাস তথা ফসল উৎপাদনে যথেষ্ট বাধা হয়। ইহার উপর আবার দিনে দিনে জমিগুলির সাধারণ উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ উর্ব্বরতা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। ইহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে উপযুক্ত সারের ব্যবহার প্রয়োজন। কিন্তু এবিষয়ে আমাদের দেশ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। আদিকাল হইতে সেই যে গোবর আর ছাইপাঁশ দিয়া সারের কাজ চলিয়া আসিতেছে, তাহার আর পরিবর্ত্তন ঘটিল না। তাহাও আবার উপযুক্ত পরিমাণে জুটানোও সকল কৃষকের সাধ্য হয় না। কারণ, এইপ্রকার সার কিনিতেও

পয়সা লাগে। কিন্তু বাঙালী কৃষকের হাতে পয়সা কোথায়? ঋণের দায়ে তাহার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সব বিকাইয়া গিয়াছে। এদেশের কৃষক পৈতৃক ঋণ লইয়াই জন্মায় এবং সামাজিক উৎসবাদিতে অমিতব্যয়িতার ফলে ঋণ বাড়িয়াই চলে। তারপর যদি হঠাৎ এক বৎসর দৈববিপর্যয় ঘটে—অজন্মা বা অনাবৃষ্টি, বন্যা বা মহামারী দেখা দেয়, তবে তো কথাই নাই। কৃষক ভিটামাটি ঘটিবাটি সব কিছু বাঁধা দেয় মহাজনের কাছে। এই হইল বাঙালী কৃষকের অবস্থা। এই আমাদের জাতির মেরুদণ্ড।

বাস্তবিক কৃষকেরা যে আমাদের জমির মেরুদণ্ড এ কথাটি ভাল করিয়াই বুঝিয়া রাখা দরকার। এদেশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র আইন দ্বারা শাসিত। এই আইনবলে ভূমির উপর কৃষকের জোতস্বত্ব থাকিলেও তাহার উপর আছে আর একটি মধ্যস্বত্ব। এই মধ্যস্বত্বকে কেন্দ্র করিয়াই এদেশের পরিশ্রমজীবী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সুফলস্বরূপ মধ্যবিত্তের শিক্ষা-সংস্কৃতি যেমনই বিস্তৃত হইয়াছে তেমনই তাহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে। কৃষকের মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাই তাহাদেরও ভালমন্দ নির্ভর করে। মহাজন, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ও পরোক্ষভাবে এই কৃষকদিগের উপরই আশ্রয় করিয়া আছে। তাহা ছাড়া কৃষিপণ্য লইয়া কেনাবেচার সূত্রে এদেশের ব্যবসায়ী মহলও প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। দেশের মধ্যে এখনও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন নগণ্য এবং তাহাতে মুষ্টিমেয় জনসংখ্যাই প্রতিপালিত হয়। বাঙলা এখনও কৃষকের দেশ। তাই কৃষকের দুর্দ্দশাতেই দেশের দুর্দ্দশা, তাহাদের সৌভাগ্যেই দেশের সৌভাগ্য। এককথায় কৃষকই বাঙালীর মেরুদণ্ড।

সুতরাং মেরুদণ্ডটিকে যদি সবল না করা যায় তবে দেহটির অস্তিত্ব অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইবেই, একথা বলাই বাহুল্য। সেইরূপ কৃষকের উন্নতি না হইলে বাঙালীর ভবিষ্যৎ শোচনীয়, একথা সুস্পষ্ট। তাহাদের উন্নতিবিধান করিতে হইলে প্রথমেই চাই শিক্ষাবিস্তার। যুগপ্রাচীন সংস্কার, ভাগ্যবাদিতা ও অজ্ঞানতা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। নূতন যুগের নূতন আলোকে তাহাদের মধ্যে সঞ্চার করিতে হইবে নূতন প্রাণ, নবনবীন প্রেরণা। শিখাইতে হইবে তাহাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, পশুপালন, সারসংগ্রহ প্রভৃতি নানাপ্রকার কৃষিসংক্রান্ত রীতি। তারপর সে-সকল রীতি ও পদ্ধতি যাহাতে কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহারও আয়োজন করিতে হইবে। আধুনিক রীতিতে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কৃষকদিগের খণ্ডিত জমিগুলিকে এক একটি বিরাট্ বিরাট্ খামারের অন্তর্ভুক্ত করা চলিতে পারে। সেই সকল খামারে ট্র্যাক্টর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার তখন সহজ হইবে। তারপর খাল কাটিয়া বা কূপ খনন করিয়া উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

এবিষয়ে অর্থের যোগান দিতে পারে সরকার অথবা কৃষি-ব্যাঙ্ক। তারপর কৃষি সমবায়কে উৎপন্ন ফসলের কেনাবেচার ভারও লইতে হইবে। কৃষকের দৈন্যের সুযোগে সস্তায় মাল কিনিয়া বাজার চড়িলে আবার তাহাদেরও কাছে যে বেশী দামে সেই মাল বেচা হয়, এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের একমাত্র পথ এই সমবায় সমিতি। সমিতি কৃষকদিগকে প্রয়োজনমত ঋণ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবে। প্রতিদানে কৃষকের সকল ফসল বেচিবার একচেটিয়া অধিকার থাকিবে তাহার। ইহাতে অতিরিক্ত যেটুকু লাভ আসিবে তাহার অংশ কৃষকেরাই পাইবে। এইভাবে চলিলে কৃষককুলের অর্থকষ্টের শতকরা ৬০ ভাগই অন্তর্হিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ যন্ত্রপাতির ব্যবহার হইলে কৃষকদিগের কায়িক পরিশ্রমের গুরুত্ব ও সময় উভয়ই হ্রাস পাইবে। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির পথে উন্নতির সুযোগ মুক্ত হইবে। তারপর অবসর সময়টুকুতে তাহারা আরও দুইটা পয়সা যাহাতে রোজগার করিতে পারে সেইজন্য দেশের মধ্যে কুটীরশিল্পের বহুল প্রসার প্রয়োজন। আবহমানকাল ধরিয়া এদেশের শিল্প ছিল প্রধানতঃ কুটীরজাত। সেই বিশ্ববিখ্যাত কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির পথ এইভাবেই মুক্ত হইতে পারে। এসকল বিষয়ে সরকারেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। বস্তুতঃ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগেই মাত্র এসকল কাজ সহজে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে। কৃষকের ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সরকার জনস্বাস্থ্যেরও উন্নতিবিধান করিবেন। গ্রামে গ্রামে চিকিৎসাকেন্দ্র, পাঠাগার, রেডিও প্রভৃতি আধুনিক সুব্যবস্থাগুলির প্রবর্ত্তনভারও সরকারকেই লইতে হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য ইহাই যে কৃষিজীবীই বাঙালী জাতির সর্ব্বশক্তির উৎস ও আধার। তাহাদের প্রতি আর মুহূর্ত্তকালও উপেক্ষা করা উচিত নয়। দেশ স্বাধীন হইয়াছে ; যদি আমরা বরাবর স্বাধীন থাকিতে চাই তবে আমাদের স্বাবলম্বী হইতেই হইবে। এই স্বাবলম্বন-সাধনায় বাঙলার কৃষিজীবীর পুনর্জাগরণ ও সংগঠনই হইবে সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। এই কথাটি দেশের চিন্তানায়ক ও সরকার উভয়কেই বিশেষ মনোযোগের সহিত সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

"যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে" (ম. প. ১৯৫২)

মানুষের ভাগ্য-সম্বন্ধে সাধারণতঃ তুইটি মত বহুকাল শুনিয়া আসিতেছি। কেহ বলেন পুরুষকার, আবার কেহ বলেন দৈবই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই দৈববাদীদিগের মধ্যেই একশ্রেণীর জড়ভরত আছেন যাঁহারা কপালের উপর সব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন। এমন লোকের কপাল ফাটিয়া লক্ষীর আবির্ভাব কখনও হইয়াছে কিনা জানি না। হইলে তাহা নেহাৎ তুর্ঘটনা। সাধারণ মানুষ সেই দৃষ্টান্তে কিছুমাত্র উপকার পাইবে না, একথা সুনিশ্চিত। আসলে দৈবের সহায়তা কর্ম্মীরই ভাগ্য প্রসন্ন করে। একথার প্রচুর প্রমাণ আধুনিক বিজ্ঞানের পাতায় পাতায় রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গ্যালভানি মরা ব্যাঙের নাচ দেখিয়া বিত্যুৎ-শক্তির আবিষ্কার করেন। ঘটনাটি দৈব সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্যালভানির সক্রিয় পর্য্যবেক্ষণ ও বুঝিবার প্রয়াস না থাকিলে কখনই উহার মধ্য হইতে বিত্যুতের মায়া ধরা যাইত না। অলস মানুষের নিকট ঘটনাটি নেহাৎ আজগুবি একটা ভূতুড়ে ব্যাপারই থাকিয়া যাইত। সেইরকম রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কার-কথাও একই সত্য প্রকাশ করে। চিন্তায় বা কর্ম্মে যাঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট, তাঁহাদেরই হাতে বিশ্বের রহস্যাবগুণ্ঠন একে একে মোচিত হইতেছে। তাঁহাদেরই সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্ এই জগৎ।

অবশ্য একথাও বলিব না যে কর্ম্মই সৌভাগ্যের একমাত্র নিদান। বস্তুতঃ এমন বহু কর্ম্মী আছেন যাঁহাদের জীবন কাটিয়া গেল চিনির বলদেরই মত। তাঁহাদের কর্ম্মের সুফলটুকু হয়তো ভোগ করে অন্যে। এরকম প্রায়ই হয় যে, 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।' কিন্তু এই যাহারা 'কই' খায় তাহারাও শুইয়া-বসিয়া কাটায় না। কারণ, ডাঙায় উজাইলেও, কই তো আর ভাজা হইয়া আকাশ হইতে একেবারে মুখে আসিয়া পড়ে না। তাহার জন্য অন্ততঃ একটু প্রয়াস করিতে হয়। আসল কথা—যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে। বিনা চেষ্টায় কাহারও ভাগ্যোন্নতি হয় না।

ধনীর অলস তুলালগণ তবে কি নিপাতনে সিদ্ধ? না, তাহাও নয়। যে যেমন ভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছে, তাহার উন্নতি বা অবনতির কথাই হইতেছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, 'দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম'। ধনীর ঘরে বা গরীবের ঘরে জন্ম সম্পূর্ণ দৈবেরই লীলা। কিন্তু যে ভাগ্য লইয়া মানুষের জন্ম তাহার উন্নতি নির্ভর করে তাহার চেষ্টারই উপর। যে মানুষ দৈবের কৃপায় সোনার পালঙ্কে জন্মিয়াছে, সে মানুষ যদি একান্ত নিশ্চেষ্ট ও অলস হয়, তবে তাহার আর অধিক উন্নতি হইবার কথা নয়। যে অবস্থায় সে পৃথিবীতে আসিয়াছে সেই অবস্থাতেই ভাগ্যও তাহার নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকিবে। বরং তাহা অবনতির দিকেই দিনে দিনে স্খলিত হইবে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে: The way to be nothing is to do nothing—অর্থাৎ কিছু না-হওয়ার মানেই হল কিছু না-করা। সাধারণের জীবনে অন্ততঃ এ কথার সত্যতা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সুযোগের অভাবেই হউক আর স্বভাবের জন্যই হউক, যে মানুষ অলসভাবে দিন যাপন করে তাহার জীবন উৎসন্নে যাইবেই। আজিকার পৃথিবীতে অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই। ভাগ্য আর আজ জুয়াখেলা নয়। জীবনকে যাহারা ফাটকার বাজার মনে করে তাহারা অবশ্য কথাটা বুঝিবে না। একচালে রাজা এবং একচালে ফকির হইয়া যাইতেও অনেক দেখা যায়। কিন্তু এই যে চালাচালি তাহাও তো কাজ এবং তাহাও মানুষেরই সযত্নচিন্তিত প্রয়াস। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয় না যে মানুষ শুইয়া থাকিলেও, ভাগ্য তাহার জুয়ার দানটা খেলিয়াই যাইবে।

আর একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে অলসের ভাগ্য শুধু অচলই নহে, অসারও বটে। অর্থাৎ তাহার ভাগ্যাভাগ্যের কোন বালাই নাই। কারণ, অলস মানুষ আসলে জীবন্তে মরা। মানুষের জীবনের অর্থ লীলা। অবস্থার বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও আপন সত্তাকে উপলব্ধি—ইহাই তো জীবন। কাজের মধ্য দিয়া মানুষ সুখদুঃখের কত আঁকাবাঁকা পথে কত কি অনুভব করে। এই অনুভূতিরই মধ্যে আনন্দ বেদনা তথা জীবনের চরিতার্থতা। তাই কর্ম্মীর ভাগ্য তাহাকে দুঃখেই ফেলুক আর সুখেই রাখুক, উহা তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে। এইজন্যই আজন্ম দুঃখী মধুকবির জীবনও ধন্য; আজন্ম সুখী কোন অলসের জীবন সে তুলনায় তুচ্ছ। জীবনকে দুঃখের তীব্রতার মধ্য দিয়াই বোধ করা যায় বেশী। অলসতার নিস্তরঙ্গ বদ্ধ জলা তো নিশ্চল মৃত্যুরই চিত্র। সুতরাং সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া বলিতে হয়—আলস্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। জীবনকে সার্থক করিতে হইলে, ভাগ্যকে প্রসন্ন করিতে চাই অহর্নিশ কর্ম্মপ্রয়াস।

একটি ঝড়ের রাতে (ম. প. ১৯৫২)

তখন নেহাৎ নীচের ক্লাসে পড়ি, বয়স ১২ বৎসরের বেশী নয়। সবে গ্রীষ্মের ছুটি হইয়াছে, পড়াশুনা সেই অর্দ্ধবাৎসরিক পরীক্ষার পর হইতেই প্রায় বন্ধ। নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে সারাদিন খেলাধুলায় কাটাই। ফাঁকে ফাঁকে মাতুলালয়ের অফুরন্ত আম-কাঁটালের সদ্গতি করি। বিকাল পড়িতেই প্রায় রোজ, অন্ততঃ এক ঝল্কা হইলেও কালবৈশাখীর ঝড় উঠে; সন্ধ্যা ঘনীভূত হইবার আগেই আবার তাহা উড়িয়া থামিয়া যায়। এই ক্ষণিকের তাণ্ডবলীলায় সে কি আম কুড়াইবার ধুম! শিশু বৃদ্ধ একত্রে ঝড়ের মধ্যেই আলো লইয়া এখানে বাহিরে যাইতে মানা নাই।

একদিন এই ঝড়ের গতি কিন্তু প্রলয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। সারাদিন রৌদ্রবৃষ্টির লুকোচুরি চলিয়াছে। সন্ধ্যার কাছাকাছি খুব এক পসলা জলও হইয়া গেল। তবু আকাশের মুখ ভার। ক্রমে এক নীরন্ধ্র নিরেট অন্ধকার সমগ্র পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আকাশের ভীরু তারাগুলি সব যেন খসিয়া পড়িয়াছে। গাছের মাথায় আর লতাগুল্মের ঘনছায়ায় তাহারা যেন অসংখ্য জোনাকীরূপে একবার চোখ মেলিয়াই পরক্ষণে ভয়ে ভয়ে চোখ বুজিতেছে। নীরব নিথর প্রকৃতির মধ্যে কি যেন সে থমথমে ভাব। রাত্রি বোধহয় গভীর হইয়া উঠিয়াছে। দিনের গতি বুঝিয়া সকল বাড়ীতেই অনেকক্ষণ আগে নৈশ আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দূরাগত একটা শূন্য নিঃস্বন ফুঁসিয়া উঠিল। মাটির ঠিক উপরকার সেই জমাট অন্ধকারটা সহসা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। দূরে দূরান্তরে কাহারা যেন চীৎকার করিয়া কি এক সাবধান-বাণী ঘোষণা করে। ঝড় উঠিয়াছে। শঙ্খধ্বনি, উলুরোল আর ঝড়ের শব্দ—সকলে মিলিয়া একটা তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করিল। গভীর রাত্রির নীরব শান্ত পরিবেশ মন্থন করিতেছে এ কি ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ! আমি আমার ক্ষুদ্র শিশুকল্পনায় দেখিলাম সে যেন কি এক করাল-রূপ তমসার কালো বুকখানি থাকিয়া থাকিয়া হিংস্র নখরে চিরিয়া দিতেছে। আকাশের বুকে তীব্র বেদনার সে কি হিজিবিজি লেখা—প্রখর জ্যোতির সর্পিল শিহরণ। তাহারই আলোকে দেখি উত্তরের বাঁশঝাড়টি একেবারে মাটিতে নুইয়া পড়িয়া কাহার কাছে যেন কাতর মিনতি করিতেছে। পূবের আমবাগানটির অবস্থা অবর্ণনীয়। এদিকে ওদিকে কত গাছ ঢলিয়া পড়িয়াছে, কেহ উৎপাটিত, কেহ ভগ্নশাখ, কেহ বা আবার মুণ্ডিত-শীর্ষ। আমার ঘর হইতে আর অন্যদিকে দৃষ্টি চলে না। চলিলেও আর দৃষ্টির পথ খোলা রাখার উপায় নাই। দরজা জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বাহিরে এতক্ষণে কি কাণ্ড চলিতেছে কে বলিবে? ভিতরে বসিয়া বৃদ্ধ দাদামশাই আর দিদিমার পাশ ঘেঁষিয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে দুর্গানাম জপ করিতেছি। এক এক বার ঘরটা শুদ্ধই যেন উপড়াইয়া ফেলিবে। খুঁটিগুলি মড়মড় করে, টিনের চালে কোথাকার কি আসিয়া দুমদাম পড়ে। শোঁ—ওঁ—শোঁ—সে কি ভীষণ গর্জ্জন! মত্ত প্রভঞ্জনের সে কি ভৈরব আক্রোশ! ভয়ে জড়সড় আমার প্রাণটি যেন গলায় আসিয়া শুকাইয়া যায়। চেতনা আমার ক্রমেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। অবশেষে কখন একটা অর্দ্ধচেতন তন্দ্রাঘোরে আমি যেন স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হই। কিন্তু স্বপ্নেও সেই ঝড়—ভীষণতর ঝড়। আমাদের ঘরের চালটি উড়িয়া গেল। হায়! হায়! এখন উপায়? তারপর—ওমা এ কি! একটা প্রচণ্ড দম্‌কা হাওয়া আসিয়া আমাকেই যে দিদিমার দুর্ব্বল আশ্রয় হইতে সবলে ছিনাইয়া লইয়া গেল। তারপর গোল পাকাইয়া আমাকে ছুঁড়িয়া দিল মহাশূন্যে। হায় ভগবান্! আমি কোথায়? ঝড়ের বেগে আমি শূন্যপথে

যেন একটা পিণ্ডের মত চালিত হইতেছি। নীচ হইতে দিদিমা অসহায়ভাবে স্বর তুলিয়া বিলাপ করিতেছেন, দাদামশাই হাঁকিতেছেন—'উত্তরে যা।' অতএব উত্তরেই ভাসিয়া চলিয়াছি। ধড়ে আর প্রাণ নাই—একটা মাংসপিণ্ড মাত্র—ল্যাজামুড়ো একত্র করিয়া গুঁড়িসুড়ি মারিয়া অতিশয় সঙ্কুচিত অবস্থায় আমি চলিয়াছি তো চলিয়াইছি। অবশেষে চেতনার শেষ লেশটুকু আর যেন রহিল না। হঠাৎ কখন কাহার কৃপায় ধুপ্ করিয়া পড়িয়া গেলাম একেবারে মায়ের বিছানায়। কলিকাতার পাকাবাড়ী, আর ভয় নাই। এই যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। মা যেন কত আদর করিয়া কত অভয় দিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। এতক্ষণের এত আতঙ্ক দূর হইয়া গেল। গভীর ঘুমে অসাড়ে ঘুমাইতে লাগিলাম। তারপর কি হইল কিছুই বলিতে পারি না।

এতক্ষণে রাত পোহাইয়াছে। কাহার ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখি —কলিকাতায় নয়, দিদিমার বুকে এতক্ষণ নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়াছি। ঝড় থামিয়া গিয়াছে। সব শান্ত।

"পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে"

(ম. প. ১৯৫৩)

একটা দেশের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য। একথা অবশ্য কোন কালেই সকলে বুঝে না। প্রাচীনকালে এবিষয়ে মাথা না ঘামাইলেও চলিত। লোকসংখ্যা ছিল তখন অনেক কম। মানুষ তখন গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির উপর নির্ভর করিয়া অল্পায়াসে জীবিকা সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইত। সেকালে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধনবৈষম্য ততটা মারাত্মক রূপও ধারণ করে নাই ; তাহা ছাড়া স্বাবলম্বনের সুযোগও তখন অন্তর্হিত হয় নাই। আজ কয়েক শতাব্দী যাবৎ জাতীয় স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা হইয়া গিয়াছে। মানুষের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আর নাই, নাই তাহার সামগ্রিক জীবনের সমাজনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা। সমাজ-জীবনের এই সর্ব্বগ্রাসী দাবীর সম্মুখে ক্রমাগত একটা কথা স্পষ্ট হইয়াছে যে দেশের মঙ্গলামঙ্গল দেশবাসী সকলেই সমান ভাবে ভোগ করে। বাস্তবজীবনের এই রূঢ় অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এই সেইদিন, কিন্তু কবির চক্ষে একথা বহুপূর্ব্বেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কবি তাই বহুপূর্ব্ব হইতেই আমাদের ভেদবিড়ম্বিত এই দেশকে সাবধান করিয়া আসিয়াছেন, "পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিশেষভাবে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক কলঙ্কেরই প্রতি। তথাপি অর্থনৈতিক বৈষম্য, কৃষ্টি ও শিক্ষার

বৈষম্যের যে বিষময় ফল তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। যুগপ্রাচীন জরাজীর্ণ সংস্কারবশে এদেশের মানুষ একদিন এদেশেরই সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্মনিহিত একটি সত্য ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহারই ফলে যুগপ্রয়োজনে যে বর্ণবিভাগ প্রচলিত হইয়াছিল, প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেও—তাহার বিকার দেশকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছিল। মানুষেরই মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান, এই জ্ঞানে এককালে ভারতবাসী নরনারায়ণের সেবা করিত। ক্রিয়াকর্ম্মে পূজাপার্ব্বণে জলাশয়-খননে আর শতেক দানধর্ম্মে এদেশে ধনী তখন নির্ধনকে অনশন হইতে রক্ষা করিত। তবু অন্নদায় তখনও তত সঙ্কটজনক হইয়া উঠে নাই। কালক্রমে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা যখন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যখন দিকে দিকে ঘনঘটাকারে জমিয়াছে, তখনই হইল কিনা দেশ স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতির প্রকোপ একদিকে, অন্যদিকে বিত্তবান্ উচ্চশ্রেণীর দানধর্ম্ম ও দীনের প্রতি দয়া-বর্জ্জন। এইরূপে দেশে অমঙ্গল অমানিশার অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছে। কবির ভবিষ্যৎদৃষ্টি তাহার ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে। দীনতা ও অজ্ঞানতায় অবনতির অগাধ গহ্বরে পড়িয়া রহিয়াছে অধিকাংশ দেশবাসী। মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য ও জ্ঞানাঢ্য মানুষ তাহাদের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। ইহাতে এই মুষ্টিমেয় মানুষের সুখের দিনও যে ফুরাইয়া আসিতেছে, সে সাবধানবাণীই ধ্বনিত হইয়াছে কবির কণ্ঠে।

ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের অতি সাধারণ একটা সূত্র এই যে, একটা বস্তুপুঞ্জের পরস্পরবিরোধী গতি বিশেষ একদিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে অত্যন্ত বড় অন্তরায়। এক রজ্জুতে বদ্ধ একদল অশ্বের মধ্যে অল্প কয়েকটি যদি সম্মুখে অগ্রসর হইতে চায় আর বাকী অধিকাংশ যদি দাঁড়াইয়া থাকে, তবে তাহাদের অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব হয় না। একথা জলের মত পরিষ্কার। সেইরূপ দেশের যে ভাগ্যবান্ শ্রেণী আজ উন্নতির পথে আগাইয়া চলিবার জন্য সচেষ্ট, তাহাদের গতিরোধ করিয়া অবনতির পথে পিছু টানিয়া আনিবার জন্য দেশের অধিকাংশ দীনহীন অজ্ঞ সাধারণ বৃহত্তর শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই জনসাধারণ যে শুধু যুগযুগ একই স্থানে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাও তো সত্য নয়। তাহারা যে দিন দিন দীন হইতে দীনতর, হীন হইতে হীনতর, অজ্ঞ হইতে অজ্ঞতর—এককথায় অবনতির ক্রমনিম্ন গহ্বরে নামিয়া যাইতেছে। সুতরাং তাহাদের টানে, তাহাদের সহিত দেশের ভাগ্যবান্ উচ্চশ্রেণীরও অবনতি অনিবার্য্য, তাহাদেরও পশ্চাৎপদ হইতে হইবে।

হইয়াছেও তাহাই। এককালে ছিল বিদ্বানের সর্ব্বদেশে পূজা, রাজার পূজা শুধু নিজের রাজ্যে। তখন লোকশিক্ষা ছিল বলিয়াই বিদ্যার এই সমাদরটুকুও ছিল। ক্রমে রাজা হইতে সকল বিত্তশালী ব্যক্তি সরস্বতীর স্থলে কুবেরকে পূজা সুরু করিলেন,

দেশে বিদ্বানের অন্নসমস্যা উপস্থিত হইল, লোকশিক্ষা মজিয়া গেল। ভারতের সংস্কৃতিগত অবনতির সূত্রপাত সেইদিন। সেইদিন হইতে এইদিন পর্য্যন্ত ধনাঢ্য মানুষ বিলাতী ডিগ্রী লইতে কতবার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছে, বিদেশী বিদ্যার গন্ধমাদন লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু বিশল্যকরণী বাছিয়া বাহির করিবার সামর্থ্য যাহাদের ছিল, তাহারা দেশে থাকিয়া শুকাইয়া মরিয়া গেল। জনগণের মনে পাতা ছিল যে-শিক্ষার যে-সংস্কৃতির আসন, তাহা গুটাইয়া ধনীর ঘরে তুলিয়া লইয়া এইভাবে দেশে কৃষ্টিগত নিরবচ্ছিন্ন অবনতিই ডাকিয়া আনা হইল।

অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া চিত্রটি হইয়াছে আরও ভয়াবহ। আজ দেশে নূতন এক ধনিকশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা বিলাতী কুকুরকে সাবান দিয়া স্নান করায়, মাংস দিয়া আপ্যায়ন করে, আর হাওয়াই গাড়ীতে মানুষ চাপা দিয়াও পরমানন্দে ভ্রমণসুখ উপভোগ করে। এককথায় মানুষের মধ্যেই যে ভগবানের অধিষ্ঠান, ভারতের এই শাশ্বত বাণী ভারতবাসী ভুলিয়াছে। ভুলিয়াছে ভগবান্‌কে, পূজা করিতেছে অর্থের দানবকে দুর্নীতির কালোবাজারে, লুটের বারোয়ারী উৎসবে। ফলে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিষ্পিষ্ট দেশের অধিকাংশ লোকসংখ্যা পৈশাচিক ক্রূরতা সহকারে আজ ভৈরবনৃত্যে ঝাণ্ডা তুলিয়া ছুটিয়া আসে প্রমত্ত বেগে। বণিক্ এবং ধনিকে মিলিয়া মারণ উচাটন আর শতেক ধ্বংসাত্মক তন্ত্রসাধনায় একাগ্র। তাহাদের সম্মোহনে দেশের সরকার মন্ত্রচালিত পুত্তলিকা মাত্র। দেশ যতটুকু আগাইয়াছিল, তাহা বুঝি এইবার মিথ্যা হইয়া যায়। এবার পশ্চাতের জনসমুদ্রের সঙ্ঘবদ্ধ টানে বুঝি অগ্রগামী ভাগ্যবানের সাধের সৌধ ভাঙিয়া পড়ে। সম্মুখে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ। দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসিয়া ধনি-দরিদ্রের একত্রে কদন্নভোজনের চিত্র বিরল নহে। দেশ-বিভাগের নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর ইহা আর কবির কল্পনামাত্র রহে নাই, বাস্তবে প্রত্যক্ষীভূত সেই চিত্রের খণ্ডাংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আজিও হয়তো প্রতিকার খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। জনগণ-মন-অধিনায়ক, হে ভারতের ভাগ্যবিধাতা, তুমি জাতিকে সেই প্রতিকারের পথ চালিত কর।

তোমার দেখা একটি মেলা (ম. প. ১৯৫৩)

আমি গ্রামের ছেলে; শহরের সমারোহের সহিত আমার তেমন একটা পরিচয় নাই। শান্ত গ্রাম্যজীবনের নিস্তরঙ্গ পরিবেশে বৎসরে দুই-একটা পূজাপার্ব্বণ বেশ একটু আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া গ্রামের প্রান্তে ঐ যে পঞ্চবটী—পাঁচটি বটের কোলাকুলি যেখানে, সেখানে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে বসে চড়কের মেলা।

আমার দেখা সকল আনন্দ-উৎসব ও মেলা-খেলার মধ্যে এইটাই সব চাইতে বেশী আনন্দ বহন করে।

কয়েকবৎসর গ্রামান্তরে স্কুলে পড়িতেছি। ফলে এই মেলাটি দেখার সুযোগ পাই না। একবার দিদির বিয়ের অছিলায় আগে হইতে বাড়ীতে বসিয়াছিলাম। যথাসময়ে চৈত্রসংক্রান্তি আসিল। সকাল হইতেই মেলায় ঢ্যাঁড়া বাজিতে লাগিল। দুপুরে খাওয়া সারিয়া রমারম পঞ্চবটিতে গিয়া পৌছিলাম। একদিকে চড়কের গাছ পোঁতা হইয়াছে। পঞ্চবটীর মূলে পূজা হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সেখানে যেটুকু ছায়া পড়িয়াছে সেখানেই চট বিছাইয়া দোকানীরা পসরা খুলিয়া বসিয়া গিয়াছে। নানারকম কাচের চুড়ি ও জিনিসপত্র, রঙবেরঙের সেলুলয়েডের খেলনা ও গেলাস প্রভৃতি, চাবির রিং, সাবান, তেল, সূচ-সুতা, চুলের ফিতা, লজেন্স, বিস্কুট, পুতুল, মাটির খেলনা প্রভৃতি কত যে রকমারী জিনিসের দোকান বসিয়াছে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। কোথাও খাবারের দোকান, কোথাও শরবতের স্টল। লাল-নীল সিরাপে ভর্তি গেলাস গেলাস তৈরী শরবত সাজানো রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে বরফ নাই। যাহা দেখি তাহাই কিনিতে ইচ্ছা করে। কখনও দুই পয়সার মটর-বাদাম কিনিয়া খাই। কখনও দুই পয়সার লটারী খেলিয়া একটা সাবান পাইয়া ফেলি। কখনও ছোট বোনের জন্য দুই-একটা টুকিটাকি জিনিস কিনি। পয়সা ফুরাইয়া আসে। কানে ভাসিয়া আসে কত রকম বাঁশী, ভেঁপু আর ছোটদের ঢোল ও বেহালার শব্দ। কিনিতে আগ্রহ হয়। অমনি পায়ের কাছে পিছনে কি একটা কিলবিল করিয়া উঠে। কে যেন চেঁচাইয়া উঠে—"সাপ, সাপ"। আতঙ্কে দু'পা আগাইয়া পিছনে চাহিয়া দেখি—ও হরি! সাপ বটে, তবে কাগজের। কাগজের শুধু সাপই নহে, কুমীর, বানর—আরও কতরকম খেলনায় মেলা ভরিয়া গিয়াছে। মাটি ও মার্বেলের গুলি একদিকে, আর একদিকে আম কাটিবার ছোট ছুরি হইতে কাটারি, কুড়াল, কাস্তে, কোদাল—কত কি দোকান। দেখিতে দেখিতে মেলার একদিক্ হইতে আর একদিকে আসিয়া পড়ি। দেখি, একপাশে একটা তাঁবু খাটানো হইয়াছে। তাহার দরজার সামনে একটা ভালুকের মূর্ত্তি হাত-পা নাড়িয়া এক ঘণ্টার তালে তালে বিকট শব্দ করিতেছে। ভিতরে ব্যাপারটা কি হইতেছে তাহা জানি—ম্যাজিক দেখানো হইতেছে। চার-পয়সার টিকিট। কেনাকাটি মাথায় উঠিল, টিকিট কাটিয়া তাঁবুতে ঢুকিয়া পড়িলাম। কত তাসের খেলা, ম্যাজিক, ভোজবাজী, এমন কি গান-বাজনা আর নাচ দেখিয়া খানিক পরে বাহিরে আসিলাম। এতক্ষণে দোকানে দোকানে গ্যাসের বা কেরোসিনের বাতি জলিয়া উঠিয়াছে। ঢোল বেহালা বাঁশী ভেঁপু ঘণ্টা গান আর অগণিত লোকের অবিশ্রান্ত কোলাহল—সকলে মিলিয়া একটা বিচিত্র আনন্দধ্বনির মত মেলাটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। দিকে দিকে কেনাবেচার ধুম—সকলের

মুখে হাসি। কোথাও আবার ছেলে হারাইয়া কেহ ব্যস্ত হইয়া খুঁজিতেছে, কোথাও বা হারানো ছেলেটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। কোথাও কেনাকাটি লইয়া পিতা ও শিশুর মধ্যে কত মান অভিমান, বায়নাক্কা আর মনভুলানো চলিতেছে। উৎসবমুখর মেলার এই মহাসম্মেলনে চারিপাশের গ্রামগুলির রুদ্ধ প্রাণ যেন আজ উছলিয়া উঠিয়াছে।

আগের চেয়ে এখন বড় হইয়াছি, কিছুটা বুঝিবার শক্তি হইয়াছে। তাই এবার হঠাৎ চোখে পড়িল, এই মেলাটির প্রধান বিশেষত্ব কোন্‌খানে। সামান্য হাটবাজারের সঙ্গে ইহার তফাৎ কোথায়, কেন তাহা গ্রামবাসীর আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া দেয় তাহা আজ সহসা আবিষ্কার করিলাম। এখানে যাহা কেনাবেচা চলিতেছে, তাহা ঠিক নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। গ্রামের শিল্পীর তৈরী বাঁশবেতের বা মাটি প্রভৃতির নানান জিনিসই এখানে বেশী। এইগুলির সবই যে দৈনন্দিন প্রয়োজনে বিশেষ দরকার এমন নয়। বাস্তবিক অপ্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত ঈপ্সিত—এমনতরো জিনিসেরই সমাবেশ এখানে বেশী। সারাবৎসরে এই একটিবার গ্রামের শিল্পী তার খেয়ালী মনের বিচিত্র সৃষ্টি বেচিবার সুযোগ পায়, সাধারণ মানুষও তেমনি বৎসরে এই একটি দিন মাত্র দারুণ অনটন ভুলিয়া যা-কিছু হউক কেনাকাটি করিয়া একটু বাজে খরচের আনন্দ ভোগ করে। মানুষের জীবনে নিত্য আছে হাটবাজার—একটি দিন আসে শুধু মেলার। তাই তাহা আনন্দের। একটু নাগরদোলায় চাপিয়া উপর হইতে নীচে, বা দক্ষিণ হইতে বামে কয়েক পাক ঘূর্ণি—নেহাৎ অর্থহীন, কিন্তু এমনতরো অর্থহীন আনন্দের লীলাতেই জীবনের একটা পরম চরিতার্থতা আছে। এইখানেই মেলার বিশেষত্ব।

আমার দেখা এই যে মেলাটি তাহা সমারোহে বা বৈচিত্র্যে হয়তো এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু আমার নিকট তবু তাহা বড় আনন্দের। মাঠের মুক্ত প্রাঙ্গণে, আকাশের খোলা চাঁদোয়ার তলে, গাছের ছায়ায়,—এই যে কেবল একটা আনন্দের আকর্ষণে এতগুলি লোকের আনাগোনা, একত্র সমাবেশ তাহার খুব বড় একটা হেতু নাই। তবু আলাদীনের মত যাদুপ্রদীপ জ্বালাইয়া কি এক মন্ত্রশক্তিবলে কে যেন এখানে গ্রামবাসীর কানে 'চিচিং ফাঁক' উচ্চারণ করে—আর অমনি মানুষের প্রাণের দুয়ার খুলিয়া যায়, ফোয়ারা ছুটে আনন্দের। আমার দেখা মেলাটির মধ্যে এই লীলাটিই আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

———

"জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে কল্যাণপূত কর্ম্মে" (ম. প. ১৯৫৪)

মানবজীবনের মূল্য-সম্বন্ধে নানান মতভেদ রহিয়াছে। অবশ্য তাহা নিছক দার্শনিকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেহ বলেন সংসার মায়াপ্রপঞ্চময়, মানবজীবন অসার। কেহ বলেন জীবন অমূল্য সম্পদ্—উহা মানবাত্মার উৎকর্ষের সুযোগ। আবার এমন একদল আনন্দবাদীও আছেন যাঁহারা বলেন—'খাও দাও ফুর্ত্তি কর'; —ইহাতেই জীবনের সার্থকতা। এইপ্রকার জীবনদর্শনভেদে জীবনের মূল্য নিরূপণের মাপকাঠিও ভিন্ন ভিন্ন। লৌকিক ধারণায় কিন্তু জীবনের মূল্য সর্ব্বত্রই প্রায় একভাবে স্থিরীকৃত হয়, এবং তাহার মধ্যে একটা বিশ্বজনীন সত্য আছে।

এমন অনেক দেখা যায় যে শতবৎসর বাঁচিবার পরও কোন মানুষ দুইদিনেই বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া যায়। অথচ সামান্য ত্রিশ বৎসর, এমন কি তাহার চেয়ে কম বাঁচিয়াও এসংসারে অমর হইয়া আছেন—এমন লোকের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। সাধারণের নিকট তাহা হইলে একটা জীবন তথা সমগ্র একটা মানুষেরই মূল্য আয়ুতে নহে, অন্য কিছু দ্বারাই নিরূপিত হয়। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে এই অন্য কিছুটা হইল মানুষের সৎকাজ। সৎকাজ মানুষকে শুধু অবিস্মরণীয়ই করে না, কখনও কখনও চিরস্মরণীয়ও করে। এজগতে কত মহাপুরুষ জন্মিয়া গিয়াছেন যাঁহাদের পরার্থতা, মনীষা ও অন্যান্য গুণ ও সৎকাজ অক্ষয় হইয়া আছে। আমরা তাঁহাদের উল্লেখমাত্র স্মরণ করিতে পারি অর্থাৎ আমরা তাঁহাদের ভুলিতে পারি না। আবার ইঁহাদের চেয়ে বড় আর একশ্রেণীর মহাপুরুষ আছেন যাঁহাদের আমরা নিত্য স্মরণ করি, স্তব করি—ইঁহারা চিরস্মরণীয়। তাহা হইলে এই যে মহাপুরুষবৃন্দ ইঁহাদের জীবনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য অজ্ঞাতসারেই আমাদের সংস্কারে গাঁথিয়া আছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠে—কেন আমরা একজনকে কোন মূল্যই দিই না, আর একজনকে কখনও ভুলিতে পারি না, তৃতীয় আর একজনকে নিত্যই স্মরণ করি? ইহার উত্তরের মধ্যেই জীবনের মূল্য কিসে, তাহারও উত্তর নিহিত রহিয়াছে। স্পষ্টতঃই মানুষ তাহার কাজের মধ্য দিয়াই লোকচিত্তে তাহার যোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

আমাদের গ্রামের পাশে যে বটগাছটা শতাধিক বৎসর উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে তাহার আয়ু তো খুবই দীর্ঘ। তবু তাহা যেদিন উৎপাটিত হইবে সেদিন তাহাকে ভুলিতে গ্রামবাসীর বেশী দেরী হইবে না। সেই পথের পুরানো পথিক কিন্তু সেইখানে আসিয়া একবার তাহাকে মনে করিবে। তাহার শীতল ছায়ায় দু'দণ্ড জিরাইয়া আগে সে যে শান্তি পাইত সে কথা মনের কোণে উঁকি দিয়া তাহাকে একটা বিয়োগব্যথার খোঁচা দিয়া যাইবে। কেন? বটগাছটার যে শতবৎসরব্যাপী স্নিগ্ধ ছায়া আর শীতল বাতাসদানের একটি মর্য্যাদাময় ইতিহাস

আছে। শুধু বহুবৎসর বাঁচিবার মধ্যে এই মহিমা নাই। ঐ জঙ্গলের ভিতর আরও বৃদ্ধ তেঁতুলগাছটার সে গৌরব নাই। উহা অবলুপ্ত হইলেও কেহ তাহার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে রাখিবে না। এইভাবে মানুষ জীবনের মূল্য কল্যাণকর্ম্মের পরিমাণ দিয়াই বিচার করে—আয়ু দিয়া নহে।

কিন্তু তৈমুরলঙও ইতিহাসে অবিনশ্বর। মনুষ্যজীবনে অতবড় উৎপাত, অতবড় ধ্বংসকারী; অতবড় সভ্যতার শত্রু কয়টা হইয়াছে? তবু তো মানুষ স্মৃতিপট হইতে জোর করিয়াও উহাকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। অথচ একথা অভ্রান্ত সত্য যে তৈমুরলঙ অবিস্মরণীয় হইলেও চিরনিন্দিত। তাহা হইলে চিরকাল মানুষের স্মরণে থাকিলেই যে একটা জীবনের উচ্চতর মূল্য স্বীকৃত হইল তাহা নহে। স্মরণীয়দের মধ্যেও পূজনীয় তাঁহারাই যাঁহারা নিজেদের জীবন কল্যাণপূতকর্ম্মে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

এই গেল লোকের কাছে একটা জীবনের কিসে মূল্য সেই কথা। ব্যক্তির নিজের কাছেও নিজের জীবনের একটা মূল্য-পরিমাণ আছে। যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ বা অনুরূপ নানা পাপের আশ্রয়ে লক্ষ-কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে এবং যমের মুখে ছাই দিয়া বহুযুগ বাঁচিয়া আছে, সেই ব্যক্তি ধিক্কৃত বোধ করিতে বাধ্য। একটা সমাজে বাস করিয়া তাহার শুধু অপকারই করিলে আর কিছু না হউক নৈতিক দিক্ দিয়াও সমাজ তাহাকে নির্য্যাতন করিবেই। আর এমন ব্যক্তির যতবেশী আয়ু ততবেশী দিন তাহাকে সমাজের নিকট হেয়, নিন্দিত ও নির্য্যাতিত থাকিতে হইবে। নিতান্ত বিকৃতবুদ্ধি না হইলে তখন এমন লোকের নিজের জীবনের মূল্য তুচ্ছ হওয়ারই কথা। অন্ততঃ বেশীদিন বাঁচার মধ্যে তাহার বিশেষ একটা সুখের কিছু ঘটে না। লোকটা বিকৃত হইলে অর্থসঞ্চয় করার মধ্যেই একটা সার্থকতা বোধ করিবে, জীবনের দৈর্ঘ্যের মধ্যে নহে। জীবনের মূল্য তাহার নিকটেও আয়ুতে নহে। সাধুব্যক্তির পক্ষে সৎকাজেই জীবনের সার্থকতা। দিনের পর দিন কাটাইয়া যে দিনটা সে ব্যক্তি একটা মহৎ কিছু করিতে পারেন, সেই দিনটা তাঁহার কাছে অক্ষয়। যতবেশী ভাল কাজ করার সৌভাগ্য ও সুযোগ তাঁহার ঘটে ততই তিনি জীবনকে ধন্য মনে করেন। লোকেও ভাবে তাহাই। একজন স্বামী বিবেকানন্দ চল্লিশ বৎসর আয়ুষ্কালে যে কাজ করিয়া গেলেন তাহা সহস্র সহস্র শতায়ুর জীবনের সমবেত মূল্যকেও ছাপাইয়া যায়। তাঁহার কৃতি তাঁহার স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখে, শতসহস্র কল্যাণকর্ম্মের প্রেরণা যোগায়—মানবজীবনকে শোধিত করে। মানুষের জীবন তাই শুধু কাজে নহে, কল্যাণময় মহৎ কাজেই ধন্য হয়। ইহার দ্বারাই জীবনের মূল্য বা সার্থকতা নিরূপিত হয়।

আধুনিক যুগে বেতারের প্রভাব (ম. প. ১৯৫৪)

এ যুগে যে দুইটি বস্তু মানবসমাজকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহারা বেতার ও চলচ্চিত্র। এমন কি সংবাদপত্রও ইহাদের নিকট ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতেছে। চলচ্চিত্রের তুলনায় বেতার অবশ্য আজও শিশু। শুধু বয়সেই নহে, বিস্তারে ও প্রভাবেও বেতার এখনও চলচ্চিত্রের সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে না। তবুও আধুনিক জীবনে উহার প্রভাব ক্রমবর্দ্ধমান। অদূর ভবিষ্যতে উহা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে তাহা বিনা দ্বিধায় ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে।

আপাততঃ বেতার বলিতে বুঝি সঙ্ঘবদ্ধ কেন্দ্র হইতে সঙ্গীতাদি সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা—সংক্ষেপে 'রেডিও'। আবার শুদ্ধ সংবাদ প্রেরণাদির ব্যবস্থাকেও 'বেতার' বলিয়া থাকি। দ্বিতীয় প্রকার বেতার সাধারণ মানুষের গোচরে আসে না। উহাতে এখনও সরকারী ও জঙ্গী বিভাগেরই প্রায় একচেটিয়া প্রভাব। কিছু কিছু সমুদ্রগামী জাহাজাদির ক্ষেত্রেও তাহার ব্যবহার আছে। সাধারণ মানুষের কাছে 'রেডিও'-ই সুপরিচিত ও অধিগম্য। বেতারের প্রভাব তাহার উপর এই 'রেডিও'-মারফতই পরিবেষিত হইয়া থাকে।

'রেডিও' আজও কমবেশী শহরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু গ্রামগুলিও আজ গ্রামের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। গ্রামের মানুষ আজ অনেকেই কর্ম্মব্যপদেশে বৎসরের অনেক অংশ শহরে কাটায়। শহরের প্রভাব ক্রমাগত এইভাবে গ্রামেও ছড়াইয়া পড়ে। 'রেডিও' শহরের মধ্য দিয়া এইরূপে সমগ্র দেশকে তাহার বিশিষ্ট প্রভাবে প্রভাবিত করিতেছে। আমাদের দেশে 'রেডিও'-মারফত আমরা প্রধানতঃ সংবাদ ও কৃষ্টিমূলক আলোচনা এই দুইপ্রকার বস্তু পাইয়া থাকি। সকালে বিকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেশবিদেশের সংবাদ ও বিশেষ ঘোষণা নিত্য আমাদের কানে পৌছায়—এই 'রেডিও'যোগে। কোন খবর সংবাদপত্রে চক্ষু যদি বা এড়াইয়া যায় কর্ণপটহে সশব্দ আঘাতে 'রেডিও' তাহা আমাদের শুনাইয়া ছাড়ে। নিজের ঘরে 'রেডিও' না থাকিলেও অব্যাহতি নাই। বিজ্ঞাপনের জন্য বা লোকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আজ রাস্তাঘাটে দোকানপাটে এখানে সেখানে সর্ব্বত্র 'রেডিও'। দাড়ি কাটিতে সেলুনে বসিয়াছেন, কানের কাছে 'রেডিও'; দোকানে বসিয়া লুচি খাইতেছেন, সঙ্গে পাইলেন 'রেডিও'-সন্দেশ। নেহাৎ বধির না হইলে শহরের মানুষের সর্ব্বেব অজ্ঞান থাকার আর কোন উপায় নাই। চলচ্চিত্র দেখা না-দেখা আপনার ইচ্ছা ও আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু 'রেডিও' বিনা পয়সায়, এমন কি অনিচ্ছাতেও আপনাকে শুনিতেই হইবে। 'রেডিও' ক্রমাগত আমাদের জীবনের

উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত উহা রুচিমানের নিকট বিরক্তিকরই হইয়া আছে।

কিন্তু নূতন যুগের শিশু ও বনিতাকুল 'রেডিও'র ভক্ত। সমাজের ভাবীরূপ তাহাদের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে—এবং সেই জন্যই সমাজ-জীবনে 'রেডিও'-র গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এই সকল 'রেডিও'-ভক্তদের নিকট কয়েকটি সূচী হালে বেশ প্রিয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। দৈনিক সঙ্গীত তো আছেই এবং সময় সময় উহার মধ্যে উপভোগ্য বস্তু যে না থাকে তাহা নয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় কণ্ঠসঙ্গীতের বেলায় বিজ্ঞপ্তি-অনুযায়ী সূচী অব্যাহত থাকে না এবং পরিবর্ত্তনের সময় একঘেয়ে রেকর্ড উপদ্রব করে। যন্ত্র-সঙ্গীতের সমঝদার অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। কিন্তু সাপ্তাহিক নাট্য-সূচীটি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তারপর 'অনুরোধের আসর', 'মহিলামহল', 'মজদুরমণ্ডলী' প্রভৃতি বিভিন্নসূচী বিভিন্নরুচি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এগুলির প্রত্যেকটি ক্রমে সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছে। হিন্দি ও সঙ্গীতশিক্ষার আসরের শ্রোতাও কম নয়। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক বক্তৃতাদি এখনও তেমন চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে নাই।

'রেডিও' এইভাবে জীবনের প্রত্যক্ষ স্তরে প্রত্যেক দিকে আপন শতধা প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। অন্তঃপুরচারী ও শিশুবৃন্দ—ইহাদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী-গঠনে তাই ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বিপুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 'রেডিও' এখনও সরকারী শাসনরজ্জুতে আড়ষ্ট। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 'রেডিও' বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেশে এখনও 'রেডিও' ততটুকু স্বাধীনতা পায় নাই; সেইজন্য আমাদের 'রেডিও'-র স্বাধীন ও সুস্থ বিকাশ নাই। তবু 'রেডিও' সমাজে অপ্রতিহত হইয়া উঠিতেছে। আজিকার নূতন যুগের নূতন মানুষ আরও বহুপরিমাণে 'রেডিও'র দ্বারা প্রভাবিত হইবে এবং বেতারচালকদের কল্পনা ও চিন্তা অনাগত ভারতের শুভাশুভ অনেক দিক্ দিয়াই নির্দ্ধারিত করিবে।

বঙ্গদেশে শরৎকাল (ম. প. ১৯৫৫)

বঙ্গদেশে শরৎকাল নানা কারণে শ্রেষ্ঠ ঋতুর সম্মান লাভ করে। নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তো আছেই ; তাহা ছাড়া শস্যে সম্পদে, স্বাস্থ্যে বৈভবে এই সময় বাঙলাদেশ একেবারে ভরিয়া উঠে। সারা বৎসরের মধ্যে এই সময়টাতেই সেইজন্য বাঙলায় শারদোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়েই বাঙালীর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—প্রাণের উৎসব।

বর্ষার ধারাসার শ্রাবণের অজস্রবর্ষণে শেষ হইয়া ভাদ্রের আকাশ নিষ্কলঙ্ক করিয়া দেয়। দিবসে আর একবার প্রখরসূর্য্যের ঈষৎ নীলাভ রৌদ্র নির্ম্মেঘ আকাশে জ্বলিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে পথঘাট শুকাইয়া উঠে, জলকাদা দূর হয়। ওদিকে জলাশয়ে জলাশয়ে, খালবিল আর পুকুর-নদীতে ঘোলা জল কাকচক্ষু হইয়া আসে, বালি আর কাদাগোলা থিতাইয়া নীচে পড়ে। শ্রাবণের বর্ষণস্নাত পৃথিবী এইবার নবকিশলয়ে শ্যামসজ্জা পরিধান করে। জলাশয়ের কাণায় কাণায় ভরা স্থির সৌষ্ঠব আর প্রকৃতির কচি সবুজে সেই গাঢ়তর শ্যামবর্ণবিকাশে ভরা যৌবনের অঙ্গশ্রী যেন ললিতলাবণ্যে উপচিয়া পড়ে। সন্ধ্যার আকাশে ছুটে তরঙ্গিত চন্দ্রিকার স্বচ্ছ ফোয়ারা। সেই জ্যোৎস্নার মায়ায় সৃষ্ট হয় শ্যামপ্রকৃতির রূপালি ওড়না। বাগানে বাগানে শিউলির উৎসার, দীঘিতে দীঘিতে পদ্মের বাহার। স্থলে জলে বিপুল সে ফুলের উৎসব, স্থলপদ্ম আর কুমুদের প্রাচুর্য্য। শুভ্র আকাশে স্ফটিকের চাঁদোয়া। তাহার নীচে রাশি রাশি সঞ্চরমাণ পেঁজা তূলা মেঘ হইয়া পাখা মেলে।

এদিকে মাঠে মাঠে কর্ম্মব্যস্ততা। আমন ধান উঠিতেছে, পাট শুকাইয়া পাট করা হইতেছে। পাটকাটির কাঁড়ি, খড়ের পালা, ধানের গোলা—সর্ব্বত্র মানুষের ব্যস্ততা। আশ্বিন যে আসিয়া পড়িল। বাজারে রঙ ধরিয়াছে, পাটের গুদামে ভারী মরশুম। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় কোমরে থলে ভরিয়া দালালেরা চলাফেরা করিতেছে। কৃষকের ঘরে লক্ষ্মী আসিতেছেন, কৃষকবনিতার সাধের গহনা বুঝি বা এইবার জুটিবে। অমনি স্যাকরার আসর জমিয়া উঠিল। ময়রার দোকানে তো আগে হইতেই ভীড়, কেননা, কুটুমের আনাগোনা, পূজার তত্ত্ব ইত্যাদির তাগিদ। মুদীরও অবসর নাই। মোটকথা, বাঙলাদেশে এমন দিনে ব্যবসাক্ষেত্রেও একটা আকস্মিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। পাটশস্যের মাধ্যমেই বাঙলার সর্ব্বাধিক অর্থাগম হয়। আর এই শরৎকালেই এই পাটের মরশুম। বাঙলার চাষী তাই এই সময়টা কিছুদিনের জন্য অভাবের যাতনা হইতে কিছুটা রেহাই পায়।

তাহা ছাড়া বর্ষাশেষে রোগভোগের প্রকোপও তখন অনেক কমিয়া আসে। বর্ষার ভিজা বাতাস শুকাইয়া শীতের আমেজ লইয়া আসে, আবহাওয়ার একটা

নাতিশীতোষ্ণ ভাব ক্রমে স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া উঠে। বর্ষায় সব্জী আর মাছের কষ্ট দূর হইয়াছে। শীতের সব্জী সবে বাজারে আসিতেছে, আসিতেছে কপির সঙ্গে কৈ। আহারের ক্ষুধা আর ক্ষুধার খোরাক—দুইয়েরই যুগপৎ আবির্ভাবে পেটুকেরা ভারী খুসী। সাধারণও অজ্ঞাতসারেই পুষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

এমন দিনেই আবার বাঙালীর দুর্গাপূজা। প্রাণের উৎসব যখন এমন সর্ব্বাঙ্গীণ তখন সামাজিক একটা সমারোহ না হইলে কি চলে? তাই শুধু দুর্গাপূজায় চলে না, লক্ষ্মীপূর্ণিমার ঘটাও এই ঋতুতেই। এই উপলক্ষে বাঙালীমাত্রেরই সাধ্যমত নূতন জামাকাপড় ও গহনাগাঁটি প্রভৃতি সাজগোজের ভারী হিড়িক লাগিয়া যায়। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতি স্তরে এইভাবে লেনদেন, সমাজের সর্ব্ববিভাগে অর্থের প্রবাহ বহিতে থাকে। শুধু মাসমাহিনার চাকুরেদের একটু অসুবিধা। তা আজকাল বোনাস-আন্দোলনে উহাদেরও একটা সুরাহা হইয়া আসিয়াছে। বাঙলায় শরৎ এইভাবে কিছুটা অর্থানুকূল্যে, কিছুটা প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমারোহে আনন্দে দুলিয়া উঠে। গ্রীষ্ম হইতে বসন্ত পর্য্যন্ত আর কোন ঋতুতে বাঙালী এমন মাতে না।

শরৎ বাঙালীর প্রাণের ঋতু। পূজার অবকাশে এইসময় বাঙালী কর্ম্মস্থল হইতে একবারটি বাড়ী ঘুরিয়া আসিবেই। সেই সুযোগে বহুদিনের অদেখা আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনা একটা পরম লাভ। ইহার মধ্য দিয়া যে প্রাণে-প্রাণে মাখামাখি তাহা অনেক পরিমাণে বাঙালীসমাজের বাঁধুনি ঠিক রাখিয়াছে। পূজান্তে ৺বিজয়ার কোলাকুলি-শেষে পত্রবিনিময় বাঙলাদেশের একটি অতি সুন্দর রীতি। এইসব পত্রের মধ্য দিয়া যে স্নেহ ভালবাসা ও শুভকামনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার যথেষ্ট মনস্তাত্ত্বিক মূল্য আছে।

শরৎকাল বাঙলাদেশে এইভাবে প্রতি বাঙালীর প্রাণের পরতে পরতে স্পর্শ রাখিয়া যায়। উহার যাদুপ্রভাবে বাঙলায় যে প্রাণচাঞ্চল্য লীলায়িত হয় তাহার তুলনা কোন দেশে কোন ঋতুতে আছে কিনা সন্দেহ।

বনভোজনের বর্ণনা (ম. প. ১৯৫৬)

বনভোজনের কথা বলিতে গেলেই অনেকদিন আগেকার একটা হাস্যকর ঘটনা মনে পড়িয়া যায়। অবশ্য এখন যাহাকে হাস্যকর বলিয়া মনে হইতেছে তখন তাহাকে তাহা মনে হয় নাই ;—বরং অত্যন্ত লজ্জাকর বেদনাদায়ক হইয়াই ঘটনাটি সেদিন দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করি।

অনেক বছর পূর্ব্বেকার কথা। শীতকালে বড়দিনের ছুটিতে মামার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ছাত্রজীবনে এই ছুটিটাই একমাত্র ভালভাবে উপভোগ করা যায়। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে—নূতন ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছি অথচ নূতন বছরের পড়া আরম্ভ হয় নাই। পিছনের কোন দুশ্চিন্তা নাই, অসুখের কোন আশঙ্কা নাই—মহা আনন্দে খেলাধুলা হাসি গল্পগুজবের মধ্য দিয়া দিনগুলি চলিয়া যাইতেছিল।

মামার বাড়ী গঙ্গার ধারে একটি গ্রামে। বাড়ীর নীচে দিয়াই ধীর মন্থর গতিতে নদী বহিয়া চলিয়াছে—শীতের বিশীর্ণ নদী। দেখিয়া মনেও হয় না যে এই নদীই কয়েকমাস পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর প্লাবনে রাক্ষসীর মত দুই কূল গ্রাস করিয়া চলিয়াছিল। আজ এই নিস্তরঙ্গ নদীর উপর দিয়া পাট বোঝাই মহাজনী নৌকা, যাত্রী বোঝাই খেয়ানৌকা, জালফেলা জেলেনৌকা ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ বহিয়া চলিয়াছে। ওপরে যতদূর দৃষ্টি যায় তীরভূমিতে পুষ্পিত সর্ষপক্ষেত্রের সোনালী গালিচা বিছানো—তাহার মধ্যে মধ্যে সবুজের ফুলতোলা। নীল আকাশে শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ছুটি-পাওয়া ছাত্রদলের মত ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।—অপূর্ব্ব দৃশ্য। বাঙলার পল্লীগ্রামের এমন স্নিগ্ধ-শান্ত-মধুর-মূর্ত্তি বোধহয় আর কোথাও নাই। আমরা শহরের ছেলে—নদীর এই শুচি শান্তরূপ, জনপদের এই কল্যাণমূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার বয়স তখন নয়। তবু কেমন যেন ভালো লাগিল। নদীতীরেই আমাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।

ইতিমধ্যে ছোটমামা একদিন প্রস্তাব করিলেন বাঘমতীর চরে গিয়া বনভোজন করিতে হইবে। ভাটির পথে মাইল দুই তফাতে একটি প্রকাণ্ড জলহীন চর। বাঘের উপদ্রবের খ্যাতিতে ইহার নাম হইয়াছে 'বাঘমতী'। আনন্দে আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদন। কাগজ কলম লইয়া ফর্দ্দ করা সুরু হইয়া গেল—কে কে সঙ্গে যাইবে, কি কি রান্না হইবে এবং তাহার জন্য কি কি উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। বাড়ীর অভিভাবকগণও প্রস্তাব অবশ্য সমর্থন করিলেন, কিন্তু স্থান অনুমোদন করিলেন না। নিকটে ভাল ভাল স্থান থাকিতে দূরবর্ত্তী বিপৎসঙ্কুল স্থানে যাওয়ার নাকি কোনই মানে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দুর্দ্দমনীয় কৈশোর তাঁহারা অনেক

দূরে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাই আরামের পথ ফেলিয়া কষ্টের পথ বাছিয়া লইবার মত আমাদের মনোভাবের মানে তাঁহারা কিছুতেই অনুধাবন করিতে পারিবেন না। ওপারের চরে বসিয়া খাইলেই যদি বনভোজন হয় তবে বাড়ীর উঠানে বসিয়া খাইলেই বা দোষ কী ?

যাই হোক অতিকষ্টে তাঁহারা রাজী হইলেন—সর্ত্ত হইল বেলা তিনটার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে হইবে, এবং দলবল লইয়া সাবধানে থাকিতে হইবে, একা একা বনে জঙ্গলে বেড়ানো চলিবে না, তাহা হইলে বিপদ্ অনিবার্য্য।—তথাস্তু। দিন স্থির হইল। জিনিসপত্র একরকম সংগ্রহ হইয়া গেল। কেহ চাল, কেহ ডাল, কেহ তরিতরকারি কেহ বা মসলাদি সংগ্রহ করিল। ইতিপূর্ব্বে শহরেও আমরা বনভোজন করিয়াছি। মোটা মোটা চাঁদা উঠিয়াছে, দোকান হইতে যথাসর্ব্বস্ব কিনিয়া কাটিয়া তৈয়ারী হইয়া দূরবর্ত্তী কোন স্থানে গিয়া আহার করিয়া আসিয়াছি। সে সব ক্ষেত্রে বনভোজনের ভোজনপর্ব্বটাই এত বড় হইয়া উঠিত যে বনভোজনের বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু থাকিত না। এখানে উপকরণ সংগ্রহ হইতেই আনন্দ সুরু। চাঁদা হিসাবে এখানে কোন টাকাপয়সা লওয়া হইল না—যাহার বাড়ীতে যাহা কিছু ভাল জিনিস আছে সে তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনিল। শুধু আমরাই কয়জন বালক নয়। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকগণও দেখিলাম বেশ মাতিয়া উঠিয়াছেন।

সমস্ত গ্রাম তোলপাড় করিয়া আমাদের বনভোজনের আয়োজনপর্ব্ব সমাধা হইল। মামাদের একখানি ছোট খেয়া-ডিঙ্গি ছিল, সেইটাতে করিয়া আমরা কয়েকটি বালক বাঘমতীর চরের দিকে রওনা হইয়া গেলাম।—রওনা হইতেই বেলা প্রায় ১০টা। বুঝিলাম খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে বিলম্ব হইবে—সন্ধ্যাও হইতে পারে। মনের মধ্যে ভয়ের আভাস যে একটুও দেখা দেয় নাই তাহা বলিলে অন্যায় হইবে। কিন্তু তাহাকে আমল দিলাম না—বাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া কষ্ট করিতেই তো আসিয়াছি, নহিলে বাড়ী বসিয়া থাকিলেই তো হইত। গতানুগতিকতার পরিবর্ত্তে নূতনত্বের আনন্দই তো বনভোজনের আনন্দ।

যাহা হউক বাঘমতীর চরে গিয়া যখন পৌছিলাম তখন ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। দেখিলাম নদী এখানে বাঁক ঘুরিয়া একটা বিশাল চড়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বনঝাউ আর সাঁইবাবলায় চড়ার একটা অংশ বেশ ছায়াশীতল, বাকী অংশে ঘন কশাড় ঝোপ আর ধু-ধু বালি। বনভোজনের উপযুক্ত জায়গা বটে। ছোটমামার স্থান-নির্ব্বাচনের তারিফ করিতে হয়। মহানন্দে আমরা হৈ হৈ করিয়া তীরে নামিয়া পড়িলাম। মাঠতলায় একটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া উনুন খোঁড়া হইল। তারপর আগুন জ্বালাইতে গিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ !—দেশলাইটা তো আনা হয় নাই। ফর্দ্দের মধ্যে মুখশুদ্ধির মসলা পর্য্যন্ত ভুলি নাই অথচ দেশলাইএর মত প্রয়োজনীয় জিনিসটা বাদ গেল কেমন করিয়া ? পকেটে

দেশলাই রাখিবার বয়স তো তখন আমাদের হয় নাই, এখন কি করা যায়? নিকটে কোন লোকজনের সাড়াশব্দও পাওয়া যাইতেছে না। আবার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিতে আনিতেই তো বিকাল হইয়া যাইবে—এখন উপায়?

ছোটমামা একটা গাছের উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন—কোথাও লোকালয় আছে কিনা। গাছ হইতে নামিয়াই ছোটমামা সোজা পূবদিকের নিবিড় অরণ্যের দিকে চলিতে লাগিলেন। দিদিমার নির্দ্দেশ স্মরণ করিয়া আমরা কয়েকজন তাঁহার অনুগমন করিতে চাহিলে এক তাড়া দিয়া আমাদের হটাইয়া দিলেন। ছোটমামা আমাদের দলপতি। তাঁহার কথা অমান্য করিতে পারি না—অথচ কাজটা ভাল হইল না,—বাঘমতীর জঙ্গলে তাঁহাকে এভাবে একলা ছাড়িয়া দেওয়া। ছোটমামা নবকুমারের গৌরব অর্জ্জন করিতে চলিয়াছেন বুঝিলাম, কিন্তু আমরা নবকুমারের সহযাত্রীদের ভীরুতা ও স্বার্থপরতার কলঙ্ক গ্রহণ করিব কেন? বিশেষতঃ আমি শহরের ছেলে, সাহসিকতার অতিব্যাখ্যান এখানকার বন্ধুবান্ধব মহলে একটু যে না করিয়াছি এমন নয়।—রাত্রে শ্মশানে যাওয়া লইয়া ছোটমামার সঙ্গেই তো একদিন চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলাম। ছোটমামা কিন্তু আমার যত বীরত্বের ব্যাখ্যান সবই হাসিয়া উড়াইয়া দেন—বিশ্বাস করিতে চাহেন না। এমন কি নতুন-দার নূতন সংস্করণ বলিয়া ঠাট্টাও করিয়াছিলেন। রাগে সর্ব্বাঙ্গ রি রি করিত। কি করিয়া ছোটমামাকে জানাইব যে শহরে থাকি বটে তবু সাহসী আমিও কম নহি। বাঘমতীর চরের নাম শুনিয়া বনভোজনের স্থান-নির্ব্বাচনে আমিই বিশেষ করিয়া এই জায়গাটার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে অন্ততঃ শহরে ভাগনের সাহসের পরিচয়টা মামা জানিতে পারিবেন।

ছোটমামা চলিয়া গেলেন। আমরা চার পাঁচজন ছেলে রান্নার জোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিলাম—ছোটমামা নিশ্চয়ই দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিবেন—তবু মনটা কেমন যেন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল—বেলা দুপুরেও জায়গাটা কেমন যেন অন্ধকার—বাঘ থাকিবার উপযুক্ত স্থান বটে। হারু অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দীপুদা, এখন যদি বাঘ বেরোয়?" হাসিয়া কহিলাম—"দূর, দিনের বেলায় কি বাঘ বেরোয়? সন্ধ্যার আগেই তো আমরা এখান থেকে চলে যাব…" —"এখানে আবার দিনরাত কি, এটা তো বাঘেরই…" হারুর কথাটা বোধহয় শেষ হয় নাই অকস্মাৎ বনের ভিতর হইতে ভীষণ একটা হুঙ্কার। তারপর আরো কয়েকটা—আমরা বনভোজন করিতে আসিয়া বাঘেরও যে খাসা বনভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি তাহা কি আগে ভাবিয়াছিলাম, —সর্ব্বনাশ! এখন কি হইবে? অবস্থাটা বর্ণনা করিতে পারিব না—অনেকদিনের ঘটনা —সবকিছু মনেও নাই, আর যাহা মনে আছে তাহা গৌরবেরও নহে।…জ্ঞান হইলে দেখিলাম ছোটমামা হাসিতেছেন, হারু উনুন জ্বালাইয়া রান্না চাপাইয়াছে, অন্যান্য ছেলেরা কাছে বসিয়া আমার অবস্থাটা বোধহয় উপভোগ করিতেছে। রান্না শেষ হইতে বেশী

দেরী হয় নাই।—তিনটার মধ্যেই প্রায় সব মিটিয়া গেল। রান্নাগুলি নাকি ভালই হইয়াছিল কিন্তু আমার মুখে সেদিন উহা এমন বিস্বাদ লাগিয়াছিল যে তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না।

নৌকায় করিয়া ফিরিবার সময় হারু ফিসফিস করিয়া বলিল—"দীপুদা, তুমি ছোটমামার গলা চিনতে পারনি ?"

"—সে কি ! তিনি তো তখন দেশলাই আনতে—"

"—দেশলাই তো তাঁর সঙ্গেই ছিল"—হারু আর হাসি চাপিতে পারিল না। খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বড় দুঃখেই চোখ ফাটিয়া জল আসিল। না হয় একটু মিথ্যা জাঁকই করিয়াছিলাম, তাই বলিয়া ছোটমামা শেষে—

ইহার পরে বনভোজন জীবনে আরো অনেক করিয়াছি কিন্তু কিশোর জীবনের এই বনভোজনের হাস্যকর অথচ বেদানাময় স্মৃতিটুকু আজও আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। তবে সেদিন যেটা সর্ব্বাপেক্ষা বেদনাময় হইয়াছিল আজ সেটা ততোধিক হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙলাদেশের পশুপক্ষী (ম. প. ১৯৫৬)

সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, প্রাকৃতিক শোভা ও জলবায়ুতে বাঙলা এক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ, বাঙালী এক বিশিষ্ট জাতি। বাঙলা দেশের পশুপক্ষীর মধ্যেও যেন এই বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র টুনটুনি পাখী হইতে শুরু করিয়া সুন্দরবনের বিশাল ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত অসংখ্য পশুপক্ষীর মধ্যে এই বৈচিত্র্য প্রকাশিত; আমাদের অতি-পরিচিত কুকুর বিড়াল গোরু ছাগলের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্য দিয়া এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত।

একদিন মানুষের সহিত পশুপক্ষীর সম্পর্ক ছিল নিবিড়, পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ—উভয়েরই আবাস ছিল অরণ্যে, পর্ব্বতগুহায়, বৃক্ষশাখায়। শহুরে সভ্যতার অনিবার্য্য পরিণামরূপে আজ সে সম্পর্ক হইয়াছে শিথিল, পরিচয় হইয়াছে ক্ষীণ। নিছক শখ করিয়া কুকুর-বিড়াল-পাখী পোষা এবং নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন করা ছাড়া, অসংখ্যপ্রকার পশু ও পাখীর কতগুলিকেই বা আমরা চিনি ? সুতরাং আলোচনার পরিধিও এই স্বল্প-পরিচয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইবে।

বাঙলাদেশের পশুর কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে গোরুর কথা। একদিন এই গোরু ছিল বাঙলার শ্রী ও সম্পদের অন্যতম উৎস। আজ ভগ্নস্বাস্থ্য ও খর্ব্বকায়

সাধারণ বাঙালীর মত বাঙলাদেশের গোরুও দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায়। কিন্তু তবুও সে অনন্য। ভাগলপুরী কি মূলতানী গোরুর মত উন্নতকায় ও বলিষ্ঠ না হইলেও বাঙলাদেশের গোরুর যে শান্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত শ্রী আছে, তাহা যেন আর কোন গোরুর মধ্যেই দেখা যায় না। বাঙলাদেশের গাভী খুব পয়স্বিনী নয় বটে, কিন্তু যে দুধটুকু সে দেয় তাহা সত্যই যেন ক্ষীর। এ অপরূপ মিষ্টত্ব আর কোন গোরুর দুধেই পাওয়া যায় না। বাঙলাদেশের ছাগল কিন্তু নিতান্তই সাধারণ। দেহ বা দুগ্ধ কোন দিক্ দিয়াই তাহার রামছাগলের মর্য্যাদা নাই। এখানকার ছাগলের ছাগজীবনের সার্থকতা দেবমন্দিরের যূপকাষ্ঠে ও ভোজনবিলাসীর রসনায়! বাঙলাদেশের কচিঘাসে পুষ্ট দেশী পাঁঠার মাংস মেদপুষ্ট দানাপুরী খাসির মাংসের তুলনায় কোন অংশে হেয় নহে।

বহু বাঙালীবাবু যত্ন করিয়া বিদেশী কুকুর পোষেন এবং দেশী কুকুরকে 'নেড়িকুত্তা' বলিয়া ঘৃণা করেন। পথেঘাটে যে কুকুর ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা সত্যই অতি কদর্য্য ও কুৎসিত। কিন্তু একটু আদর-যত্ন পাইলে ইহারাই 'বাঘা' 'কেলো' 'ভুলুয়া'-রূপে আদরণীয় ও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। বিড়ালের বিচিত্রিত বর্ণ ও রোমশ দেহ বোধকরি তাহাকে অতটা অবহেলার পাত্র করিয়া তোলে নাই। 'ষষ্ঠীর বাহন'-রূপে বাঙালী গৃহিণীরা বিড়ালকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আর অপুত্রক দম্পতির পোষ্য জীবরূপে বিড়াল তো আমাদের ঈর্ষার পাত্র। ইহাদের জন্য দৈনিক দুধ ও মাছের যে বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা আমাদের অনেকের ভাগ্যেই জুটে না। গৃহপালিত জীবরূপে গোরুছাগল ও কুকুর-বিড়াল পরিবারের পরিজনদের মত একান্ত আপন হইয়া উঠে।

বন্যপশুদের মধ্যে বানর ও শিয়াল আমাদের বিশেষ পরিচিত। ইহারা প্রায়ই লোকালয়ে আবির্ভূত হইয়া উপদ্রব শুরু করে। পণ্ডিতদের মতে বানরের ও মানুষের পূর্ব্বপুরুষগণ নাকি সহোদরস্থানীয় ছিল। তাই বোধকরি মানুষের উপর ইহাদের মমত্ব-বোধ একটু বেশি এবং সেই কারণেই আত্মীয়ের মত উপদ্রবও করে অকুণ্ঠিতচিত্তে। এক-একদিন দল বাঁধিয়া ইহারা লোকালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং লাফাইয়া-ঝাঁপাইয়া গৃহস্থের ভাঁড়ারে-রান্নাঘরে ঢুকিয়া দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেয়। শিয়ালের উপস্থিতি কিন্তু সহজে টের পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে নিঃশব্দে গৃহস্থের ঘরে ঢুকিয়া হাঁস বা মুরগী লইয়া অতি দ্রুত মিলাইয়া যায় বনের পথে। নির্জ্জন ও সুষুপ্ত পল্লীর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া প্রহরে প্রহরে সমস্বরে ডাকিয়া উঠে 'হুক্কা-হুয়া' স্বরে।

বাঙলার পশুজগৎকে কিন্তু আভিজাত্য দিয়াছে সুন্দরবনের কৃষ্ণপীত ডোরাসমন্বিত অতিকায় ব্যাঘ্র। শ্রী ও শৌর্য্যের মূর্ত্ত প্রতীক এই বাঘ Royal Bengal Tiger নামে ভুবনবিখ্যাত। ইহাদের ভয়ে ত্রস্ত ও চকিত নয়নে চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে

যখন সুঠাম ও তন্বঙ্গী* হরিণের দল নদীতে জলপান করিতে আসে, তখন এই অভিজাত পশুশ্রেষ্ঠ যেভাবে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে তাহা সত্যই দেখিবার মতো।

বাঙলার পাখীজগৎ আরো বিচিত্র ও রহস্যময়। কী অপূর্ব তাহাদের বর্ণসুষমা, কী সুমিষ্ট তাহাদের কণ্ঠমাধুরী, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ তাহাদের জীবন। অতি পরিচিত চড়ুই-শালিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও কালো ও কুৎসিত কাককে আমরা ভুলিতে পারি না। উচ্চনীচ তাললয়সমন্বিত মোরগের তীক্ষ্ণ ডাক সর্ব্বত্র শ্রুত না হইলেও, 'প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া' কাকের কর্কশকণ্ঠের কাকলী কর্ণগোচর হয় না এমন জায়গা বোধহয় বাঙলাদেশে নাই।

পাখীর পাখীত্ব কিন্তু তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠে। সেই দিক্ দিয়া 'বসন্তের কোকিলে'র বুঝি জুড়ি নাই। বসন্তে যখন মলয় পবন বহিতে থাকে, আম্রমুকুলের গন্ধে ও বকুল মাধবী রজনীগন্ধার সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া উঠে, তখন এই মধুকণ্ঠ কোকিল পঞ্চমস্বরে যে তান ধরে তাহাতে মোহিত না হয় কে! আবার বর্ষাকালে বউ-কথা-কও পাখী যখন কোন্ সলজ্জ কুলবধূর মুখে কথা ফুটাইবার জন্য অবিশ্রাম ডাকিয়া ডাকিয়া মিনতি জানায়, দিগন্তপ্লাবিত জ্যোৎস্নায় উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশাহারা হইয়া পাপিয়া যখন 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' বলিয়া ডাকিতে থাকে, তখন আমাদের সমস্ত মনপ্রাণও যেন কেমন আকুল ও উতলা হইয়া উঠে। নিদাঘের অলস ও উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে আকাশের স্ফটিকস্বচ্ছ জলের জন্য তৃষিত চাতকের আর্ত্তকণ্ঠের 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' ডাক যেন অকৃপণ মেঘের হৃদয় গলাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া, প্রকৃতির দরবারের জলসায় দোয়েল-পাপিয়া-শ্যামা ও আরও কত নাম-না-জানা পাখীর সম্মিলিত কণ্ঠের যে মধুর ঐকতান বাজিতে থাকে, কৃত্রিম সভ্যতার যন্ত্রসঙ্গীতের মোহে বিভ্রান্ত মানুষের তাহা শুনিবার কান কোথায়!

নীলকণ্ঠ, টিয়া, মাছরাঙার বর্ণবৈচিত্র্য, বাবুই ও টুনটুনির বাসাবোনার শিল্পনৈপুণ্য, ফিঙে ও খঞ্জনের সদাচঞ্চল পুচ্ছনৃত্য আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। লেজের গরবে ফিঙের তো মাটিতে পা পড়ে না—পাছে তাহার সুন্দর পুচ্ছ ধূলার স্পর্শে মলিন হইয়া যায়।

কয়েকটি পরিচিত পাখীকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর কতকগুলি সংস্কারের সৃষ্টি, হইয়াছে। পায়রা লক্ষ্মীমন্ত পাখী, বাঙালী গৃহিণী চালডাল ছড়াইয়া ইহাদের আহ্বান জানায়। কিন্তু এই পায়রাজাতীয় ঘুঘু ভিটেয় চরিলে তাহা নাকি গৃহস্থের সর্ব্বনাশের সূচনা করে। নিশাচর পাখী পেঁচার ডাক অত্যন্ত কর্কশ। কিন্তু লক্ষ্মীর বাহনরূপে

* তনু অঙ্গ = তন্বঙ্গ (কর্ম্মধারয়) + ইন্ (অস্ত্যর্থে) = তন্বঙ্গিন্। পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনে তন্বঙ্গী। বহুব্রীহি সমাসে তন্বঙ্গী স্ত্রীলিঙ্গ।

লক্ষীপেঁচার ডাক যেমন আকাঙ্ক্ষিত, কালপেঁচার ডাক তেমনি অশুভ ও অমঙ্গলদ্যোতক। তাই কালপেঁচার ডাক শুনিলেই অমঙ্গল দূর করিবার জন্য শঙ্খধ্বনি করা হয়।

হরিয়াল, বক, সারস, জলপিপি, কাদাখোঁচা প্রভৃতি পাখীকে মাংসের লোভে মানুষ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া থাকে। অনেকে আবার নিছক শিকারের নির্দয় আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য এইসব নিরীহ পাখীদের হত্যা করে।

যত্ন, কৌতূহল ও অভিনিবেশসহকারে পশুপক্ষীর রহস্যময় জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলে মানুষের নিকট অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ই উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে। পশু ও পাখী যে কত দিক্ দিয়া আমাদের সেবা ও কল্যাণ করিতেছে, অকৃতজ্ঞ মানুষ তখনই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

"হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস—" (ম. প. ১৯৫৬)

পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন পরিবেশে—কেহ ধনীর অট্টালিকায়, কেহ দরিদ্রের পর্ণকুটীরে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া তাহার জীবনযাত্রা হয় সুরু। জীবনের প্রতিযোগিতায় সকলেই তো একই স্থান হইতে, একই অবস্থা হইতে যাত্রা সুরু করিতে পারে না। আর্থিক অবস্থায়, শারীরিক সামর্থ্যে ও মানসিক ক্ষমতায় কত রকমের অসাম্য মানুষের। এই সকল জন্মগত অসাম্য মানিয়া লইয়াই তো মানুষকে জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়। এই অসাম্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কত রকমের মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে—কেহ বলেন কর্ম্মফল, কাহারও মতে দৈব, কাহারও মতে অদৃষ্ট।

নাম যাহাই দেওয়া হউক, আসল কারণটা কিন্তু অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। মানুষের জন্মগত পারিপার্শ্বিকের অসাম্য ঘটিবার কারণ বা তাহা দূর করিবার উপায়—কোনটাই মানুষ অদ্যাবধি জানিতে পারে নাই।

দৈব বনাম পুরুষকারের বিবাদটা বহুকাল হইতেই মানুষের সমাজে চলিয়া আসিতেছে। মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে দৈব-নামক অলক্ষ্য শক্তিরই প্রাধান্য, না মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টাই অধিক কার্য্যকরী—এ লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। মানুষে মানুষে সর্ব্ববিধ অসাম্য দূর করিবার জন্য জগতের চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ আজ কত পরিকল্পনাই রচনা করিতেছেন, কিন্তু বিপদ্ হইতেছে, যে পাথেয় লইয়া মানুষ তাহার জীবনপথ-পরিক্রমা সুরু করিয়াছে সেইখানেই যে বিরাট্ একটা অসাম্য রহিয়া গিয়াছে। এই অসাম্যের মূল কারণটাকে আমরা 'অদৃষ্ট' নামক একটি অজ্ঞাত বস্তুর উপর ন্যস্ত করিয়াছি। এই হিসাবে অদৃষ্ট-শব্দটার অর্থ হইল—যাহা দেখা যায় না, অর্থাৎ যাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধটা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির গোচর নয়।

কিন্তু এই অদৃষ্ট নামক অজ্ঞেয় শক্তিই কি আমাদের জীবনযাত্রার একমাত্র পাথেয় ? মানুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমও যে তাহার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে কম কার্য্যকর নহে তাহার দৃষ্টান্তও তো মানুষের ইতিহাসে কম নাই।

মূল কথা হইল, খানিকটা দৈবশক্তি বা অদৃষ্ট এবং খানিকটা কর্ম্মশক্তি বা পুরুষকার উভয়ে সম্মিলিতভাবেই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

অবশ্য একশ্রেণীর কর্ম্মহীন অলস জড়ভরত আছেন যাঁহারা একমাত্র দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা কি পরিমাণ সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারেন তাহা তাঁহারাই জানেন, তবে ঘুমন্ত সিংহের মুখগহ্বরে স্বেচ্ছায় কোন মৃগ প্রবেশ করিয়াছে, এমন কোন দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ পৃথিবীতে বেশী পাওয়া যাইবে না। দৈবের অনুকম্পায় লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা অধিকাংশই কর্ম্মী পুরুষ। প্রবল পুরুষকারের সঙ্গে যে জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলে, দৈব আসিয়া তাহারই গলায় বরমাল্য পরাইয়া দেয়, তাহারই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিয়া আমরা অদৃষ্টের জয়গান করি। অদৃষ্টই মানুষের অগ্রগতির পথ নিয়ন্ত্রণ করে : এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা, পুরুষকারের দ্বারা সেই অদৃষ্টকেও অনেকখানি গড়িয়া লওয়া যায় এ কথাও একেবারে মিথ্যা নহে। সুতরাং দৈব-নিয়ন্ত্রিত অদৃষ্টের অখণ্ডনীয় লিপিই একমাত্র কথা নহে।

আর যদি অদৃষ্টলিপির উপর মানুষের কোন হাতই না থাকে, তবে কি হইবে তাহা লইয়া বৃথা চিন্তা করিয়া ? আমরা আমাদের প্রবল পুরুষকারের সঙ্গেই কর্ম্ম করিয়া চলিব ; আমাদের হাতে যেটুকু করিবার আছে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া লাগিয়া যাইব আমাদের ভাগ্য-সংগঠনে। পথে যদি দৈবের কৃপালাভ সম্ভব হয়, অদৃষ্ট যদি সুপ্রসন্ন হয়—তবে তো ভালোই। যদি না হয়, তাহাতেই বা দুঃখ কি ? মনের আনন্দ তো আমাদের নিজেদের হাতে। অদৃষ্টে আমাদের যাহাই থাকুক, তাহাকেই হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবার মতো মনের বল আমরা নিশ্চয়ই হারাইব না। অলস অকর্ম্মণ্য জড়-ভরতের দল যদি অদৃষ্টের অনুকম্পালাভে স্ফীতোদর হইয়া আমাদের পরিশ্রমক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত মুখের উপর মোটরের কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যায় তাহা হইলেও ক্রোধ করিব না, অন্তরের শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া হা হুতাশ করিতে বসিব না, বরং ভাগ্যদেবীর এই অন্তঃসারহীন খামখেয়ালিপনাকে সগর্ব্বে পরিহাস করিয়া চলিব।

অদৃষ্টের অমোঘ বিধান যদি মাথা পাতিয়া লইতেই হয়, তাহা হইলেও দীন ক্রীতদাসের মতো দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাহা লইব না। অদৃষ্টের এই স্বেচ্ছাচারিতাকে উপহাসের দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়া পরম আনন্দেই আমরা আমাদের নির্দ্ধারিত কর্ম্মের পথে চলিব।

———

দেশোন্নতির কাজে বিজ্ঞানের আবশ্যকতা

বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে আজ আর বিজ্ঞানের যাদুকরী শক্তির কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের সোনার-কাঠির যাদুস্পর্শে রূপকথার সাতমহলা প্রাসাদের দ্বার আজ খুলিয়া গিয়াছে; উহার রহস্যময় কক্ষে কক্ষে জীবন-উপভোগের যে বহুবিচিত্র উপকরণ স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহা আজ মানুষ করায়ত্ত করিয়াছে। অসাধ্য-সাধনের কী অদ্ভুত ক্ষমতা বিজ্ঞানের।

দেশোন্নতির কাজে বিজ্ঞানের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। দেশোন্নতির কাজে বিজ্ঞান মানুষের অনুগত সেবক। যে-কোনপ্রকার সৃজন, পালন ও সংহারের কাজে বিজ্ঞানের সমান দক্ষতা। ঊষর মরুভূমিকে শ্যামল ও শস্যপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে বিজ্ঞান, নদীর দুরন্ত ও দুর্ব্বার জলরাশিকে বশীভূত করিয়া কোটি কোটি বিদ্যুৎকণার সৃষ্টি করিতেছে বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞানই মানুষের আজ্ঞাবহ দাসরূপে দুস্তর ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার বুকের উপর দিয়া মানুষের বিজয়রথকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

পৃথিবীর যে-কোন দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান। গ্রেট বৃটেন, জার্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশগুলি বিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পে, আকাশচুম্বী প্রাসাদ-নির্মাণে, নদী ও সেচ পরিকল্পনায়, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ-সৃষ্টিতে, ঔষধ-প্রস্তুতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অদ্বিতীয়। মাত্র কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের সহায়তায় সোভিয়েট রাশিয়া আজ পৃথিবীর অন্যতম উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে জাপান যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। উন্নত-ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করিয়া জাপান প্রতি একর জমিতে আশি-নব্বই মণ শস্য উৎপন্ন করিতেছে। মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া ও সুইজারল্যাণ্ড, যন্ত্রশিল্পে ও সূক্ষ্ম কারিগরীতে অপূর্ব্ব দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া দেশকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। সুদীর্ঘ রাষ্ট্রবিপ্লব ও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসানে নবীন মহাচীন আজ জাতিগঠন ও দেশোন্নয়নের কাজে বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নবজাত রাষ্ট্র ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিও নির্ভর করিতেছে এই বিজ্ঞানের উপর।

দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে হইলে, একদিকে যেমন বন্যা ও দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করিয়া জাতীয় জীবনের অপচয় বন্ধ করিতে হইবে, তেমনি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ্ ও বিরাট্ জনবলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া নিত্য নূতন ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। এই দুই দিক্ দিয়াই বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ সহায় ও পথনির্দ্দেশক।

ভারতবর্ষ এখনও কৃষিপ্রধান ও শিল্পে অনগ্রসর দেশ। সুতরাং কৃষির উন্নতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই এই সম্ভাবনাকে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। কারণ, কৃষির উন্নতির পথে যে দুইটি প্রধান অন্তরায়,—উপযুক্ত সারের অভাব ও জলাভাব, তাহা বিজ্ঞানের সাহায্যেই মিটিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন মাটি ও ভিন্ন ভিন্ন শস্যের উপযোগী বিভিন্ন সার বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যেই আজ আমাদের দেশে সিন্ধিতে এশিয়ার বৃহত্তম সার-উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

জলের জন্য কৃষককে আজ আর সতৃষ্ণ নয়নে উদ্বেগাকুল প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। বিজ্ঞানের কৃপায় নদীতে বাঁধ দিয়া বর্ষার বন্যার বিপুল জলরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিরাট্ জলাধারে সঞ্চিত করিয়া রাখা হইতেছে এবং উহার দ্বারা লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া নদী হইতে বহুদূরে অবস্থিত এমন অনেক রুক্ষ ও অনুর্ব্বর স্থান রহিয়াছে, যেখানে এই সেচের জল পৌঁছায় না। সেখানেও বিজ্ঞান মানুষের মুক্তিদাতা। ধরিত্রীমাতার বক্ষে যে সুধারাশি সঙ্গোপনে সঞ্চিত আছে, বিজ্ঞান গভীর নলকূপ খনন করিয়া তাহার উৎসমুখ খুলিয়া দিতেছে, মানবসন্তানের কল্যাণে সেই সুধারাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া অজস্রধারায় প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ একটি গভীর নলকূপ দশ-বারোখানি অনুর্ব্বর গ্রামকে জলসিঞ্চনে শ্যামল ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারে। কৃষির উন্নতির দ্বারা খাদ্যের দিক্ দিয়া দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ই হইবে না, উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে বিক্রয় করিয়া দেশ ঐশ্বর্য্যশালীও হইবে।

আধুনিক যন্ত্রযুগে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ছাড়া দেশোন্নয়ন সম্ভব নহে। সুতরাং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রশিল্পেরও দ্রুত প্রসার করিতে হইবে। একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হইতে পারে। দেশকে এরূপভাবে শিল্পসমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে যেন নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিসের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে না হয়। নূতন নূতন যন্ত্রশিল্প প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশের সমস্তপ্রকার কাঁচামালকে শিল্পে নিয়োজিত করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। অন্যদিকে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীর দল উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভূস্তরের গোপনকক্ষে সযত্নে রক্ষিত অনাবিষ্কৃত নব নব খনিজ সম্পদ্ আহরণ করিয়া আনিবে।

দেশোন্নয়নের কাজে নূতন রাস্তাঘাট ও শহর নির্ম্মাণের প্রয়োজন। এখানেও বিজ্ঞানের দান অনস্বীকার্য্য। আধুনিক স্থাপত্যশিল্পে ও নগর-পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছে। নদীর উপর সেতুবন্ধন, পর্ব্বত-অরণ্য ভেদ করিয়া রাস্তা-নির্ম্মাণ, সুউচ্চ প্রাসাদ-সৃষ্টি আজ বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে অত্যাশ্চর্য্য দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইতেছে।

দেশকে উন্নত করিতে হইলে দেশের পশুসমাজকেও অবহেলা করা উচিত নয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসায়, উন্নত-ধরনের মাছের চাষ ও পশুপালন প্রভৃতি

দেশোন্নতির সহায়ক। এই সকল ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিলে দ্রুত সুফল লাভ করা যাইবে।

কিন্তু শুধু কৃষি-শিল্পের উন্নতি ও সম্পদ সৃষ্টি করিলেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে না। দেশের চরম ও চিরস্থায়ী উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। সুতরাং দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশের শিক্ষাকেও উন্নত করিতে হইবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান শিক্ষানীতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

আমাদের রাষ্ট্রকর্ণধারগণ দেশোন্নতির কাজে বিজ্ঞানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এই পথেই দেশোন্নয়নে ও জাতিগঠনে অগ্রসর হইয়াছেন।

দেশ ও জাতির কল্যাণকর বহুমুখী উন্নতিমূলক কাজে সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, বন্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সংখ্যাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের পবিত্র হস্তের কল্যাণ-স্পর্শে জাতীয় জীবনের সকল দিকে সোনার ফুল ফুটিয়া উঠিবে,—স্বাস্থ্যশ্রী, জ্ঞানগরিমা ও ঐশ্বর্য্যদীপ্তিতে দেশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

—

সঙ্কেতে নিবন্ধ

(১) বাঙলার কুটীরশিল্প

১। সূচনাঃ প্রাচীন বাঙলার কুটীরশিল্পের সমৃদ্ধি—রেশম তাঁত পাট প্রভৃতি সকল শিল্প তখন বাঙলার কুটীরে কুটীরেই ছড়াইয়া ছিল ইত্যাদি।

২। বাঙলার কুটীরশিল্পের বিবরণঃ (ক) প্রাচীনঃ সেকালে তাঁতশিল্পে বাঙলার নৈপুণ্য—ঢাকার মস্‌লিন বস্ত্র, উহার বহির্বাণিজ্য, দেশবিদেশে খ্যাতি; রেশমশিল্প—পলুপালন, তসর-গরদ-মটকা প্রভৃতি বস্ত্রের বয়ন; পাট হইতে সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন, পট্টবস্ত্রের ব্যবহার; মৃৎশিল্প—তৈজসপত্র, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ প্রভৃতি; এইগুলি ব্যতীত আরও অসংখ্য শিল্পকার্য্য—সেই শিল্পবৃত্তি-অনুসারে সেকালের সমাজবিভাগ—কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর, স্বর্ণকার প্রভৃতি শ্রেণীর উদ্ভব। প্রাচীন যুগের সীবনশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নক্সীকাঁথা—কাশ্মীরী শালের কারুকার্য্যকেও হার মানাইয়া দেয় ক্ষেত্রবিশেষে; বাঙলার পূজাপার্ব্বণ ও দশকর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া সারাদেশে বিচিত্র কুটীরশিল্পের প্রসার ও উৎকর্ষ।

(খ) বর্ত্তমান অবস্থাঃ আশাপ্রদ নহে—যন্ত্রের আক্রমনে ম্রিয়মাণ, কেবল বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্মশিল্পগুলি এখনও কোনক্রমে বাঁচিয়া—রেশমশিল্প বাঙালীর অবহেলায় নষ্ট হইয়াছে। ইহা কলকারখানাজাত কৃত্রিম রেশমের সহিত অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। ইহার অবনতির কারণ ও অন্যান্য শিল্পের অবনতি-বিশ্লেষণ।

৩। কুটীরশিল্পের উপযোগিতাঃ বাঙলার সমাজের ভিত্তিই রচিত কুটীরশিল্পের উপর—যন্ত্রশিল্পের ছাঁচে গঠিত নয়; কাজেই কুটীরশিল্পের সহিত বাঙলার গ্রামগুলির জীবনমরণ সমস্যা জড়িত। দ্বিতীয়তঃ এদেশ কৃষিপ্রধান, কিন্তু জলের জন্য প্রকৃতির কৃপার্থী বাঙালী কৃষক—বৎসরে অনেক সময় তাহাদের অবসর, সুতরাং কুটীরশিল্প তাহাদের সহায় ইত্যাদি।

৪। কুটীরশিল্পের পুনরুন্নয়নের উপায়ঃ গ্রাম্য শিল্পীদিগকে মূলধন, কাঁচামাল ও উৎসাহ সরবরাহ—এজন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান-প্রবর্ত্তন। ঋণদান ও যৌথ ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শাসনকর্তৃপক্ষের মনোযোগ ও সহযোগ চাই—বিজ্ঞানের সাহায্য সম্ভবস্থলে গ্রহণ ইত্যাদি।

৫। উপসংহারঃ আজ 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' রব উঠিয়াছে—কিন্তু গ্রামে জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ করিতে হইবে কুটীরশিল্পের প্রসারে—বাঙালীসমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে ইত্যাদি।

(২) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

১। সূচনা: শিক্ষা দেহ ও মন উভয়েরই শিক্ষা বুঝায়—কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষা বলিতে স্কুল-কলেজের মানসিক শিক্ষাকেই বুঝায় ইত্যাদি।

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য: দেহমনের উৎকর্ষ-সাধন—পুঁথি-পুস্তকের শিক্ষা মনের পরিপোষণ করে—দেহের পুষ্টির জন্য চাই অন্যতম শিক্ষা—তাহাই স্বাস্থ্যচর্চ্চা।

৩। স্বাস্থ্যহীনের শিক্ষা: নিরর্থক, বিড়ম্বনা—কর্ম্মক্ষেত্রে ও সাধারণ জীবনে স্বাস্থ্যহীনতার ন্যায় অভিশাপ নাই—দৃষ্টান্ত, আলোচনা।

৪। স্বাস্থ্যের বৃহত্তর অর্থ: মানসিক স্বাস্থ্যও বুঝায়—যে শিক্ষা মনকে বিকৃত করে তাহা নিষ্ফল—শিক্ষার আদর্শে তাই কায়িক ও মানসিক উভয়প্রকার স্বাস্থ্যের প্রশ্নই নিহিত।

৫। আধুনিক জগতে শিক্ষা: রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিকৃত—উদাহরণ, আলোচনা।

৬। উপসংহার: শিক্ষার প্রকৃষ্ট আদর্শ স্বাস্থ্যের পরিপুষ্টিদায়ক—মানুষের কায়মনোবাক্যে সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি—আমাদের দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা—মন্তব্য।

(৩) স্ত্রীশিক্ষা ও গৃহস্থালী

১। সূচনা: স্ত্রীশিক্ষা এদেশের সর্ব্বসাধারণের সোৎসাহ সমর্থন লাভ করে নাই; কারণ রক্ষণশীলতা, ভ্রান্ত ধারণা—অবশ্য বিকৃত শিক্ষার উদাহরণও অনেকের বিরূপতার হেতু ইত্যাদি।

২। স্ত্রীশিক্ষায় গৃহস্থালীর স্থান: নারী প্রধানতঃ মাতা, গৃহিণী—তাহার শিক্ষা তাই নারীত্বের পরিপুষ্টিসাধন করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়—পুরুষের ন্যায় কলাবিজ্ঞানাদি-বিষয়ে তাহাদের শিক্ষার সুযোগ যেমন থাকা উচিত তেমনি সেই সঙ্গে গৃহধর্ম্মের মূলনীতিবিষয়েও চাই শিক্ষা—এইরূপ শিক্ষাই আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা।

৩। আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা: উহা পুরুষের শিক্ষার তুল্য, শুধু তাহা নহে—উহাতে নারীধর্ম্মের বিকাশসাধনের ব্যবস্থা নাই, ফলে মেয়েদের বিকৃতি—আচারে আচরণে বিবিয়ানা, গৃহধর্ম্মের প্রতি বিরূপতা—উহাতে শঙ্কার উদ্ভব হয় এই যে নারীগণ এরূপ শিক্ষা পাইলে ঘর গুছাইবে কে?

৪। স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ: পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মৌলিক ব্যবধান ও সাধারণ ধর্ম্ম। জ্ঞানবিজ্ঞানে স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে তাহার উদাহরণ—এইরূপে জগতের প্রতি তাহাদের দান—সেই দানের পথ রুদ্ধ করা অসঙ্গত—পুরুষ ও

স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে তাই কৃত্রিম প্রাচীর-রচনা ভুল—তবে স্ত্রীশিক্ষায় কতকগুলি জিনিসে বেশী জোর দিতে হইবে—সেই দিক্‌টা গৃহস্থালীর—আলোচনা।

৫। উপসংহার: স্ত্রীশিক্ষা ও গৃহস্থালী পরস্পরবিরোধী নহে—একটি অপরটির পরিপূরক—গৃহস্থালী কেবল রান্নাবাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সীমবদ্ধ নহে—সুগৃহিণী হইতে হইলে মানসিক গুণাবলী, শিশুপালন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, নিয়মশৃঙ্খলা প্রভৃতিও প্রয়োজন—সিদ্ধান্ত।

(৪) বিপদে ধৈর্য্য (ক. বি. প্র. বিশেষ ১৯৫০)

১। সূচনা: এ সংসারে বিপদ-আপদ অপরিহার্য্য—ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হয়—ইহার জন্য মানুষের প্রধান অস্ত্র হইল ধৈর্য্য।

২। ধৈর্য্য: ইহা নির্বীর্য্য সহনশীলতা নহে—গর্দ্দভের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, মানুষের মধ্যে তাহা বিসদৃশ। ধৈর্য্যের মধ্যে সহিষ্ণুতা অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা শক্তিশালীর সহিষ্ণুতা, অপরিহার্য্য দুর্ভাগ্যকে মাথা পাতিয়া সহিবার ক্ষমতা। মত্ত প্রভঞ্জন বটের মূল উৎপাটন করিতে চাহে—বট সধৈর্য্যে প্রতিরোধ করে, ভাঙিয়া পড়ে না—ইহাই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধৈর্য্য নিষ্ক্রিয় নহে—উহার পশ্চাতে সক্রিয় প্রয়াস থাকা চাই—নচেৎ উহা শক্তিহীনের অলস দুঃখবরণের নামান্তর হইয়া পড়ে।

৩। বিপদে ধৈর্য্যের উপযোগিতা: হঠকারিতা সর্ব্বদাই হানিকর। তাহা ছাড়া অধৈর্য্যে বুদ্ধি লোপ পায়, শক্তিসত্ত্বেও পরাজয় ঘটে। ধৈর্য্য তাই বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার প্রচুর শক্তি থাকিলেও প্রয়োজন—জগতের ইতিহাসে শক্তি-মদমত্তেরই পরাজয় বেশী—সাক্ষাৎ বিপদকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিলেই হইল না, পরিণামও বিবেচনার যোগ্য—ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করিতে হইলে চাই ধৈর্য্য—উদাহরণ।

৪। উপসংহার: মানবজীবনে পাণ্ডিত্য, শক্তি প্রভৃতি সকলে যাহা কিছু করিতে পারে একা ধৈর্য্য তাহার চেয়ে বেশী ফলপ্রদ—কর্ম্মজগতে ধৈর্য্যের মত সহায় নাই—ব্যস্তবাগীশ শুধু বিপদেই বিব্রত হয় না, সম্পদেও কার্য্য পণ্ড করে—মন্তব্য, উদাহরণ, আলোচনা।

(৫) বাঙলার শিল্প (ক. বি. ১৯৪১)

১। সূচনা: প্রাচীনকালে বাঙলার শিল্প জগতের বিস্ময় ছিল—দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্র ছিল তাহার সমাদর—বর্ত্তমানে বাঙলা সে গৌরব হারাইয়াছে—তবু বাঙলার শিল্প একেবারে নগণ্য নহে।

২। বিবরণ—অতীত ও বর্ত্তমান: 'কুটীরশিল্প' প্রবন্ধের সঙ্কেত দ্রষ্টব্য।

৩। বাঙালীর শিল্পপ্রয়াসের মূল প্রেরণাঃ বাঙালীর সুকুমার শিল্পমনঃ রূপ-পিপাসু বাঙালী ঘটে-পটে নাচে-গানে সকল বিষয়েই ইহার পরিচয় দেয়—দ্বিতীয় প্রেরণা বাঙালীর সমাজজীবনের বিচিত্র প্রয়োজন হইতে আসে—এদেশের পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে মূর্ত্তিশিল্প, বাস্তশিল্প, কুসুমশিল্প, চিত্র, আলপনা, শোলার কাজ, আরও কত শত শিল্প—বাণিজ্যব্যপদেশে তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প, মৃৎশিল্প, হাতীর দাঁতের কাজ, তৈজসশিল্প প্রভৃতি—ইহাদের কিছু কিছু বহির্বাণিজ্যেরও উপকরণ।

৪। অবনতির কারণঃ যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা, বিদেশী শাসকের প্রতিকূলতা, অভ্যন্তরীণ নানাপ্রকার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণ।

৫। পুনরুন্নয়নের উপায়ঃ 'কুটীরশিল্প' দ্রষ্টব্য।

৬। উপসংহারঃ বাঙালীর অস্তিত্বরক্ষার জন্য, ঐতিহ্যরক্ষার জন্য বাঙলার শিল্পের পুনরুন্নয়নের প্রয়োজন ইত্যাদি।

(৬) **শীতকালে বাঙলাদেশের শোভা** (ক. বি. প্র. অতি. ১৯৪৯)

১। সূচনাঃ ঋতুহিসাবে বাঙলার সাহিত্যে শীত উপেক্ষিত—কিন্তু ভারতের অন্য যে-কোন প্রদেশে যেমনই হউক না কেন, বাঙলায় শীত সৌন্দর্য্যে সম্পদে বিশেষ শ্রীমণ্ডিত ইত্যাদি।

২। শীতের বর্ণনাঃ প্রত্যূষে কুয়াসার কুহেলী—স্বর্ণোজ্জ্বল তপনের অপরূপ অভ্যুদয়—দিবসে নির্ম্মেঘ গগনতলে প্রখর কিরণ—রবিশস্যের প্রাচুর্য্য—পাশ্চাত্ত্য-শীতের ন্যায় পত্রপল্লবহীন নহে প্রকৃতি—বরং ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ শীত—শাকসব্জী প্রভৃতির প্রাচুর্য্য—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য—মানুষের দেহ-মনে আনন্দ—হৈমন্তিক শস্য-সম্ভার ঘরে ঘরে—পেটে ক্ষুধা মুখে হাসি—মানুষও সুন্দর শীতে—রসের প্রাচুর্য্য—খেজুরেও ক্ষরে রস।

৩। শীতের শোভায় বাঙলার প্রাণস্পন্দনঃ বিভিন্ন পার্ব্বণ—পৌষসংক্রান্তি, শ্রীপঞ্চমী প্রভৃতি—পিঠেপুলির সম্ভার—কৃষকের সাময়িক অপেক্ষাকৃত অবসর—গান-কীর্ত্তনের মহড়া—দিকে দিকে আনন্দ।

৪। উপসংহারঃ শীতের সৌন্দর্য্য এইরূপে মানুষে প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত—উহার আবেদন প্রতি বাঙালীর অন্তরে।

(৭) **খাদ্যসমস্যা**

১। সূচনাঃ ভারতে খাদ্যসমস্যা আজ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় উপনীত—বিশেষ করিয়া বাঙলার অবস্থা শোচনীয় ইত্যাদি।

২। সমস্যার স্বরূপঃ ইহা পশ্চিম-বাঙলার বিপুল জনসংখ্যা এবং পাকিস্তান-বিতাড়িত জনসংখ্যার অন্নসংস্থানের সমস্যা—ভারত-বিভাগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি

বাঙলার—বাঙলা ভারতে সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ—তাই সৈন্যসমাবেশ, বিভিন্ন সর্ব্বভারতীয় দপ্তরের কর্ম্মচারীদিগের অবস্থান—পশ্চিম-বাঙলা শিল্পপ্রধান—পাকিস্তানের সহিত পাট-ব্যবসায়ে অচল অবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বহু ভূভাগ পাটচাষে নিয়োগ—প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে বা ভয়ে চাষীদের বাস্তুত্যাগ, তাহাতে অনাবাদী জমি পড়িয়া থাকা—এই সকল কারণে চাউল-সমস্যা—খাদ্যসামগ্রীর অন্যান্য বহু দ্রব্য—মৎস্য, মাংস (ছাগ, মুরগী ইত্যাদি), ডিম, ঘি প্রভৃতি পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল।

৩। প্রতিকার : সাময়িক : অনাবাদী জমির বাধ্যতামূলক চাষ—শরণার্থী চাষীর পুনর্বাসন, লাঙ্গলাদি কৃষি-যন্ত্র সরবরাহ—ট্র্যাক্টর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, উন্নত সার ও জলসেচের (খাল, নলকূপ ইত্যাদির দ্বারা) সুবন্দোবস্ত করা—বন্যা-নিরোধের সাময়িক ব্যবস্থা—কৃষকদিগের মধ্যে শিক্ষা বিতরণ। খাদ্যশস্যের বণ্টন : চোরাকারবার দমন—বড় চাষীর মজুদ ব্যবসায় সংযত করা—কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি-নিবারণ—মজুতশস্য কড়া আইনে বাজারে বাহির করার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা—দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—দামোদর ভ্যালি ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা দ্রুত কার্য্যে পরিণত করা—উত্তরোত্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তন—কৃষিসম্বন্ধে গবেষণা—কৃষকের শিক্ষা ইত্যাদি।

৪। উপসংহার : জাতির স্বাস্থ্য, জীবন, তথা ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সমাধানের উপর—সর্ব্বশক্তিপ্রয়োগে ইহার প্রতিকার চাই—ইহার জন্য সাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ সহযোগিতা চাই—ধনীর নিষ্ঠুরতা যেন জাতীয় ধ্বংসের কারণ না নয়—প্রচার—ইত্যাদি।

(৮) ভারতের বনসম্পদ

১। সূচনা : সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে সারা ভারতবর্ষব্যাপী বনমহোৎসব হইয়া গিয়াছে—এ-সম্বন্ধে কেহ সত্যই উৎসাহ বোধ করিয়াছে, কেহ বা ইহা লইয়াই ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছে—প্রকৃতপক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকে ইহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ইত্যাদি।

২। বনসম্পদ : বন বলিতে কেবল বৃক্ষরাজিপূর্ণ অরণ্য বুঝি—তাহার প্রতি আকর্ষণ প্রব্রজ্যার বয়স হইলেই মাত্র সম্ভব—মুনিঋষির কথা স্বতন্ত্র—বৈষয়িক মানুষের কাছেও বনসম্পদ—কাঠ ও উহার বিচিত্র ব্যবহার, ঘরবাড়ী, জানা[illegible] আসবাব, জালানী, রেলের স্লিপার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া নানা [illegible]প্রাচ্যের ব্যবহার—গালা, রজন—বনজ সম্পদ—কস্তুরীমৃগের নাভি, নানাপ্রকার [illegible]গৌরব এইরূপ বহু প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তুর ভাণ্ডার বন, আর এক হিসাবে বন আ[illegible] পরম সম্পদ—বৃষ্টিপাতবৃদ্ধির কারণ বন, অজন্মা-নিবারণে ইহার দান [illegible]

ক্ষয়নিবারণ, আবহাওয়ানিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বনের কাজ—বনজ শিল্পে ভারতে প্রচুর ধনাগম—বিশেষ করিয়া ডলার-সঙ্কটের দিনে ইহার সমৃদ্ধি খুব প্রয়োজন।

৩। ভারতের বনভূমির ক্ষয়ঃ নিবারণের উপায়, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, পুষ্করিণী খনন করিয়া পাড়ে বৃক্ষরোপণ এককালে ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল—বর্ত্তমানে সে মনোভাব ফিরাইয়া আনা দুষ্কর—সরকারকেই তাহার ভার লইতে হইবে—বিশেষ প্রচার ও বনসংরক্ষণ ও পুষ্টির বিধান করিতে হইবে ইত্যাদি।

৪। উপসংহারঃ মানুষের পূর্ব্বপুরুষ নাকি বনমানুষ—বনের প্রতি মোহ বন্যতার পরিচয় নহে—আধুনিক জীবনের তাগিদেই চাই বনসম্পদের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(৯) "রৈল যারা পিছুর টানে কাঁদবে তারা কাঁদবে"

১। সূচনাঃ প্রবচনটির অর্থঃ রক্ষণশীল মনোভাব লইয়া যাহারা অতীতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে তাহাদের পরিণাম দুঃখময়—এ বিশ্ব চলমান—মুহূর্ত্ত গড়াইয়া পড়ে ভবিষ্যতের মুহূর্ত্তে বিপুল বিবর্ত্তনক্রমে ইত্যাদি।

২। মানব ও জড়জগৎ বিবর্ত্তনশীলঃ প্রকৃতি হইতে উদাহরণ—বিশ্বসৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত বিপুল পরিবর্ত্তন—মানুষেব ইতিহাস—নগ্ন বর্ব্বর অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্যতার স্তরে ক্রমবিকাশ—ইহার মধ্যে স্থির নিশ্চল হইয়া থাকিবার উপায় নাই—থাকিলে বদ্ধ জলার দশাপ্রাপ্তি অনিবার্য্য ইত্যাদি।

৩। আলোচনাঃ রক্ষণশীলতা বর্জ্জনীয়—তাই বলিয়া যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই বর্জ্জনীয় নহে—আসল কথা অতীতের ভাণ্ডারেই সঞ্চিত আমাদের চলার পথের পাথেয়—প্রবচনটির অর্থ তাই অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা নহে—যে গোরু খোঁটায় বাঁধা তাহার তৃণখাদ্য অচিরেই ফুরাইয়া যায়, দুঃখ হয় অনিবার্য্য—অতীতের সহিত আমাদের সংযোগ দড়ির বাঁধনে বদ্ধ থাকা উচিত নয়—চলার পথে চলিতেই হইবে, অতীত শুধু দিবে আলো, দিবে প্রেরণা ইত্যাদি।

৪। উপসংহারঃ প্রাচীনপন্থী অন্ধ গোঁড়াগণ তাই নিন্দনীয়—তাহাদের স্থান নাই প্রগতির জগতে—দুঃখ তাহাদের ভাগ্যে—কিন্তু নূতনের নেশায় আতিশয্যও বর্জ্জনীয় ইত্যাদি।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

প্রবেশিকা বাঙলা রচনা ও নিবন্ধ-এর

অবশিষ্টাংশ

১। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রদত্ত কয়েকটি নূতন নিবন্ধ

২। চুম্বক-লিখন (Precis-Writing)

৩। গল্প-গঠন (Story-building)

[এই শ্লিপের বিনিময়ে উপরোক্ত **অবশিষ্টাংশ** অনুগ্রহপূর্ব্বক
১৯৫৯ এপ্রিল-এর মধ্যেই গ্রহণ করিবেন।]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

বাঙলা ভাষার প্রধান শিক্ষক

স্কুলের সিল

মহাশয়ের স্বাক্ষর

তারিখ